ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৩৩ ভাগ ।
৪ সংখ্যা ।

১৬ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৮১৯ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফঃস্বলে ৩

প্রার্থনা ।

হে দেবাদিদেব, তুমিই আমাদের বন্ধু, নিত্যকালের বন্ধু । তোমার মত বন্ধু বল আমাদের আর কে আছে ? তুমি বন্ধু হইয়া আমাদের সম্বন্ধে যখন যাহা ব্যবস্থা কর তাহাই আমাদের সম্বন্ধে কল্যাণ ও মঙ্গল । আমরা যদি তোমার প্রতি অনুরক্ত হই, তাহা হইলে দুঃখও দুঃখ থাকে না, ক্লেশও ক্লেশ থাকে না, এমন কিছু নাই যাহা তোমার জন্য আমরা বহন করিয়া সুখী হই না । যাহা তুমি হাতে তুলিয়া দাও না, তাহা যদি রাজ্যপদও হয়, তাহা আমাদের নিকট কেবল তুচ্ছ নহে, বিষতুল্য প্রাণহানিকর । বিবিধ পরীক্ষা বিপৎ যদি তোমাপ্রেরিত হয়, তাহা হইলে ধন জন সম্পৎ অপেক্ষা উহা আমাদের অতি আদরের সামগ্রী । তোমার হাত হইতে যাহা আইসে তাহাই ভাল, এ কথায় কি এতদিন পরে আমরা অবিশ্বাস করিব ? আমরা প্রথমে যাহা মন্দ মনে করিয়াছিলাম, তাহাই আমাদের সম্বন্ধে ভাল হইল, ইহা কি আমরা শতবার দেখি নাই ? যদি তোমায় আমাদের পরম সুহৃৎ বলিয়া বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে কি আর কখন এ বিষয়ে সন্দেহ করিতাম । যদি এখনও সংশয় রহিল, তাহা হইলে আমরা তোমায় আজও সুহৃৎ বলিয়া গ্রহণ করি নাই । "সকল ঘটনা সত্যমূলক" এ কথা তিনিই বলিতে পারেন, যাঁহার তোমার সৌহৃদ্যের প্রতি স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে । যে কোন ঘটনা আমাদের সম্বন্ধে ঘটুক তাহার মূলে সত্য আছে, তোমার বিশেষ অভিপ্রায় আছে, এ বলিয়া যদি ভক্তিনয়নে বিশ্বাসনয়নে সেই ঘটনা দেখি, তাহা হইলে তোমার কি অভিপ্রায় এবং আমাদের জন্য কোন্ মঙ্গল তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাহা কি আর আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে ? এত দিন পরেও যদি তোমার উপরে আমাদের পূর্ণ আস্থা না জন্মিল তাহা হইলে বল আমাদের মত ঘোর অপরাধী আর কে আছে ? হে পরমদেব, এই জন্য তব সন্নিধানে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি তোমার স্থির সৌহৃদ্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ়, আমাদের ভক্তিনয়ন বিশ্বাসনয়ন উজ্জ্বল ও আবরণমুক্ত, এবং 'সকল ঘটনা সত্যমূলক' এ কথার প্রতি আমাদিগকে আস্থাবান্ করিয়া দাও । আমরা এইরূপে চিরদিনের জন্য তোমার বিশ্বাসী সন্তান হইয়া কৃতার্থ হইব, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে প্রণাম করি ।

সর্ব্বাতীত, স্বয়ংরূপ ও সর্ব্বগত ঈশ্বর।

এক, অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্নভাবে সাধকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। আমাদের আরাধনা মধ্যে এই তিন ভাবেরই সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সর্ব্বাতীত ঈশ্বর "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" এই আরাধনাবাক্য মধ্যে স্পষ্ট প্রকাশিত। যিনি অনন্ত তিনি সর্ব্বাতীত। সর্ব্বাতীত না হইয়া কখন অনন্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। অনন্ত সমকক্ষ দুই বস্তু কল্পনা করিতে পারা যায় না। যেখানে সমকক্ষতা সম্ভব, সেখানেই শক্ত্যাদিতে পরিমিতত্ব উপস্থিত হইবেই হইবে। দুই ব্যক্তির যদি সমান শক্তি থাকে, তাহা হইলে কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিবে না, উভয়ের শক্তি প্রকাশের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র থাকিবে, যদি না থাকে তাহা হইলে চির সংগ্রাম চলিবে। পারসিকেরা ভাল ও মন্দ দুই শক্তির চিরবিবাদ কল্পনা করিয়া অন্তে ভাল কর্ত্তৃক মন্দের পরাজয় স্বীকার করাতে মন্দের সান্তত্ব এবং ভালর অনন্তত্ব পাকতঃ মানিয়াছেন। এই মন্দ অসৃষ্ট নয়, সৃষ্টেরই পতনের অবস্থা এ কথা বলিয়া ইহুদিগণ উহার সান্তত্ব আরও সুস্পষ্ট করিয়াছেন। কাল ও দেশ এ দুই আমাদের চিন্তায় অনন্ত; কিন্তু ইহারা সৃষ্ট বস্তুগত বলিয়া সান্তত্ব ইহাদের সঙ্গে লাগিয়াই আছে। বস্তুতঃ স্থিতি ও গতি এ দুই আশ্রয় করিয়া যখন দেশ ও কালের প্রকাশ তখন উহারা একই বিষয়ের দুই দিক্, ইহা বলিলে কিছু ক্ষতি হয় না।

যে দিক্ দিয়া দেখা যাউক, ঈশ্বরের অনন্তত্ব যে আমাদের মনে তাঁহার সর্ব্বাতীতত্ব ও একত্ব মুদ্রিত করিয়া দেয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অনন্তের দ্বারা যদি অন্য সমুদায় নিরবকাশ হয়, তাহা হইলে এ সৃষ্টির অবকাশ হইল কি প্রকারে? এক বহু হইলেন কিরূপে? "অজায়মানো বহুধা ব্যজায়ত" বেদান্তের এই বাক্য স্রষ্টার সর্ব্বাতীতত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সৃষ্টি হইল প্রদর্শন করিতেছে। 'জায়মান না হইয়াও বহুপ্রকারে জন্মিলেন' এ কিরূপ কথা? আপনি যেরূপ সেইরূপ থাকিয়া বহু প্রকার হইলেন এ বাক্যের এরূপ অর্থ করিলে আমাদের মনে কি ভাবের উদয় হয়? যিনি বহু হইলেন তিনি জড় না চেতন? যদি জড় হন, তাহা হইলে বহু হইতে গিয়া আত্মস্বরূপ ত্যাগ অপরিহার্য্য, কেননা জড় রূপান্তর হইলেই সে পূর্ব্বস্বরূপ হারাইয়া ফেলে। বিশেষতঃ জড়ে একত্ব নাই, একত্ব থাকিলে বহুত্ব হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে, কেননা জড় অপর জড়ের সহিত সংযোগ বিনা নূতন অন্য কিছু উৎপাদন করিতে পারে না। যদি বল জড় স্থূল জড় নয় শক্তিমাত্র, তাহা হইলে শক্তির আত্মস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া বিবিধ ভাবে প্রকাশ সম্ভব বটে, কিন্তু শক্তির বিবিধ ভাবে প্রকাশের মধ্যে চেতনত্ব প্রকাশ পায়, সুতরাং শক্তি বলিতে চেতনশক্তিই বুঝাইতেছে। চেতনশক্তি জায়মান না হইয়াও বহু প্রকারে জন্মায়, ইহা আমরা আত্ম দৃষ্টান্তেই নিয়ত বুঝিতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগের হইতে সহস্র প্রকারের ভাব আত্মাকারে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ আমরা যে এক সেই একই থাকিয়া যাইতেছি, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া সে সমুদায় ভাব বা তদ্ব্যঞ্জক শব্দ নয়, আমরা তাহাদের সহিত নিত্য অনুস্যূত। সমুদায় মানবকে এক মানব এবং সমুদায় ভাব ও তদ্ব্যঞ্জক শব্দ সেই এক মানবের যদি আমরা কল্পনা করি, তাহা হইলে ঈশ্বর আপনি যেরূপ সেইরূপ থাকিয়া বহুধা হইলেন কিরূপে তাহার নিদর্শন কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়। আমরা অল্পজ্ঞান মানব, এ ভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে আমরা আর কি উৎকৃষ্ট নিদর্শন গ্রহণ করিতে পারি।

অনন্ত স্বরূপের অতীত ভূমিতে নহে, তাঁহারই অভ্যন্তরে কোটি কোটি জগৎ ও জীবের প্রকাশ স্বীকার করিয়া আমরা অনন্তস্বরূপের সর্ব্বাতীতত্ব ও একত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলাম, এখন তাঁহার স্বয়ংরূপত্ব কি একবার নির্দ্ধারিত হউক। অনন্তের অভ্যন্তরে

যে জীবসমূহ প্রকাশ পাইল তাহারা সেই অনন্ত-নিরপেক্ষ হইয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থ, অথবা সর্ব্বথা তৎসাপেক্ষ? অনন্ত ভিন্ন যখন আর সকলই সান্ত, সান্ত হইলেই যখন শক্ত্যাদিতে হীন, তখন তাহারা যে অনন্ত সাপেক্ষ ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। যখন ইহারা সাপেক্ষ তখনই অনন্তের স্বরূপের ভিতরে এমন কিছু আছে, যাহাতে তাহাদিগের সকল অভাব পূরণ হইতে পারে। "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" আরাধনার দ্বিতীয় বাক্য তাহা কিছু কি ব্যক্ত করে? শান্ত অর্থাৎ সর্ব্বাতীত হইয়াও তিনি শিব। এই শিব বা মঙ্গল এক হইয়া বহুধা প্রকাশ পান। সর্ব্বাতীত অনন্তের বহুধা প্রকাশ এবং এ স্বরূপের বহুধা প্রকাশের মধ্যে একটু ইতর বিশেষ আছে। অনন্তের অভ্যন্তরে সমুদায় জীব ও জগৎ, সমুদায় জীব ও জগতের ভিতরে মঙ্গলের প্রকাশ এ প্রভেদ কিছু সামান্য প্রভেদ নয়। প্রকাশ স্থলের ভিন্নতা অনুসারে ইঁহার ভিন্নতা গৃহীত হইতে পারে, এ জন্য স্বয়ংরূপ দ্যোতক অদ্বৈত শব্দ এখানে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি বহুধা প্রকাশ পাইতেছেন তিনি দ্বিত্ববিরহিত এ কথা বলাতে স্বয়ংরূপত্ব স্থির হইতেছে কিরূপে? বহুরূপে প্রকাশ পাইয়াও আপনি যাহা তাহা ঠিক আছেন, তাঁহার কোন রূপান্তর হয় নাই, একভাবাপন্ন রহিয়াছেন, অথচ আপনি স্বয়ং কি জীবের নিকটে প্রকাশ করিতেছেন, রূপান্তের ন্যায় তিনি সাধকের চিত্তে প্রতিভাত হইতেছেন; এ জন্য মঙ্গলস্বরূপে প্রকাশিত এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বয়ংরূপ। "মঙ্গল মানে ঈশ্বর, ঈশ্বর মানে মঙ্গল, মঙ্গল ভিন্ন ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর ভিন্ন মঙ্গল নাই" কেশবচন্দ্রের এ কথা এই ভাবই প্রকাশ করে। অনন্তে সর্ব্বাতীত ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব অস্ফুট, মঙ্গলে ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটত্বই স্বয়ংরূপত্ব। এ কথা সত্য, "ঈশ্বরের প্রেম গুপ্ত প্রেম, লোকে দেখিতে পায় না। তিনি মঙ্গল করেন, লোকে তাঁহাকে দেখে না, আপনার উপরে সকলেই সুখ্যাতি লয়। মঙ্গলের কাজ ঈশ্বর ভিন্ন হয় না।' যেখানে লোকের দৃষ্টি ঈশ্বরের উপরে নিপতিত হয় না, যে সকল ব্যক্তির ভিতর দিয়া মঙ্গল প্রকাশ পাইল তাহাদের উপরে নিবদ্ধ থাকে, সেখানে ঈশ্বর গুপ্ত রহিলেন তাঁহার স্বয়ংরূপ অব্যক্ত রহিল, কিন্তু যে ব্যক্তির দৃষ্টি ঈশ্বরের উপরে পড়িয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাঁহার নিকটে আর তাঁহার স্বয়ংরূপ অপ্রকাশ থাকিল কোথায়? প্রেমে স্বয়ং ঈশ্বর ধরা পড়েন বলিয়া এখানে স্বয়ংরূপত্বের প্রাধান্য। "শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম্" এ আরাধনা বাক্যও স্বয়ংরূপত্বের অন্তর্গত। যে বেদান্ত বাক্যের ইটি অংশ তাহার সমুদায়ের এই অর্থ পাঠ করিলেই ইহা সকলে বুঝিতে পারিবেন, "তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।"

এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সর্ব্বাতীতত্ব স্বয়ংরূপত্ব প্রতিপন্ন হইল। এখন সর্ব্বগতত্ব কোন্ স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, ইহাই দেখা উচিত। আনন্দে—রসস্বরূপে (রসো বৈ সঃ) সর্ব্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রেম ও পুণ্যের আবির্ভাব সাধকের হৃদয় আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎ দর্শনে সমর্থ হয়, (রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।) এই আনন্দস্বরূপে যখন মন নিমগ্ন হয় তখন ত্রিভুবন সেই আনন্দোমাত্রামাত্র লাভ করিয়া সেই আনন্দে একীভূত প্রতীত হয়। যিনি সর্ব্বাতীত ছিলেন, যিনি প্রেম প্রকাশ করিয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে সাধক হইতে পৃথক থাকিয়া তাঁহার রক্ষণাদি কার্য্যে ব্যপৃত ছিলেন, এখন তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আপনার সঙ্গে এক করিয়া লইলেন। এখন আর সাধকের আত্মপর ভেদ থাকিবে না, একাত্মতা রসে তিনি নিমগ্ন হইলেন। যেখানে ইতঃপূর্ব্বে ভেদ বুদ্ধি ছিল, এখন সে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইল। সাধক এখন যেখানে যাহার উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, এক আনন্দময়ের লীলাভূমি

দর্শন করেন। এ অবস্থায় চক্ষু নিমীলন ও উন্মীলন এ দুইয়েতে আর কোন প্রভেদ থাকে না, এক সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষুর সন্নিধানে প্রকাশিত। ঈশ্বরের সর্ব্বগতত্ব এইরূপে সাধকের নিকট আর জ্ঞানের বিষয় থাকে না, নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয় হয়,।

আত্মপূজক বন্ধু নহেন।

কতক দিন হইল আমাদের মন একটি নূতন চিন্তার পথে গিয়া পড়িয়াছে, এবং সে চিন্তায় আমাদিগকে একান্ত ব্যথিতহৃদয় করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের মন স্বভাবতঃ বন্ধু অন্বেষণ করে, সকল বন্ধু অপেক্ষা ধর্ম্মবন্ধু আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয়। এই বন্ধু অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সহজে মনে উপস্থিত হয় পরীক্ষা করিয়া বন্ধু গ্রহণ সমুচিত। কেননা একবার যাঁহাকে বন্ধুপদে বরণ করা গেল, তাঁহাকে আর জীবনান্ত পর্য্যন্ত ছাড়া উচিত নয়, ছাড়িলে বন্ধুদ্রোহীর অপরাধ ঘটে। কি লক্ষণ দেখিয়া তবে কোন্ বন্ধুকে ধর্ম্মবন্ধুর পদে বরণ করিব, ইহাই দেখা সমুচিত।

এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও উপরে যাঁহারা ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করেন না, দুই, তিন বা বহু ঈশ্বরবাদী দিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের ধর্ম্মবন্ধুত্ব কখন সম্ভবপর নহে। একেশ্বরনিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্য হইতে সুতরাং আমাদিগকে ধর্ম্মবন্ধু গ্রহণ করিতে হইতেছে। ইঁহাদিগের মধ্য হইতে কিরূপে বন্ধু নির্ব্বাচন করিব, ইহাই গভীর প্রশ্ন। সকলেই যদি একেশ্বরনিষ্ঠ হইলেন, তাহা হইলে সকলেই আমাদের বন্ধু, নির্ব্বাচন কথা কোন প্রকারে স্থান প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। একেশ্বরবাদী নামে পরিচিত হইলেই কি বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি একেশ্বরবাদী হয়? একেশ্বরবাদিগণের মধ্যে কি বহু ঈশ্বরবাদের সম্ভাবনা নাই? আমার ঈশ্বর সেই আমার জীবনের উপরে যাহার প্রভুত্ব আছে। কথায় ভাষায় আমি তাহাকে ঈশ্বর বলিতে না পারি, কিন্তু যে প্রভুত্বের সিংহাসন ঈশ্বরের প্রাপ্য, সেই সিংহাসন যদি সে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে নামে না হউক কার্য্যতঃ আমার ঈশ্বর। এরূপ অবস্থায় মুখে একেশ্বরবাদী হইয়াও আমি যে বহু ঈশ্বরবাদী হইলাম তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? কোন একজন একেশ্বরবাদী এরূপ অবস্থায় আমায় ধর্ম্মবন্ধু পদে বরণ করিতে পারেন না।

বাহ্য ও আন্তরিক এই দুই প্রকার পৌত্তলিকতার প্রভেদ আমরা অনেক দিন হইল শুনিয়া আসিতেছি। ধন মান সম্পদাদির প্রতি অত্যাসক্তি বশতঃ তাহাদের কোন একটিকে হৃদয়ের উপরে প্রভুত্ব দিলে আন্তরিক পৌত্তলিকতা হইল ইহা যে কোন ব্যক্তি স্বীকার করিবেন। কিন্তু এরূপ পৌত্তলিকতা বা বহু ঈশ্বরবাদ নির্ণয় স্থল দর্শন হইতে ঘটিয়াছে। ঈশ্বর যেমন একজন, তাঁহার স্থলাধিকার করিবার জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীও তেমনি একজন। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কে? আমি। ধন মান সম্পদাদি কাহার জন্য? আমার জন্য। যদি তাহারা আমার কার্য্যে না লাগিত, আমি তাহাদিগকে লইয়া কি করিতাম? যাহা কিছু প্রিয়, তাহা আমার জন্য উপনিষৎকার এ কথা বলিয়া যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমার কার্য্যে লাগে এজন্য তাহারা আমার প্রিয় এই পর্য্যন্ত ধনাদির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া মানুষ স্থির থাকতে পারে না; একেবারে তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব করিয়া তুলে। সকল চিন্তা সকল যত্ন তাহাদিগের জন্য লোকে নিয়ত নিযুক্ত করে, ইহাতে বাহ্যদৃষ্টিতে লোকের প্রতীতি হয় যে, অমুকে ধনের, অমুকে মানের অমুকে ইন্দ্রিয়সেবার দাস। ঐ সমুদায়ের উহারা উপাসনা করিয়া থাকে, বাস্তবিক একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এক আত্ম পূজাই বিবিধ আকার ধারণ করিয়া বিবিধ বাহ্য নিদর্শনের সহিত আপনাকে সংযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ধনাদি সমুদায়ের মূলে যে

বসিয়া রহিয়াছে? আমি, তবে এই আমিই পূজার বিষয়।

যে ব্যক্তি আত্মপূজায় রত, তাহাকে একেশ্বরবাদী বলিব কি প্রকারে? সে যে আপনি আপনার পূজা করিতেছে। ঈশ্বর তাহার ঈশ্বর নহে, সে আপনি আপনার ঈশ্বর। মতের বা ক্ষণিক ভাবের অনুরোধে সে পূজা উপাসনাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে, এবং ক্ষণিক ভাব ভক্তিও প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু দেখিতে হইবে, তাহার সমগ্র জীবন ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গিত, না আপনার জন্য উৎসর্গিত। সে কি আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অন্বেষণ করে, না ঈশ্বরের জন্য কষ্ট বহন করিতে হইলেও সে তাহাতে প্রস্তুত; প্রস্তুত কেন বলিতেছি, আনন্দিত। মহর্ষি ঈশাকে যখন এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল তাঁহার মা এবং ভাইয়েরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান, তখন তাহাকে তিনি কি উত্তর দিলেন? তাঁহার মা ও ভাই এই সকল ব্যক্তি যাঁহারা ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করেন, এবং তাহা পালন করেন।" ঈশা মা ও ভাইদের প্রতি প্রীতি বা ভক্তিশূন্য ছিলেন না, কিন্তু এতদ্বারা তিনি নিত্যকালস্থায়ী সম্বন্ধ কিসে জন্মায় তাহাই দেখাইয়াছেন। যাঁহাকে আমরা ধর্ম্মবন্ধু করিব, তিনি আমাদের নিত্যকালের বন্ধু হইবেন। তিনি যদি ঈশ্বরের কথা শোনেন, এবং জীবনে তাহা পালন করেন, অন্য কোন কথার দিকে কর্ণপাত না করেন, এবং তদ্বারা জীবন নিয়মিত না করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে নিঃসংশয় ধর্ম্মবন্ধু পদে বরণ করিতে পারি, এবং তাঁহার বন্ধুত্বে চির আশ্বস্ত থাকিতে পারি।

ধর্ম্মবন্ধুসম্বন্ধে যাহা বলা হইল আত্মীয় স্বজন পুত্রকন্যা প্রভৃতি সকলের সম্বন্ধে এই একই কথা বলা যায়। আত্মীয় প্রভৃতির সহিত অনিত্য সম্বন্ধও আছে নিত্য সম্বন্ধও আছে। ইঁহারা যদি ঈশ্বরপূজক না হইয়া আত্মপূজক হন তাহা হইলে বিরোধ বিসংবাদ অশান্তি বিচ্ছেদ পদে পদে ঘটিবে। যদিও স্বার্থানুরোধে একত্র বাস হয়, তথাপি মন বুঝিতে পারিবে, যত দিন স্বার্থ আছে, ততদিন সম্বন্ধ আছে, একত্র বাস আছে, স্বার্থও চলিয়া যাইবে সম্বন্ধও কাটিয়া যাইবে। এরূপ স্থলে কে আর বলিবে ইহারা আমার নিত্যকালের আত্মীয়স্বজন পুত্রকন্যা। কিন্তু ইঁহারা সকলেই যদি ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলেন, ঈশ্বর ভিন্ন জীবনের নিয়ামক ও প্রভু আর কেহ না হয়, তাহা হইলে ইঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ঈশ্বরকে লইয়া হইল, এবং সে সম্বন্ধ কোন কালে নষ্ট হইবার নহে। আত্মপূজক বন্ধু নহেন, ইহা যেমন আমরা বলিতে পারি, তেমনি নিত্য সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতে পারি, আত্মপূজকগণ আমাদের ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রত্যেক মানবের মধ্যে একটি একটি আদর্শ আছে, সেই আদর্শ অনুসারে সে আশা করে, বিশ্বাস করে, জীবন সেই দিকে লইয়া যাইতে যত্ন করে। অথচ মানুষ এমন আত্মজ্ঞানবিহীন যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কি তাহার আদর্শ সে কিছুই বলিয়া উঠিতে পারে না। মানুষের মন সর্ব্বদা বাহিরের বিষয়ে আবদ্ধ, আপনি কি ইহা ভাবিবার তাহার অবসর হয় না। মন আপনাকে ভাবুক আর না ভাবুক, যে কোন কাজ হউক তাহার সঙ্গে মন অজ্ঞাতসারে লাগিয়া আছে। এই মন আবার আপনি অচল, উহার ভিতরে আরও নিগূঢ় স্থানে জীবনের উন্নত ও অবনত অবস্থানুসারে এক একটি আদর্শ আছে, সেই আদর্শ উহার গতি নিয়মিত করে। আত্মদর্শী ও অনাত্মদর্শী এ দুইয়ের প্রভেদ এই, এক জন মনের প্রত্যেক গতি অধ্যয়ন করিয়া তাহার নিগূঢ় প্রদেশস্থ আদর্শের সহিত উহার কোথায় অমিল হইতেছে দেখেন, এবং যে উপায়ে এই অমিল তিরোহিত হয় তদবলম্বনে অমিল মিটাইয়া লেন। যাই অমিল মিটাইয়া লইলেন, অমনি আদর্শ পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইল, জীবন ক্রমান্বয়ে উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইতে লাগিল। অনাত্মদর্শী ব্যক্তির ঠিক ইহার বিপরীত ভাব। অন্তর ও বাহির এ দুইয়ের সংগ্রাম কোন দিন তাহার ঘোচে না, জীবনে উন্নতির লক্ষণও প্রকাশ পায় না।

দেহের সহিত জড়জগতের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ মানুষ আপনি কি ইহা সর্ব্বদা ভুলিয়া রহিয়াছে। এই বিস্মৃতি উন্নত জীবন লাভের পক্ষে একান্ত অন্তরায়। দেহসর্ব্বস্ব ভোগবিলাসসর্ব্বস্ব হইলে মানুষ প্রবৃত্তি বাসনার একান্ত অধীন হইয়া পড়ে, এবং

পশুজীবন সুলভ বিষয় সমূহ মনকে এমনই আকর্ষণ করিয়া রাখে যে, কেহই তাহার সুখ সাধন বিনা আর কিছু যে তাহার অনুসর্ত্তব্য বিষয় আছে ইহা আর সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহাকে বুঝাইতে চাও, উহা তাহার সম্বন্ধে দেবলোকের ভাষার ন্যায় অবুদ্ধ। এই অবস্থা অতিক্রম করিতে গিয়া কিছুদিনের জন্য মানুষকে আবার বিপরীত দিকে ধাবিত হইতে হয়। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, জগৎ অলীক মিথ্যা, সুতরাং এ দুইয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে দুর্ব্বল ও তাহাদের বিষয় হইতে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিয়া আত্মাকে মনন আত্মাকে চিন্তা, আত্মাকে লইয়া দিবারজনী ব্যাপৃত থাকা ইহাই জীবনের নিত্য যত্ন ও সাধনের বিষয় হয়। ইহাতে এই লাভ হয় যে, আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব চিরস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম হইয়া তাহাকে প্রকৃত মর্য্যাদা অর্পণ করা হয়, এবং চিরন্তনজীবনে দিন দিন মানুষ উন্নত হইতে থাকে। জগৎ জীব যাহা কিছু সকলই জ্ঞানমূলক, জ্ঞান বিদ্যমান না থাকিলে সকলই নাই হইয়া যায়, এই জ্ঞানই সেই আত্মা। জ্ঞানের সমাদর ও আত্মার সমাদর একই, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মদর্শী ব্যক্তিগণ দেহ ও জগৎ নিরপেক্ষ হইয়া আত্মরত আত্মতুষ্ট হইয়া জীবন যাপন করেন।

আত্মদর্শী ব্যক্তি দেহ নিরপেক্ষ ও জগৎ নিরপেক্ষ হইলেন, আত্মা তাঁহার সর্ব্বস্ব হইল, ইহা নিন্দার বিষয় নহে, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, সে ক্ষতি নিবারণ না হইলে তাঁহার জীবন দিন দিন শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হইয়া উঠিবে। আত্মা কেবল জ্ঞান নহে, আত্মা প্রেমও। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জ্ঞান সমুদায় অবলোকন করিতে পারে, কিন্তু প্রেমের ভিতরে সাপেক্ষতা আছে। জ্ঞান আপনাতে আপনি বাস করে, আপনার ভিতরে সমুদায় জীব ও জগৎ দর্শন করে। প্রেম আপনাতে বাস না করিয়া অপরেতে বাস করে। আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা আপনার ভিতরে অন্বেষণ না করিয়া পরের ভিতরে আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা উপলব্ধি করে। জ্ঞান ও প্রেমের যখন ঈদৃশ বিপরীত ভাব, এবং এ দুই লইয়াই যখন আত্মা, তখন কেবল জ্ঞান সর্ব্বস্ব হইলে মানুষ কৃতার্থ হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? আত্মদর্শী জ্ঞানে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন সেখান হইতে পশ্চাতে গমন না করিয়া সেখান হইতেই প্রেম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই সাধনের প্রকৃত নিয়ম। এ নিয়মের অন্যথা করিলে উত্থান না হইয়া পতন অবশ্যম্ভাবী। দেহ নিরপেক্ষ জগন্নিরপেক্ষ হইয়া যে, আত্মবস্তু সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেই আত্মবস্তু অপরেতে প্রত্যক্ষ করিয়া যদি তৎপ্রতি হৃদয়ের অনুরাগ স্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেহ ও পার্থিব বস্তু সংসৃষ্ট নরনারীর উপরে অনুরাগ স্থাপন করিলে যে বিকারের সম্ভাবনা আছে তাহা অবরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং অন্তদিকে অপরের আত্মার কল্যাণের সঙ্গে, সুখের সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে আপনাকে জড়িত করাতে প্রেম বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা জ্ঞানী নহেন, প্রেমিক, তাঁহাদের আত্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে দেহনিরপেক্ষতা আছে। এই দেহনিরপেক্ষতাকে আত্মবস্তু প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে নিয়োগ করিলে প্রেমিক ব্যক্তির জ্ঞানভূমিতে আরোহণ হয়।

১৪ই মাঘ—বুধবার।

(সায়ংকালের উপদেশ)

স্বর্গ মর্ত্ত্য এক, ইহা অনেকবার আমরা প্রচার করিলাম, এবং ইহা যে অভ্রান্ত সত্য তাহাও সময়ে সময়ে অনুভব করিয়াছি। আবার কখনও কখনও মনে হয় স্বর্গ এই মর্ত্ত্য লোক হইতে বহু দূরে। এই স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যভূমি যখন স্বতন্ত্র ও পরস্পর বহুদূরবর্ত্তী মনে হয় তখন এই মর্ত্ত্যভূমি হইতে স্বর্গে যাইবার কোন পথ আছে কি না অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। রামায়ণে শুনিতে পাই রাবণপৃথিবী হইতে স্বর্গে যাইবার জন্য একটী পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিল, এবং তাহা তাহার জীবনকালে সম্পন্ন করিতে না পারিয়া মৃত্যুকালে এই জন্য আক্ষেপ করিয়াছিল। সতী অপহারী দুষ্ট-রাবণের মনে কেন এই পবিত্র সঙ্কল্প হইয়াছিল? স্বর্গবাসের আকাঙ্ক্ষা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। পাপীর মন হইতেও এই বাসনা একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তাই রাবণের মনেও এই সঙ্কল্প হইয়াছিল। স্বর্গের পথ রাজর্ষি দেবর্ষিগণের দ্বারা রচিত হইতে পারে, স্বর্গের সোপান ভক্ত যোগিগণের জীবন দ্বারা গঠিত হইতে পারে। সাধুভক্তগণের জীবনের উপর ঈশ্বর এই স্বর্গের সোপান রক্ষা করেন; গত কল্য আমাদের একটী প্রিয়তম যুবক বন্ধু কোন্ পথে স্বর্গে যাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়াছেন।* আজ আমরাও তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। স্বর্গের পথ কতই আছে। ভক্তিপথ, যোগপথ জ্ঞানপথ, কর্ম্মপথ, আরও কত স্বর্গের পথ আছে। আমরা কোন্ পথে স্বর্গ যাত্রা করিব? ব্রহ্মযোগপথ, ব্রহ্মভক্তিপথ, ব্রহ্মপ্রেমে আস্নেহস্বর্গের পথ, ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের পথ, ব্রহ্মের প্রিয় কর্ম্ম সাধন করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম পথ, এই সকল পথই কি আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে? না এমন কোন নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পথের পথিক হইলে আমরা সকল পথে যাত্রার ফল একবারে লাভ করিতে পারি? সতীঅপহরণকারী রাবণ স্বর্গের পথ প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আমাদের মধ্যে যিনি বলিলেন "নারি, তুমি ব্রহ্মকন্যা তুমি সতী, তুমি মা বিশ্বজননীর প্রতিনিধি" তিনি যথার্থই স্বর্গপথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্য সত্য এক নূতন পথ পাইয়াছিলেন। যাঁহার আদেশে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রাম্যমান্ সেই মহান্ ব্রহ্মাণ্ডপতিকে তিনি দেখিয়াছিলেন আজও দেখিতেছেন, তাঁহার অভ্রান্ত বাণী তিনি শুনিয়াছিলেন, আজও শুনিতেছেন; এই পথ নব বিধানের পথ। নববিধানের স্বর্গপথ কেবল যোগপথ নহে, কেবল ভক্তিপথ নহে, কেবল কর্ম্মপথ নহে। আমার নিজ ইচ্ছা অনু-

* বাবু মোহিতচন্দ্র সেনের আলবার্ট হলে বক্তৃতা।

সারে ব্রহ্ম জ্ঞানে সমুন্নত হইয়া, নিজ ইচ্ছানুসারে নিজ সাধনবলে ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া, কিম্বা নিজের প্রেমে আপ্লুত হইয়া ব্রহ্ম ভক্তিতে স্নান করিয়া অথবা ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য তাঁহার পুত্র কন্যা-গণের সেবা করিয়া আমরা ব্রহ্মলাভ করিব, স্বর্গ প্রাপ্ত হইব, ইহার সম্ভাবনা নাই। আমার ব্রহ্মজ্ঞানের মূল্যে, আমার ব্রহ্মভক্তির মূল্যে, অথবা আমার কর্ত্তব্য পালনের মূল্যে কিম্বা এ সমুদায়ের মূল্যে আমি প্রকৃত স্বর্গ অথবা ব্রহ্মধাম ক্রয় করিতে পারি না। অকিঞ্চনতা, দীনতা এবং আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা নাই। বীজ বিনষ্ট না হইলে তাহা হইতে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। তেমনি মানুষ না মরিলে দেবতার জন্ম হয় না। স্বর্গের পথ পাইব না, যদি সাধারণ আমিত্ব বিনাশ না করি; আমি স্বীয় বলে ব্রহ্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ব্রহ্মভক্তজনের সঙ্গে বাস করিব, এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে। মনুষ্যসন্তান যখন নীচ আমিত্ব সংহার করে, তখন সে মৃত্যুদশায় পতিত হয় সত্য; কিন্তু তাহার ভিতর হইতে সত্য ব্রহ্মসন্তান বাহির হইতে থাকে। নীচমানুষ সাধারণ মানুষ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা হইতে উচ্চ আত্মা, দেব সন্তান, জন্ম গ্রহণ করে। এই ব্রহ্মসন্তানের লক্ষণ কি? অদৃশ্য ব্রহ্ম দেবীর নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করি। কি কি লক্ষণাক্রান্ত হইলে ব্রহ্মসন্তান হইবে? দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মসন্তান আসিয়াছিলেন, কেবল সেই রূপ ব্রহ্মসন্তান হইলেও আমাদের চলিবে না। নূতন এক প্রকার ব্রহ্মসন্তান হইতে হইবে। পূর্ব্ব কালের ঋষিগণ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। আমরা সেই সচ্চিদানন্দের সন্তান, ব্রহ্ম আমাদিগকে চিদানন্দ বিতরণ করিতেছেন। পূর্ব্ব হইতে আমরা শ্রেষ্ঠতর অধিকার লাভ করিয়াছি। এই যে প্রার্থনা পাঠ করা হইল তাহাতে জানা গেল ব্রহ্মকে মা মা বলিয়া ডাকিতে হইবে। ঈশা পিতা পিতা বলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়া সমস্ত দুঃখ যাতনা ভুলিয়া যাইতেন, এবং আত্ম ইচ্ছা বিনাশ করিয়া ব্রহ্ম ইচ্ছার জয় স্থাপন করিলেন। সেই দিব্য পিতাকেই কোমলতর ভাবে আমরা মা মা বলিয়া পূজা করিব, সেই সচ্চিদানন্দ পিতাই সরস্বতী এবং শান্তি রূপিণীরূপে দেখাদিতেছেন। এই মায়ের সন্তানের সুলক্ষণ সকল আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। এই মা মহা সতীকে বিশ্বাস-নয়নে নিয়ত দেখিতে হইবে। এই মা চিন্ময়ী সরস্বতী মধুর বিন যন্ত্রে নিত্য মধুর ঝঙ্কার করিতেছেন, সেই অমৃতময়ী বাণী দিব্য কর্ণে শুনিতে হইবে। ঋষিরা বলিয়াছেন ব্রহ্ম রসস্বরূপ আনন্দ-রূপমমৃত। ভক্তিরসনাযোগে নিয়ত এই আনন্দ রস আস্বাদন করিতে হইবে। আত্মার কর্ণ অনন্তকাল মায়ের কথা শুনিবে। আত্মার রসনা অনন্তকাল মায়ের আনন্দরূপ জনিত সুধা পান করিবে, ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা তাঁহাকে এরূপ ভয় দেখাইয়া বলিয়া ছিল, যে রসনাতে তুমি হরিনাম কর সেই রসনা কাটিয়া দিব। প্রহ্লাদ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, পিতা, আত্মার অদৃশ্য রসনাত তুমি কাটিতে পারিবে না। সেই রসনায় নিত্য হরিনাম সুধা পান করিব। আমিত্ব বিনাশের জন্য হইতে যে দেব সন্তান, ব্রহ্ম-সন্তান উৎপন্ন হন তিনি আপনি কিছুই নহেন। ব্রহ্মের প্রভাবে তিনি সকল প্রভাব বিস্তার করেন। ব্রহ্ম তাঁহার শক্তি, ব্রহ্ম তাঁহার নিশ্বাস, ব্রহ্ম তাঁহার অন্ন জল। এই ব্রহ্মময় নিখিলভুবন তাঁহার নয়ন মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। নারী ব্রহ্ম কন্যা সতীরূপে ব্রহ্ম সন্তানের গৃহে পবিত্রতা ও পুণ্যের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাই স্বর্গ। নববিধানের স্বর্গযাত্রীর যোগ ভক্তি, জ্ঞান কর্ম্মের সম্মিলিত পথ এখানে পরিসমাপ্ত। সংক্ষেপে এই নববিধানের স্বর্গ, স্বর্গপথ ও স্বর্গবাসীর লক্ষণ বিবৃত হইল। পুণ্যময় পরমেশ্বর আমা-দিগকে এই পথের পথিক ও এই লক্ষণাক্রান্ত করিয়া এই পবিত্র স্বর্গ ভোগের অধিকারী করুন। মা, ভক্ত বৎসলে, মা পুণ্যময়ি, তোমাকে সরল অন্তরে মা বলিয়াডাকিতে পারিলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে। তোমাকে,মা বলিয়া তোমার ভক্ত সন্তান কত সুখী হইলেন, কত স্বর্গের সামগ্রী লাভ করিলেন। মা, তোমার ভক্ত এই ধরাতলে কত প্রকার স্বর্গের সুখ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গের পথ তিনি পাইয়াছিলেন। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও যেন তোমার এই নববিধানের পবিত্র স্বর্গবাসী হইয়া সুখী হই, ধন্য হই; এবং তোমার মহিমা গান করিতে করিতে আমরা জীবন সফল করি।

১৮ই মাঘ—রবিবার।

শান্তি কুটীর।

হে বন্ধুগণ, প্রিয় ভাইগণ, স্নেহের ভগিনীগণ, আবার তোমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়াছ। এই জন্য আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। এই ক্ষুদ্র কুটীরে এমন যথেষ্ট স্থান নাই যাহাতে তোমাদের অবকাশ হয়, এমন বিছানা নাই, যাহাতে তোমাদিগকে আদর করিয়া বসাইতে পারি। আপনাদের ভালবাসা ও সদ্ভাব গুণে আমাদের এই ত্রুটি ক্ষমা কর।

আমাদের এই যে মিলন, ইহা শুভমিলন। এই উপলক্ষে বিধাতাকে বিশেষ ভাবে ডাকিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে মিলিত প্রাণে এই কয় দিন বিশেষ আগ্রহে তাঁহার পূজাবন্দনা করিয়া পরম কৃতার্থ হইয়াছি। অনেক বলিয়াছি। আর বলিতে ইচ্ছা হয় না। তথাপি তোমাদের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া আজও কিছু বলিতেছি—

মানুষের সঙ্গে বৃক্ষের বড়ই সাদৃশ্য। ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি; কিন্তু বৃক্ষ-মূলে অনুসন্ধান কর বীজের চিহ্নও আর পাইবে না, বৃক্ষ বীজকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করে না। বৃক্ষ মাটীর উপর স্থিতি করে, মাটীর উপর দণ্ডায়মান থাকে; কিন্তু নিগূঢ় অনুসন্ধিৎসা দ্বারা আলোচনা কর দেখিবে যে,মৃত্তিকাও বৃক্ষের স্থিতি ও দণ্ডায়মান থাকার হেতু নহে। বৃক্ষমূলই বৃক্ষের স্থিতির কারন! এই মূল কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। একটী

আম্র বৃক্ষের শিকড় কোথায় চলিয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইবে না। মানুষও যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন, সেই ক্ষুদ্র বীজ কোথায় গেল কিছুই জানিতে পার না। পৃথিবীর মাটীও মানুষের দ্বিতীয় কারণ নহে। মানুষ যে মূলের উপর নির্ভর করিয়া এই ইহ পরকালে স্থিতি করিতেছে, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই মূলের অনুসন্ধান করিয়াও তুমি বাহির করিতে পার না। বৃক্ষ আপনার মূল মাটীতে লুকাইয়া রাখে। মানুষের মূল কোথায়? যে মূল হইতে মানুষের প্রাণ, জ্ঞান, ধন মান এবং অনন্তকাল স্থিতি সেই মূল কোথায়, কোন্ আঁধারে লুক্কায়িত? যে মূল হইতে মানুষ রস গ্রহণ করিয়া এত বড় হয়, এত কীর্ত্তিমান্ হয়, সেই মূলাধার কোন্ অজ্ঞানিত, অগম্য দেশে আপন স্বভাবে আপনি আবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন? ক্ষুদ্র মূলের উপর স্থিতি করিয়া বৃক্ষ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, আকাশ ভেদ করিয়া মস্তক উন্নত করে দেখিতে পাও। কিন্তু বল মহাজনের মস্তকের ন্যায় কোন্ বৃক্ষের মস্তক উন্নত হইয়াছে? যে মূলের শক্তিতে মানুষ এত উন্নত ও চির উন্নতিশীল সেই মূল, সেই মূলাধার যিনি তাঁহাকে অন্বেষণ কর। যাঁহা হইতে গুণ জ্ঞান পাইয়া এত আস্ফালন করিলাম, সেই গুণসাগর, রত্নসাগর যিনি তিনিত দেখা দিলেন না। যত ক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তত ক্ষণ তুমি আপনার মর্য্যাদা কি বুঝিবে? অতএব হে যুবক, আর আপন বলের বল করিও না। হে ধার্ম্মিক, আর আপন ধর্ম্মের এত গৌরব করিও না। গাছ যেমন মাটী হইতে রস পাইয়া জীবিত থাকে, তোমাদেরও সমস্ত শক্তি, বল স্ফূর্ত্তি ও কীর্ত্তি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইতেছ। যাহা হউক এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আরও কথা আছে। তাহা এই, ক্ষুদ্র একটী বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, একটী বৃক্ষে কত বীজ হয়, একটী বৃক্ষ হইতে কিত শত শত বৃক্ষের উৎপত্তি। এমন অনেক বৃক্ষ আছে তাহার বীজ হয় না, পাতা হইতে অসংখ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। ইব্রাহিম এক দিন আপন বৃদ্ধা মহিষীর সন্তান হইল না বলিয়া বড়ই দুঃখ করিয়া ভগবানের নিকট আক্ষেপোক্তি করেন। তাহাতে ভগবান্ বলেন, সাগরের সৈকতে যত বালুকা স্থিতি করে তোমার তত সন্তান হইবে। এই ইব্রাহিমের সন্তান অসংখ্য ইহুদিও মুসলমান্। শাক্যের একটী পুত্র ছিল, তাহারও কি গতি হইল কে জানে? কিন্তু এই শাক্যের কত লক্ষ সন্তান আজ চিনে, তাতারে, জাপানে, সিংহলে। আরও কত দেশ পূর্ণ করিয়াছে। ঈশা বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সন্তানে পৃথিবী পরিপূর্ণ। খৃষ্ট সন্তানের প্রবল প্রতাপে আজ এই জগৎ অধিকৃত। অতি সামান্য অতিক্ষুদ্র একটা বীজ হইতে একটী বৃক্ষ, একটী বৃক্ষ হইতে আবার শত শত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বনভূমি আচ্ছন্ন করে। মহাপুরুষগণের সন্তান বৃন্দ ঠিক এই রূপ। আমি ইহাকেই মণ্ডলী বলি। ২।৫ জন বসিয়া কথা কহিলে, একটী বিধি স্থাপন করিলে, অথবা কত গুলি নিয়ম প্রণালী করিয়া রাখিলে ইহাকে মণ্ডলী বলিতে ইচ্ছা হয় না। মণ্ডলী বলিলে তাহা ভগবানের একটী অসীম শক্তির বিকাশ মনে হয়। তাহাকে এই ক্ষুদ্র আকারে দেখিতে ইচ্ছা হয় না।

বিশ্বাসী ও মণ্ডলীতে কিছু পার্থক্য নাই। একটী বিশ্বাসী শত শত বিশ্বাসীর জন্মদাতা। একটী বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বলিলে তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই শত শত প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে। বড়বাজারের এমন অনেক স্থান আছে এক দিকে কত কত মিঠাই মিছরীর দোকান, অপর দিকে কত আবর্জ্জনা ময়লা, তথাপি যদি তথাকার চৌতলের ছাদের উপর একটী গোলাপ ফোটে, তাহার গন্ধে শত শত মৌমাছী আকৃষ্ট হইবে, এবং সেই গোলাপের মধু আহরণ করিয়া মধু চক্র নির্ম্মান করিবে। তেমনি বিশ্বাসী যেখানেই কেন না থাকুন তাঁহার আকর্ষণে অনেকে আকৃষ্ট হইবে, এবং সেই সকল বিশ্বাসীর সম্মিলিত আত্মার প্রভাবে প্রকাণ্ড মণ্ডলী গঠিত হইবে। বিশ্বাসীর মণ্ডলী সঙ্কীর্ণ নহে। এই মণ্ডলীর শক্তি সামান্য নহে। বিশ্বাসের শক্তিতে গৌরাঙ্গের পার্শ্বে অদ্বৈত, বিশ্বাসের প্রভাবে শাক্যের পশ্চাতে মহেন্দ্র, বিশ্বাসের অসীম শক্তিতে ঈশার পার্শ্বে জন এবং আরও কত বিশ্বাসে অগ্নিসম তেজোময় শিষ্য। কেবল ইহাতেই পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার পশ্চাতে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মণ্ডলীর অবয়ব দর্শন কর। বিশ্বাসের আকর্ষনেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পার্শ্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উপবেশন করিলেন, তাহারই পশ্চাতে দণ্ডায়মান এই নববিধানের মণ্ডলী। অতএব যদি যথার্থ বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বলে তবে তৎ সঙ্গে সঙ্গে শত শত প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে এবং সমস্ত অবিশ্বাসের অন্ধকার বিনাশ করিবে। একটী ফুলে শত শত মাছী আসিয়া মধু সংগ্রহে ব্যস্ত হয়, একটী বৃক্ষ হইতে শত শত বৃক্ষ হইয়া হিমালয়ের বনভূমি ছাইয়া ফেলে। হিমালয়ের বন প্রদেশ আমি দেখিয়াছি। ইচ্ছা করি তোমরাও তাহা দেখিয়া এস। এমন ছোট বড় নানা বৃক্ষ বন আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, দেখিলে বৃক্ষ বংশের বিস্তারের অন্ত করা যায় না। ইহাতে কত ফুল, কত ফল, কত শোভা।

ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের মণ্ডলীর মূলাধার। তিনি আমাদের রস, জল, ভক্তি, প্রেম. তোমরা সকলে আবার সেই পরব্রহ্মের ক্ষেত্রে রোপিত হও। গত বুধবার তোমাদিগকে বলিয়াছি সকলে আপনাপন শিকড় এই পৃথিবীর মাটী হইতে উৎপাটন করিয়া বৈকুণ্ঠের প্রান্তরে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে রোপণ কর, এবং বিশ্বাস ও নির্ভরের সেচনী দ্বারা তাহাতে ভগবৎ কৃপাবারি সেচন কর। পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন তুমি তোমার একটী জীবনের মূলে জল দান করিয়া বাঁচাইতে পার না, এই প্রকাণ্ড মণ্ডলীর মূলে তুমি কত জল দিবে? ঈশা আজ নাই; কিন্তু ঈশাই এই প্রকাণ্ড মণ্ডলীকে রক্ষা করিতেছে। যিনি বিশ্বাসীর মূলাধার, যিনি নিশীথের শান্ত, যিনি প্রভাতের শোভা, তিনি এই মণ্ডলীর প্রাণাধার হইয়া এই মণ্ডলীকে রক্ষা করিতেছেন।

এক বীজ হইতে সমস্ত বৃক্ষের উৎপত্তি। এক রাজা রামমোহন রায় হইতে এই ব্রাহ্মমণ্ডলীর উৎপত্তি। যাহারা এক ঈশ্বরকে

বিশ্বাস করে, যাহারা পাপতাপ দুঃখ মোচনের জন্য এক বার ব্রহ্মের চরণ ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, এক ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে প্রতিদিন যাহারা অন্ন জল সুখ স্বাস্থ্য পাইতেছে, এক জগৎপতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া যাহারা এক পরব্রহ্মভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিতেছে। এক ঈশ্বরে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তি; তাহারা কেমন করিয়া বলে আমরা এক মণ্ডলী নহি? বরং রজ্জুর তৃণগুলি পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে, বরং আকাশ স্বীয় নিলীমা পরিহার করিতে পারে, বরং জল নিজ শৈত্যকে ও অগ্নি নিজ তেজকে পরিত্যাগ করা সম্ভব, তথাপি তোমাদের অমিল হইতে পারে না। তোমার অমিল তোমার সঙ্গে, তোমার অমিল তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে, তোমার বিবাদ তোমার বিবেক বন্ধুর সঙ্গে, তোমার অমিল অপর ভাইয়ের সঙ্গে নহে; তুমি চক্ষু বুজিয়া দুই ঘটা উপাসনা কর, আর কাহারও সঙ্গে তোমার মিল হয় না। পরমেশ্বরের কোন মণ্ডলীতে তোমার স্থান নাই। তুমি একাকী অসঙ্গ। ইহা হইলে তোমার উপাসনা সত্য হয় বলিতে পারি না। তুমি আমাকে কি বুঝাইতে আসিয়াছ? উপাসনা কর, ঈশ্বর সহবাস লাভ কর, আর তোমার সঙ্গে কাহারও মিলে না, ইহা অসম্ভব কথা। আগুন আগুনকে নির্ব্বাণ করে না, তাহাকে বৃদ্ধি করে। জলই আগুনকে নির্ব্বাণ করে। শত্রুতা দ্বারা শত্রুতার বিনাশ হয় না। ক্ষমাই শত্রুতার মহৌষধি। এই কয় দিন যেমন একত্র হইয়া প্রাণের আবেগে উপাসনা করিলে, ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সঙ্গীত করিলে, তেমন করিয়া কিছু কাল থাকিয়া দেখ, এই উৎসবের দেব-প্রসাদ জীবন-সম্বল করিয়া পরম যতনে ইহা হৃদয়ে রক্ষা করিয়া দেখ, আবার সেই দিন ফিরিয়া আসে কিনা। ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি বৃক্ষের সমস্ত ডাল কাটিয়া ফেলিলেও যদি তাহার মূল থাকে, এবং প্রকৃতিতে যদি রসও থাকে, ও ঈশ্বরের ভাণ্ডারে যদি শিশির থাকে, আকাশে যদি জল থাকে তবে বৃক্ষ বাঁচিবেই বাঁচিবে। তেমনি যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, বিবেক থাকে, প্রার্থনা থাকে, এবং ঈশ্বরের কৃপা থাকে তবে এই ধর্ম্মমণ্ডলী থাকিবেই থাকিবে। আমরা আচার্য্যের কথা শুনিতাম; ইহা খোসামোদ নহে। তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্ম আমাদিগকে এমন আকর্ষণ করিত যে, আমরা তাঁহার কথা না শুনিয়া পারিতাম না। কাগজে লিখিয়া দলাদলি করিয়া মণ্ডলী হয় না দেখিয়াছি, এবং এই বুঝিয়াছি যেমন একটী বৃক্ষ হইতে শত শত বৃক্ষের উৎপত্তি তেমনি একটী বিশ্বাসী বিবেকী ও সরল প্রার্থনাশীল জীবন হইতে শত শত জীবনের সৃষ্টি। এই প্রকারে উৎপন্ন যে শত শত আত্মা তাহাই এই নববিধানের মণ্ডলী।

অতএব তোমাদিগের নিকট আজ উৎসবের শেষ দিনে, সকলের আগ্রহ আনন্দ ও শান্তির সমতার দিনে সর্ব্বশেষ এই কথা বলিলাম। ইহাতে মণ্ডলীর উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধির উপায় কি তাহা বুঝিতে পারিলে। এখন পরব্রহ্মের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া নিজ নিজ জীবন এই ভাবে প্রস্তুত কর। নিরাশ হইও না, শত আশাতে প্রাণকে জাগ্রত কর। ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার কৃপাহস্ত আমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয় নাই। তাঁহার উদ্যান এখনও বসন্ত বিরাজিত। আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং নিজ নিজ বিবেকের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলী রূপে পরিণত হই।

হে অপার আনন্দনিলয়, নিঃশব্দে তুমি বনে বীজ বপন কর, নিঃশব্দে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপাদন কর। একটী বৃক্ষের দ্বারা শত শত বৃক্ষের সৃজন করিয়া ঘন সন্নিবিষ্ট শাখা পত্রে মরুভূমিকে ছায়া ও শোভার আকর কর। তেমনি নিঃশব্দে এই ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া এমন মণ্ডলীসৃজন কর যাহার আকর্ষণে কুলবধূ আর ঘরে থাকিতে পারে না। বিদ্বান্, অজ্ঞান, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, এই বিধানে আসিয়া পড়ে। আমরা তেমন করিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছি। ধনের লোভে আসি নাই, মানের লোভে আসি নাই, বিদ্বান জ্ঞানী হইব বলিয়াও আসি নাই। তুমি ডাকিলে, আর থাকিতে পারিলাম না, তাই আসিলাম। আর একজনকে সঙ্গে করিয়া ডাকিয়াছিলে, যাঁহার বিশ্বাস, ভক্তি প্রেম পরিপূর্ণ জীবন আমাদের সকলের আকর্ষণের হেতু করিয়া আমাদিগকে ডাকিয়াছিলে, তিনি আজ এখানে সশরীরে বিদ্যমান নাই। তাঁহার কাছে বসিয়া আমরা কত শিক্ষা করিয়াছি। সেই পবিত্র ফুলের গন্ধে এই সমস্ত মধুলোলুপ মক্ষিকা সমবেত হইয়া এই মণ্ডলীরূপ মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। হে পিতা, যদি এই মধুচক্রের মধুরূপ প্রেমভক্তি তোমার হয়, তবে এই আশীর্ব্বাদ কর এই মণ্ডলী এই কর্ম্মচারী ভৃত্যগণ তোমার হউক। প্রেমে মিলাইয়া আমাদিগকে আর একবার অখণ্ড কর।

বহু বৎসরের পরীক্ষার মধ্যে এমনি প্রাণের জীবন্তভাব কমিয়া গিয়াছে যে, ১০ জনকে ডাকিয়া আর উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদের যাতনা অত্যন্ত অধিক ভোগ করিয়াছি। আমরা এবার আবার তোমার আহ্বানে মিলিত হইয়াছি ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের এই মিলন দৃঢ় কর। সকলকে একাকার এক কর। তোমার সঙ্গে অমিলন ঘুচাও। বিবেকের সঙ্গে অমিলন দূর কর। তার পর সকলের সঙ্গে মিলাও এই কয়েক দিন আমি বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি যে, তোমার সঙ্গে অমিল হয় নাই, বিবেকের সঙ্গে বিবাদ হয় নাই। এখন এই আশীর্ব্বাদ কর আপনার মিলন লইয়া বাহিরে সকলের সঙ্গে মিলন স্থাপন করি। সকলের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করি, এখন সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। সকলে মিলিত মস্তকে, একহৃদয় একপ্রাণ, একাত্মা হইয়া তোমার পবিত্র চরণে বার বার নমস্কার করি।

হদিসের অনুবাদ।

(উৎসবে পঠিত)

হজরত মোহম্মদ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এবং শয়নকালে এরূপ বলিতেন।

খজিকা বলিয়াছেন ;—প্রেরিত পুরুষ রজনীতে যখন শয্যা গ্রহণ করিতেন দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া দক্ষিণ হস্ত কপোলতলে স্থাপন পূর্ব্বক বলিতেন, "হে প্রভো, আমি তোমার নামে মরিতেছি ও জীবিত হইতেছি, অর্থাৎ তোমার নামে নিদ্রিত ও জাগরিত হইতেছি" এবং যখন তিনি জাগরিত হইতেন তখন বলিতেন, সেই পরমেশ্বরের সম্যক প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবিত করিলেন, তাঁহার যোগেই পুনরুত্থান হইবে।"

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শয্যাতে উপস্থিত হইবে তাহার উচিত যে, স্বীয় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাহা ঝাড়িয়া লয়, যেহেতু তাহার উপর কি পড়িয়া আছে সে জানে না। তদনন্তর যেন সে বলে, "হে আমার প্রভো, আমি তোমার নামযোগে আমার পার্শ্ব স্থাপন করিলাম, এবং তোমার নামযোগে তাহা উত্থাপন করিব, তুমি আমার আত্মাকে যদি গ্রহণ কর তবে তৎপ্রতি দয়া করিও, এবং যদি প্রত্যর্পণ কর, তবে ইহাকে তাহা দ্বারা রক্ষা করিও যদ্দ্বারা সাধুকিঙ্কর দিগের জীবনকে রক্ষা করিয়া থাক।"

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ শয্যা আশ্রয় করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ণ করিতেন, তৎপর বলিতেন, "আমার প্রভো, তোমাতে আমার প্রাণ আমি সমর্পণ করিলাম, তোমার দিকে আমি উন্মুখ হইলাম, আমার জীবনের কার্য্য তোমাকে উৎসর্গ করিলাম, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আগ্রহের সহিত আমার পৃষ্ঠ তোমার প্রতি স্থাপন করিলাম, অর্থাৎ তোমার উপর নির্ভর করিলাম আমার আশ্রয় ও রক্ষা তোমা ব্যতীত অন্যত্র নাই। তুমি যে গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছ, আমি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং তুমি যে সংবাদবাহককে প্রেরণ করিয়াছ আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করি।" প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এ সকল কথা বলে তৎপর সেই রজনীতে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, এস্‌লাম ধর্ম্মে স্থিতি করিয়া তাহার মৃত্যু হয়।" অন্য উক্তিতে এরূপ আছে যে, প্রেরিত পুরুষ এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, "হে অমুক, যখন তুমি শয্যা আশ্রয় করিতে যাইবে তখন নমাজের জন্য যেরূপ অঙ্গশুদ্ধি করিয়া থাক, সেরূপ অঙ্গশুদ্ধি করিবে, তৎপর দক্ষিণপার্শ্বে শয়ণ করিবে, তদনন্তর বলিও" হে আমার ঈশ্বর, আমি আমার প্রাণ তোমাকে উৎসর্গ করিলাম।" পরে যদি তোমার মৃত্যু হয়, এস্‌লাম ধর্ম্মে তোমার মৃত্যু হইবে। আর যদি তোমার পক্ষে রাত্রি প্রভাত হয় কুশলে প্রভাত হইবে।"

আনসের উক্তি ; প্রেরিত পুরুষ যখন শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন তখন বলিতেন, "সেই ঈশ্বরের সম্যক্ প্রশংসা যিনি আমাকে অন্ন জল দান করিয়াছেন, এবং আমার গুরুতর কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন ; আমাকে রিপুকুল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আমার কার্য্যসম্পাদক ও আশ্রয় নাই।"

আলির উক্তি ;—হজরতেরকন্যা ফাতেমা স্বহস্তে যাতাযন্ত্র ঘুরাইয়া গোধূমাদি চূর্ণ করার ক্লেশের বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য পিতৃ উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, হজরত অনেক পরিচারিকাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হজরতের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন এ বিষয় তিনি আয়শা দেবীকে জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া আইসেন। পরে যখন হজরত মোহম্মদ গৃহে প্রত্যাগত হন তখন আয়শা তাঁহাকে উহা জ্ঞাপন করেন। আলি বলিয়াছেন, "পরিশেষে হজরত আমাদের নিকটে উপস্থিত হন, তখন আমরা দুই জনে (আলি ও তাঁহার পত্নী ফাতেমা) শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা দণ্ডায়মান হইতে ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, 'তোমরা আপনাদের স্থানে স্থির থাক।" পরে তিনি আসিয়া আমার ও ফাতেমার এরূপ মধ্যস্থলে বসিলেন, যে আমি তাঁহার চরণের শীতলতা স্বীয় উদরোপরি অনুভব করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা যে বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিষয় কি আমি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিব? যখন তোমরা তোমাদের শয্যা আশ্রয় করিবে তখন তেত্রিশ বার সহবান আল্লা, (পবিত্র পরমেশ্বর), তেত্রিশবার "অল্‌হম্‌দোলেল্লাহে" ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, চৌত্রিশবার আল্লাহো আকবর (ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠে) বলিবে। পরিচারক অপেক্ষা তোমাদের সম্বন্ধে ইহাই কল্যাণজনক।"

আবু হোরয়রার উক্তি ;—ফাতেমা একজন পরিচারকের জন্য প্রার্থনা করিতে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি (হজরত) বলিয়াছিলেন, "পরিচারক অপেক্ষা যাহা উত্তম তাহা কি তোমাকে প্রদর্শন করিব? তেত্রিশ বার পরমেশ্বরের পবিত্রতা, তেত্রিশ বার পরমেশ্বরের গুণানুবাদ, চৌত্রিশ বার পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যেক নমাজের সময় ও তোমাদের শয়নের সময় বর্ণন করিবে।"

৭ই মার্চ্চ—১৮৯৭।

ব্রহ্মমন্দির। *

একজন মোসলমান সাধক সাধনে, প্রার্থনা আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত সাধক ছিলেন। যখন উপাসনার প্রারম্ভে তিনি বলিলেন; "আমি তোমাকেই পূজা করিতেছি" তখন অন্তরে আঘাত পাইলেন, অন্তর মধ্যে এই কথা শ্রবণ করিলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, আমার পূজা কর না, আত্মীয় প্রতিবেশীর পূজাকরিয়া থাক।" তিনি এইরূপ ভগবদ্বাণী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, তাহার পরই লোকসংসর্গ ও লোকানুরাগ পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া উপরি উক্ত বচনটি পড়িলেন। ইটি কোরাণের প্রথম অধ্যায়ের বচন। প্রত্যেক মোসল-

* ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বক্তৃতার সার।

মান সাধক নমাজের প্রবৃত্ত হইয়াএই বচন উচ্চারণ করিয়া থাকেন। যখনতিনি উহাউচ্চারণ করিলেন তখনই অন্তরে এরূপ ধ্বনি হইল, "তুমি অসত্য বলিতেছ, আমার পূজা করনা, বস্তুতঃ স্বীয় স্ত্রীর পূজা করিয়া থাক।" এই গুপ্তবাণী শ্রবণ করিয়া সাধক স্বীয় ভার্য্যার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন সেই বচন পাঠ করিলেন তখন অন্তরে আঘাত পাইলেন, এবং এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ, আমার অর্চনা করিতেছ না, বিষয় সম্পত্তির অর্চনা করিতেছ। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি সমুদায় ধনসম্পত্তি ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিলেন। পরে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি তোমাকেই পূজা করিতেছি, এই কথা বলিলেন, তখন তিনি হৃদয়ে এইরূপ শুনিতে পাইলেন ;—"তুমি অসত্য কথা বলিতেছ, আমার পূজা করিতেছ না, স্বীয় উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের পূজা করিয়া থাক।" ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি আপন প্রিয় পরিচ্ছদ তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মার্থ দান করিলেন, সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। তৎপর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন বলিলেন, "তোমাকেই পূজা করিতেছি" তখন এইরূপ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিলেন, "তুমি সত্যকথা কহিতেছ, এক্ষণ যথার্থ আমার পূজা করিতেছ। তুমি একজন প্রকৃত সাধক।"

আমরা ধন সম্পত্তি মান সম্ভ্রম স্ত্রীপুত্রাদির পূজা করিয়া থাকি। ব্রহ্মোপাসনা করিতে বসিয়া উক্ত সাধকের ন্যায় আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেও এইরূপ ধ্বনি হয় ;—তুমি আমার পূজা করিতেছ না, স্ত্রীর পূজা বা অমুক অমুকের পূজা করিয়া থাক। আমরা ব্রহ্মবাণী শ্রবণে সমুৎসুক নহি, এবং শুনিতে চাহি না। উপাসনা করিতে বসিয়াও মন বিষয়চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, সুতরাং প্রত্যাদেশ শ্রবণ হয় না—হৃদয়ে যে আঘাত হয় তাহা অনুভব করি না। কেবল কতকগুলি কথা বলিয়া যাই, আরাধনা প্রার্থনাদির বাক্যস্রোতে ভাসিয়া চলি। আমরা সঙ্গীতে গাইয়া থাকি, সংসারের উচ্ছিষ্ট তাঁহাকে না দিয়া ষোলআনা প্রেম দিতে হইবে। কিন্তু চোদ্দ আনা পনের আনা সংসারকে দিয়া তাঁহাকে দুই আনা বা এক আনা প্রেম দি কি না সন্দেহ। আমরা অনেক সময় বৃথা আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাল যাপন করি। কিন্তু ব্রহ্মবাণী শুনিতে কত টুক যত্ন করিয়া থাকি। আমরা বেদী হইতে কত গভীর তত্ত্ব শুনিতেছি, কিন্তু যেন এক কর্ণদিয়া শ্রবণ অন্য কর্ণদিয়া নিঃসরণ হয়। আমরা প্রেমভক্তি যোগ সমাধিবিষয়ে উচ্চ উচ্চ কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু তৎসাধনে আমাদের কয় জনের আগ্রহ আছে? ভগবানের উজ্জ্বল প্রকাশ দিন দিন কতদূর হইতেছে, জীবন কতদূর উন্নত হইল, ভগবানে চিত্ত কিরূপ সমাহিত হইল, ইহার কি আমরা অনুসন্ধান লই? এক সময়ে মহাপুরুষ মোহম্মদ নমাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পাদুকা যুগল সম্মুখে স্থাপিত ছিল, পাদুকায় সংযুক্ত সুন্দর ফিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় নমাজে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত হয়। তাহাতে তিনি অন্তরে অতিশয় ক্লেশানুভব করেন। উপাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া তিনি উপাসনার বিঘ্নস্বরূপ সেই পাদুকা দ্বয় দূরে নিক্ষেপ করেন। উপাসনা সাধন ভজনের যাহা বিঘ্ন বলিয়া জানি, আমরা কি তাহা হইতে দূরে থাকিতে প্রস্তুত? বিঘ্ন অন্তরায়ের সঙ্গে আমরা চিরকাল যোগ সন্ধি স্থাপন করিয়া আছি। এমন অবস্থায় ধর্ম্মজীবনের উন্নতি কেমন করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? একজন সাধক তরুতলে বসিয়া ধ্যান ধারণায় নিযুক্তছিলেন। একদা একটী কলকণ্ঠ বিহঙ্গ সেই বৃক্ষের শাখায় বসিয়া সুমধুর স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষীর মিষ্টস্বরে সাধকের মন আকৃষ্ট হইল, তিনি ধ্যান ধারণা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিহঙ্গকূজনে হৃদয় স্থাপন করিলেন। এমন সময় এরূপ দৈববাণী শুনিতে পাইলেন যে, "তুমি আমার প্রতি প্রাণ মন স্থাপন করিয়াছিলে, আশ্চর্য্য যে একটি সামান্য পক্ষীর স্বরের মিষ্টতা পাইয়া আমাকে তুচ্ছ করিলে, সামান্য মূল্যে আমাকে বিক্রয় করিলে?" এরূপ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। আর এরূপ কার্য্য করিব না বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমরা এরূপ কত সামান্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগী বশতঃ কত সময় ঈশ্বরকে তুচ্ছ করিয়া অন্তর হইতে বিদায় দান করি। তিনি আমাদিগকে অনুযোগ করেন, আমরা তাহা শুনিয়াও শুনি না। ঈশ্বরপূজার সঙ্গে অনেক সময় স্বষ্ট নিকৃষ্ট বস্তুর পূজা করিয়া থাকি। এরূপ শিথিল ভাবে জীবন যাপন করিলে কখন কিছু হইয়া উঠিবে না। সাধনে দৃঢ়ব্রতা হওয়া চাই, অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। সংসারের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া কেহ কখন ঈশ্বর লাভ করে নাই, করিতে পারিবে না।

সংবাদ।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন। ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত যাইবেন তাঁহার এরূপ সঙ্কল্প।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় ভগলপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গিয়াছেন।

আমরা ঢাকাস্থ প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায়ের ৪র্থ কন্যার পরলোক গমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যথিত হইয়াছি। কন্যাটীর ১৬। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল জ্বর ও প্লীহারোগে বিষম ক্লেশ পাইয়াছিলেন। প্রেমময়ী জননী তাঁহাকে শারীরিক সমুদায় যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া আপনার প্রেমক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই মাঘ শনিবার ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র এম্ এ বি এল্ শ্রীমান্ সুধাংশু নাথ চক্রবর্ত্তীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই ত্রৈলোক্য

নাথ সান্ন্যাল আচার্য্যের কার্য্য ও পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। প্রেমময় পরমেশ্বর নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

গত ৫ই ফাল্গুন বুধবার স্বর্গগত ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রমিলা দেবীর সঙ্গে স্বর্গগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পুত্র সিবিলিয়ান শ্রীমান্ মহীমোহন ঘোষের শুভ পরিণয় কার্য্য নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই উমানাথ গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাহসভায় বহু সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। বিবাহান্তে পরসপ্তাহেই নবদম্পতী ইয়ুরোপে যাত্রা করিয়াছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর উভয়ের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করুন।

আমরা দুঃখিত যে, ছাপরা নগরে প্রীতিভাজন বারিষ্টার শ্রীমান্ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষের একটি নবকুমার প্রসূত হইয়া তৎপর দিন জননীর ক্রোড়শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রথম কন্যার গর্ভজাত এই প্রথম দৌহিত্র ছিল। আনন্দ অচিরেই নিরানন্দে পরিণত হইয়াছে। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২রা ফাল্গুন উপাসনাশ্রমে তেজপুর হইতে পেন্‌সন প্রাপ্ত এক্‌ষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর প্রেমাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ সস্ত্রীক উপাধ্যায় কর্ত্তৃক যথারীতি নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় একপক্ষকাল ব্যাপিয়া হুগলি জিলার অন্তর্গত ভাস্তারা, অমরপুর, সুগন্ধা প্রভৃতি পল্লীতে এবং হুগলি ও চুঁচড়া নগরে ভ্রমণ করিয়া বিশেষ২ বন্ধুর আলয়ে উপাসনা সঙ্গীত সৎপ্রসঙ্গ ও উপদেশাদি দ্বারা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

সঙ্কীর্ত্তনমত্ত প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারি দেব মহাশয়ের প্রকাশিত সাধকরঞ্জন নামক সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন পুস্তকের প্রথমভাগ আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছি। এই পুস্তকে ৫৬৬টি সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদায়ই উক্ত ভ্রাতা কর্ত্তৃক বিরচিত। শয্যাগত হইয়া রোগজীর্ণ শরীরে এক্ষণ ও তিনি হৃদয়হুগ্ধকর নানা ভাবের সঙ্গীত সকল রচনা করিয়া থাকেন। সাধকরঞ্জন ৫৪০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১৲ মাত্র। ২৬ নং ছুতারপাড়া লেনে গ্রন্থকারের নিকটে তত্ত্ব করিলে গ্রাহকগণ তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভক্তিভাজন আচার্য্যপত্নীর পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছে! কয়েক বৎসর হইতে তিনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি পৃষ্ঠদেশে কার্ব্বাঙ্কোল প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আমরা তাঁহার এই সঙ্কট পীড়ার জন্য চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছি। সিবিল সার্জ্জন ওব্রেণ সাহেব, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত প্রাণধন বসু, মন্মথনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ সেন যত্নপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

অদ্য আমাদের সমবিশ্বাসী প্রিয় ভ্রাতা আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মিত্রের গর্ভধারিণী কলিকাতায় নিজ আবাসে স্বর্গগত হইয়াছেন। ১০ দিন হইল তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভ্রাতা নৃত্যগোপাল মিত্র কর্ম্মক্ষেত্র আরাতে আছেন। জননীর সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ তারযোগে প্রাপ্ত হইয়া ইতিপূর্ব্বে তিন দিনের জন্য তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আগামীকল্য পুনরায় আরা হইতে যাত্রা করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। জননী ন্যূনাধিক ৫৫ বৎসর বয়সে পতি পুত্র কন্যা পৌত্রাদি এই পৃথিবীতে রাখিয়া লোকান্তরে যাত্রা করিয়াছেন।

প্রেরিত।

আবেদন।

মহাশয়, অদ্য প্রায় ২৮ আটাইশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, বঙ্গাব্দ ১২৭৭ সনে (ইং ১৮৬৯) অত্র নসিরাবাদ নগরে, দেশ বিদেশস্থ দয়ালু মহোদয়গণের উৎসাহ ও অর্থ সাহায্যে অন্যূন চারি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে, গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত একখণ্ড ভূমিতে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রথমে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মন্দিরে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ ক্রমাগত ১২।১৩ বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মোপাসনা ও উৎসবাদি করিয়া আসিতেছিলেন। অকস্মাৎ ১২৯২ সনের (ইং ১৮৮৫) ভূমিকম্পে মন্দিরটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় ব্রাহ্মদিগের উপাসনাদি কার্য্যের অন্তরায় উপস্থিত হয়। দানশীল মহোদয়গণ উদারতা গুণে যথোচিত সহানুভূতি প্রকাশ ও অর্থ সাহায্য প্রদান করায় প্রায় ১২০০৲ শত টাকা ব্যয়ে, অল্পদিন মধ্যেই মন্দিরটী পুনঃ সংস্কৃত ও উপাসনার উপযোগি ভাবে নির্ম্মিত হয়। তদবধি এতাবৎ কাল ঐ মন্দিরে ব্রাহ্মগণ উপাসনাদি করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষের ৩০শে জ্যৈষ্ঠের (১২ জুনের প্রবল ভূমিকম্পে পুনরায় মন্দিরটী ভগ্ন ও একবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণ স্থানীয় গরিব ব্রাহ্মগণ মস্তক রাখিবার একমাত্র আশ্রয়স্থানবিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের সামাজিক উপাসনা ও উৎসবাদির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পুনঃ পুনঃ যেরূপ ভূমিকম্প হইতেছে তাহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া, একখানি ইষ্টক প্রাচীরময় টিনের গৃহ ব্রহ্মমন্দিরের স্থানে নির্ম্মাণ করাই বিবেচনা সিদ্ধ। ইহাতে সহস্র মুদ্রাব্যয় আবশ্যক। মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট যে সমস্ত উপকরণ আছে, তাহার মূল্য ব্যতীত অন্যূন ৭।৮ শত মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইলে দানশীল মহোদয় গণের সাহায্য প্রার্থনা ভিন্ন ব্রাহ্মদিগের উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্বদুইবারে দয়ালু মহোদয়গণ অর্থাদি প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ময়মনসিংহস্থ ব্রাহ্মমণ্ডলী এবারও তদ্রূপ আশা করিয়া আপনাদিগের দ্বারস্থ হইতেছেন। ভরসা করি আপনি যথোচিত অর্থানুকূল্য প্রদান করতঃ ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের সুবিধা বিধান করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে উপকৃত ও বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক।

ময়মনসিংহ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। ১৩০৪ সন।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবজজ।
শ্রীচন্দ্রশেখর কর, ডিঃ মাজিষ্ট্রেট।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে,সি,দে কর্ত্তৃক ১৭ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
৫ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, সোমবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ৩৲

প্রার্থনা।

হে নিত্যাশ্রয়, বল, সংসারে এমন অবস্থা আমাদের কখন হইতে প[illegible]র কি না যখন আমরা বলিতে পারি, আমরা এ[illegible]ন্ত আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছি। তোমাকে যাঁহারা আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিল না, তাহারাতো নিত্য নিরাশ্রয়। তোমাকে আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ না করিলে তুমি কি আর তাহাদিগকে আশ্রয় দাও না? আশ্রয় দাও বটে, কিন্তু তাহাদের নিরাশ্রয়তা তো কিছুতেই ঘোচে না। তাহারা এক আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে, আবার সে আশ্রয় হইতে যখন বঞ্চিত হয়, তখন অন্য আশ্রয় অন্বেষণ করে। এইরূপে সংসারে আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিতে করিতে নিরাশ্রয়তার ক্লেশ কিছুতেই তাহাদের মন হইতে অন্তরিত হয় না। একেতো সংসারের আশ্রয় সুখী করিতে পারে না, বহু ক্লেশ বহু নীচতা স্বীকার করিয়া ভয়ে ভয়ে আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়, তাহার উপর আবার ঈদৃশ ক্লেশকর আশ্রয়ও চিরদিন থাকে না, সুতরাং সাংসারিক আশ্রয়গুলি নিরাশ্রয়তার বোধ কি প্রকারে মন হইতে দূর করিয়া দিবে? যাহারা তোমাকে আশ্রয় করিল না, বল তাহাদের নিরাশ্রয়তা ঘুচিবে কি প্রকারে? আমাদের মনে হয়, ইহলোকে কত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, বা পরহিতকারী ব্যক্তি আছে, কাহারও না কাহারও আশ্রয় লাভ করিব, পরলোকে কোথায় কে আশ্রয় হইবে? ফলে আশ্রয়সম্বন্ধে উভয় লোকই সমান। তোমা বিনা ইহলোকেই বা আমাদের কে আশ্রয়, পরলোকেই বা কে আশ্রয়? এখানে অতি আত্মীয়ও পর হয় কেন, পরই বা আত্মীয় হয় কেন? আত্মীয়ও আত্মীয় নয়, পরও পর নয়। তুমিই সকলের যথার্থ আত্মীয়। তুমি কোন্ সময়ে কাহাকে আপনার হাতের যন্ত্র করিয়া, তদাবরণে আবৃত হইয়া আশ্রয় হইবে আমরা কিছুই জানি না; কিন্তু এই মাত্র জানি তুমি যখন যে আচ্ছাদনে কেন আপনাকে আচ্ছাদিত না কর, তুমি বিনা কেহ আমাদের নিত্যাশ্রয় হইতে পারে না। সর্ব্ববিধ আবরণ উন্মোচন করিয়া তোমাকে দেখিলে আর কি কখন মনে ভয় ভাবনা উপস্থিত হয়? যখন যে আবরণে আবৃত থাকিয়া তুমি আমাদিগকে আশ্রয় দাও, সে আশ্রয় আমাদের হৃদয় মন প্রাণকে উন্নত করে, কেন না আমাদের দৃষ্টিতো আর আবরণের উপরে বদ্ধ থাকে না, তোমারই উপরে বদ্ধ থাকে। তুমি সেই আবরণে আবৃত থাকিয়া আমাদের কল্যাণের

জন্য কখন কি ব্যক্ত করিতেছ আমরা তাহাই দেখি, দেখিয়া তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করি। অপূর্ণ আবরণ কখন দোষশূন্য নয় আমরা জানি, কিন্তু তুমি যে আপনি সর্ব্বদোষশূন্য, আমাদের চক্ষু থাকিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, আবরণের দোষ তুমি আমাদের কল্যাণের হেতু করিয়া তোল। হে একমাত্র পরমাশ্রয়, তাই তব চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি, ইহলোক বা পরলোক কোথাও আমরা যে কখন আশ্রয়শূন্য নই, এ বোধ আমাদের মনে তুমি দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দাও এবং তুমি স্বয়ং সর্ব্বাবস্থায় আমাদের আশ্রয় হইয়া আছ, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর। হে দেব, এই ভিক্ষা করিয়া আমরা বিনীতভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

স্বর্গগত আচার্য্যপত্নী।

অর্দ্ধকলেবর ভবারণ্যে রক্ষা করিয়া অর্দ্ধকলেবর অগ্নিমুখে নিক্ষেপপূর্ব্বক আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বর্গে আরোহণ করিলেন। সেই কাল হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্যে বাস করিয়া সে অর্দ্ধকলেবরও আজ (১৮ ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রাতে ৮ ঘটিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে) ভূতলে বিসর্জ্জিত হইল, আত্মা যে পথ দিয়া কেশবচন্দ্র গমন করিয়াছেন সেই পথ দিয়া সেই ধামে প্রস্থান করিল। যে দুই আত্মা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক একত্র গ্রথিত হইয়াছিল, সে দুই আত্মা বিদেহ ও সদেহ অবস্থায় আর কতকাল বিচ্ছিন্নপ্রায় অবস্থান করিবে? এ দুই আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বয়ং কেশবচন্দ্রের কথায় ভিন্ন অন্য কথায় কি কেহ প্রকাশ করিতে পারে? সে কথা গুলির অনুবাদ এই ;—

"প্রিয়ে, তুমি আমার নিকটে এক বুদ্ধির অগম্য বস্তু। যখন তোমাকে বিবাহ করি, তাহার পূর্ব্বে তুমি আমার নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলে, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমার এক জন বন্ধু! আমি তোমাকে চিনিতাম না, তুমি আমাকে চিনিতে না। তোমার বাড়ী এক স্থানে ছিল, আমার বাড়ী এক স্থানে। এক্ষণে যাহা আমার বাড়ী তাহাই তোমার বাড়ী এবং আমার সমুদায় দ্রব্যাদি তোমার। আমার সন্তানেরা তোমাকে মা বলিয়া ডাকে এবং আমাকে পিতা বলিয়া ডাকে। প্রিয়ে, আমরা ছিলাম দুজন, এক্ষণে হয়েছি একজন; অর্থাৎ একের ভিতরে দুজন। ইহা আশ্চর্য্য এবং বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার! কে ইহার অর্থ করিবে? যে হৃদয়দ্বয় পরস্পর অপরিচিত বলিয়া অতিশয় বিচ্ছিন্ন ছিল, তাহাদের মধ্যে এ প্রকার নিকট সম্পর্ক এবং যোগ কোন্ শক্তি স্থাপন করিল? সত্যই সেই অনাদি অনন্তপুরুষ যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছেন, তিনিই আমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন। যদি বল কেন? তাহা আমি জানি না। যদি বল কিরূপে? তাহাও আমি জানি না। যাঁহাকে লোকে দয়াময় বলে তাঁহার কার্য্যসকল কে বুঝিতে পারে? তাহা অনুসন্ধানের অতীত। হে প্রিয় আত্মা, কেন এবং কিরূপে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম তাহা আমি যথার্থই জানি না। আমার মনে হয়, কে যেন তোমাকে ঈশ্বরের দয়ার পক্ষপুটে আরোহণ করাইয়া হঠাৎ আমার নিকটে লইয়া আসিয়াছে। এ লোকটা কে, আমি আমার মনকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম, ভিতর হইতে একটি শব্দ বলিয়া উঠিল, 'তোমার জীবনের কার্য্যে তোমাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য এবং তোমাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তোমার আনন্দ এবং দুঃখের সহভাগিনী হইবার জন্য ইনি স্বর্গ হইতে প্রেরিত। ইঁহাকে গ্রহণ কর, ইঁহাকে প্রণাম কর, এবং ইঁহাকে তোমার আপনার করিয়া লও।' আমি ইহা শুনিলাম, সেই মত কার্য্য করিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধি ব্যাপারটি বুঝিতে পারিল না এবং অদ্যাপিও বুঝিতে পারে নাই। তোমার মুখপানে যখন আমি প্রথম দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন আমার ভিতরে বিচিত্র ভাবসকল উত্তেজিত হইয়া আমার হৃদয় তোমার দিকে আকৃষ্ট হইল। নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি তোমাকে যে গুপ্ত আকর্ষ অর্পণ করিয়াছেন, তুমি তাহার দ্বারাই আমাকে টানিয়াছিলে; নতুবা আমি কেন উক্ত প্রকার ভাব সকল অনুভব করিলাম। মনের এই ভাবকে লোকে প্রণয় বলে। প্রণয়, ইহা কি? আমি ইহা মনে মনে জানি, কিন্তু ইহা যে কি তাহা বলিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি, অর্থাৎ তোমার প্রতি আমি একটি গভীর ভাব অন্তরে অন্তরে পোষণ করি। ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। প্রশস্ত ভূমণ্ডলমধ্যে আমি তোমাকে যে প্রকার ভালবাসি, কেনই বা আর কাহাকে সে প্রকার ভালবাসি না। তোমার মত আর কেহ কি উৎকৃষ্ট নাই? আর কেহ কি এমন গুণসম্পন্ন নহে? তবে তুমি আমার হৃদয়ের আনুগত্য ও অনুরাগ যত আকর্ষণ কর, কেন আর কেহ সেরূপ পারে না? বলিতে কি, আমার ভালবাসাকে বান্ধিয়া রাখিবার এবং হৃদয়কে টানিবার ভার তোমাকে দান করা হইয়াছে; নতুবা তুমি কখনই তাহা পারিতে না। তোমার ঈশ্বরই তোমাকে আমার উপরে এই গূঢ় শক্তি এবং কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। হে স্বর্গের সুন্দর সন্ততি, তোমার পিতা আমার হৃদয়রজ্জুতে

তোমাকে দৃঢ় করিয়া বান্ধিয়াছেন, সুতরাং স্বর্গীয় ভালবাসাতে আমি তোমার তুমি আমার। কি বলিলাম, স্বর্গীয় ভালবাসা? হাঁ। পৃথিবী যাহা ইচ্ছা বলুক না। বিবাহসম্বন্ধীয় যথার্থ প্রণয় একটি পবিত্র ভাব। স্বামী এবং স্ত্রীর প্রণয়, ইহা স্বর্গীয় আসক্তি। কে এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে? তাহারা পরম পবিত্র পুরুষকে অপমান করে, যাহারা ইহাকে পার্থিব প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করে। হে প্রিয় আত্মা, ইহা কি হইতে পারে যে আমার মধ্যে যে পশু প্রকৃতি আছে তাহা তোমাকে ভালবাসে? কখনই না। একটি অমর আত্মার আর একটির ভিতরে লয়, ইহা কেবল স্বর্গীয় উদ্রিক্তভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে। হে বন্ধু, আমাদের প্রণয়ের স্বর্গীয় ভাবসম্বন্ধে তুমি সাক্ষ্য দান কর, সে বিষয় সঙ্কুচিত হইও না। এই সংশয়প্রধান কাল, এই কুপথগামী বংশ, এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ বাক্য চায়, আমরা কোন দ্বিধা বা অবিষদ ভাব না রাখিয়া অসন্দিগ্ধ বাক্য অর্পণ করিব। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আমি তোমাকে ভালবাসিতাম না। ঈশ্বর যদি আমায় তোমাকে ভালবাসিবার ক্ষমতা না দিতেন, আমি তোমাকে ভালবাসিতে পারিতাম না। দাম্পত্যপ্রণয়ের সম্বন্ধ, ভাব, বল, কর্ত্তব্য, আনন্দ, সকলই স্বর্গীয়। যখন তুমি প্রথমে আমার নিকটে আসিয়া বিবাহের পিঁড়িতে বসিলে, তখন আমি তোমার শরীরের গলায় মালা পরাইয়া দিই নাই, কিন্তু তোমার আত্মার গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছিলাম। হে নারী, আমি তোমার দেহকে বিবাহ করি নাই, কিন্তু তোমার আত্মাকে বিবাহ করিয়াছি। আমি আমোদ প্রমোদের জন্য বিবাহ করি নাই, কিন্তু এই জন্য করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এবং আমার পরকালের পক্ষে সহযাত্রী হইবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে নিয়োগপত্র লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিলে। সাংসারের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং প্রলোভনের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ ফকীর এবং বৈরাগী লইয়া একটী স্বর্গের বাড়ী, একটি প্রেমের পরিবার গঠন করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সুগম্ভীর সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার প্রার্থনার প্রিয় সঙ্গিনীরূপে, আধ্যাত্মিক জগতে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে, স্বর্গের অদৃশ্য মণিমাণিক্যে বিভূষিত একটি আত্মা এই ভাবে, তুমি নিকটে দণ্ডায়মানা। এই জন্য তোমার স্বামী তোমাকে আধ্যাত্মিক প্রেমে ভালবাসিতে এবং তোমার সঙ্গে ধর্ম্মের সখ্যভাবে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। যখন আমরা নিত্য গৃহধর্ম্ম পালন করি, তখন আমরা ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সহকর্ম্মিরূপে অবস্থান করি। আমাদের ধর্ম্মের প্রেম বলিয়া ইহা কি কম উদ্দীপ্ত? প্রার্থনার সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া কি কম প্রোৎসাহিত? না। সত্য সত্য এমন লোক আছেন যাঁহারা বৈরাগীর ভাবে ঈশ্বরকে পূজা করিবেন মনে করিয়া আপনাদের স্ত্রীকে ঘৃণা করেন। আবার এ প্রকার লোকও আছে, যাহারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট এবং সেবা করিবে বলিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রতি উপেক্ষা করে। কিন্তু হে প্রিয় অর্দ্ধাঙ্গ, আমি এ সকল মত পোষণ করি না। এ প্রকার বাতুলতার সহিত আমার যোগ নাই। আমার মত উচ্চতর। যখন তুমি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছ, আমি তোমাকে ঘৃণা করিতে পারি না। তোমাকে ঘৃণা করা পাপ। তোমাকে মান্য করা, তোমাকে ভালবাসা পুণ্য। ঈশ্বরের সমক্ষে তোমার সঙ্গে আমি প্রার্থনা করিব, ঈশ্বরের সমক্ষে তোমার সঙ্গে আমি বসিব। তুমি তোমার সুমধুর স্বরে তাঁহার নাম সঙ্গীত করিবে এবং আমার হৃদয়কে মোহিত করিয়া দিবে। তুমি সমুদায় সাংসারিক ভাবনা, অপবিত্র চিন্তা, ক্রোধ, দ্বেষ, সমস্ত মন্দ প্রবৃত্তি, লঘুতা, স্বর্গের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং বৈরাগিণীর ন্যায় দরিদ্রতা ও বিনয়ের ব্রত গ্রহণ করিবে। স্বর্গীয় প্রভুর আরাধনা সেবাতে এবং জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য সকল পালনে তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে যোগদান করিবে। এইরূপে ইহকাল এবং অনন্তকালের জন্য আমরা ঈশ্বরেতে এক আত্মা হইয়া সংযুক্ত হইয়া যাইব এবং নিত্য পুণ্য শান্তি লাভ করিব। আমাদের ভালবাসা পৃথিবীর অতীত বৈরাগীর প্রেমে এবং নিত্য আধ্যাত্মিক সখ্যভাবে পরিণত হউক। সংসার এবং শারীরিক ভাবাসক্ত স্বামী যে আপনার স্ত্রীকে ভালবাসে তাহা নহে। বৈরাগীই কেবল প্রকৃত প্রণয় এবং জ্বলন্ত অনুরাগে ভাল বাসিতে পারে, কারণ তাঁহার ভালবাসা ঈশ্বরের নিকট হইতে আইসে। এ প্রকার ভালবাসা আমাদের হউক। হে আত্মা, যেমন আমি লিখিতেছি, লিখিতে লিখিতে তোমার শরীর এবং সাংসারিক বিষয় সকল যেন সমস্ত অন্তর্হিত হইল, এবং একটী আধ্যাত্মিক স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। পরম মাতার ক্রোড়ে প্রার্থী ঋষিভাবে একটী আত্মা স্ত্রী বসিয়া আছে ইহা কি মনোহর স্বর্গীয় দৃশ্য! হে প্রিয়ে, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্যে বিবাহের আরম্ভ, বৈরাগ্যে উহার পর্য্যবসান হইয়াছে। বৈরাগ্যের ভিতরে এত প্রেম এত অনুরাগ কে বিশ্বাস করিতে পারে? যখন তাঁহার বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ, পত্নীর বয়স নবম। এ সময়ে বৈরাগ্যের কথা কেন? "এই সকল হইল কখন? আঠার, উনিশ, কুড়ি বৎসরে। ... স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে। 'সংসার বিলাসে তুমি সুখ লাভ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে? এ সকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে?' ঠিক আমার মনের ভিতর এই সকল কথা কে বলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, একে আমি স্ত্রীর অধীন করিব?

সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম এ জীবনে স্ত্রৈণ হইব না। কেন না স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি।" কেশবচন্দ্রের এ ভাব কি পবিত্র প্রণয়বিরোধী, না ইহাই পবিত্র প্রণয়ের পত্তনভূমি? বিবাহের দিনে প্রথম মুখাবলোকনে যাঁহার প্রতি তাঁহার চিত্ত বিমুগ্ধভাবে আকৃষ্ট হইল, তাঁহার প্রতি আসক্তি না জন্মে, এজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কেন? লোকে বলে কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্যসমুচিত ব্যবহার তাঁহার পত্নীর মনে অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে অতি নবীনবয়সে জাতিকুলের ভয় পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর আচরিত ধর্ম্মের অনুরোধে তাঁহার অনুসরণ করিয়া অজ্ঞাতকুলশীল প্রধানাচার্য্যের গৃহে গিয়া কেন তিনি বাস করিলেন? অশান্তি স্বামীর অপ্রণয়-নিবন্ধন, না গুরুজনের, গৃহস্থিত নরনারীগণের গঞ্জনার জন্য? স্বামীকে সংসারী করিয়া তুলিতে না পারিলে হিন্দুর গৃহে কি পত্নীর গঞ্জনার সীমা থাকে? এরূপ গঞ্জনায় যে তিনি সর্ব্বদা অস্থির ছিলেন তাহা আর কে না জানে? ধর্ম্মের জন্য নিপীড়নে তাঁহার কোমল হৃদয় যে নিয়ত ক্লেশানুভব করিবে, ইহা কি আর বিচিত্র! সম্ভ্রান্ত জাত্যভিমানী ধনীর গৃহের পুত্রবধূ হইয়া পিরালী গৃহে গমন, প্রকাশ্যে পিরালীর সঙ্গে পান ভোজন, ইহাতে সে কালে তিরস্কার, গঞ্জনা, নির্য্যাতন কি প্রকার সহ্য করিতে হইত, এ কালের অনেকের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। গৃহে আমোদ প্রমোদ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হইতেছে, কেশবচন্দ্র, কেশবচন্দ্রের পত্নী বা তাঁহার পুত্র কন্যাগণের তাহাতে যোগ দেওয়ার অধিকার নাই, তাঁহারা অনাদৃত, অনিমন্ত্রিত, এ সকল ক্লেশ নারীহৃদয়ের বহন করা কি সামান্য কথা! ধর্ম্মার্থনিহত হইলে তখনই প্রাণ নিঃশেষ হইল, সকল জ্বালার নিবৃত্তি হইল। কথায় ব্যবহারে ক্রমিক যাতনাদান তুষানলসদৃশ! আজও তাঁহার এ যাতনার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পুত্রকন্যাগণ আক্ষেপ করেন।

কেশবচন্দ্র পত্নীর সঙ্গে আত্মায় আত্মায় এক হইয়া যে ভাব অভিব্যক্ত করিলেন উহা কোন্ সময়ে? ইংরাজী ১৮৮০ সনে, যখন তিনি নৈনীতালে গিয়া যোগিভাবে পত্নীকে সঙ্গিনী করিয়া সেই চিত্র প্রতিফলিত করাইয়াছিলেন। এ ভাব কি ইঁহাতে এই নূতন সমাগত হইয়াছিল? না। হঠাৎ এ ভাব আইসে নাই, ইহার সূত্রপাত অতি প্রথম হইতে তাঁহাতে ছিল, জীবনবেদের "বৈরাগ্য ও অরণ্যবাস" অধ্যায় পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এ সময়ে এ ভাব অবশ্য ঘনীভূত হইয়াছে; অন্যথা তিনি এসময়ে এরূপ প্রার্থনা করিবেন কেন?"...আপনার লোক, বাড়ী, এই শরীর, ইহা কি ছাড়িতে পারি? কিন্তু তুমি বজ্রধ্বনিতে বলিতেছ সব কেটে ফেল, মেরে ফেল। বড় নিষ্ঠুর আজ্ঞা। হে ঠাকুর, ভয় করে, পারবো না বুঝি। কিন্তু প্রেমের রাজ্যে যাইবার ঐ এক উপায় আছে। নরবলি না হলে তুমি সন্তুষ্ট হবে না। ...হরি যার সংসার শুদ্ধ করেন তার সংসার বিষের সংসার নহে। কিন্তু যেখানে হাড়কাঠখানা বসান আছে, নরবলি হয়, ঐ জায়গাটী ভয়ানক। বড় ভয় করে, হায়, ঐ জায়গাটা পার করে দাও।... ঐ জায়গাটায় সকলে কাঁদবে, ভাই ভগ্নী মাতা পিতা, ভিতরের বাসনা সব কাঁদবে। তার পর যাই কান্না থামিল, স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই ভগ্নী ভিতরের রক্ত সকলে হাসে।" এ কথা গুলির সঙ্গে সে সময়ের এই কথাগুলিকে যোগ করিলে কি বুঝায়;—"এই পর্ব্বতে মহাদেব থাকেন। মহাদেবের সন্তান আমরা, মহাদেবের পুত্র আমরা সুন্দর হইব, যোগ করিয়া কাল দেহকে সুন্দর করিব, স্বামী স্ত্রীতে সাধন ধ্যান যোগ করিব, আত্মায় আত্মায় মিলিয়া পরমাত্মায় ডুবিব। কলিকাতায় যাইয়া যোগেশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব, তাহারা বুঝিবে আমরা যোগেশ্বরের পুত্র কন্যা।" তবে ইনি কি পর্ব্বত হইতে এই নূতন ভাব লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন? ইতঃপূর্ব্বে আর্য্যনারীসমাজে যোগ সাধন তিনি প্রব-

ষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই আর্য্যনারীসমাজের সর্ব্বপ্রধান পরিচারিকা তাঁহার আপনার জীবন-সঙ্গিনী। পত্নীকে যোগিনী করিয়া আপনার নিত্যকালের সঙ্গিনী করিবার নিমিত্ত কেশবচন্দ্রের এত যত্ন কেন, তৎকালের প্রার্থনায় নিবিষ্ট এই কথাগুলি তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ করে।

"হে দয়াময় দীনবন্ধু, আমরা পর্ব্বতে আসিয়া যোগী বৈরাগী, না সংসারী? পর্ব্বতের গোলমাল কোলাহল ও সংসার, ছেলে স্ত্রী টাকা, নানাপ্রকার চিন্তা, ইহার মধ্যে যোগধ্যান হয় না। পর্ব্বতের উপরে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী হইয়া নির্জ্জনে যোগ করিতে হয়। যেন বিবাহ হয় নাই, স্ত্রী নাই ছেলেপিলে নাই, এই ভাবে যোগ করিতে হয়। তাহা না হইয়া পর্ব্বতের উপর কোলাহল, যেন হাট বাজার বসিয়াছে। মায়া, রোগ, টাকা কড়ীর ভাবনা ও জঞ্জাল, এ সমস্ত লইয়া যোগরাজ্যে কিরূপে যাইব? কিন্তু তুমি বলিতেছ, সমস্ত সংসার ও জঞ্জাল লইয়া যোগ কর। নববিধান যোগরাজ্যে প্রবেশ করিতে বলিতেছে। মহাদেবের হুঙ্কারে আমাদের মস্তক অবনত হইল, যাহা প্রভুর আদেশ তাহা করিতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা এই। নতুবা কেনই বা নববিধানের পরেই পর্ব্বত উপরে আসিলাম। কি জন্য তিনি এই কয়জন সাধককে পর্ব্বতের উপর আনিলেন? এত লোক জন সন্তান ও স্ত্রী প্রভৃতিকে কেন আনিলেন? রোগ শোক নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া কি করিব। এই সমস্ত লইয়া যোগশিখরে আরোহণ করি। এই পর্ব্বতে হরপার্ব্বতী নিজের সন্তান লইয়া যোগ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বলিয়া আমরা উহা তত ভাবি না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই নৈনীতালে, প্রভু, সাক্ষাৎ হর গৌরী লইয়া একটী কীর্ত্তি দেখাও। বিশেষ সময়ে নববিধানে স্বামী স্ত্রী দুই জনে যোগ করুন। প্রত্যেক স্বামী স্ত্রী লইয়া হরগৌরী হউন। সন্তান থাক, সমস্ত সংসার লইয়া ইহার ভিতরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া যোগরাজ্যে প্রবেশ করিব। দয়াময় তাঁহার চরণ দিন ও সদয় হউন।"

আচার্য্যপত্নীর কথা বলিতে গিয়া আমরা আচার্য্যের কথা এত বলিতেছি কেন? পত্নী যদি যোগপথে পতির অনুকূল থাকিতেন তাহা হইলে একের কথা বলিতে গিয়া অপরের কথা তুলিবার তত প্রয়োজন ছিল না। পত্নীর নিকটে সন্তানগণের নিকটে যোগী যোগের কথা বলিবেন, সে পথে আনিবার জন্য প্রাণগত যত্ন করিবেন, জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার এই ব্রত। কেশবচন্দ্র সে ব্রত আপনি কত দূর নিজ জীবনে পালন করিয়াছেন, তাঁহার জীবনসঙ্গিনীসম্বন্ধে সে প্রযত্নে সফল-মনোরথ হইয়াছেন কি না? ইহা দেখাইলেই পতির মাহাত্ম্যে পত্নীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় জন্য পত্নীর জীবন উল্লেখ করিতে গিয়া পতির প্রযত্নের উল্লেখ। কেশবচন্দ্র আপনার পত্নী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এ স্ত্রীর কি আসিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় বাঁকা। এক দিকে আমি, আর উনি অন্য দিকে চলেন।" যদি এতই প্রতিকূল, তবে বৃথা প্রযত্নে সময়ক্ষেপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন পত্নীর উপরে পবিত্র প্রেমের জয়লাভ। "আমার বিশ বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? এই যে আশা পূর্ণ হইতেছে?" বিশ বৎসর ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের নিকটে রোদন! ইহাকেই বলে পবিত্র প্রণয়। আমরা দুদিন যত্ন করিয়া তিন দিনের দিন নিরাশ হই, আর ইহার কিছু হইবে না বলিয়া ছাড়িয়া দি। কেশবচন্দ্র পূর্ণ বিশ্বাসী, তিনি প্রার্থনার বলের উপরে নিরাশ হইবেন কেন? যখন তিনি দেশভ্রমণে বাহির হইতেন, পত্নীকে সঙ্গে লইতেন, নানাদেশ দেখাইতেন, ইহাতে তত গভীর প্রণয় প্রকাশ পায় না, যত প্রকাশ পায় আধ্যাত্মরাজ্যে নব-বৃন্দাবনে পত্নীকে সঙ্গিনী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রাণগত যত্নে। ১৮০১ শকে বৈশাখ মাসের অন্তিমভাগে আর্য্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেশবচন্দ্র আর্য্যনারীগণের যোগপথে প্রবেশের দ্বার খুলিলেন, পত্নীকে আষাঢ় মাসে মৈত্রেয়ী ব্রত দিলেন। "স্বামীর সহিত একত্র ব্রহ্মস্তব পাঠ ও ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন এবং উভয়ে 'সাহোবাচ' প্রতিদিন পাঠ" মৈত্রেয়ী ব্রতের এ নিয়ম পতিপত্নীর যোগভূমিতে সম্মিলনের সূত্রপাতস্বরূপ হইল। পরবর্ষ জ্যৈষ্ঠ মাসে নৈনীতালে হিমালয় শিখরে হরগৌরীর ভাব শিক্ষার জন্য একতন্ত্রী হাতে লইয়া কেশবচন্দ্র আপনি যোগে বসিলেন পত্নীকে সঙ্গে বসাইলেন। যোগীর পার্শ্বে তাঁহার পত্নী, ইহা ছবিতে উঠিল।

এই ছবিতেই কি তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন? পত্নীকে এবং অপরাপর নারীগণকে যোগ শিক্ষা দিবার জন্য একতন্ত্রী সহকারে সাধিত নবীনযোগপ্রণালী তিনি উদ্ভাবন করিলেন। আর্য্যনারীসমাজের অধিবেশন এই নবীনযোগপ্রণালীপ্রধান হইল। এই পথে পত্নীকে সঙ্গিনী করিবার তাঁহার যত্ন দিন দিন ঘনীভূত হইতে চলিল। যোগের পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য ১৮০৩ শকের বৈশাখ মাসে স্বাধ্যায় ও নির্জ্জনসাধনপ্রধান ব্রতে পত্নীকে দীক্ষিত করিলেন। এসকল বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মর্ম্ম অপরে তত বুঝিতেন না; কেশবচন্দ্র কিন্তু সম্মুখে একটি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এ সব করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্ষুণ্ণ যত্ন অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিল। ১৮০৪ শকের কার্ত্তিক মাসে অধ্যাত্মবিবাহের দিন উপস্থিত হইল। এই বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "চারিহাত মিলাইয়াছিলে একবার, সে সংসারের পক্ষে কাজের বটে, ধর্ম্মের পক্ষে বড় কাজের নয়। আর আজ চারিহাত মিলাইলে ধর্ম্মের ঘরে। সেই বিবাহ দিয়াছিলে বালির ঘাটে, আর আজ বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে।......এ বিবাহ উচ্চ পবিত্র প্রশান্ত সুন্দর। উভয়ের মনে নিকৃষ্ট ভাব থাকিবে না। এ বিবাহ পবিত্র। নীচ তিক্ত ভাবে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইব না। এমন ভাল বাসিব পরস্পরকে যাহা বিষয়ী স্বামী স্ত্রীরা কখনও পারে না। পরস্পরের দিকে যখন তাকাইব, উভয়ের ভিতর দেবত্ব দেবীত্ব দেখিব।" ১৮০৪ শকের ১৩ কার্ত্তিক রবিবার কেশবচন্দ্র পত্নীকে যুগলসাধনব্রতে দীক্ষিত করিলেন। ঈশা, গৌতম, গৌরাঙ্গ, মোহম্মদ, নানক, শিবদুর্গা, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী, ইঁহাদিগের বিষয় পাঠ ও শ্রবণ, পতিসহ যোগসাধন, কুটীরে নির্জ্জনসাধন এ ব্রতের প্রধান অঙ্গ ছিল। ইঁনি পত্নীসহকারে অধ্যাত্মবিবাহে সংযুক্ত হইলেন, বন্ধুগণ তাহা করিলেন না; এজন্য প্রার্থনায় আক্ষেপ করিয়া কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "সংসার আমাদের চায় না, বন্ধুরা চান কিনা জানি না, চাহিলে সঙ্গে আসিতেন, বৃন্দাবনবাসী হইতেন। এঁরা সংসারের কুমন্ত্রণায় ভুলিলেন, স্ত্রীর কথায় কাণ দিলেন, শেষে কি হইল? এক নৌকায় সকলে যাবেন, তাত হবে না। তুমি ছোট নৌকা পাঠাইলে কেন? যাঁদের এক সঙ্গে নৌকায় চড়িয়া যাবার কথা ছিল তাঁরা ঘাটে দাঁড়িয়ে বিদায় দেন কেন?" কেশবচন্দ্র আপনি যে পথে যখন আরোহণ করিতেন, বন্ধুগণকে সেইপথে আরূঢ় তিনি দেখিতে পাইতেন। এবার তাহা ঘটিল না। "এইপথে যোড়া যোড়া চলেছে;"—কৈ বন্ধুগণের সম্বন্ধে তাহা তো সিদ্ধ হইল না। যদি না হইল, তবে কেশবচন্দ্রের হৃদয় হইতে গভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইবেইবা না কেন?

কেশবচন্দ্র অধ্যাত্মবিবাহে সফলমনোরথ হইলেন। ইহার সূত্রপাত কোন্ দিন হয় আমাদের মনে আছে। যে দিন তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিলেন, সেই দিন হইতে সংসারের সঙ্গে তাঁহার নূতন সম্বন্ধ হইল, দেহ মন আধ্যাত্ম বিবাহের দিকে ধাবিত হইল। যে দিন তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানের নাম সুব্রত রাখিলেন, সেই দিন আমরা বুঝিতে পারিলাম, ব্রতের চরম ফল তাঁহাতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুব্রতের জন্মের বর্ষকাল মধ্যে তিনি পত্নীসহ অধ্যাত্মবিবাহে আবদ্ধ হইলেন। এই হইতে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ বিনা অন্য প্রসঙ্গে তাঁহার ঘোর বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল, বন্ধুগণের সহিত দিন দিন তাঁহার বিচ্ছেদ বাড়িতে লাগিল, পত্নী সহ অধ্যাত্মযোগে একীভূত হইবার জন্য ক্রমে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন। পরিশেষে ৩ এপ্রেল দল হইতে বিদায় লইয়া, দলকে পবিত্রাত্মার হস্তে রাখিয়া সপরিবার শিমলায় হিমালয়শিখরে প্রস্থান করিলেন। রোগের বৃদ্ধি সহকারে যোগের এত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে তাঁহার পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। এ বিচ্ছেদ শারীরিক বিচ্ছেদের

অগ্রদূত হইল! মনে হয় যেন বিধাতার এই-রূপই ব্যবস্থা। বিচ্ছেদ না হইলে যোগ কি কখন সম্ভবপর? যাই শরীরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিল অমনি তাঁহার জীবনসঙ্গিনীর মন যোগের জন্য আকুল হইল। সে আকুল ভাব কিরূপ, ইঁহার প্রার্থনার এই অংশ পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

...খাঁচা ভাঙ্গিয়া গেল, স্বামী পাখী উড়িয়া, মা, তোমার কোলে লুকাইল। স্বাপক্ষী উড়ে উড়ে বেড়ায়। তার ভগ্ন খাঁচা আর ভাল লাগে না। তাঁর যে আত্মা পাখী উড়িয়া গিয়াছে স্বামীর সঙ্গে, বাহিরের শরীরটা বাহিরে পৃথিবীতে। যখন স্বামীর সঙ্গে ছিল, তখন বেশ দেখিতে পাইত, আনন্দে বিচরণ করিত। পক্ষী রাত্রি হইলে কাণা হয়, সূর্য্য অস্ত হইলে আর কিছু দেখিতে পায় না। আনন্দ, সুখ, পৃথিবীর বস্তু, তার হৃদয়কে আর টানিতে পারে না, ফিরাইতে পারে না।......হে দয়াময় আশীর্ব্বাদ কর যেন সতীদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অনন্তকাল পতিসনে থাকিতে পারি।

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবীর যোগের জন্য প্রাণ আকুল হইল। কমলকুটীরের দ্বিতল ছাদের উপরে মঙ্গলপাড়াস্থ মহিলাগণকে লইয়া প্রতিদিন যোগ সাধন হইতে লাগিল। ক্রমে প্রমত্ততা বাড়িয়া উঠিল। প্রচারে চিত্ত আকুল হইল, কিন্তু বাধা পাইয়া সে ভাব মন্দীভূত হইল। এসময়ের একটী সমগ্র প্রার্থনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাতেই সকলে ইঁহার তাৎকালীন মনের ভাব সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"হে যোগেশ্বর যোগীর হৃদয়রঞ্জন নববিধানের হরি, তোমার নববিধানে আমরা উচ্চ অধিকার পাইলাম। তোমার বিধানকুমার এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়াযাইলেন, পতিত নারী-জাতিকে উদ্ধার করিলেনএবং উচ্চ অধিকারিণী করিলেন। হে মাত, নববিধানে আমরা এমন অধিকার পাইলাম যে, আমরা তোমার ভক্ত সাধকগণের মত উপাসনা করিব, তোমার দাসেরা যেমন তোমার ঘরে সেবা করিবেন আমরাও সেইরূপ সেবা করিব। আমরা যোগ করিলেও করিতে পারি। মা, কেমন করে এমন জীবনে যে এমন উচ্চ প্রার্থনা করিতেছি জানি না। মাত, তোমার প্রকাশে অসম্ভব সম্ভব হয়। মা, যদি এদুঃখিনীকে সুখী করিবে বলিয়া উচ্চ অধিকার দিলে তবে ইহাকে যোগনিদ্রায় অভিভূত করিয়া দাও। মা, ক্ষুদ্র শিশু যেমন নিদ্রার সময় মার কোলে শয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তখন তার আর খেলনা পুতুল ভাল লাগে না, মাতৃক্রোড়ে শয়নের জন্য তাহার মাথা হেলিয়া পড়ে, মা, তেমনি আমার আত্মা সংসারের পরিশ্রমে, খেলায় শ্রান্ত হইয়া তোমার আরামক্রোড়ে শয়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। মাত, নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট কোথায় পাপ, কোথায় প্রলোভন, কোথায় মায়া? ইহারা কেহই আক্রমণ করিতে পারে না। সে এখন মৃতের ন্যায় অবশ। সুযোগ পাইয়া দস্যুগণ যদি আসে, মা, তুমি প্রহরী হইয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছ, তাহার কে কি করিবে? মাত, যখন নাট্য অভিনয় হয় তখন যে ব্যক্তির নিদ্রার আকর্ষণ হয়, সে নানাপ্রকার বাদ্য ও গোলের মধ্যেও নিদ্রাকর্ষণে আকৃষ্ট, সে তখন আর কোন দিকে চাইতে পারে না। তাই বলি, জননী, আমাকে যোগনিদ্রায় ঘুম পাড়াও। এই যোগ স্বর্গের সোপান, এই পথ ধরিলে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, এই পথই আমার প্রার্থনীয়। এই ঘরে, মাত তোমার সঙ্গে মিলিত হব, এই ঘরে যাইলে আমি তোমার পুত্র-কন্যাগণকে দেখিব, এই ঘরেই আমি তোমার বিধানকুমারের সঙ্গে মিলিব। মাত, তোমার যোগিশ্রেষ্ঠ পুত্র কেমন যোগনিদ্রায় তোমার কোলে অনন্তকালের জন্য ঘুমালেন। এ পৃথিবীতে তাঁহার নিকটে সংসারের সকলি যোগের অনুকূল ছিল, প্রতিকূল কিছুই ছিল না। মাত, এই যোগই মানুষের অনন্তকালের সাক্ষী আর কিছুই সঙ্গে যাবে না। যোগই চিরসম্বল, যোগই পরমবন্ধু। অতএব, জননী, আমাকে যোগিনী কর, এই তব চরণে প্রার্থনা।"

ইঁহার যোগের জন্য ব্যাকুলতা দিন দিন গাঢ় হইতে চলিল, তাই প্রার্থনা করিতেছেন;—

"...যোগী ভক্তগণ তোমাকে দেখেছেন, তোমার সুন্দর নাম দিয়াছেন, তুমি ঐ আধারেই থাক। এ পাপীদের কাছে, এ শ্রেণীর নিকটে আস্‌বে না?...এখন তোমার উচ্চশ্রেণীর কাছে থেকে নামিতে হবে। তুমি নববিধানে এলে কেন? সংসারের ভিতরে মা লক্ষ্মী হয়ে প্রবেশ করিলে কেন? যখন পাপীকে আশা দিলে তখন অসম্ভব সম্ভব করিতে হইবে। সংসারীকে বৈরাগী করিতে হবে, চঞ্চলমতি জীবকে তোমার যোগী করিতে হবে। মৃত্যুর আগে যেন বলে যেতে পারি, অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, আসক্ত চিত্ত বৈরাগী হয়েছে, চঞ্চলচিত্ত স্থিরচিত্ত যোগী হয়েছে। যদি ভাল জীবন হইত তাহা হইলে বলিতাম না। কিন্তু যখন অসম্ভব সম্ভব করিবে তখন এই পাপাসক্ত মনকে যোগী করিতে হবে।..."

আচার্য্যপত্নী নিতান্ত সরলচিত্তা ছিলেন। তিনি শিশুভাবের প্রার্থী হইয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে তখন তাহা বড়ই ভাল শুনাইয়াছিল।

"...মা, সকাল বেলা ছিল ভাল, মধ্যাহ্নকালে বড় গোলমাল গেল, মহাবিপ্লব ঝড় জল মেঘ পাপ তাপ কলঙ্ক আসিল। এখন এ সকল নিবৃত্ত কর, অনুতাপের পর শান্তি বর্ষণ কর। মাতৃগর্ভ

হইতে যখন জন্মাইলাম, তখন যেমন ছিলাম, তেমনি ভাবে এখন চৈতন্যরূপিণী তোমাতে যেন সচৈতন্য থাকিতে পারি। যখন ঝড় বৃষ্টি থামিল, চারি দিক্ স্থির শান্ত হইল, মেঘ চলিয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইল, পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া শোভাবিস্তার করিল, তখন যেমন আর পূর্ব্বের ভাব কিছুই থাকে না, তেমনি, মাত, আমার হৃদয় আকাশের সমস্ত পাপ দূর করিয়া দিয়া প্রেমচন্দ্র তুমি উদিত হও...।"

প্রার্থনার এ অংশে সারল্য ও তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বপ্রবণচিত্ততা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এ সময়ে দল ও দরবারের প্রতি তাঁহার কি প্রকার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার তৎকালের একটী প্রার্থনা পড়িলে বেশ বুঝান যায়। ঐ প্রার্থনার শেষের কতকটা অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"...মা, আমি দুর্ব্বল, আমি তোমার নববিধান বহিতে পারি না। যাঁহারা তোমার নববিধান বহিতেছেন, আমাকে এবং আমার ভগিনীগণকে তাঁহাদের অনুগামী কর।...জননী, এ পৃথিবীতে সকলেই কেবল দল ও একতা চায়।...একখানি কাষ্ঠেতে আগ হয় না, অগ্নি না হলে রান্না হয় না; একটি ঝাঁটার কাটিতে দেবালয় পরিষ্কার হয় না; প্রত্যেক চালকে ভিন্ন করিলে অন্ন প্রস্তুত হয় না, শরীর রক্ষা হয় না; সূতা সকল স্বতন্ত্র থাকিলে বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। সমস্ত জড় জগৎ পরমাণুর সমষ্টি, পরমাণুকে ভিন্ন করিলে কিছুই থাকে না। খাওয়া পরা চলে না, দেহও থাকে না। মা, আমি মূর্খ, আমি যেন তোমার নববিধান দরবারকে বিশ্বাস করিতে পারি। তোমার এই দরবারে তোমার বিধানকুমার চিরদিন বাস করিবেন। যে দরবার আবার স্বর্গে যাবে, আমি বিন্দু হয়ে তাহাতে থাকিব। আমি বিশ্বাস করি, যে সকল বিশ্বাসী আত্মা তোমার পুত্রের আত্মাকে স্পর্শ করিতেছেন, তাঁহারা তোমাতে তোমার পুত্রের কথা শুনিতে পান, তাঁহারই কার্য্য তাঁদের দ্বারা তুমি সিদ্ধ করাইয়া লও। মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সপরিবারে তোমার শ্রীদরবারকে মান্য ও যত্ন ও আদর করিতে পারি। হে দলপতি দলের ঈশ্বর, তোমার দলকে তুমি মহীয়ান্ কর, এই তোমার চরণে ভিক্ষা।"

কেশবচন্দ্রের প্রতি ইঁহার কি প্রকার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, ইঁহার প্রার্থনার এই অংশ পাঠ করিলে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন,—

"..... নাথ, তোমার বিধানকুমারকে যেন প্রাণের ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া পূজা করিতে পারি। নাথ, পূজা শব্দ সেই অর্থে বলি, যে অর্থে গুরুজনসম্বন্ধে পত্র লিখিতে গেলে পূজনীয় লিখিতে হয়। যদি গুরুজনকে পূজনীয় বলি তবে তোমার পুত্র, যিনি আমাদের তোমার ঘরে লইয়া যাইতেছেন, পরিত্রাণ দিতেছেন, তাঁহাকে আমি কি পূজা করিতে পারি না? হে নাথ, তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার বিধানকুমারকে তোমার সকল ছেলে মেয়ের চেয়ে অধিক শ্রদ্ধা করিতে পারি। তাঁহার নিকটে আমি অধিক ঋণী ও অনেক উপকার পাইয়াছি। আর তোমার দেবদেবী সন্তানসন্ততিদিগকে ভাল বাসিতে ও ভক্তি করিতে তাঁহারই নিকট শিখিয়াছি। হে প্রভু, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কোলে তোমার ছেলেকে যেন অনন্তকাল দেখি, যেন তোমার বিধানকুমারকে প্রাণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি, কারণ আমি তা হলে তোমাকে পাব, তোমার পরিবারে স্থান পাব।"

ইঁহার মতে, কেশবচন্দ্র বিবেক, বৈরাগ্য, পুণ্য, প্রেম, সতীত্ব, বিনয় লজ্জা, ক্ষমা, কোমলতা, এই সকল সদ্গুণের সমষ্টি। তাই ইনি একটী প্রার্থনা এই কথা গুলিতে শেষ করিয়াছেন, "আমাদের কাছে, মা তুমি, ছদ্মবেশে তাঁহাকে মানুষদেহ দিয়ে পাঠাইয়াছিল। তিনি যাহাতে গঠিত তাই তিনি আছেন, যাহা ছদ্মবেশে আমাদের নিকটে আসিয়াছিল তাহাই নাই। মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তিনি যাহা তাহাই হৃদয়ের ভিতরে চিরজীবন রাখিতে পারি।"

যোগের জন্য, ভক্তির জন্য, শিশুত্বের জন্য, আনুগত্যের জন্য নিরতিশয় ব্যাকুলতা এবং একান্ত ভক্তির পাত্র অনন্তকালের সহযাত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবিমিশ্র গাঢ় অনুরাগ, ইঁহার জীবনের কি অপূর্ব্ব শ্রীই না প্রকাশ করিতেছে। এ শ্রী হইতে আমাদের চক্ষু ফিরাইবার কিছুতেই অভিলাষ হয় না। তবে কি না ধর্ম্মজীবনের এক দিক্ দেখিলে চিত্র পূর্ণ হয় না, এজন্যই ইঁহার পরীক্ষাসঙ্কুল শেষ জীবনের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টিপাত করিতে হইতেছে। যে জীবনে ধন জনমান সম্ভ্রমাদি হইতে কোন পরীক্ষা উপস্থিত হয় নাই, সে জীবন সংসারিগণের কোন উপকারে আসে না, তাই পৃথিবীর লোকের দৃষ্টি সাধকজীবনের পরীক্ষাসঙ্কুল অংশ দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট হয়। সুতরাং এ অংশের কথা বলিতে গিয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, পরীক্ষা জয় করিবার প্রণালী পুরুষ ও নারীর কখন এক প্রকার হইতে পারে না। এক জন বীরদর্পে বলিতেছেন, দূর হ শয়তান, আর একজন পুণ্য-

ভূমিজাত প্রেমে উঁহাকে পরাস্ত করিতেছেন। যখন লোকে মনে করিতেছে আচার্য্যপত্নী পরীক্ষা দ্বারা পরাস্ত হইলেন, তখনও নারীর কোমলহৃদয়-সুলভ এই উপায়ে যে তিনি অপরাজিত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই। তাঁহার প্রতি ঈদৃশ অসংশয়িত বিশ্বাস স্বয়ং কেশবচন্দ্র আমাদের হৃদয়ে উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। নারিকেলডাঙ্গার পোলীস ষ্টেশনে ভূতপূর্ব্ব পোলীস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বর্গগত শ্রীযুক্ত কালীনাথ বসুর গৃহে বসিয়া পত্নীর প্রতি পতির কীদৃশ গভীর বিশ্বাস থাকা চাই, এবং আত্মপত্নীর প্রতি কিপ্রকার তাঁহার অটল বিশ্বাস আছে, এতৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, এবং যে কথা শুনিয়া আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, আজও আমাদের মনে সে কথা এই মুহূর্ত্তকালের আলাপের ন্যায় জাগিয়া আছে। সকল সময়ে সেই কথা আমাদের হৃদয়ের সংশয় নিরসন করিয়াছে এবং আচার্য্য-পত্নীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ভগবান্ যথাসময় তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন এবং যাইবার কিছু পূর্ব্বে আচার্য্য সহ সম্মিলনার্থ তিনি যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরা আশা ও বিশ্বাস করি, তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি অগ্রে গমন করিলেন, আমরা পরে যাইতেছি। এখানে থাকিবার সময়ে আমাদের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ মমতা ছিল, তাহার বিরতি হয় নাই বরং মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা আশ্বস্ত।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

২৩ ফাল্গুন, রবিবার, ১৮১৯ শক।

পরলোক।

মানুষ যখন ঘর শূন্য করিয়া শ্মশানভূমি আশ্রয় করে, সেই শ্মশানযাত্রা হইতে আবার কোথায় চলিয়া যায়? মানুষ কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া চিতার কাষ্ঠশয্যা গ্রহণ করিল, তথা হইতে, আবার কোন অগম্য দেশে চলিয়া গেল? শরীর ও গাত্রাবরণ সকল খসিয়া পড়িল, অগ্নিই আচ্ছাদন হইল, এখন রহিল কি? সমুদয় শেষ হইল, রহিল কিছু ধূম ও ভস্ম। তখন কোন জ্যোতির্ম্ময় আত্মা বস্তু রহিল কি না বল। এই মানুষ ছিল, তাহার কত উৎসাহ উদ্যম ছিল, সংসারে সুখ স্বাস্থ্যের কতই ব্যবস্থা ছিল, সুখ দুঃখ কত বুঝিত, কত যত্নে শরীর রক্ষা করিত, একটি কণ্টক বিদ্ধ হইলে কত যন্ত্রণা বোধ হইত, রোগের যাতনাতে কত অধীর হইত, এখন দেখ শ্মশানের অগ্নি তাহার সকল সুখ দুঃখ গ্রাস করিল। যে মানুষকে দেখিতে পাইতে, চির পরিচিত বলিয়া জানিতে, এখন আর তাহাকে দেখিতে পাও না, চির পরিচিত লোকের মত, আত্মীয় বন্ধুর মত তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারিতেছ না। সেই মানুষ আর নাই। কোন মানুষ রহিল কি না, সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় আত্মা মানুষ রহিল কি না, একবার চিন্তা কর। যে মানুষ রহিল তাহার বাসভূমি কোথায় তাহাও চিন্তার বিষয়।

চোখের সম্মুখে কাল লোক ছিল, আজ সুমেরু কুমেরু অনুসন্ধান কর, আর তাহার দেখা পাইবে না। কাল যাহার জন্য এত চেষ্টা ভাবনা, যত্ন, ঔষধ, পথ্য, সেবা, আজ দশ সহস্র প্রকার আয়োজন কর কিছুই সে আর গ্রহণ করিবে না, ইন্দ্রের ধনরাশি, বৃহস্পতির জ্ঞানরাশি আজ সকলই তুচ্ছ। দেহের সৌন্দর্য্য গেল, দেহের উত্তাপ পথের কর্দ্দমের মত শীতল হইল, উদ্যম ও চেষ্টা দেহে আর কিছুই অনুভূত হইতেছে না। শরীর গেল, মান, অভিমান অবসান হইল। হিন্দুশাস্ত্র বলে, মন বুদ্ধি, অহঙ্কার স্মৃতি সকলই শেষ হইয়া যায়। যদি এই সকলই বিনাশ হয় তবে অবশিষ্ট থাকে কি? হে জীব, তুমি যদি শরীর নহ, তুমি যদি বস্ত্র, অলঙ্কার নহ, তুমি যদি মনবুদ্ধি অহঙ্কার নহ, তবে বল তুমি কে? হে জীবন, তুমি যদি এ ঘরে থাকিবে না, শীঘ্র এ ঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঘর আশ্রয় করিবে, তবে বল তুমি কে? ঘরে যাইবে; কেন না পৃথিবীর এই উপর্য্যুপরি আঘাত ও পরিবর্ত্তনে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, এবং তাহার অন্তিম তত্ত্বের কথা স্মরণ হইতেছে। তাহার স্থিতি ও গতি চঞ্চল দেখিয়া, অচঞ্চল, অবিনাশী আশ্রয় লাভ করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছে। আত্মাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, আত্মা তুমি কে? আত্মা বলে, আমি কে আমি তাহা জানি না। আমি আছি এই মাত্র জানি। আত্মা বস্তু; এবং সে কোন স্থান হইতে আসিয়াছে ও কোথাও চলিয়া যাইবে, এই সত্য অভ্রান্ত। কিন্তু আত্মা আপনার স্থিতি, গতি ও পরিণাম ও উন্নতির চরম সংবাদ অবগত নহে।

আত্মাকে দেহের সঙ্গে দেহ মনে করিও না, জড়ের সঙ্গে জড় বলিয়া ভাবিও না। বাসনা কামনা, সুখ দুঃখ ও মানসিক নানা বৃত্তিকেও আত্মার সঙ্গে এক করিও না। কাহাকেও আমার পিতা মনে করিও না, কাহাকেও মা মনে করিও না, কাহাকেও সন্তান বলিয়া ডাকিও না, কাহাকেও স্ত্রী বলিয়া ভাবিও না। পৃথি-

বীর কার্য্যসাধন জন্য নানা আকার ও নানা নাম, কিন্তু বাস্তবিক কেহ কাহারও নহে। কেহ কাহারও নহে, কেহ আমার নহে, কিন্তু আমি আছি, ইহা সত্য। প্রত্যেকে "আমি," প্রত্যেকে আছি সত্য; কিন্তু এই যে, অস্তিত্ব ইহা আমার শক্তি এবং আমার ইচ্ছাতে নহে। আমি আপনা হইতে অস্তিত্ব পাই নাই, আমি আপনার শক্তিতে বাঁচিয়া রহি নাই। রক্ত আমার শক্তিতে চলে না, নিশ্বাস আমার ইচ্ছা অনুসারে পড়ে না। হে বাপ, তুমি খেতে দাও, বস্ত্র দাও, কত স্নেহে প্রতিপালন কর; কিন্তু তুমিওত বাঁচাইয়া রাখিতে পার না। স্নেহপরায়ণা জননি, তুমি আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছ, কিন্তু তথাপি কি তুমি আমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রাখিতে পার। তোমরা শ্মশান হইতে চলিয়া যাও, তথাপি আমার কেহ থাকে এবং আমি থাকি। আমি আছি আর এক জনের শক্তিতে, আমি আছি আর এক জনের আজ্ঞাতে, আমি আছি এবং তাঁহার আদেশ ও আহ্বান হইবা মাত্র আমি চলিয়া যাইব। শক্তি বল, আশ্রয় বল, প্রাণদাতা বল সকলই তিনি। তিনি অন্তরাত্মা আমি আত্মা। তিনি পরমাত্মা আমি আশ্রিত ক্ষুদ্র আত্মা। দোহাই ধর্ম্মের আমি আর কিছুই জানি না।

ধন দিল কে আমি জানি না, বিদ্যা জ্ঞান দিল কে আমি জানি না, ধর্ম্ম পুণ্য দিয়া শোভিত করে কে তাহাও জানি না, শ্মশানের অগ্নি হইতে জ্যোতির্ম্ময় আকার দিয়া কোন্ মহাজ্যোতি আমাকে কোলে করেন তাহাও জ্ঞাত নাই। বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয় এবং তাহাতে কোন অজানিত শক্তির ক্রিয়াবলে ফুল ফোটে, ফল ধরে, তেমনি জানি ধন, বল, জ্ঞান, ধর্ম্ম, উন্নতি ও চরম শান্তি। আমার অস্তিত্ব, স্থিতি, গতি, এই মাত্র বলিলাম। এক প্রকাণ্ড অবিনাশী আশ্রয়ে আমি আছি ইহাই জানি, আর কিছু জানি না। আরও বলিতে পারি ধন থাকিলে চোরে নিতে পারে, বল থাকিলে রোগ তাহাকে সংহার করিতে পারে, জ্ঞানকেও বার্দ্ধক্যের বিস্মৃতি মলিন করিতে পারে, দেহকে যম আহার করিতে পারে; কিন্তু ইহাতে আমার কিছুই যায় না, আমি বিনাশ হই না। এই সকল থাকাতে যেমন আমি থাকি না, এই সকল যাওয়াতেও আমি যাই না। আরও কথা আছে, এই যে স্থিতিমান্ আমি, এই আমি চৈতন্যরূপী। এই যে চক্ষে দেখি, ইহার পশ্চাতে আর একটি চক্ষু আছে। তাহা জ্ঞান চক্ষু। আমি চৈতন্যরূপে দেহে অবস্থান করি। আমি জ্ঞান-বস্তু, বুদ্ধির কণিকা। আমি অগ্নিখণ্ডরূপে দেহে বাস করি। জীবনে মরণে আমি এক মহাচৈতন্যের অভিনয় দেখিতেছি। যাহা কিছু হইতেছে তাহাতেই এক মহাজ্ঞানবিধি। যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা এই জ্ঞানতত্ত্ব দিলেন। যাঁহারা চলিয়া গেলেন তাঁহারাও এই জ্ঞান চৈতন্যের লীলা অভিনয় করিতে করিতে এক অতি গভীর ও বিস্ময়কর যবনিকার অন্তরালস্থ হইলেন।

হিমালয় প্রকাণ্ড হইতে পারে; কিন্তু মানুষ তাহা অপেক্ষা বড়। হিমালয় আপনাকে জানে না। মানুষ চৈতন্যের প্রভাবে জ্ঞানপক্ষপুটে আকাশে ভ্রমণ করিতেছে চন্দ্র সূর্য্য তারকার বিষয় মানুষ জানে, ধূমকেতুর মুণ্ডে কি আছে মানুষ তাহাও নির্ণয় করিতে সমর্থ। মানুষ দুর্ব্বল হইলেও জ্ঞান দুর্ব্বল হয় না। সমস্ত বিনাশ হয় তথাপি জ্ঞান চৈতন্য বর্ত্তমান থাকে। আত্মার আর একটি বস্তু আছে তাহা প্রেম। যেমন দেশলাইর আগুন দিয়া এই সমস্ত কলিকাতা দগ্ধ করা যাইতে পারে, তেমনি প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভিন্নতাকে বিনাশ করিয়া এক করিতে পারা যায়। প্রেমের দ্বারা এক ইহুদি সন্তান সমস্ত পৃথিবীকে বক্ষে করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি কেহ কাহারও নহে। মাতা পিতা স্ত্রী স্বামী সন্তান ও বন্ধুর সম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছি। বাস্তবিক যখন শ্মশানের জ্বলন্ত আগুনে আচ্ছন্ন মানুষকে দর্শন কর, তখন প্রেমের বিচিত্র অভিনয় কি আর ভাবিতে অবসর পাও? কিন্তু প্রেম মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত, কেহ কাহারও নহে, তথাপি কেহ কেবল আপনার জন্য জীবন পায় নাই। সকলেই পরের জন্য জীবন লাভ করিয়াছে। নিজ জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য দিয়া পরকে ভাল বাসিতে ও সেবা করিতে মানুষের মধ্যে প্রেমবস্তু বর্ত্তমান। প্রেমময় ঈশ্বর অনন্ত প্রেমে জীবন সৃজন ও প্রতিপালন করেন। মানুষকে প্রেম দিয়া পরস্পরকে ভাল বাসিতে এবং প্রেমভক্তিতে ঈশ্বরকে পূজা করিতে মানুষের প্রতি আদেশ: প্রেম যেন মায়ার নিগড় প্রস্তুত না করে। নিস্বার্থ প্রেমে ঈশা যে পরিবার রচনা করিলেন, সেই পরিবারের জন্য সকলের প্রেম অগ্রসর হউক।

আর একটী কথা, আমি আনন্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আনন্দে চলিয়া যাইব। আনন্দপূর্ণ এই পৃথিবী, প্রভাত হইতে না হইতে প্রকৃতি আনন্দে হাসিয়া উঠে, কত পাখী আনন্দে সঙ্গীত করে, কত পদ্ম ফুটিয়া সরোবরকে শোভিত করে, কত কত কুসুমের হাসিতে উদ্যান হাস্যময়। শ্মশানের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত পতির অভাব ও বিচ্ছেদ যাতনা সংবরণ করিতে অসমর্থা হইয়া বিধবা আর্ত্তনাদ করে, যাহারা শিশু তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইতেছে; কিন্তু আকাশে চন্দ্র হাসিতে থাকে। শোকে দুঃখে আমরা কাতর হই; কিন্তু প্রকৃতির আনন্দ কিছুতেই কমে না। আমাদের শোকে আহত, দুঃখে কাতর প্রাণেও প্রকৃতির আনন্দ শান্তিতে নিমগ্ন হইয়া কত সান্ত্বনা পাই। মানুষ মরিতে বসে, তথাপি হরিনামের হিল্লোলে তাহার মুখকমল কেমন ফুটিয়া উঠে। দুঃখের পর সান্ত্বনা, অশ্রুপূর্ণ লোচনের পার্শ্বে সান্ত্বনার রেখা কি দেখ নাই? অতএব মৃত্যু দুঃখের কারণ নহে আনন্দের হেতু, চির শান্তির বার্ত্তাবহ। এস আমরা সকলে কিছু কাল মৃত্যুর অন্ধকারে বাস করি। এই যে সমস্ত কথা বলিলাম তাহার সার কি? মানুষ সচ্চিদানন্দের সন্তান, তুমি সচ্চিদানন্দের সন্তান সচ্চিদানন্দ। তুমি সেই সচ্চিদানন্দের কোলে বিকসিত একটি ফুল। তুমি তাঁহার অনন্ত বক্ষঃসমুদ্রজলে একটি বিন্দু; কিন্তু তুমিও সচ্চিদানন্দ। কত যুবতী বিধবা অলঙ্কারবিহীনা; কিন্তু সচ্চিদানন্দ তাহার অন্তরে বাস করিতেছেন। সকল যায়, কিন্তু সচ্চিদানন্দের সন্তান সচ্চিদানন্দই থাকে। আমার শ্রোতাদিগের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি কখনও দুঃখ পান নাই। কিন্তু এমনও

কেহ নাই যিনি দুঃখের পর সান্ত্বনা পান নাই। অন্ধকারের পরে আলোক আছে, রজনীর সুপ্রভাত আছে, মৃত্যুর পর জীবন আছে। যদি ইহা বুঝিয়া থাক, তবে পরলোক কি তাহা বুঝিয়াছ। পরমেশ্বর নিরাকার হইয়াও দেখা দিয়া যেমন সকল সন্দেহ ভঞ্জন করেন, তেমনি তিনি এই সমস্ত দুঃখ যাতনা, মৃত্যুর মধ্য দিয়া পরলোকের সুন্দর বিশ্বাসভূমিতে সকলকে উপস্থিত করিয়া পরলোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দান করেন। পরলোকতত্ত্ব নিগূঢ়, আমরা ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সমুদয় অবগত নহি। তথাপি যখন এত দূর বুঝিতে পারিতেছি, তখন বল মরণে আর ভয় কি? আমরা যখন বিলাসী, আমরা যখন অবিশ্বাসী, আমরা যখন দেহী, তখন মনে হয় সচ্চিদানন্দ আবার কি? অদেহী হওয়া আবার কিরূপ? এই শরীরইত সব, এই সম্ভোগই যে সার; ইহার অতীত আবার কি আছে? এই রূপে একবার উত্থান একবার পতন, ইহার মধ্যে আমরা অবস্থান করিতেছি। তবে বল দেখি সত্য যাহা তাহা কিরূপে স্থায়ী হয়?

ইহার তিনটি বিধি আছে। প্রথম বিধি ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করা, দেহকে ভুলিয়া যাওয়া, কুভাব কুকল্পনা বিস্মৃত হওয়া, মনের চঞ্চলতা, ও শারীরিক সমস্ত বৃত্তিকে পরিহার করা। এ ছাড়া আর বৈরাগ্য চাই না। ইহা হইলেই পরলোকের সম্বল হইল।

দ্বিতীয় বিধি—যদি ত্যাগ কর ত্যাগ কর এই সাধনের সম্বল হইল, তবে ত্যাগের পর গ্রহণ করিবে কি? কোন স্থান শূন্য থাকা স্বভাবের নিয়ম নহে। কিছু ত্যাগ করিলে কিছু গ্রহণ করা বিধি। যদি সংসার ত্যাগ কর, দেহ ত্যাগ কর, বিলাস বিসর্জ্জন কর, তবে গ্রহণ করিতে হইবে ব্রহ্মস্মৃতি, ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মসেবা। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে শূন্য স্থান পূর্ণ হইবে। হে আত্মন্, যখন তুমি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম স্বরূপে আবৃত হও, যোগে অবিচ্ছিন্ন হও, ধ্যানে এক হও, তখন তুমি দেহে থাক, না অদেহী হও? ব্রহ্মসহবাসে যখন তুমি আত্মবিস্মৃত হও, তখন তুমি সংসারে থাক, না স্বর্গ বাসী হও? তোমার জাগ্রৎ বিবেক যখন এই ভববন্ধনকে নিন্দা করে, যখন তুমি পুণ্যাগ্নিতে দগ্ধ হও, পাপজঞ্জাল সমস্ত খসিয়া পড়ে, পুণ্যগঙ্গাজলে স্নান করিয়া যখন তুমি প্রসন্ন দৃষ্টিলাভ কর, তখন তুমি কোথায় থাক? সচ্চিদানন্দের প্রেম আঁখি যখন তোমার মোহমুক্ত চক্ষুর সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখন তুমি কোথায় চলিয়া যাও বলিতে পার কি? তবে আর বলিতে হইবে না যে, অদেহী হইলে এখানেই স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ইহাই ইহলোকে পরলোক সম্ভোগ। ত্যাগ করিয়া ভোগের জন্য গ্রহণ করিতে হয় এই বস্তু।

তৃতীয় উপায়—যদি বল এখানে থাকিব কাহার জন্য? সকল ত্যাগ ও পরলোকে এবং পরমাত্মা সহবাসই যদি একমাত্র সার হইল, তবে এই সংসারে থাকিব কেন? এবং ইহাতে নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনাই বা কি আছে? পরার্থ নামে একটি সুবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র আছে। তুমি তাহাকে আশ্রয় করিয়া কেন পরম সুখী হও না? পরমাত্মার উত্তাপে তোমার আত্মা পরিপক্ক হইয়া যে উত্তমবীজ হইবে তাহা এই পরার্থক্ষেত্রে রোপণ কর। পরমাত্মার সম্ভোগে যে বল হইবে তাহা দ্বারা পরার্থ ক্ষেত্র কর্ষণ কর। স্বার্থ ভুলিয়া যাও নিঃস্বার্থ হও, নির্ব্বিকার হইবে, মুক্ত হইবে, নিরাপদে থাকিতে পারিবে। হে বন্ধুগণ, মানুষ যখন শরীর ছাড়িল, চিতার ভস্ম সার হইল, তখন সে দিব্য তনু, ভাগবতী তনু লাভ করিল। এই দিব্য দেহের গতি কত দূর ব্যাপী, ইহার আনন্দ সুখ শান্তি কি অপরিমেয়, তাহা আমি জানি না। কেন না এই যে মৃত্যুর অন্ধকার ইহা কেহ ভেদ করিতে পারে না। পরলোকের প্রান্তর হইতে কেহ ফিরিয়া আসে না। অতএব বলি ব্রহ্মসহবাস করিও, যোগে স্থির থাকিও, প্রেম ভক্তিতে মগ্ন থাকিও, মায়া মোহ হইতে মুক্ত থাকিও, দেহবাস পরিত্যাগ কর, স্বার্থের বাঁধ কাটিয়া পরার্থের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ কর। সচ্চিদানন্দের সন্তান হইয়া আনন্দে অবস্থিতি কর। মৃত্যুকে ভয় করিও না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশ জন্য প্রতীক্ষা করে, তুমিও বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় সেইরূপ প্রস্তুত হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা কর। হে বন্ধুগণ, আপনার অস্তিত্ব, স্থিতি, গতি ও মুক্তি বিষয়ে এইমাত্র বলিলাম। পরলোক গভীর ও বিস্ময়কর, আরও কত তত্ত্ব ক্রমে জানিতে পারিবে। ইহা অনন্ত কাল জানিবার ও সম্ভোগ করিবার বিষয়। ইহা হইতে নিবৃত্ত হইও না।

হে মৃত্যুঞ্জয়, হে জ্যোতির্ম্ময়, আমাদের মৃত্যু আমাদিগকে তোমার কাছে লইয়া যাইবার দূত ভিন্ন আর কেহত নহে। হে সচ্চিদানন্দ, রোগ দুঃখ শোক, আমাদের পরলোকের বার্ত্তাবহ বই আর কিছুই ত নহে। কৃপা করিয়া পরলোকে যাঁহারা বাস করিতেছেন তাঁহাদিগকে আনিয়া আমাদিগকে দেখাও। মৃত্যুর অন্ধকারে আমরা অধীর ও আত্মবিস্মৃত, এখন তোমাকে আশ্রয় করিতে না পারিলে আর সান্ত্বনা পাইতেছি না। সংসারের নানা অবস্থাতে পড়িয়া আমাদের ভক্তির পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে। আত্মশুদ্ধির পথ অবরুদ্ধ, দেহী হইয়া মায়াবদ্ধ হইলাম, বিলাসী হইয়া পাপ হ্রদে পতিত হইলাম। এখন অদেহী কর, শ্মশানের ভস্ম হস্তে করিয়া বিলাসের মুখে দান কর। এই শোকের সময় আমাদের মণ্ডলীতে অবতীর্ণ হইয়া পরলোকে যাইবার পথ রচনা কর। আমাদিগকে আকাঙ্ক্ষিত দিব্য স্থিতি দাও, পরলোকের প্রান্তরে আমাদিগকে একত্র করিয়া সকলকে নিত্যানন্দে অধিকারী কর। তোমাতে পরম সুখী হই, পরমানন্দ লাভ করি। তুমি একমাত্র অটল অবিনাশী আশ্রয়দাতা ইহাতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া প্রেমভক্তিভরে আশ্বস্ত অন্তরে বারবার তোমাকে নমস্কার করি।

সংবাদ।

আচার্য্যপত্নী স্বর্গ লোকস্থা হইলে পর শ্রীদরবারের নিম্ন লিখিত নির্দ্ধারণ কলিকাতাস্থ ও বিদেশস্থ নববিধানাশ্রিত বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মের নিকটে ও নববিধান সমাজে প্রেরণ করা হইয়াছিল। অনেক স্থান হইতে বিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ পত্র দ্বারা ও কেহ

কেহ টেলিগ্রাম যোগে দরবারের সম্পাদক ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়ের নিকটে আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অনেকে এরূপ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা সমুচিত সংযম বিধিপালন ও শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

"১৮ ফাল্গুন মঙ্গলবার আচার্য্যপত্নীর পরলোকগমনোপলক্ষে শ্রীদরবার নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

"অদ্য আচার্য্যপত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকস্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ জন্য প্রেরিতগণ এক সপ্তাহকাল শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন। শ্রীদরবার ইচ্ছা করেন যে, নববিধানমণ্ডলীর সভ্যগণ পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ জন্য কোনপ্রকার শোকচিহ্ন কয়েক দিনের নিমিত্ত ধারণ করেন।"

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়

সম্পাদক।

সপ্তাহ কাল শোকচিহ্ন ধারণের পর বিগত ২৪শে ফাল্গুন শ্রীদরবারাশ্রিত প্রেরিতগণ রমানাথ মজুমদারের লেন ৩নং ভবনে স্বর্গগতা আচার্য্য পত্নীর উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রচারার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া মেদিনীপুরে গিয়াছেন। গত কল্য রবিবারে উপাধ্যায় সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। "জীবন্ত উপাসনা আত্মার অন্নপান" উপদেশের বিষয় ছিল।

বিগত ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার হাবড়ার অদূরস্থ দক্ষিণ ব্যাটরা পল্লীতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরকালী দাসের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী চারুশীলার সঙ্গে স্বাতিনিবাসী শ্রীমান্ কালীপদ দাসের শুভ পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য ও পৌরোহিত্য করিয়াছেন। উক্ত পল্লীতে ব্রাহ্মবিবাহ এই প্রথম হইল। পল্লীনিবাসী ২০০। ২৫০ নরনারী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিবাহ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কার্য্য প্রণালী দেখিয়া সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রাতা হরকালীর নিমন্ত্রণানুসারে কলিকাতা হইতে অনেক নববিধান প্রচারক ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবদম্পতীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ১০ই ফাল্গুন কলিকাতা হাইকোর্টের বারিষ্টার গৃহস্থ প্রচারক প্রীতিভাজন শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি, এ শান্তিপুর নববিধান সমাজের নিমন্ত্রণানুসারে তথায় যাইয়া ৩।৪ দিন অবস্থান পূর্ব্বক উপাসনা, উপদেশ, বক্তৃতা ও সৎ প্রসঙ্গাদি দ্বারা নববিধান প্রচারপূর্ব্বক তত্রত্য নরনারীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের প্রিয়বন্ধু প্রীতিভাজন ত্রিগুণাচরণ সেন এম্ এ দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণাভোগ করিয়া সেনহাটী গ্রামে নিজালয়ে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ধর্ম্মানুরাগী সুবিনীত ও সাধুচরিত্র স্বদেশ হিতৈষী যুবা ছিলেন। ত্রিগুণাচরণ অনেকসময় আমাদিগকে আগ্রহ সহকারে পারিবারিক উপাসনাদি কার্য্য সম্পাদনের জন্য আপন পরিবারের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতাস্থ অনেক প্রধান বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষতার কার্য্য করিয়াছেন। দেশহিতকর সৎকার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার দেহমুক্ত আত্মাকে শান্তি ক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত নিরাশ্রয় সহধর্ম্মিণী ও বালক বালিকাদিগের অন্তরে সান্ত্বনাবারি সিঞ্চন করুন।

গত ১৮ই ফাল্গুন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রিয়ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মিত্রের কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী কলিকাতাস্থ স্বীয় পিত্রালয়ে স্বর্গগত জননীর আদ্য শ্রাদ্ধক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাচার্য্যের কার্য্য, উপাধ্যায় এবং ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অধ্যেতার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমাদের উক্ত প্রিয় ভ্রাতার বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধক্রমে এক এক জন প্রচারক যাইয়া সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারে ক্রমাগত এক এক দিন উপাসনা কার্য্য করিয়াছেন। ভ্রাতার জননী অতিশয় সতীসাধ্বী ছিলেন।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী কিয়দ্দিন টাঙ্গাইলে স্থিতি করিয়া তথাকার নববিধান সমাজ ও বন্ধুদিগের আলয়ে উপাসনা কার্য্য এবং টাঙ্গাইল ও সন্তোষ পল্লীস্থ কতিপয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে নীতি উপদেশ এবং টাঙ্গাইলস্থ রমেশচন্দ্র হলে "অসাধ্য সাধন" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। পরে তিনি পিংনাতে ও টাঙ্গাইলের সান্নিহিত কোন কোন পল্লীতে কিছু কিছু কার্য্য করিয়া ময়মনসিংহে গিয়াছেন। সেখানে বিশেষ বিশেষ উপায়ে বিধান প্রচার করিয়া আমাদের ভ্রাতা সত্বরই প্রত্যাগমন করিবার মনস্থ করিয়াছেন।

সম্প্রতি স্বর্গগত খেলাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী খগোলে নবসংহিতানুসারে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। প্রীতিভাজন শ্রীমান্ চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমরা দুঃখিত যে, এবার স্থানাভাবে ভাগলপুরের ও নওয়াখালী এবং অমরাগড়ির উৎসব বৃত্তান্ত এবং অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ ও প্রেরিত পত্র ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
৫ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৮১৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান, তুমি ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যৎ আমাদিগের নিকটে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষদর্শনের বিষয় করিতে পারিতে। তুমি তাহা কর নাই। কর নাই আমাদের কল্যাণেরই জন্য, ইহা, বল, আমরা বুঝি না কেন? আমাদের ক্রমান্বয়ে যত্ন এই, কিসে আমরা আমাদের জীবনের নিগূঢ় ভবিষ্যৎ পূর্ব্ব হইতে জানিব। বৈজ্ঞানিক প্রণালী এখানে অকর্ম্মণ্য, তাই আমরা কল্পনার পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ প্রণালী পর্য্যন্ত আশ্রয় করিতে একান্ত ব্যস্ত। যত আমাদের বিশ্বাস ক্ষীণ হয়, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ততই এ সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত আশুপ্রত্যয়ী হইয়া পড়ি, কল্পিত ভয় ভাবনা চিন্তায় আমরা একান্ত অধীর ও অস্থির হই। তুমি ক্রমান্বয়ে বলিতেছ, "ভবিষ্যতে তোদের কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না, আমি কল্যাণের কর্ত্তা অকল্যাণের কর্ত্তা নই!" এইটুকু শুনিয়া যখন আমাদের মন তৃপ্ত হইতেছে না, বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত বীরের ন্যায় ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতেছে না, পথে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তখন আমাদের দুর্দ্দশার আর অবধি নাই। মাতঃ, জীবনপথে এমন সকল ঘটনা ঘটে যাহা দেখিতে অতি ভীষণ দুঃখকর, অথচ সেই গুলিই আমাদের প্রভূত কল্যাণের হেতু। আমরা যদি সেই ঘটনা পূর্ব্বে জানিতাম, আমরা ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িতাম, সকল উদ্যম যত্ন শেষ হইয়া যাইত। মনে হয়, তুমি এ জন্যই আমাদের নিকটে ভবিষ্যৎ লুক্কায়িত রাখিয়াছ। ভবিষ্যতের প্রভু আমরা নই, ভবিষ্যতের প্রভু তুমি, ভবিষ্যৎকে আমাদের জীবনসম্বন্ধে কি প্রকারে নিয়োগ করিলে আমাদের জীবনের উহা উপযোগী হইবে, উহা কেবল তুমিই জান। আমাদের জীবনের গঠনকর্ত্তা আমরা নই, আমরা কেবল তোমার বর্ত্তমান অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন করিব; এবং সেই অভিপ্রায় অনুবর্ত্তন হইতে ভবিষ্যৎ উৎপন্ন হইবে। যাহা তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন, যাহা তোমার আপনাকে করিতে হইবে, সে বিষয়ে আমাদিগকে তুমি বৃথা বৃথা জ্ঞান দিবে, আর আমরা অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইব, ইহা কখন ন্যায়সঙ্গত নহে। ভবিষ্যৎ আমাদিগের নিকটে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকুক, তাহাতে আমাদের কল্যাণ বিনা অকল্যাণ কোথায়? যদি উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন না থাকিত, তাহা হইলে কি আর আমাদের প্রার্থনার অবকাশ থাকিত? সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন তোমার হাতে আছে, তাইতো আমাদিগকে প্রার্থিভাবে

তোমার নিকটে যাইতে হয়। ভবিষ্যৎ যতটুকু তুমি আমাদিগের নিকটে প্রকাশ কর, সেই টুকু অনুসারে যদি আমরা বিশ্বাস, নির্ভর ও ভক্তি সহকারে কার্য্য করিয়া যাই, আমাদের আর উদ্বিগ্ন হইবার কোন বিষয় থাকে না। যে ভবিষ্যৎ এখনও আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিল, সেই ভবিষ্যৎ আমাদের প্রার্থনা যত্ন উদ্দীপন করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য মঙ্গলপূর্ণ তোমার ব্যবস্থা! হে করুণানিলয়, আমাদের সম্বন্ধে তোমার এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া কেন আমরা একান্তহৃদয়ে তোমার প্রতি আমাদের ভবিষ্যজ্জীবনের জন্য একান্ত নির্ভর করি না। আমরা সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিয়া তোমার অভিপ্রায় পালন করিব, তুমি তোমার যে সকল অভিপ্রায়সিদ্ধ বিষয়ে আমাদিগকে প্রার্থী করিবে, সেই সকল বিষয়ে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিব, আর সহজে আমাদের বর্ত্তমান জীবন অনন্ত ভবিষ্যজ্জীবনের সঙ্গে অবিরোধিভাবে মিলিত হইয়া দিন দিন আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে, ইহাই তো আমাদের পক্ষে সুখ ও আনন্দের হেতু। হে দীনবন্ধো, তাই তব চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি, তুমি যে সময়ে যতটুকু আমাদিগকে জানিতে দাও, তাহাতেই আহ্লাদিত হইয়া উহার যেন আমরা সদ্ব্যবহার করি, এবং ভবিষ্যতের জন্য নির্ভর ও নিশ্চিন্ততা সহকারে তোমার দ্বারে নিয়ত প্রার্থিভাবে দাঁড়াইয়া থাকি। হে দেব, তব সন্নিধানে এই হৃদয়ের অভিলাষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক বার বার আমরা তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

যোগ, ভক্তি, নববিধান।

যোগের ঈশ্বর, ভক্তির ঈশ্বর, নববিধানের ঈশ্বর কি ভিন্ন? তিনি এক, তিনি ভিন্ন হইবেন কি প্রকারে? অথচ যোগী যে ভাবে ঈশ্বরকে দেখেন ভক্ত সে ভাবে ঈশ্বরকে দেখেন না, এবং নববিধানও এমন ভাবে ঈশ্বরকে দেখেন যাহাতে প্রাচীন যোগী ও ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হয়। এক ঈশ্বরকে লইয়া এরূপ ভিন্ন দৃষ্টি কেন উপস্থিত, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধবিরহিত ঈশ্বর যোগীর যোগের বিষয়। জগৎ ও জীব পূর্ব্বে ছিল না, এক সন্মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। জীবসত্তা ও জগৎসত্তা যোগীর নিকটে ব্রহ্মসত্তা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং এই দুই সত্তা উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মসত্তা প্রত্যক্ষগোচর করা যোগীর সর্ব্বপ্রথম যত্নের বিষয়। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে চিত্ত স্থাপনপূর্ব্বক স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় এক সত্তামাত্রে পর্য্যবসন্ন করিয়া যোগীর তাহাতে স্থিতি, তাঁহার অনুসর্ত্তব্য পন্থা। এখন যখন এক অনন্ত সত্তা ভাবিতে গেলেই সেই সত্তাতে অনুস্যূত স্থূল সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ হয়, তখন চিন্তাযোগে সেই সময়ে সেই অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর, যৎকালে যে অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম প্রকাশ হয় নাই, এক অনন্ত সত্তামাত্র ছিল। এক উপায় আছে, সে উপায়—সর্ব্বাতীত অনন্ত ব্রহ্মে কাল ও দেশের বিলোপ সাধন করা। স্থূল পদার্থমাত্রেই কাল দেশ অবলম্বন করিয়া আমাদের অনুভবের বিষয় হয়। যাহা সূক্ষ্ম, কেবল অনুভবমাত্রগোচর, যেমন শক্তি জ্ঞান প্রাণ মন অহম্, তাহাও কাল অবলম্বন না করিয়া অনুভবগোচর করা যাইতে পারে না। অনন্ত ব্রহ্মসম্বন্ধে কাল ও দেশের নিয়োগ কখন হইতে পারে না, সুতরাং কালদেশগত স্থূল সূক্ষ্মের অতীতভূমিতেও ব্রহ্মসত্তা বিদ্যমান, ইহা সকলকেই মানিতে হইবে। ব্রহ্মকে যথার্থ অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় করিতে হইলে সর্ব্বাতীতভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য যত্ন, এই কারণেই প্রয়োজন। যোগী তাহাই করিয়া থাকেন। জগৎ ও জীবের সহিত সর্ব্বথা অসম্বদ্ধ ব্রহ্ম যোগীর ধারণার বিষয়। সুতরাং যোগে সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম আরাধ্য।

ভক্তের ঈশ্বর ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে

সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রধান। ভক্ত যদি আপনার সঙ্গে ঈশ্বরের বিশেষ সম্বন্ধ অনুভব না করিলেন, তবে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কি প্রকারে? যাঁহার সহিত আমরা কোন সম্বন্ধ অনুভব করি না, তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের অনুরাগ উদ্দীপিত হয় না। সুতরাং যোগী যে প্রকার সমুদায় সম্বন্ধ উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মকে ধারণ করিবার জন্য যত্ন করেন, সম্বন্ধানুভব তাঁহার পক্ষে যোগের অন্তরায়, তেমনি কেবল সত্তামাত্র ব্রহ্মকেও আপনার সহিত সম্বন্ধে বদ্ধ ভাবে বিনা ভক্ত চিন্তার বিষয় করিতে পারেন না। যোগীর নিকট আত্মচিন্তা উড়িয়া গিয়া কেবল সত্তামাত্রে সমুদায়ের বিলোপ অনুভূত হইয়া থাকে, ভক্ত সেই সত্তাতে নিজ সত্তার স্থিতি অনুভব করিয়া আপনি ব্রহ্ম কর্ত্তৃক নিত্যকাল আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছেন উপলব্ধি করেন। ভক্তের নিকটে এই সত্তা চিৎসত্তা। কোন কোন যোগী চিৎসত্তা যদিও উপলব্ধি করেন, তথাপি তাহা সর্ব্বথা সম্বন্ধবিরহিত। ভক্তের নিকটে এই চিৎসত্তা তাঁহাকে দেখিতেছেন, তাঁহার বিষয় সমুদায় জানিতেছেন। কেবল জানিয়াই ক্ষান্ত আছেন তাহা নহে, তাঁহার জন্য সমুদায় আয়োজন করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমুদায় অভাব পূরণ করিতেছেন। সুতরাং এই চিৎসত্তা প্রেমসত্তা হইয়া তাঁহার নিকটে প্রকাশমান। ব্রহ্ম আর এখন নিষ্ক্রিয় সত্তামাত্র নহেন, তিনি ক্রমান্বয়ে আপনাকে ভক্তের নিকটে প্রকাশ করিতেছেন, আত্মপরিচয়দান করিতেছেন। ভক্তের ঈশ্বর সুতরাং স্বয়ংরূপে প্রকাশিত।

যোগীর সর্ব্বাতীত এবং ভক্তের স্বয়ংরূপে প্রকাশিত ব্রহ্ম চিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। যোগীর সত্তা বা চিন্মাত্র ব্রহ্ম ভক্তের আনন্দবর্দ্ধন করিতে সমর্থ নহেন, এজন্য তাঁহারা যোগীর আরাধ্য ব্রহ্মকে তেজঃস্থানীয় এবং ভক্তের উপাস্য জ্ঞানঘন প্রেমঘন আনন্দঘন ব্রহ্মকে সূর্য্যস্থানীয় বর্ণনা করিয়াছেন। একই বস্তুকে এরূপ ভিন্নভাবে গ্রহণ নববিধানের অনুমোদিত নহে। যিনি সর্ব্বাতীত তিনিই স্বয়ংরূপে প্রকাশিত, সুতরাং এক অনন্তের পূর্ণানন্দমধ্যে তদ্দ্বারা অভিষিক্ত ও তন্মধ্যে নিমগ্ন বিশ্ব ও জীবসমূহকে দর্শন করিয়া নববিধানবাদী সর্ব্বান্তর্ভাবক সর্ব্বগত ব্রহ্মের আরাধনায় সকলের সহিত একাত্মতাসূত্রে বদ্ধ হন। ব্রহ্মের সর্ব্বাতীতত্ব এ স্থলে সর্ব্বান্তর্ভাবকত্বরূপে প্রকাশিত। তিনি জীব ও জগৎ আপনার অন্তর্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি জীব ও জগতের অতীত না হন, তাহা হইলে উহাদিগকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া রাখিবেন কি প্রকারে? সর্ব্বান্তর্ভাবক না হইয়া সর্ব্বগত হইলে তিনি যে ঐ সকলেতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই সকলের মধ্য দিয়া তিনি নিয়ত সাধকগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এবং সর্ব্বগতভাবে সাধকগণ তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন।

সর্ব্বাতীত, স্বয়ংরূপ ও সর্ব্বগত, ইহার কোন না কোন এক ভাবে প্রাচীনকালে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাধকগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম আরাধিত হইয়াছেন। প্রতি সাধকে এ তিনের একত্র অবস্থিতি কেন ঘটে নাই, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ব্রহ্মের সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব পরিস্ফুটরূপে কোথাও গৃহীত হয় নাই, নববিধান এই সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের ত্রিবিধ প্রকাশকে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন। এখানেই নববিধানের বিশেষত্ব। ঈশ্বরের এই সর্ব্বান্তর্ভাবকত্বের ভাব জীবনের নিয়ামক হইলে সাধক সকল ভাব আপনার ভিতরে অন্তর্ভূত করিতে সর্ব্বদা অবহিত থাকেন। কোন সত্য কোন ভাব বাদ দিয়া গ্রহণ করা তাঁহার সম্বন্ধে একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্মের উপাসক নববিধানবাদী সকলই যখন অন্তর্ভূত করিয়া লয়েন, তখন তাঁহাতে সত্যে সত্যে ভাবে ভাবে বিরোধ অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাঁহার এই নবভাব দর্শন করিয়াই লোকে তাঁহার নববিধানিত্বের পরিচয় পায়।

স্বাধীনতা, মুক্তি, ঈশ্বর।

স্বাধীনতাসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। আবার পুনরায় তৎসম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন কি? প্রবন্ধের শিরোভাগে যে কয়েকটি শব্দ একত্র বিন্যস্ত হইয়াছে তাহাতেই উহা প্রকাশ পাইতেছে। স্বাধীনতা কি? স্বাধীনতা—মুক্তি। মুক্তি কি? ঈশ্বর সহ অভিন্ন ভাবে স্থিতি। প্রথমতঃ তাহা হইলে স্বাধীনতা ও মুক্তি এক কি প্রকারে, তাহাই দেখা যাউক।

আত্মা আপনি যখন আপনাতে অবস্থান করে, বাহিরের কোন বিষয় বা অন্তরের প্রবৃত্তি দ্বারা আপনা হইতে বিচ্যুত না হয়, অন্য কথায় আপনার বশে আপনি থাকিয়া বাহ্য ও আন্তরিক বিষয় সকল নিয়মিত করে, তখন আত্মা স্বাধীন। এই স্বাধীনতা তাহার স্বভাব, ইহার বিপরীত বিকার। যখন আত্মা স্বাধীন তখন সে প্রমুক্ত, কেন না এখন এমন কিছু নাই যাহাতে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। কিছুতে আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, এ কথা বলিলে লোকের মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, তবে বুঝি যথেচ্ছাচরণ স্বাধীনতা! একটু হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যথেচ্ছাচরণ স্বাধীনতা নহে, অধীনতা। আত্মা যখন আপনাতে স্থিতি করিয়া বিষয়সমূহকে নিয়মিত করে, তখন তাহার নিয়মিত করিবার সামর্থ্য কোথা হইতে উপস্থিত হয়? যদি তাহার অবিচলিত দৃঢ় সঙ্কল্প না থাকে, তাহা হইলে বিবিধ প্রকারের বিষয়সমূহ দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া আপনার সঙ্কল্পানুসারে কখনই সে উহাদিগকে নিয়মিত করিতে পারে না। অবিচলিত দৃঢ় সঙ্কল্প স্বেচ্ছাচরণের সম্পূর্ণ বিরোধী। যখন যেরূপ মনে হইতেছে সেইরূপ করিতেছি, ইহাতে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখায় না, প্রবৃত্তিবাসনার অধীনতা দেখাইয়া থাকে, সুতরাং স্বেচ্ছাচরণমধ্যে স্বাধীনতা নাই, অধীনতা বিদ্যমান।

আত্মা যখন স্বসঙ্কল্প হইতে বিচলিত হয় না তখন সে মুক্ত। সহস্র প্রলোভন উপস্থিত হইলেও যাঁহার সঙ্কল্পক্ষতি হয় না, তিনি মুক্ত পুরুষ। যদি বল, সঙ্কল্প মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়ই তো আছে। কোন ব্যক্তি যদি মন্দ সঙ্কল্পে দৃঢ় ভাবে নিয়ত আপনার জীবন পরিচালিত করে তাহা হইলে সে ব্যক্তিও কি মুক্ত? প্রচলিত কথায় ভাল সঙ্কল্প ও মন্দ সঙ্কল্প আমরা বলিয়া থাকি, কিন্তু যেখানে দৃঢ় সঙ্কল্প সেখানে মন্দসঙ্কল্প কখন আসিতে পারে না। দৃঢ়তা ভালোর ভিতরে থাকে, মন্দের ভিতরে কখন দৃঢ়তা থাকিতে পারে না; কেন না চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব হইতে মন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি বল, একজন দুরাচারী ক্রমান্বয়ে একই প্রকার দুরাচারের কার্য্য করিতেছে, লোকনিন্দা অপমানাদি কিছুই তাহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারিতেছে না, এখানে সে ব্যক্তি দৃঢ়সঙ্কল্প ইহা না বলিয়া অন্য কি বলা যাইতে পারে? গূঢ়রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেখিবে এখানে কোন সঙ্কল্প নাই, প্রবৃত্তি বিশেষের অধীনতা আছে। এই প্রবৃত্তিবিশেষের অধীনতা সে ব্যক্তিকে এমনই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার ভয় সম্ভ্রমাদি সমুদায় মানবীয় গুণ তাহা হইতে তিরোহিত হইয়াছে। সে এখন অবশভাবে প্রবলতর প্রবৃত্তিদ্বারা নীয়মান। সঙ্কল্প ইচ্ছার সামর্থ্য প্রকাশ করে, দৌর্ব্বল্য নহে। যেখানে সঙ্কল্প বা ইচ্ছার সামর্থ্য সুদৃঢ়, সেখানেই মুক্তি।

অবিচলিত দৃঢ় সঙ্কল্পজনিত মুক্তি কিরূপে সমুপস্থিত হয়! সঙ্কল্পে দৃঢ়ভাবে স্থিতি করিলে প্রবৃত্তিবাসনা যেন বিচলিত করিতে না পারিল; ইহাদের প্রভাব হইতে জীব যেন বিমুক্ত হইল, কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা এই, এই সঙ্কল্প কি সর্ব্বথা অনুৎপন্ন? মানুষ স্বয়ং উৎপন্ন, তাহাতে এমন কি কিছু আছে যাহা উৎপন্ন নয়? অবশ্য সঙ্কল্প তাহার ভিতরে কোথাও হইতে সংক্রামিত হয়, অন্যথা অন্ধপ্রবৃত্তি বাসনাসমূহের গতি সেই সঙ্কল্প

এ প্রকারে কিরূপে নিয়মিত করিবে যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির পথে জীবের গতি হইবে। এই সঙ্কল্প তবে সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত, এবং সেই সঙ্কল্পের অনুপ্রবেশে জীব দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। সুতরাং জীব বিষয়ের অধীন না হইলেও ঈশ্বরের অধীন হইল, সে স্বাধীন একথা বলিব কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উপরে যখন আমাদের স্বাধীনতা ও অধীনতা নির্ভর করিতেছে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপের একতা আমরা অনেক বার উল্লেখ করিয়াছি। যদি স্বরূপের একতা না থাকে, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের ভূমি চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায়। জীবে অল্প পরিমাণ জ্ঞান প্রেম পুণ্য আছে বলিয়া ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যের সহিত তাহার যোগ হয়। অন্য কথায়, উপাদান এক জন্য আত্মা ঈশ্বর হইতে আপনার পোষণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। জীব যদি অল্প পরিমাণেও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র না হয়, তাহা হইলে তাহার ঈশ্বরের সহিত যোগের সম্ভাবনা কোথায়? সে যখনই প্রবৃত্তি বাসনার শৃঙ্খল কাটিয়া প্রমুক্ত হয়, তখনই স্বাধীন প্রমুক্ত ভাববশতঃ ঈশ্বরের সহিত তাহার একতা উপস্থিত হয় এবং তাহার সঙ্কল্প সত্যসঙ্কল্পের সহিত একত্ব লাভ করাতে প্রবৃত্তি বাসনার উপরে প্রভূত বল প্রকাশ করে। এইরূপে স্বাধীনতা যেমন মুক্তির সহিত অভিন্ন, তেমনি ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিতির পক্ষেও উহার উপযোগিতা আছে, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিতেছি।

উপরে যাহা নির্দ্ধারিত হইল, স্বাধীনতার স্বরূপ যদি সেই প্রকারই হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতার তুল্য অমূল্য আর কিছুই হইতে পারে না। পৃথিবীতে লোকে যাহাকে সচরাচর স্বাধীনতা বলিয়া থাকে, তাহা যে প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, মনে হয় এখন তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা যে স্বাধীনতার কথা বলিতেছি, উহা চিত্তের সমতা, কোন প্রবৃত্তি বা বাসনা দ্বারা উহা চঞ্চল বা দোলায়মান হয় না। এই সমতা বা চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা প্রাচীনকালে যোগ নামে আখ্যাত হইত। আমরা অধিকাংশ সময়ে সংস্কার, রুচি বা অভিমানের দাস হইয়া কোন কার্য্য করি অথবা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হই, কখন কখন বাহ্যকারণে এমন একটা নির্ব্বন্ধ উপস্থিত হয় যে, অন্যায় বুঝিয়াও বলপূর্ব্বক সেই নির্ব্বন্ধ রক্ষা করি। এ সকলই চিত্তের বিকার, অযোগের অবস্থা, স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুতি। যেখানে স্বাধীনতা সেখানে মুক্তাবস্থা, সেখানে ঈশ্বরের সহিত যোগের অবস্থা। একালে লোকে স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া পাগল, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কি জানিয়া স্বাধীন হওয়া অল্পলোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

হে মন, তুমি লোকচরিত্রের বিষয় অতি অল্পই অবগত আছ। তুমি মনে করিতেছ, অমুক ব্যক্তি যখন অমুক বিষয়ে বিমত প্রকাশ করিয়াছে, তখন তাহার সে বিষয়ে চির দিনই বিমত থাকিবে। এরূপ তোমার মনে করা ভুল। বাতাসের গতি পরিবর্ত্তনের ন্যায় মানুষের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। যে অবস্থাধীনতায় তাহার সেরূপ মত হইয়াছিল, সেরূপ অবস্থা তাহার চিরদিন থাকিবার নহে। যাই তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, অমনই মনেরও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। তোমার পক্ষে এই দেখা উচিত যে, লোকের মতামতের উপর তোমার কোন সিদ্ধান্ত যেন নির্ভর না করে। যে কোন ব্যক্তির মত যেরূপে পরিবর্ত্তিত হউক না কেন,তুমি সত্যের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে সিদ্ধান্ত করিবে তাহার কোন কালে পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। যদি পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চাও, বিশ্বস্ততা সহকারে সত্য আশ্রয় কর।

হে মানব, তুমি দুদিনের জীব নহ। তোমার জীবনের এখানে আরম্ভ দেখিতেছ কিন্তু উহার শেষ তুমি কল্পনাও করিতে পার না। এই অশেষ জীবনের অশেষ কল্যাণ যে সকল ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত আছে, সেই ব্যাপারগুলিকে এমন লঘু দৃষ্টিতে দেখিও না যে, লোকের নিন্দা প্রশংসা বা পার্থিব ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করিয়া তুমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। তুমি স্পষ্ট দেখিতেছ, আমার জীবনের অমুক ব্যাপারের সঙ্গে অনন্তকালের কল্যাণ অনুস্যূত

রহিয়াছে, কিন্তু এই ব্যাপারে যদি প্রবৃত্ত হই, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, অতি আপনার লোক পর হইয়া যাইবে, অতএব অনন্ত জীবনের ক্ষতি সহ্য করিয়াও তাহাদের মন রক্ষা করা আমার পক্ষে ভাল, কেন না তাহা হইলে আপাত অসুখকর অনেক বিষয় হইতে রক্ষা পাইব। দুদিনের কষ্ট নিবারণ জন্য তুমি অনন্ত জীবনকে তুচ্ছ করিতেছ, বল তোমার তুল্য নির্ব্বোধ আর কে আছে? মানবের সন্তুষ্টি সাধনই কি তোমার জীবনের লক্ষ্য? স্বার্থাধীন মানবকে চিরদিন সন্তুষ্ট রাখিবে ইহা কি সম্ভব?

বল, হে মানব, তুমি তোমার আত্মার প্রতি এত অনাদর কর কেন? যাহার প্রতি তোমার স্রষ্টার এত আদর, তৎপ্রতি তোমার নিজের অনাদর কি শোভা পায়! আত্মার গৌরববিচ্যুত করিয়া রাজমুকুট পরিধান করাতে বল তোমার কি লাভ? আত্মার অবমাননা করিয়া তুমি সিংহাসনে উপবেশন কর, সিংহাসন তোমার নিকটে জলন্ত অঙ্গাররাশি হইবে, এবং তোমাকে দিবানিশি দগ্ধ করিবে। তুমি আত্মাকে অনাদর করিয়া সুখী হইবে মনে করিয়াছ, ইহা তোমার বড় ভুল। যার সুখে তোমার সুখ সেই যদি সর্ব্ব প্রথমে অসুখী হইল, বল আর সুখের সম্ভাবনা রহিল কোথায়? আত্মাকে যথেষ্ট সমাদর কর, পর্ণকুটীর ভূমিশয্যা তোমায় প্রচুর শান্তি সুখ অর্পণ করিবে। যদি তোমার এ কথায় প্রত্যয় না হয়, জীবনের পরীক্ষা দ্বারা এ কথার সত্যতা স্থির করিয়া লও। তবে আশঙ্কার বিষয় এই, পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে বা অগাধ জলে পড়িয়া যাও, আর জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহা হইতে উঠিতে না পার। ঈশ্বর না করুন তোমার এরূপ দুর্দ্দশা হয়।

প্রাপ্ত।

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রসাদে ভাগলপুর স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ উৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন প্রচারক গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। নানাবিধ কারণে এবার স্থানান্তর হইতে অপর কাহারও উৎসবে যোগদানের সুবিধা হয় নাই। কেবল মাত্র মুঙ্গের হইতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বাগ্‌চি ও গিরপঁয়াথ হইতে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর নায়ক আসিয়াছিলেন। বাগ্‌চি মহাশয়ে ভাবপূর্ণ সুললিত সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। এবারে বাহ্যাড়ম্বরের অনেক অভাব ও ত্রুটি হইয়াছিল, কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈদৃশ মধুময় সতেজ ও সরস ভাব ইতিপূর্ব্বে কখনও অনুভূত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বাহিরের আয়োজন এবং অনুষ্ঠান ঈশ্বরের দিকে মানবাত্মাকে অনেক সময়ে আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে প্রকৃত ব্যাকুল প্রাণ অনবরত ভগবৎসঙ্গ লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে উৎকণ্ঠিত হয় এবং প্রকৃত জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত সাধুচরিত্র সম্মুখস্থ থাকিয়া তাঁহার প্রকাশ সর্ব্বদা উপাসকদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, সেখানে আনন্দ, সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য চিরপ্রসিদ্ধ। উৎসবের কার্য্যবিবরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

৭ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী—সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা। (আচার্য্যের কার্য্য উপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বত্র সুসম্পন্ন করিয়াছেন)। উপদেশে সকলকে ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া বিশেষ ভাবে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করেন।

৮ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী—প্রাতে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বন্দনীয় শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে উপাসনা। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী হইতে কীর্ত্তন বাহির হয় এবং সহরের অনেক স্থানে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিবারণ বাবুর বাড়ীতে সকলে প্রত্যাগত হন। উপযুক্ত গায়কের অভাবে এবং নৈসর্গিক প্রতিকূলতা হেতু কীর্ত্তন আশানুরূপ না হইলেও কীর্ত্তনকারীদিগের মধ্যে অনেকের ব্যাকুলপ্রাণগুলি ব্রহ্মনামকীর্ত্তন তাঁহার মুক্তিপ্রদ চরণে বাস্তবিকই পৌঁছাইয়াছিল।

৯ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারি—সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। প্রাতে মন্দিরে উপাসনা—একমাত্র ব্রহ্মই মানবের উপদেষ্টা গুরু, মানুষ তাঁহারই সন্নিধানে আপনার সমস্ত জটিলতার মীমাংসা করিতে পারে, সাধু মহাত্মাগণ ধর্ম্মপথের সহায় এবং ব্রহ্মকে সর্ব্বদা উজ্জ্বলরূপে মানবের সম্মুখে প্রকাশ রাখেন এইমাত্র, উপদেষ্টা ইহাই বিশদরূপে উপাসক মণ্ডলীর হৃদয় মুদ্রিত করিয়া দেন। মধ্যাহ্নে আলোচনা—ইহাতে অতি আবশ্যকীয় গূঢ় কথা সকলের সিদ্ধান্ত হয়। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রকৃত যোগ কি, ইহারই সম্যক্ আলোচনা হয়। ব্রহ্মচর্য্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে সর্ব্বদা সহবাস করেন তিনিই ব্রহ্মচারী এবং প্রকৃত যোগ ইহারই অবলম্বনে গঠিত। উপাধ্যায় মহাশয় বলেন, ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান বিভিন্ন বিভাগের মূলীভূত কারণ মত ও বিশ্বাসের বিশেষ কোন পার্থক্য নয়, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অসদ্ভাব (Personal feeling)। আশা করা যায় তাঁহার কৃপায় এই ভাব শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া সকল ভাই ভগ্নী নবধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় চিরসুখ শান্তি লাভ করিবেন। অপরাহ্নে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন এবং সায়ংকালে উপাসনা।

১০ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারি—ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব। প্রাতে উপাসনান্তে যে উপদেশ হয় তাহার সার মর্ম্ম এই;— নারীগণ সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, সুতরাং কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত হইয়া উপাসনাদি সাধনোপযোগী অনুষ্ঠান অনেক সময়ে নিয়মমত করিয়া উঠিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা যদি গৃহের প্রতি কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে ভগবানের হস্ত দেখিতে পান এবং তাঁহারই গৃহে দাসী হইয়া তাঁহারই কার্য্য করিতেছেন ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলেই জানা যাইবে যে, তাঁহারা প্রকৃত সাধন লাভ করিয়াছেন। এই জন্য ব্রাহ্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মিকার সাধনপ্রণালী

কতকটা স্বতন্ত্র বুঝিতে হইবে এবং কঠিনতর হইলেও অতি সুন্দর সাধন।

১১ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী—বালকবালিকাদিগের উৎসব। তরলমতি শিশু দলকে ঈশ্বর-জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করান বড়ই কঠিন ব্যাপার। মাতাপিতার ভালবাসা ও স্নেহ হইতেই ঐ ভাব তাহাদের উপলব্ধি হওয়া সম্ভব। উপাধ্যায় মহাশয় ইহা অতি সহজে সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

১২ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী—শ্রদ্ধেয় বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়। তৎপরে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের বিশেষ সভা হয়। ভাগলপুরে ধর্ম্মপ্রচারের পক্ষে সুবিধা এবং বিধিব্যবস্থা কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কি উপায়ে এই অভাব দূর হইতে পারে তাহা অবলম্বনেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। অনেক আলোচনার পর এই স্থির হয় যে, এরূপ একটি কেন্দ্র ঠিক করিতে হইবে যেখান হইতে প্রত্যেক ব্রাহ্মের আপনাপন সার্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার অনায়াসসাধ্য এবং আশানুরূপ হইয়া জনসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সংসাধিত হইবার সহায়তা করে। এই উদ্দেশে একটী স্বতন্ত্র বাড়ী লওয়া হইবে এবং ইহার কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদনের জন্য একটী সব্‌কমিটি গঠিত হয়। সেই বাড়ীতে ধর্ম্ম ও নীতি সংক্রান্ত পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকাদি সন্নিবিষ্ট থাকিবে। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের জন্য সঙ্গীতাদি ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকিবার সম্ভাবনা এবং আবশ্যক মত পিতৃমাতৃহীন ও অসহায় শিশুদের শিক্ষা ইত্যাদি দাতব্য কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প আছে।

১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—স্থানীয় টাউন হলে The Views and Prospect of the Brahmo Samaj সম্বন্ধে নিবারণ বাবুর ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধটী অতি সুন্দর হইয়াছে এবং শ্রোতৃবর্গের এত ভাল লাগিয়াছিল যে উহা মুদ্রিত করিবার জন্য প্রবন্ধলেখক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। আশা করা যায় উহা মুদ্রিত হইবে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই ধর্ম্ম নূতন এবং প্রকৃত হৃদয়ের ধর্ম্ম এবং ইহা সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ প্রেরণ করিয়াছেন।

১৫ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—পূর্ব্বোক্ত স্থানেই উপাধ্যায় মহাশয়ের 'যোগ ধর্ম্ম' বিষয়ে বক্তৃতা। প্রকৃত যোগ কি এবং পূর্ব্বাপর শাস্ত্রোক্ত যোগসকলের গুণাগুণ কি এ সমস্ত সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতাতে সত্য সত্যই সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সময়ের অভাবে যোগশাস্ত্র সম্যক্ আলোচনা করা অসম্ভব হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন অংশে কতক অসম্পূর্ণ রহিয়াছিল। কিন্তু মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ যে স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রোক্ত নানাপ্রকার অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন ব্যতিরেকে যোগ সাধনই যে প্রকৃত সাধন তাহা পরিষ্কার ভাবে সকলের প্রতীতি হইয়াছে।

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক।

নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশতম সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

এবারকার উৎসবে নববিধান সমাজের গৃহস্থ প্রচারক পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি, এ ব্যারিষ্টার মহানুভব আহূত হইয়াছিলেন। তিনি ১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার মধ্যাহ্ন কালে শুভাগমন করেন। তাঁহার শুভাগমনে আমরা পরম আনন্দ প্রাপ্ত হই। ১৬ই ফাল্গুন রবিবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তিনি এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

১লা ফাল্গুন হইতে উৎসবে প্রস্তুত হইবার জন্য প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে (৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত) নগরপথে উষা কীর্ত্তন।

৯ই ফাল্গুন রবিবার। উৎসবের উদ্বোধন। উৎসবার্থ অসম্পন্ন মন্দির সংলগ্ন নূতন গৃহে প্রবেশ। প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা। প্রাতে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্র নারায়ণ মৈত্রেয় মহাশয় উপাসনা করেন। সন্ধ্যা কালের উপাসনা আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এতদুপলক্ষে একটী গীত রচিত হইয়াছিল। উপাসকগণ হরেন্দ্র বাবুর বাসা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই গীত গান করিতে করিতে উপাসনা গৃহে গমন করেন। সন্ধ্যাকালের উপাসনায় আমাদের বন্ধু প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার নূতন রচিত অপূর্ব্ব ভাব পূর্ণ সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনে আমাদিগকে প্রেমানন্দে পুলকিত করিয়াছিলেন।

১৩ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। অপরাহ্নে সূত্রগড় গ্রামে ঢাকানিবাসী ব্রহ্মনামপ্রিয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহানুভবের ভাব সঙ্গীত গান।

১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার। প্রার্থনা সমাজের উৎসব। হরেন্দ্র বাবুর বাসায় প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। হরেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন। অপরাহ্নে এক অনাবৃত প্রশস্ত স্থানে শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় "শান্তিধাম বা শান্তিপুর।" সংসারবাসী পরিদর্শকের সহিত শান্তিধামবাসিগণের কথোপকথনে বিচক্ষণ বক্তা, অরূপ ঠাকুরের পরিচয় দেন। এই বক্তৃতায় বক্তার মানসিক শক্তি সদ্ভাব সুন্দররূপ প্রকাশ পায়। যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হন। কেহ কেহ বলেন, এরূপ বক্তৃতা কখনও শ্রবণ করেন নাই। বক্তৃতার জন্য পূর্ব্বে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই; তথাপি অনেক গুলি লোক শ্রবণার্থ সমবেত হইয়াছিলেন।

এই দিবস রাত্রিতে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যারিষ্টার মহাশয় আমাদের প্রার্থনায় ব্রাহ্ম মিশন স্কুলের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

১৫ই ফাল্গুন শনিবার। প্রাতে ব্রাহ্ম মিশন স্কুলের পারিতোষিক। ব্রাহ্ম সমাজ সম্পাদকের প্রস্তাবে শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার নগেন্দ্র বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে স্কুলের বার্ষিক বিবরণী বিবৃত হয়। তৎপরে কয়েকটি ছাত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা পদ্য আবৃত্তি করে। তৎপরে মহানুভব নগেন্দ্রবাবু স্বহস্তে ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্ম মিশন স্কুলের প্রকৃতি অর্থাৎ খৃষ্টীয় মিশন স্কুলের সহিত ইহার পার্থক্য কি? এই বিষয় বিশদ ভাবে ব্যক্ত করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হরেন্দ্র বাবু ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া কয়েকটি উৎসাহকর বাক্য বলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হয়।

পারিতোষিকসভা ভঙ্গের পরই হরেন্দ্র বাবুর বাসায় উপাসনা। শ্রদ্ধাভাজন নগেন্দ্র বাবু উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা অতি মধুর ও গভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। উপদেশ সকলেরই হৃদয় আকর্ষন করিয়াছিলে।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মৈত্রের মহাশয়ের সুরম্য ভবনে "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ত্রিবিধ অবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা। পূর্ব্ব দিবসের বক্তৃতার সুখ্যাতি ঘোষিত হওয়ায় মতিলাল বাবুর প্রশস্ত ভবন লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেক ভদ্র মহিলা বক্তৃতা শ্রবণার্থ অন্তরালে উপস্থিত ছিলেন। বন্ধুসভার সহৃদয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র রায় মহাশয় বক্তৃতা সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বক্তার পরিচয় প্রদান করিলে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। বক্তৃতা অতীব সুমিষ্ট ও গভীর জ্ঞানোপদেশ পূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই স্থির ভাবে বিলক্ষণ আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রবীণ বক্তা নিরাকার উপাসনা তত্ত্ব অতি বিশদরূপে বুঝাইয়াছিলেন। যাহা ধর্ম্ম তাহাকেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সকল মনুষ্যের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরাজিত, যিনি যে পরিমাণে ধর্ম্মাভিমুখী, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। ইহাই তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভিক উক্তি। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার অসারতা বক্তৃতায় সুন্দররূপ প্রতিপাদিত হইয়াছিল।

বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র বাবু অসম্পন্ন মন্দির সংলগ্ন নূতন গৃহে উপাসনা করেন। তাঁহার উপাসনায় উপাসকগণ প্রকৃত সুখ শান্তি—প্রকৃত প্রস্তাবে উৎসবানন্দ প্রাপ্ত হন।

১৬ই ফাল্গুন রবিবার। প্রাতে ৭টার সময় অসম্পন্ন সমাজ গৃহে চন্দ্রাতপের নিম্নে উপাসনা সম্পাদন। শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্র বাবু উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় নগর সঙ্কীর্ত্তন। একটী নূতন সঙ্কীর্ত্তন গীত হয়। সঙ্কীর্ত্তনশ্রবণার্থ নগরপথে জনতা হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তনের কাগজ গ্রহণ করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ সেন মহাশয়ের রামনগরস্থ ডিস্পেন্সারি হইতে বহির্গত হইয়া সুদীর্ঘ রাসের শরণি ভ্রমণ পূর্ব্বক গায়ক সম্প্রদায় সমাজ গৃহে উপনীত হন। সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে উপাসনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। হরেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন।

১৭ই ফাল্গুন সোমবার। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা। হরেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। এই দিবস উৎসবের শান্তিবাচন। উৎসবে কৃষ্ণনগর হইতে কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

অষ্টষষ্টিতম মাঘোৎসব।

নোয়াখালী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

দয়াময় ভগবানের প্রসাদে অষ্টষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে অত্রত্য উপাসকমণ্ডলী অতি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার কৃপা সম্ভোগ করিয়াছেন। এই উৎসবে তাঁহার যেরূপ করুণা অবতরণ করিয়াছিল, উৎসবের পূর্ব্বে তাহা কেহ এখনও আশা করিয়াছিলেন না। ভগবান্ এবার অযাচিতরূপে সকলকে কৃতার্থ করিয়াছেন। উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৬ই মাঘ মঙ্গল বার হইতে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার প্রায় ৩৪ দিবস পূর্ব্ব হইতেই কতিপয় উপাসক একত্রিত ভাবে নগরের স্থানে স্থানে ঊষা কীর্ত্তন করিয়াছেন; এবং এই কয়েক দিন ঊষা কীর্ত্তনের পরেই শ্রীযুত বাবু রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় সমবেত হইয়া পারিবারিক উপাসনা করিয়াছেন। এই উপাসনাদি অতিশয় মধুর ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। উক্ত ৬ই তারিখে সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। জননী তাঁহার সন্তানদিগকে উৎসবের এই কয়েকটী দিন একাগ্র চিত্তে সরল ও শান্ত মনে দীনভাবে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিতে বলেন।

৭ই বুধবার প্রাতে—শ্রীযুক্ত রজনী বাবুর বাসায় উপাসনা। অপরাহ্ণে মন্দিরে "পরকাল" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহাতে প্রকাশ পায় যে ইহ কালেও আমরা যেমন ভগবানের বক্ষে বিচরণ করিতেছি পরকালেও ঠিক তদ্রূপ করিব এবং আমরা ইহকালে আত্মার যে সমস্ত বৃত্তি দেখিতে পাইতেছি, পরকালে তাহাদেরই ক্রম বিকাশ হইবে।

৮ই বৃহস্পতিবার প্রাতে অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত শশীকুমার বসু মহাশয়ের বাসায় তাঁহার বাসাস্থ উপাসনা সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়। এই উপাসনাতে অত্রত্য অধিকাংশ উপাসকই উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ভ্রাতার বাসায় উপাসনা সভাতে অত্রত্য ভিন্নভাবাপন্ন সভ্যগণকে ভগবান্ পবিত্র ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত করিবার অভিপ্রায়ে আপনি সংঘটন করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হয়।

৯ই শুক্রবার প্রাতে অপরাহ্ণে মন্দিরে উপাসনা। সাক্ষাৎ ভাবে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে কেবল মাত্র তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে চাওয়া নিষ্ফল, ইহা অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

১০ই শনিবার প্রাতে উপাসনায় প্রকাশিত হয় যে মহর্ষি ঈশার সন্তানত্ব আমাদিগের প্রত্যেককে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং যত ক্ষুদ্র পরিমাণেই হউক না কেন ভগবান্

আমাদিগের মধ্যে ঐ জীবন ক্রমে ক্রমে বিধান করিতেছেন। মধ্যাহ্নে সূর্য্যগ্রহণের সময় মন্দিরে প্রথম কীর্ত্তন হয়। তৎপর আচার্য্যের উপদেশ হইতে "ব্রহ্ম দর্শন" প্রবন্ধটী পাঠকরা হয়। অপরাহ্নে মন্দিরে লক্ষ্মীপুরা হইতে আগত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কালীকান্ত মিত্র উপাসনা করেন। এই উৎসব ব্যাপারে ভগবান্ এবার তাঁহার পাপী সন্তানদিগকে লইয়াই লীলা বিহার করিতেছেন, পাপীদিগকে ইহা বুঝিতে দেন, এবং হৃদয়ে ব্রহ্মপ্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পাপ সমূহকে ভস্মীভূত করিতে আদেশ করেন।

১১ই মাঘ রবিবার সমস্ত দিন ব্যাপিয়া উৎসব হয়। এই দিনকার বিস্তারিত বিবরণ সবিশেষ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব পর নহে। কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অজস্র কৃপাবারি বর্ষিত হইয়াছে। এই দিন উপাসনার মধ্যে তৎসময়ের ভাবানুসারে ৪টী নূতন সঙ্গীত রচিত হয়। এই সঙ্গীত গুলি পাঠ করিলে এই দিবসের ভাব কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইতে পারে। অপরাহ্নে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। এই প্রার্থনাতে সকলেই স্বীয় জীবনে ভগবানের সাক্ষ্যদান করেন। ইহার পর সায়াহ্নে মন্দির দ্বারে প্রথম কীর্ত্তন হয়। সমস্ত নর নারীই ব্রহ্মের পুত্র কন্যা এবং নববিধান ব্রহ্মের সহিত এই নিত্য সম্বন্ধ সকলকে বুঝাইবার জন্য আগমন করিয়াছেন, ইহা সমস্ত দিনকার ব্যাপারের ভিতরে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

১২ই মাঘ সোমবার প্রাতে শ্রীযুক্ত রজনী বাবুর বাসায় উপাসনা। অপরাহ্নে অপর সমাজের নগর কীর্ত্তন হয়। উপাসকমণ্ডলীর অনেকেই উৎসাহ সহকারে তাহাতে যোগ দান করেন।

১৩ই মাঘ মঙ্গলবার প্রাতে সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদ গুপ্তের বাসায় উপাসনা।

১৪ই মাঘ বুধবার প্রাতে (এই দিবস সরস্বতী পূজার দিন) ভিন্নভাবাপন্ন সভ্যগণ সমবেত হইয়া চিন্ময়ী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া ধন্য হয়েন। ভগবান্ এই পতিত বঙ্গভূমির উদ্ধারের নিমিত্ত কেমন এক দিকে মহাত্মা রাম মোহন প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়া অন্য দিকে সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পরা এবং অপরা এই উভয়বিধ জ্ঞানের মহান্ সূত্রপাত করিয়াছেন, ইহা সুন্দররূপে প্রকাশিত করেন। সায়াহ্নে অপর সমাজের উপাসনায় উপাসকগণ যোগ দান করেন।

১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতে এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত প্রথম নগর কীর্ত্তন আমতলার বাজারে পর্য্যন্ত আসিলে তথায় সাধারণকে সম্বোধন করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, সরল ভাবে ভগবানকে ডাকিলে তিনি সকলের নিকটেই প্রকাশিত হন। তাঁহার নিকট জাতি ধর্ম্মের কোনও বিরোধ নাই। কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত রজনী বাবুর বাসায় যোগান্ত সকলে বিদায় গ্রহণ করেন।

১৬ মাঘ শুক্রবার প্রাতে—উপাসনা হইয়া সায়াহ্নে শান্তিবাচন হয়।

উপাসনাশ্রম।

হরির সংসার।

১৪ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

কয়েক দিন হইল মনের ভিতরে একটি বিষয়ে ভয়ানক বিসংবাদ চলিতেছে। সে বিসংবাদের মীমাংসা করিতে গিয়া বিপরীত চিন্তা উদিত হইয়াছে। এ চিন্তা যদিও সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি সংসার ছাড়িয়া যাইবার পক্ষে চিত্তের গতি দেখিতেছি না। মন বলে, বৈরাগ্য হইলে সংসার ছাড়িয়া যাইবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। যাঁহারা বৈরাগ্যের নামে সংসার ছাড়িলেন, তাঁহারা নামমাত্র সংসার ছাড়িলেন, যেখানে গেলেন সেখানেই সংসার তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বৈরাগ্যে পূর্ণমনোরথ হইলেন, এবং তাঁহারা ব্রহ্মযোগে কৃতার্থ হইয়া আর সংসারে ফিরিলেন না। এই অল্পসংখ্যকের পথ ধরিয়া কেন সংসার ছাড়িয়া চলিয়া না যাই, মনকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, তুমি কি আবার সেই প্রাচীন বিধানে ফিরিয়া যাইতে চাও? তুমি যে দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, সেইদিন হইতে কি তোমার প্রতি এই আদেশ হয় নাই, সংসারে থাকিয়া তোমার ব্রহ্ম লাভ করিতে হইবে। তুমি এত দিন ধর্ম্মসাধন করিয়া কি সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে চাও। মনের এ কথা বলিবার অধিকার আছে, কেন না আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এইরূপই আদেশ, এবং এই আদেশ জন্যই প্রাচীন বিধান হইতে এ বিধানের স্বতন্ত্রতা। দেখিতেছি সংসারে লোক নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ক্লেশ পাইতেছে, অথচ এমন কেহ নাই যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেয়। কখন দারিদ্র্য, কখন মৃত্যু, কখন ব্যাধি, কখন আগন্তুক বিপদ পরীক্ষা, এ সকলেতে লোকের মন এক এক বার অধীর ও অস্থির হইতেছে, আবার যে সংসার সেই সংসারই করিতেছে; কেন না তাহারা এমন কোন অবস্থা জানে না, যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে দুঃখ ক্লেশের ভিতরেও সুখ ও সান্ত্বনা পাইবে। রাজাই হউন, আর দরিদ্রই হউন, ধন জন দাস দাসীতে পরিবেষ্টিতই হউন, আর দিনান্তে শাকান্নভোজীই হউন, সকলকেই দুঃখ ক্লেশের অংশ বহন করিতেই হইবে। যদি আমরা এমন কোন সুখের পন্থা পাইয়া থাকি, যে পন্থায় চলিলে নরনারী সুখী হইতে পারে, সে পন্থা সকলের নিকটে বলিতে স্বভাবতই বাসনা হয়। যাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহারা যদি এ পন্থা না ধরিয়া সংসারের পথ ধরে, মনে বড় ক্লেশ হয়। উপায় নাই। লউক না লউক তথাপি পন্থা বলিতেই হইবে। যদি সাধকের জীবন আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, এবং সাধনেরপথে সুখেরসঙ্গে আমাদেরসাক্ষাৎ হইয়া থাকে, তাহা হইলে লোকে সম্মুখে দুঃখের সাগরে ডুবিবে আর আমরা চুপকরিয়া বসিয়া থাকিব, এরূপ স্বার্থপর জীবন ধারণ করা আমাদের পক্ষে কখনই সঙ্গত নয়।

সংসারের সর্ব্ববিধ বিপৎপরীক্ষার ভিতরে থাকিব, অথচ

সে সকল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; এমন উপায় কি আছে যাহা অবলম্বন করিলে এইটি আমাদের জীবনে সিদ্ধ হইবে। আজ যে প্রার্থনা পঠিত হইল তাহাতে এই পাইতেছি, এমন একটি সংসার আছে যে সংসারে সকলই হরিময়। যদি সকলই হরিময় হয়, তাহা হইলে সে সংসার তো সুখের সংসার হইবেই। স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলেতেই যদি প্রাণের হরিকে দেখিতে পাই, সংসারের সমুদায় বস্তু যদি হরিময় হইয়া যায়, সংসার যদি হরির সংসার হয়, তাহা হইলে আর সুখের অবশিষ্ট রহিল কি! কিন্তু এ অবস্থা লাভ কি সকলের পক্ষে সুলভ? যদি এই কথা নরনারীকে বলা যায়, তাহারা বলিবে, যাহা অনেক সাধন দ্বারাও লাভ করা সুকঠিন, তাহা উপদেশ করিয়া কি ফল? দুঃখে কষ্টে পড়িলে হরি আসিয়া উদ্ধার করিবেন, এরূপ নির্ভর কয় জন করিতে পারে? যদি তাহাই না পারিল, তাহা হইলে হরিময় সংসার দেখা, হরির সংসার বিশ্বাস করা, ইহা কি কখন সম্ভব? সহজ নয় সন্দেহ কি? যদি সহজ হইত তাহা হইলে সংসারে এত দুঃখের কাহিনী কখন শুনিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যাহা কঠিন তাহা মানুষ করিবার জন্য যত্ন করে, আর যাহা সহজ তাহা উপেক্ষা করে কেন? লোকে কত প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছে, উপবাসাদি দ্বারা শরীর ক্ষীণ করিতেছে, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিবার জন্য অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে, অথচ বিশ্বাসের সহজ পন্থা কেহই ধরিতেছে না। সকলের যিনি পিতা মাতা, যাঁহার করুণা স্নেহ নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে, লোকে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করে না বলিয়াই এত কঠোর তপস্যা পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। যদি সহজে বিশ্বাস হইল তো হইল, না হইলে দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যাতেও কিছু হয় না। তপস্যাতে কৃতার্থ না হইয়া পরিশেষে অনেককে সেই বিশ্বাসেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। আমি সুখের পন্থা যাহা জানি, যে পন্থায় ঈশ্বর-কৃপায় চলিয়া সুখ পাইয়াছি, নিত্য সুখের আশা পাইয়াছি, সে সুখের পন্থা আর কিছুই নহে, আপনার বলিয়া কিছু না রাখা, সমুদায় হরির চরণে অর্পণ করা। যদি বল, এও তো বড় কঠিন হইল, এখানে বিশ্বাস নির্ভর যে অনেক চাই, তাহা হইলে বলিতে হইতেছে, যদি একটু বিশ্বাসও হরিকে দিতে না পারিলে; তাঁহাকে অনন্তশক্তি বলিতেছ, অথচ তাঁহার উপরে সামান্য সংসারের ভার দিতে না পারিলে, তাহা হইলে বল তোমার গতি কি হইবে?

হরির প্রতিজ্ঞা এই, যে ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিতে চলে, সংসারের সমুদায় বিষয় বুদ্ধির সাহায্যে চালাইতে চায়, তিনি তাহার নিকটে আত্মগোপন করিবেন। সংসারী লোকেরা সংসার করিতে গিয়া এত হিমসিম খায় কেন? সামান্য সংসারের জ্বালায় দিনরাত্রি তাহারা কেনইবা এত জ্বালাতন? একটা করিতে গিয়া আর একটা হয় না, এ দিক্ রাখিতে ও দিক্ থাকে না, বিপৎ পরীক্ষা সর্ব্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে, এরূপই বা হয় কেন? অবশ্য ইহার মধ্যে হরির কোন কৌশল আছে। তিনি নরনারীর দুঃখ দেখিয়া উপহাস করিতে পারেন, শেষটা কি ইহাই বিশ্বাস করিব? এরূপ বিশ্বাসতো কিছুতেই করিতে পারি না। সংসারিগণ প্রতি দিন এত কষ্ট পাইতেছে, অথচ হরি স্থির গম্ভীর নিস্তব্ধ উদাসীন হইয়া আছেন, ইহা দেখিলে মনে হয়, তাঁহার নরনারীকে সৃজন না করিলেই হইত। তিনি যখন সৃজন করিয়াছেন, তখন তাঁহার গভীর অভিপ্রায় আছে। এমন কিছু তিনি ইহাদিগকে দিবেন, যাহাতে সকল কষ্ট দুঃখের পূর্ণ পরিশোধ হইবে। তুমি বলিবে, কবে দুঃখের পরিশোধ হইবে তাহা ভাবিয়া এখন কি লাভ? এখন যে সংসারিগণের কষ্ট তাহার কি উপায়? তাহার পন্থা কি কিছু আছে? আছে, কিন্তু সে পন্থা নরনারী অবলম্বন করে কৈ? পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, আপনার বলিয়া কিছু না রাখা, সমুদায় হরির চরণে অর্পণ করা, ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। 'এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন' মুখে এ সঙ্গীত অনেকেই গান, কিন্তু কাজে কিছু হয় না কেন, বলিতে পার? সব তোমায় দিলাম, এরূপ সাধারণ ভাবে দিলাম বলিলে দেওয়া হয় না। তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, তোমার মনে কিসের প্রতি লোভ আছে, কি তুমি ছাড়িতে পার না? যাহার প্রতি তোমার লোভ বা টান আছে, জানিবে হরির সেইটি সরাইয়া লইবার জন্য তোমার জীবনে তজ্জন্য দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা দিন দিন এত বাড়াইতেছেন। তোমার যদি সুদিন হইয়া থাকে তাহা হইলে কেন দুঃখ কষ্ট হয় তাহা বুঝিয়া সেইটি হরির চরণে অর্পণ কর, অমনি হরি আসিয়া তোমার সমুদায় ভার গ্রহণ করিবেন।

বল, তুমি যদি তোমার সামান্য টানের বা লোভের বিষয় ছাড়িয়া দিয়া হরির শরণাপন্ন হও, আর তিনি তোমার সংসারের সকল ভার লন, তাহা হইলে তোমার ক্ষতি হয়, না লাভ হয়? তুমিতো দুঃখে দুঃখে সংসার করিতেছ, একবার হরির হাতে ভার দিয়া দেখনা কেমন সুখের সংসার হয়। তিনি আসিয়া যখন তোমার সংসারের বন্দোবস্ত করিবেন, তখন কি আর তোমার কিছু অভাব থাকিবে? তিনি যেমন বন্দোবস্ত করিতে জানেন, এমন আর কে বন্দোবস্ত করিতে জানে? এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়, যাঁহারা নববিধানী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদেরও সংসার অন্য দশজন সংসারীর মত। তাঁহারা আপনার সংসারের বন্দোবস্ত আপনারা করিতে চান, হরিকে বন্দোবস্ত করিতে দেন না, তাই তাঁহাদের সংসারও দুঃখের সংসার। নববিধানীরা হরির এত গুণ বর্ণন করেন, অথচ তাঁহাকে সংসারের বন্দোবস্ত করিতে দেন না কেন জান? হরি বন্দোবস্ত করিতে গেলে তাঁহাদের মনের মত কিছু হইবে না, এই ভয়ে তাঁহারা অনেকে হরির হাত হইতে সংসার ছাড়াইয়া লইয়া আপনাদের হাতে লইয়াছেন। এরূপ স্থলে দুঃখ হইবে না তো কি হইবে? যদিও বা তাঁহারা এখন নূতন নূতন কয়েক দিন সুখ মনে করিতেছেন, তাহার পরে যে কি দুর্ভোগ ভুগিবেন তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। জানিও, হরি যে বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে যাহার মন তুষ্ট, তাহার দিন দিন আনন্দ

বাড়িতে থাকে। তুমি কি মনে কর, হরির হাতে সংসার দিলে তোমার পর্ণকুটীর তিনি একদিনের মধ্যে রাজপ্রাসাদ করিয়া দিবেন? তাহা হইলেতো তিনি নিকৃষ্ট সংসারী হইলেন। তোমার পর্ণকুটীরকে যদি তিনি রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও সুখের নিলয় করিতে না পারিলেন তবে তাঁহার মহত্ব বা ঈশ্বরত্ব কি? তুমি যেমন রাজপ্রসাদকে শ্রেষ্ঠ মনে কর, হরিও কি তাই করেন? তাঁহার নিকটে পর্ণকুটীর ও রাজপ্রাসাদ কি একই নয়? তবে হরির অনুপযুক্ত যাহা তাহা মনে আনিও না। যখন হরি তোমার পর্ণকুটীর আলো করিয়া বসিবেন, আর তার সমুদায় বন্দোবস্ত নিজ হাতে করিবেন, তখন রাজপ্রাসাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। রাজা রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া তোমার পর্ণকুটীরের দ্বারে ভিকারী হইয়া সুখ শান্তি ভিক্ষা করিবেন। এ কিছু কবিকল্পনা নয়, পৃথিবীতে চিরদিন ইহাই ঘটিয়া আসিয়াছে। তোমার গৃহের একটি সামান্য ফুলের মালা রাজার কোটীমুদ্রা মূল্যের কণ্ঠহারকে উপহাস করিবে। হরির প্রদত্ত মালা যখন কণ্ঠে পরি, তখন পৃথিবীর হীরামুক্তাসজ্জিত কণ্ঠহার দূর করিয়া ফেলিয়া দি। এরূপ হয় কেন? হরি হাস্যমুখে যাহা দেন, তাহাতেই আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যায়। যে গৃহে প্রেমপুণ্য সদা বিরাজমান সে গৃহে কি কখন দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে? সেখানে আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। আইস আমরা সকলে আমাদের সংসার হরির হাতে দি, এবং তাঁহার হাতে দিয়া পৃথিবীতে থাকিয়াই বৈকুণ্ঠবাসী হই।

সংবাদ।

গত রবিবার কালীপুরস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নবকুমারীর নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় কুমারীকে সুরমা নাম প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ৭ই চৈত্র প্রীতিভাজন ডাক্তার শ্রীমান্ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নবকুমারের জাতকর্ম্ম কুমারের মাতামহ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয়ের কলিকাতাস্থ আবাসে উপাধ্যায় কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সম্প্রতি বঙ্গে প্রার্থনা সমাজের সভ্য রঙ্গনাথ সদানন্দ কালকার ২২ বৎসর বয়সে উপস্থিত মহামারীতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

আবার দাতব্যচিকিৎসালয়ের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মিত্র মহাশয় এক মাস কাল শোক চিহ্ন ধারণ ও সংযম বিধি পালনপূর্ব্বক অদ্য ৩নং রমানাথ মজুমদারের লেনে স্বর্গগতা মাতৃদেবীর আদ্য শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাচার্য্যের ও উপাধ্যায় এবং ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অধ্যেতার কার্য্য করিয়াছিলেন। ভ্রাতা নৃত্যগোপাল মিত্র এতদুপলক্ষে বিবিধ বিষয়ে যথোপযুক্ত দান করিয়াছেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মেদিনীপুরে যাইয়া দুইটী ইংরেজি বক্তৃতা দান ও উপাসনাদি কার্য্য করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া গত সপ্তাহে খাঁটুরায় গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে গত রবিবার উপাধ্যায় সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ২৬শে ফাল্গুন বেনিয়াটোলাস্থ ৪৫নং ভবনে চট্টগ্রাম নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগিরির সঙ্গে মজফফরপুর নিবাসী ডিপুটী কালেক্টর শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেবনারায়ণের এক মাত্র কন্যা শ্রীমতী সূর্য্যকুমারীর পরিণয়ের নিবন্ধনপত্র অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রার্থনা করিলে পর কন্যা'র পিতা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেবনারায়ণ ভাবী জামতা শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রলালকে ও ধীরেন্দ্রলাল ভাবী শ্বশুরকে এক এক খানা নিবন্ধন পত্র লিখিয়া দেন। তৎপর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেবনারায়ণ ভাবী জামাতাকে এবং ধীরেন্দ্রের বন্দনীয়া বৃদ্ধা হিন্দু জননী ভাবী বধূকে কিছু কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য আশীর্ব্বাদস্বরূপ প্রদান করেন। তদনন্তর বন্ধু ভোজ হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা আনন্দের সহিত একার্য্যে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২৪শে ফাল্গুন প্রাতে মঙ্গলবার খাঁটুরা গ্রামস্থ নববিধান মন্দিরের সম্মুখ ভাগে স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের সমাধিপার্শ্বে উক্ত প্রেরিত ভ্রাতার স্বর্গ গমনের ৭ম সাংবৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং সমুদায় পুত্রকন্যা ও জামাতা এবং আমাদের কোন কোন বন্ধু কলিকাতা হইতে সেখানে যাইয়া সেই উপাসনার যোগদান করিয়াছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনা কার্য্য করেন। স্বর্গস্থ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী ও প্রথমা ও দ্বিতীয় কন্যা প্রার্থনা ও প্রথম পুত্র শ্রীমান্ মনোমতধন দে সঙ্গীত করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে জামাতা শ্রীমান্ রাধানাথ দেব দুঃখী কাঙ্গালদিগকে পয়সা ও তণ্ডুল বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন।

গত ২৮শে ফাল্গুন ঢাকাস্থ বিধান পল্লীতে বিক্রম পুর স্বর্ণগ্রাম নিবাসী স্বর্গগত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতার সঙ্গে মত্তগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্র মোহনের শুভ পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কন্যার মাতাকে এই বিবাহে অনেক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। স্বর্গগত স্বামীর অন্তিম উপাদেশানুসারে তিনি প্রিয়তমা কন্যাকে নব সংহিতানুসারে পাত্রস্থ করিয়া প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর নব দম্পতীর কল্যাণ বিধান করুন।

বিগত ২৪শে ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে শান্তিকুটীরে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী তাঁহার স্বর্গগত পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাহাতে উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। সৌদামিনী দেবীর ভক্তি ভাজন পিতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায় মহাশয় কয়েক মাস মাত্র রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৮৭ বৎসর বয়সে বিগত ২২শে ফাল্গুন স্বর্গগত হইয়াছেন। তিনি অতিশয় সাধুচরিত্র পুরুষ ছিলেন, পরলোকের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর মাসাধিককাল পূর্ব্বে হইতে ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি এক এক দিন যাইয়া তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইয়া আসিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত শ্রবণে গায়ককে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ও ভাবে গদগদ হইয়া প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। এই বৃদ্ধ মহাত্মা রোগাক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে চলচ্ছক্তি সম্পন্ন ছিলেন। কোনও কোন প্রচারক বা ব্রাহ্মবন্ধু বক্তৃতা দান করিতেছেন সংবাদ পাইলে তৎ শ্রবণের জন্য দৌড়িয়া যাইতেন। তিনি পুত্রাদির গলগ্রহ কখন হন নাই, বৃদ্ধ বয়সেও বিষয় কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি পরলোকযাত্রার শেষ মুহূর্ত্তেও বলিয়াছেন, আমি মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করি না, মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ হাসিতে

হাসিতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জামাতা শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার নিকটে যাইয়া প্রার্থনা ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন।

প্রেরিত।

সুদূর উৎকলে থাকিলেও কলিকাতার পূজনীয় ব্রাহ্ম অগ্রণী মহোদয়গণের সম্মিলন সংবাদপাঠে আজ আমার হৃদয়তন্ত্রী তাঁহাদিগের সঙ্গে সমভাবে বাজিয়া উঠিতেছে, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে ও প্রাণ পুলকিত হইতেছে। বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ যে, তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া প্রতিকূল ঘটনা বিজড়িত ক্ষণিক ক্ষীণপক্ষ ব্রাহ্মসমাজকে আবার নূতন জীবন দিয়া তদ্দ্বারা শত শত নরনারীর সুষুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করিবার উপায় বিধান করিলেন। পরম দয়ালু পরমেশ্বর কোন প্রণালীতে তাঁহার পতিত সন্তানগণের উদ্ধার সাধন করেন তাহা বোঝা কাহার সাধ্য? কেন বিদ্যুদ্বেগধারী ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যমধ্যে এক সময়ে শিথিলতা উপস্থিত হইল তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই প্রকৃতির সর্ব্বত্রই উত্থান ও পতনের বিধি রহিয়াছে। পর্ব্বতে উঠিতে হইলে মধ্যে মধ্যে কত বার নিম্ন দেশে নামিতেও হয়। সমুদ্রের ভাটা দেখিয়া আর জোয়ার হইবে না কে বলিতে পারে? চন্দ্রকলার ক্রমশঃ হ্রাস দেখিয়া তাহার আর বৃদ্ধি হইবে না কে অবধারণ করিতে পারে? যে করুণাময়ের ইচ্ছায় সমুদ্রের ভাটা হয় তাঁহারই ইচ্ছায় আবার তাহার জোয়ার হইয়া থাকে, এবং তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রকলার হ্রাস হয় ইচ্ছায় আবার বৃদ্ধি থাকে। অতএব হ্রাস কিংবা অবনতি হইল বলিয়া আমাদিগের হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসিবেই আসিবে। আমরা চিন্তা করিয়া কিছুই করিতে পারি না। যে সম্মিলনের জন্য এতদিন ধরিয়া চেষ্টা হইলেও কিছুই হইতে পারে নাই তাহা হঠাৎ কিরূপে হইয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিলেই সকল অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায়, সকল অভাব দূর হইয়া যায় ও সকল প্রকার বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়া যায়।

সম্মিলিত উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত ধর্ম্মবীর মহোদয়গণ যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কাঁদিয়া ছিলাম, এক মাঘোৎসবের দিন প্রাতঃকালে ব্রহ্ম মন্দিরে আচার্য্য দেবের হৃদয় ভেদী উপদেশ শুনিয়া কাঁদিয়াছিলাম, আর আজ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহোদয়গণের গভীর ভাবপূর্ণ চিত্তমুগ্ধকারী উপদেশ পাঠে পরমেশ্বরের বিশেষ করুণা সম্ভোগ ও স্মরণ করিয়া কাঁদিলাম অন্যান্য সময়ে অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে বটে; কিন্তু এমন কান্না বুঝি আর কখনও কাঁদিতে হয় নাই। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যাঁহাদিগকে আমরা জীবনের আদর্শ স্থানীয় করিয়াছি, যাঁহারা আমাদিগের আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত, যাঁহাদিগের পবিত্র অনুশাসন আমাদিগের জীবনপথের পরিচয়, তাঁহাদিগের স্বর্গীয় উপদেশ আমাদিগের সংসারাসক্ত মৃত জীবনকে নিত্য এই ভাবে জাগ্রত করুক।

বালেশ্বর
১৮।২।৯৮

বশংবদ।
শ্রীরমানাথ দাস।

মহাশয়,

ভক্তিপূর্ণ প্রণামান্তে নিবেদন। আমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের ষষ্ঠদশ সাংবৎসরিক উৎসব অতি দীন ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এবার ভক্তি ভাজন উপাচার্য্য মহাশয় বিশেষ কারণে কোচবিহারে স্থিতি করিতেছেন এবং নানা কারণে কয়েকটী বন্ধু উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বন্ধুগণের অনুপস্থিতি জন্য কলিকাতার কোনও প্রচারক মহাশয়কে আনিতে পারা যায় নাই। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ রায় এবং অখিলচন্দ্র রায়, বাবু শরৎচন্দ্র রায়, আমি, আর দুইটি স্থানীয় বন্ধু এবং কয়েকটী ব্রাহ্মিকা ভগিনী, এই কয়জনেই উপস্থিত ছিলাম।

৪ঠা ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর শ্রীমন্দিরে উদ্বোধন হয়। ঐ সময়ে আশুবাবু একটি নূতন কীর্ত্তন রচনা করিয়া গান করেন। কীর্ত্তনটি সময়োপযোগী এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অখিল বাবু সকল সাধু ভক্ত এবং প্রেরিতগণের পদধূলি মস্তকে লইয়া উদ্বোধন আরম্ভ করেন। প্রার্থনাতে "মা নিজকৃপাগুণে ভক্তগণ সঙ্গে দীনাত্মাদিগের হৃদয়ে এবং গৃহে অবতীর্ণ হইলেন" এই রূপ ভাব প্রকাশ হয়। ৫ই সন্ধ্যার পর নারীসমাজের উৎসবে আশুবাবু উপাসনা করেন। "সহিষ্ণু হইয়া প্রেমসাধন করিলে সংসারে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়," সংক্ষেপ উপদেশের বিষয় ছিল। ৬ই সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসবের দিন, কিন্তু আয়োজন করিতে বিলম্ব হওয়ায় বেলা প্রায় ১০টার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। অখিল বাবু উপাসনা করেন। "সাধু মহাজনগণের সহিত আমাদিগের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ" উপদেশের বিষয় ছিল। উপদেশের শেষ ভাগেই অখিল বাবু আজীবন চিরকুমার থাকিবেন ইহা প্রকাশ করিলেন। তিনি বহুদিন হইতে বিশেষতঃ গত মাঘোৎসব হইতে আজ পর্য্যন্ত বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিতেছিলেন, আজ ব্যক্ত করিলেন। বেলা ৩টার সময় আমাকেই মধ্যাহ্ন উপাসনা করিতে হয়। "বিধাতা আমাকে এখানে আনিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন" এইরূপ প্রার্থনা হইয়াছিল। অনন্তর পাঠ এবং আলোচনা হয়। সন্ধ্যার পর একটি কীর্ত্তনান্তে পুনর্ব্বার অখিলবাবু উপাসনা করেন। "যখন আমরা সাধু মহাজনগণের বংশজ, তখন নরনারীর প্রতি প্রেম সাধন করিতেই হইবে" ইহাই উপদেশের বিষয়। ৭ই প্রাতঃকালে শরৎ বাবু উপাসনা করেন "স্থানীয় মণ্ডলীর চিহ্নিত সেবকের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ" প্রার্থনার বিষয় ছিল। উহা অত্যন্ত মধুর হইয়াছিল। অপরাহ্নে, ১ম—বন্ধুগণের অনুপস্থিতি, ২য়—আশু বাবুর শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য নগর কীর্ত্তন হইল না। ৮ই জয়পুরস্কুলের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হয়। স্থানীয় দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯ই সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে সামাজিক উপাসনা হয়। ১০ই অপরাহ্নে স্থানীয় সমাজের সাধারণ সভা এবং উপাসকমণ্ডলীর বিশেষ অধিবেশন হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীমন্দিরে ধ্যান এবং শান্তিবাচন হয়। আশু বাবু শান্তিবাচনের প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার ভাব "যদি নিজগুণে ভক্তগণ সঙ্গে হৃদয়াধিকার করিয়াছ, তবে আশীর্ব্বাদ কর যেন সংবৎসর কাল হৃদয়কে পবিত্র রাখিয়া তব সহবাসে আগামী বর্ষের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি।"

দীনাত্মাদিগের শূন্যগৃহে মা বিধান জননী যে কি প্রকারে উৎসব করেন এবার আমরা তাহারই উজ্জ্বল প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ইতি।

আমরাগড়ী
"কৃপাকুটীর"
২১শে ফাল্গুন ১৩০৪

বিনয়াবনত
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
— সংখ্যা।

১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য		২৷৽
মফঃস্বলে	ঐ	৩

প্রার্থনা।

হে জীবনদাতা, আমাদের জীবন তোমা বিনা মুহূর্ত্তের জন্য বাঁচে না, একথা আমরা কোন দিন অস্বীকার করি নাই। আরাধনা, পূজা, বন্দনা সকলেরই মধ্যে একথা কোন না কোন আকারে প্রকাশ পায়, কিন্তু একথা মানিলে জীবন যেরূপ হয়, সেরূপ কেন হইতেছে না, ইহাই আমাদের ভাবিবার বিষয়। তোমা বিনা জীবন বাঁচে না ইহার অর্থ মনে হয় আমরা ঠিক বুঝি নাই। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস অন্ন পান, দেহের অন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সকলই তোমা হইতে আসিতেছে ইহা জানিয়া আমরা বলিতে পারি, তোমা বিনা আমাদের প্রাণ বাঁচে না, কিন্তু এ সকল লক্ষ্য করিয়া আমরা নিত্যকালের জন্য তো বলিতে পারি না তোমা বিনা আমাদের প্রাণ বাঁচে না, দেহনিরপেক্ষ আত্মা তোমা বিনা বাঁচে না, একথা যদি আমরা প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারি, তবে বুঝিলাম তোমাকে নিত্য জীবনের বিষয় করিয়া লইয়াছি; আর কখন আমরা তোমায় জীবনে ছাড়িতে পারিব না। বল নাথ, আমরা কি শরীরের অন্ন পানের জন্য বাঁচিয়া আছি, না তোমার যে কথায় জীবন দেয়, সেই কথার জন্য বাঁচিয়া আছি, তোমার পুত্র ঈশা চিরন্তন পন্থা অবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মানুষ কেবল অন্ন পানে জীবন ধারণ করিবে না, কিন্তু সেই কথায় যাহা ঈশ্বরের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়।" বল, আমারা কেবল পৃথিবীর অন্ন পানে জীবন ধারণ করিতেছি, না তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই শ্রবণ করিয়া নিত্য জীবন ভোগ করিতেছি? হে দেব, তুমি তোমার কথা যদি আমাদিগকে না শুনাইতে, আমরা এত পরীক্ষা বিপদের মধ্যে কখন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম না। কি দুর্দ্দশা যে, আজ হইতে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, তোমর কথায় যখন আমরা এত দিন জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছি, তখন এইরূপে পৃথিবীর জীবন শেষ করিয়া যাইতে আমাদের মনের একান্ত বাসনা। হে প্রভো, তুমি তো জীবকে নিত্যজীবন দান করিয়া কৃতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, আমরা যে পাপবিকারের অধীন হইয়া তোমার কথার প্রতি কর্ণপাত করি না, নিজ বুদ্ধি ও সংস্কারের হাতে জীবন সমর্পণ করিয়া জীবনে নানা প্রকার পাপ কলঙ্ক দুঃখ আনয়ন করি, হে দেবাদিদেব, তুমি যদি আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি নিবারণ না কর, আমাদের প্রবৃত্তি বাসনার পথ অবরুদ্ধ করিয়া না দাও, তাহা হইলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার কোন

আশা নাই। এ জন্য আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, এবং এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা যেন তোমার কথাকে আমাদের জীবনের উপজীব্য করি। দৈহিক অন্নপান দাও, তজ্জন্য আমরা তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ, কিন্তু আত্মার নিত্যকালের অন্ন পান তোমার মুখের কথা। সে কথার জন্য আমাদের সর্ব্বস্ব তোমার চরণতলে অর্পণ করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, গ্রহণ করিয়া আমাদের জীবন সার্থক কর। আমরা বিনীত ভাবে তোমার চরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

প্রেম ও পুণ্যের যোগভূমি।

প্রেম ও পুণ্যের মিলন কি প্রকারে জীবনে সাধিত হইতে পারে, এ প্রশ্ন আমরা অনেকের নিকট শুনিতে পাই। বিচার দ্বারা তর্ক দ্বারা বা অন্য কোন প্রকার বাহ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া এ উভয়ের মিলন কেহ সাধিত করিবেন, ইহা আমরা কোন প্রকারে আশা করিতে পারি না। যদি আমাদের নিজের জীবনের কথায় প্রেম ও পুণ্যের মিলন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়,তাহা হইলে নির্ভয়ে এই কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে হয় যে, ভগবৎকৃপায় আমরা যে আরাধনাপ্রণালী লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই মিলন ভূমি রহিয়াছে। এক দিনে নয়, আরাধনা করিতে করিতে আমাদিগের নিকট এই ভূমি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

"শিবমদ্বৈতম্" "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এই আরাধনামন্ত্র মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? এক দিকে শিব বা প্রেম, অন্য দিকে শুদ্ধ অপাপ বিদ্ধ বা পুণ্য এবং ঐ উভয়ের মধ্যে অদ্বৈত বা অদ্বিতীয়ত্ব। এখন জিজ্ঞাসা এই অদ্বিতীয়ত্বেই কি প্রেম ও পুণ্যের যোগভূমি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, হাঁ! হাঁ, বলিতেছি এই জন্য যে, আমরা জীবনে এই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই যে অপরে উহা গ্রহণ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই; তাই তৎসম্বন্ধে কারণ প্রদর্শন প্রয়োজন। প্রেম ও পুণ্যের যোগ অদ্বিতীয়ত্বে কেন কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয় আমরা দেখাইতে যত্ন করিতেছি।

আরাধনা কিন্তু সামান্য ব্যাপার নহে। যখন যে স্বরূপের আরাধনা হয়, তখন সেই স্বরূপের প্রভাব জীবনের উপর নিপতিত হয়, সেই স্বরূপের প্রভাবে আমাদের ভিতরকার তদনুরূপ স্বরূপ প্রস্ফুটিত, পরিপুষ্ট ও সরল হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে সেই স্বরূপকে আপনার স্বরূপের অনুরূপ করিয়া লইবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়। আমরা যে স্বরূপ লইয়া অদ্যকার প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, দৃষ্টান্ত স্থলে সেই স্বরূপই গৃহীত হউক। যখন আমরা প্রেমস্বরূপের আরাধনা করি, তখন তদ্দ্বারা আমাদের হৃদয়েই প্রেম জাগ্রৎ হয়, আরাধ্য দেবতার প্রেমের প্রভাব আমাদের ক্ষুদ্র প্রেমের উপরে নিপতিত হইয়া উহাকে পরিপুষ্ট ও সবল করিয়া তোলে। প্রেমের স্বভাব আত্মসাৎ করা, ঈশ্বরের প্রেম যখন আমাদিগকে এবং আমাদের প্রেম তাঁহাকে আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত, তখন তিনি বিনা আর যে কেহ আমাদিগের প্রিয় হইতে পারেই না, ইহা আমাদের হৃদয় অনুভব করিতে থাকে। এই অনুভব যত গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে, ততই আমাদের জীবন মন আত্মা সকলের তিনি একমাত্র প্রভু ইহা জানিয়া তাঁহার চরণে এসকল সর্ব্বথা সমর্পণ করিবার জন্য আমাদের চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমাদের প্রিয় প্রভু পরমেশ্বরকে আত্মোপরি প্রভুত্ব দান করিতে দিয়া দেখি, যে আত্মা অনেক স্থানে বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে। যিনি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির প্রভু, সমুদায় বিশ্ব যাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার শাসন অণুমাত্র অতিক্রম করিতেছে না, দেবগণ যাঁহার পদতলে চির দিনের জন্য আত্ম বিক্রয় করিয়াছেন, যাঁহার গৌরব ও ঐশ্বর্য্যে সমুদয় ভুবন পূর্ণ তাঁহাকে হৃদয় সিংহাসন দিতে পারিলাম

না, প্রবৃত্তি, বাসনা, ধন মানাদি দাস করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের নিগড় ভাঙ্গিতে অসমর্থ হইলাম, একের প্রাপ্য ভালবাসা শতেকের নিকটে বিক্রীত করিয়াছি, ইহা যতই হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, ততই যন্ত্রণা ক্লেশ অনুতাপে হৃদয় পূর্ণ হইতে চলিল। এক মতে আমার প্রাণের প্রিয়তম প্রভু আমার জীবনের স্বামী, আমি আর কাহারও নিকট স্বামিত্ব স্বীকার করিব না, এই বলিয়া আত্মা যখন একেতে অভিনিবিষ্ট হইল, তখন তাহাতে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের অবকাশ হইল।

যদি বল, একেবারে কি প্রেম হইতে পুণ্যে প্রবেশ করা যায় না? প্রেম পুণ্য কি এক সামগ্রী নয়? ঈশ্বরের সমুদায় স্বরূপ এক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমাদের গ্রহণোপযোগিতানুসারে উহার প্রকাশ আমাদের নিকট হইয়া থাকে। ঈশ্বরের করুণা দয়া ও প্রেমের পক্ষপাতী কে আর নয়? সকলেই ঈশ্বরের দয়ার দিক্ ভাবিতে ব্যস্ত। কিন্তু দয়া বা প্রেমের উপাসকের শুদ্ধ জীবন হয় না কেন? দয়ার প্রশ্রয় লইয়া কি তাহারা এরূপ হইয়া থাকে? প্রশ্রয় লওয়া অসম্ভব, কিন্তু দয়া প্রেম ভাবিলে যে সুখ হয়, সেই সুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট। সে প্রেমের নিকট যে আত্ম বিক্রয় করিতে হইবে, তাঁহাকেই যে জীবনের একমাত্র প্রভু করিতে হইবে সে দিকে দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি নাই কেন তাহা জান? সে প্রেমকে একটু দূরে রাখা হইয়াছে; আত্মসাৎ হওয়া বা আত্মসাৎ করা এ দুইয়েরই একান্ত বিপক্ষ। বিপক্ষ কেন জান? প্রবৃত্তি বাসনা প্রভৃতি তাহাদের প্রভু, তাহারা উহাদের নিকটে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ, সকলের যিনি প্রভু তাঁহাকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিতে মন প্রস্তুত নয়, সুতরাং শত প্রভুর সেবায় প্রবৃত্ত জীবন শুদ্ধ হইবে কি প্রকারে? প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ ঈশ্বরকে যত দিন তাহারা জীবনের একমাত্র প্রভু না করিতেছে, তত দিন পুণ্যস্বরূপের সঙ্গে মিলন অসম্ভব।

এক অদ্বিতীয় প্রেম স্বরূপ ঈশ্বরকে যখন আমি আমার হৃদয়ের রাজা করিলাম তখন আমি স্বাধীন হইলাম, আমার উপরে আর প্রবৃত্তি বাসনা প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব রহিল না। আমি একমাত্র আমার প্রেমময় প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করি, তাঁহারই মহিমা সর্ব্বত্র দর্শন করি, ত্রিভুবনের তিনি একমাত্র পিতা মাতা সুহৃৎ ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় আরও তৎপ্রতি অনুরক্ত ও অনুগত হইয়া পড়ে। প্রবৃত্তি বাসনার প্ররোচনায় আর আমার মন ভোলে না। আমার উপরে আমার একমাত্র প্রভুর সম্পূর্ণ জয় লাভ হইয়াছে এখন সেই ইচ্ছাই আমার জীবনের নিয়ন্তা। এখন আমি প্রমুক্ত স্বাধীন। পুণ্য কি শুদ্ধতা কি এখন আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর কি আমি পুণ্য হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি? আর কি প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিবার আমার সামর্থ্য আছে? প্রেম ও পুণ্যের সৌন্দর্য্যে আমার প্রাণ শুদ্ধ, আমার আর অন্য কিছু অভিলাষ করিবার অবকাশ কোথায়? আর কি আমার অপর কোন প্রভু আছে যে, আমি তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব? আমি ঈশ্বরের হইয়া গিয়াছি, তাই আমাকে সাধুতা, পুণ্য ও শুদ্ধতা যাহা কিছু সম্ভবপর হইয়াছে।

এখন ভাবিয়া দেখ, প্রেমকে এক মাত্র প্রভু হইতে না দিলে পুণ্যের সহিত পরিচয়ের সম্ভাবনা আছে কি না? প্রেমস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রেম যে একমাত্র পরমপ্রভুর, ইহা দেখা চাই। শুধু প্রেম দেখিলে বা ভাবিলে কি হইবে, যদি সে প্রেমের তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব না থাকিল? প্রেমের এমন কর্ত্তৃত্ব থাকা চাই যে, আর কিছুতেই কর্ত্তৃত্বের সম্ভাবনা তোমার উপরে থাকিবে না। যদি জগতের কোথাও সে প্রেম ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তা আছে, এরূপ তোমার মনে থাকে, তাহা হইলে তোমার সে প্রেমের কর্ত্তৃত্বাধীনতা পূর্ণ পরিমাণে হইল না, কেননা এক জন কর্ত্তা থাকিতে আর এক জন কর্ত্তা স্বীকার করিলে তৎপ্রতি

আনুগত্যের অবকাশ থাকিল বলিয়া একেতে তোমার প্রেমবশ্যতা পূর্ণ হইল না। তিল পরিমাণ অন্য কাহারও প্রতি আনুগত্যের সম্ভাবনা থাকিলে, জীবনে পুণ্যোদয় অসম্ভব রহিল। পুণ্যার্জ্জন ও স্থায়ী পুণ্য লাভ সাধারণের পক্ষে এত কঠিন কেন, এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

প্রশ্ন হইতেছে, একজনের কর্ত্তৃত্ব বিনা আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করা এ সংসারে সম্ভব কি না? সংসারে থাকিতে গেলেই বিবিধ ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া চলিতে হয়, অন্যথা এক-দিনের জন্যও জীবন চলে না, এরূপ স্থলে প্রেম পুণ্যের মিলনের যদি এই একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে ইহা অসম্ভব বলিয়া অবশ্য মানিতে হইবে। সংসারে যদি একের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার কঠিন না হইত, তাহা হইলে স্বতন্ত্রভাবে অদ্বিতীয় স্বরূপের প্রতিদিন আরাধনায় কোন প্রয়োজন ছিল না. কেন না এমন কোন্ স্বরূপ আছে যাহার সঙ্গে এক অদ্বিয়তীয়ত্ব লাগিয়া নাই? জীব বা জগৎ এক নহে বহু, এক ঈশ্বরই এক অদ্বিতীয়, সুতরাং যে কোন স্বরূপের সহিত এক অদ্বিতীয় সংযুক্ত না থাকিলে ঈশ্বরের আরাধনাই হয় না। অদ্বিতীয় স্বরূপের স্বতন্ত্র আরাধনার প্রয়োজন এই যে, তদ্দ্বারা ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র একের কর্ত্তৃত্ব অবলোকন সহজ হইবে। যেখানে অপরের কর্তৃত্ব চক্ষে দেখা যায় সেখানেও তাহার কর্ত্তৃত্ব নয়, একমাত্র ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, এটি উজ্জ্বলভাবে হৃদয়ের সন্নিধানে সর্ব্বদা জাগ্রৎ রাখিবার জন্য প্রেমস্বরূপের অব্যবহিত ভাবে অদ্বিতীয় স্বরূপের পরিস্ফুট আরাধনা করিয়া পুণ্যস্বরূপের অন্তরে প্রকাশের অবকাশ দান করা সমুচিত। এতক্ষণ আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা যদি সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তবে আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই, যাহা বলা হইল তাহাতেই নিঃসন্দেহ প্রেম ও পুণ্যের যোগভূমি প্রকাশ পাইয়াছে।

কায়স্থ আত্মস্থ ও ব্রহ্মস্থ।

জাতি ভেদ প্রথা এ দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না, বলেন তাঁহাদেরও তৎপ্রতি ভিতরে ভিতরে এরূপ টান আছে যে, অনেক সময়ে তাহা দেখিয়া মন বড়ই ক্লেশ পায়। এরূপ টান জানিবার কারণ কেবল কুসংস্কার, ইহা বলিয়া ভেদবুদ্ধি উড়াইয়া দেওয়ার যত্ন বৃথা। এমন অবশ্য কিছু কারণ আছে যাহার জন্য যাঁহারা প্রকাশ্যে পান ভোজন ও ব্যবহারে জাতিভেদ মানেন না, তাঁহারাও এক শোণিত হইবার পক্ষে পশ্চাৎপদ। ভ্রান্তি, কুসংস্কার, সাংসারিকতা প্রভৃতি কারণের দ্বারা চালিত হইয়া অনেকের চিত্ত এ বিষয়ে অনুচিত টান প্রকাশ করে না, একথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু এ টানের ভিতরে যে একটী সত্যমূলক ভূমি আছে, আমরা আজ তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত।

এই বিষয়টি ভাল করিয়া আলোচিত হইতে পারে এজন্য আমরা মানবশ্রেণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছি, কায়স্থ, আত্মস্থ ও ব্রহ্মস্থ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীকে আমরা তিন শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিতেছি, অথচ এ চারি শ্রেণীই প্রকারান্তরে ইহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, কায়স্থ পূর্ব্ব কালে শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন, আজও তাহাই রহিলেন। কেবল আত্মস্থ মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয় শ্রেণীকে আমরা নিবিষ্ট করিতেছি এই মাত্র। যিনি ব্রহ্মস্থ তিনি ব্রাহ্মণ, ইহা পূর্ব্বেও যেমন আজও তেমনি। শম দম, শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণ অনুসারে পূর্ব্বে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল, কালে উহা জন্মগত হইয়াছে। ইহা আর এখন কে না জানেন? গুণানুসারে শ্রেণী নিবন্ধন কোন কালে অন্তর্হিত হইবে না; সুতরাং সেই শ্রেণী নিবন্ধন এমন ভূমির উপরে স্থাপিত হওয়া সমুচিত, যাহা সমুদায় শ্রেণীনিবন্ধন বিলোপের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

যাঁহারা শরীরসর্ব্বস্ব তাঁহারা কায়স্থ। তাঁহাদের সমুদায় চিন্তা, সমুদায় পরিশ্রম, সমুদায় উদ্যম শরীরের জন্য ; শরীরের স্বাস্থ্য, শরীরের সৌন্দর্য্য, শরীরের আরাম, অশন বসন ভূষণ, গৃহ বিত্ত, শোণিত মাংসের সম্বন্ধ, এই সকল লইয়া তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত। শরীর ছাড়া আর যে কিছু যত্ন আদরের সামগ্রী আছে ইহা তাঁহারা অনুধাবন করেন না। লোকের উপদেশে, পরম্পরা শ্রুতিতে, মধ্যে মধ্যে আপনার অন্তরেও দেহাতীত যেন কিছু আছে মনে হয়, কিন্তু এরূপ ভাব অতি ক্ষণস্থায়ী, আমোদ প্রমোদ বেশ ভূষা প্রভৃতি মনকে এমনই আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে যে, উচ্চ ভাব স্থায়ী হওয়াতো দূরের কথা, ভাল বিষয়ের আলাপ হইতে হইতে উহা ভাঙ্গিয়া যায়, সংসারের কথা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সে কথা উপস্থিত হইবামাত্র উৎসাহের আর পরিসীমা থাকে না। কোন স্থলে গভীর বিষয়ের আলাপ উপস্থিত, সেখানে যদি এই সকল লোক গমন করেন, তাঁহারা অস্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন বুঝিতে পারেন। সেখান হইতে শীঘ্র বিদায় পাইতে পারিলে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া কায়স্থ কাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, এবং পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকই অধিক।

জ্ঞান, বুদ্ধি, সৌশীল্য, মানসিক নৈপুণ্য, এই সকল বিষয়ে যাঁহাদের উৎসাহ তাঁহারা আত্মস্থ। ইহাঁদের মন শরীরে নিবিষ্ট নহে, আপনাতে নিবিষ্ট। বিদ্যার্জ্জন জ্ঞানালোচনা, কবিত্ব, শিল্পিত্ব, ভদ্রব্যবহার, মান, সম্ভ্রম, দয়া, দাক্ষিণ্য, রক্ষণশীলতা, চাতুর্য্য, দক্ষতা, উদ্যম ইত্যাদি বিবিধ মানসিক গুণকে ইহাঁরা আপনাতে এবং অপরেতে দেখিতে ভাল বাসেন। ইহাঁদের সহিত আলাপ ব্যবহারে, পারিবারিক সংস্রবে, সকল বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়, এবং ইহাঁদের সংসর্গসুখ বিস্মৃত হওয়া বড়ই কঠিন। কায়স্থগণ শরীরসর্ব্বস্ব, আত্মস্থ ব্যক্তিগণ মানসর্ব্বস্ব। যে সকল কার্য্যে আলোচনায় ব্যবহারে মনের বল, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, মুগ্ধকরত্বগুণ বাড়ে এ বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বদা বিশেষ যত্ন। মন নিজ সামর্থ্যে প্রকৃতিকে আত্মবশে আনয়ন করিতে পারে, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা উদ্যোগী, সুতরাং জ্ঞান বিজ্ঞানাদি চর্চ্চায় ইহাঁরা সবিশেষ আমোদ লাভ করেন। ইহাঁদের শরীর ও গৃহ উৎকৃষ্টভাবে রক্ষিত ও সজ্জিত হয়, কিন্তু তাহা শরীর ও গৃহের জন্য নহে, মনের বল ও স্বাস্থ্য বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ প্রদর্শন জন্য। আত্মস্থ ব্যক্তিগণের মনে গৌরবাকাঙ্ক্ষা, যশের আকাঙ্ক্ষা, অপরের অনুদ্বেগকর প্রচ্ছন্ন অভিমান নিয়ত থাকে, সুনিপুণ দৃষ্টি ভিন্ন এসকল অপরে ধরিয়া ফেলিতে পারেন না, কিন্তু সমুদায় উদ্যোগ চেষ্টা এ অনুষ্ঠানের মূলে যে এগুলি থাকে তাহাতে আর সংশয় নাই।

কায়স্থ ও আত্মস্থ শ্রেণীর বিষয় বলা হইল, এখন ব্রহ্মস্থ শ্রেণীর বিষয় বলিলেই আমাদের বলিবার বিষয় শেষ হয়। ব্রহ্মস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান বা অন্যান্য সদ্গুণের অভাব আছে তাহা নহে, বরং এ সকলের উৎকর্ষই দৃষ্ট হয়, কিন্তু একটি বিষয়ের জন্য আত্মস্থ শ্রেণী হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র, সেটি আত্মগোপন। শরীর বা আত্মা তাঁহাদের যত্ন চেষ্টা উদ্যমের মূল নহে, স্বয়ং ব্রহ্ম তাঁহাদিগের সমুদায় বিষয়ের প্রেরক। তাঁহারা মান অপমান, নিন্দা খ্যাতি, সুখ দুঃখ কিছুরই প্রতি দৃক্পাত করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি ব্রহ্মের উপরে স্থাপিত। তিনি যাহা বলেন তাহাই তাঁহারা করেন, অন্যের কথায় তাঁহারা কিছু করেন না। সাধারণ লোকে ইহাঁদের কার্য্যের মূল বুঝিতে অক্ষম, সুতরাং আত্মস্থ ব্যক্তিগণ যে প্রকার সর্ব্বত্র প্রশংসিত হন, এ প্রকার প্রশংসাভাজন কখন ইহাঁরা হয়েন না। ইহাঁরা মানবজাতির যে প্রকার কল্যাণ বর্দ্ধন করেন অপর দুই শ্রেণী সে প্রকার

কল্যাণবৃদ্ধি করিতে পারেন না, অথচ এই প্রকার কল্যাণবৃদ্ধির পুরস্কার তৎকালে নিন্দা ঘৃণা নির্য্যাতন পৃথিবী হইতে গমনের পর দেবশ্রেণীতে স্থান দান, এদুইই যে সাধারণ লোকদিগের অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আমরা এবিষয়ে অধিক আর কিছু বলিতে চাই না, এই বলিয়া আমাদের বক্তব্য বিষয় শেষ করি যে, মানবজাতির মধ্যে যাঁহারা যে শ্রেণীর তাঁহারা সেই শ্রেণীর সঙ্গ ভাল বাসেন। সঙ্গ দ্বারাও এই জন্য অনেক সময়ে শ্রেণী বুঝিয়া লওয়া সহজ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বালকেরা অনেক পাপের বিষয় কিছুই জানে না ও বুঝে না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইন্দ্রিয় সকল যখন প্রস্ফুটিত হয় তখন কুসঙ্গে পড়িয়া ও কুদৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও পাপের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন অভ্যাস দ্বারা জীবনে পাপ বদ্ধমূল হয়। নির্দ্দোষ মেষশাবকের ন্যায় মানুষ জন্মগ্রহণ করে, পরে সে বয়োবৃদ্ধ হইয়া নানা কারণে পাপে পতিত হয়। মনুষ্য স্বাধীনতাবশতঃ পাপের সম্ভাবনায় জন্ম গ্রহণ করে, পাপী দণ্ডার্হ হইয়া সে ভূমিষ্ট হয় না।

পশু যেমন পাপের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক দণ্ডিত হয় না, শিশুও তদ্রূপ। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন শিশুরাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী, শিশু না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তিনি স্বর্গের দেবতা বলিয়া শিশুদিগকে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন। এই অবস্থায় কে তাহাদিগকে পাপী বলিতে সাহসী হইবে? শিশুপ্রকৃতি লাভই পরিত্রাণ লাভের উপায়, মধ্যবর্ত্তী নহে।

অনুতাপ ঈশ্বর প্রেরিত পাপের শাস্তি। মনুষ্য পাপ করিয়া অধঃপতিত হইলে মঙ্গলময় ন্যায়বান্ ঈশ্বর অনুতাপযোগে উপযুক্ত শাস্তি দানপূর্ব্বক তাহাকে সংশোধন করিয়া আপনার পদাশ্রয়ে গ্রহণ করেন। তিনি পিতা মাতা, সন্তানকে মঙ্গলের জন্য শাস্তিদান করেন, বিনাশের জন্য নহে। তিনি প্রেমময় ন্যায়বান্ হইয়া পরিমিত পাপের জন্য অপরিমিত দণ্ড কাহার প্রতি বিধান করিতে পারেন না। ঈশ্বর অনন্ত প্রেমময় ন্যায়বান্, ক্রোধান্ধ নিষ্ঠুর দৈত্য নহেন। তিনি দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয়ের বল ও আশ্রয়, তাহাদিগের শত্রু নহেন। "দীনাত্মারা ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই" ইহা ঈশার নিজমুখের উক্তি। নিরাশ্রয় দীনাত্মাদিগকে প্রেমময় ঈশ্বর স্বর্গে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশা পরিত্রাণার্থ কেবল শিশু ও দীনাত্মা হইবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।

আক্‌বর বাদশার আচরিত ধর্ম্মপ্রণালী।

সুপ্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবর কোরাণ ও হদিসের বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া চলিতেন না। নমাজ রোজা ইত্যাদির সঙ্গে তাঁহার যে কোন সম্পর্ক ছিল এরূপ আমরা অবগত নহি। মোসলমান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে মোসলমান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার ধর্ম্মমত কিরূপ, তিনি কি প্রকার ধর্ম্মাচরণ করিতেন, সাধারণতঃ প্রায় কেহই তাহা বিশেষ অবগত নহেন। তিনি হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমুদায় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ ও সহানুভূতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক লোকদিগকে শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন, সময়ে সময়ে নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সাধুভক্তি তাঁহার প্রগাঢ় ছিল। কিন্তু তিনি নিজে হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে আক্‌বর জ্যোতির উপাসক ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ও মন্ত্রী পণ্ডিতবর আবুল্‌ফজলের লেখাতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের রহস্য স্পষ্ট ব্যক্ত। এবিষয়ে পারস্য ভাষায় আবুল্‌ফজল যাহা লিখিয়াছেন এস্থানে তাহা অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল ;—

"সমুজ্জ্বল হৃদয় সম্রাট্ জ্যোতির প্রতি প্রীতি স্থাপনকে ঈশ্বরোপাসনা মনে করেন। মলিন হৃদয় মূর্খ লোকেরা তাহা ঈশ্বর বিস্মৃতি ও অনলোপাসনা মনে করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানান্বেষী সূক্ষ্মদর্শী লোকে উহা শ্রেয়ঃ বলিয়া জানেন। যখন মূর্ত্তি আরাধনা সাধুলোকদিগের নিকটে শুভানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত, তাহা না করিলে অনুচিত বলিয়া গণ্য হয়, তখন মনুষ্যের রক্ষা ও জীবনের মূল স্বরূপ এই উচ্চ মৌলিক পদার্থকে সম্মান করা কেমন করিয়া সঙ্গত নয়? কেন তাহা মন্দকার্য্য বলিয়া মনে করা হয়? শেখ শরফোদ্দন মোনিরী কি সুন্দর বলিয়াছেন, "যখন সূর্য্য অস্তমিত হয় তখন প্রদীপ না জ্বালাইয়া কি করা যায়?" ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ প্রস্রবণ মূলের অন্তর্গত প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড, উহা সেই পবিত্র স্বরূপের চিহ্ন স্বরূপ। দিবাকর ও হুতাশনের অভাব হইলে অন্ন ও ঔষধ কোথা হইতে উৎপন্ন হইত? এই দর্শন শক্তি সম্পন্ন চক্ষু কিরূপে কার্য্যক্ষম হইত? এই বিজয় প্রদীপের অগ্নি স্বর্গীয়।

"মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে প্রখর কিরণমালায় আচ্ছন্ন করে। এক প্রকার তাপগ্রাহী শুভ্র প্রস্তর (হিন্দিভাষায় তাহাকে সূর্য্যক্রান্ত বলে) সূর্য্যাভিমুখে স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ কার্পাস তাহার নিকটে ধারণ করিলে সেই কার্পাসে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সেই স্বর্গীয় অগ্নি কর্ম্মচারী দিগের হস্তে সমর্পণ করা যায়। মশালচি বাবুর্চ্চি প্রভৃতি উক্ত জ্যোতিতে আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করে। সম্বৎসর কাল স্বচ্ছন্দে অতীত

হইলে আবার সেই প্রণালীতে নূতন অগ্নি গৃহীত হয়। যে পাত্রে উহা রক্ষা করা হইয়া থাকে তাহাকে আগুন ঘর (আতশদান) বলা যায়। এক প্রকার শ্বেতবর্ণ সমুজ্জ্বল প্রস্তরও পাওয়া যায়, তাহাকে চন্দ্রকান্ত বলিয়া থাকে। চন্দ্রের অভিমুখে ধারণ করিলে উহা হইতে জল নিঃসৃত হয়।

"যখন দিবাভাগের এক ঘণ্টা কাল অবশিষ্ট থাকে তখন সম্রাট্ অশ্ব বা হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় থাকিলে তাহা হইতে অবতরণ করেন, নিদ্রিত থাকিলে জাগরিত হন। দিবাকর স্বীয় কিরণজাল প্রত্যাহার করিবামাত্র রাজকিঙ্করগণ দ্বাদশটি হিরন্ময় ও রজতময় আলোকাধারে কর্পূর বাসিত আলোকপুঞ্জ প্রজ্বলিত করিয়া রাজাধিরাজের সম্মুখ ভাগে উপস্থিত করে। একজন কলকণ্ঠগায়ক আলোক হস্তে ধারণ করিয়া নানা প্রকার তানলয়ে ঈশ্বরের স্তোত্র বন্দনা করিতে থাকে। তৎপর সে মহারাজের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া নিবৃত্ত হয়। স্বয়ং সম্রাট্ স্তবস্তুতির এক সামায় উপস্থিত হন, এবং নব উদ্যমে প্রার্থনা করেন।

"নানা প্রকার আলোকাধার স্থাপিত হয়, সে সকল বর্ণনার অতীত। সে সমস্ত দীপাধার বিবিধ কারুকার্য্য যুক্ত, কোন কোনটা ওজনে দশমণ বা ততোধিক, তাহাতে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। কোনটা বা এক শাখা বিশিষ্ট, কোন কোনটা দুই বা ততোধিক শাখাযুক্ত। সে সকলের সৌন্দর্য্যে নয়ন আকৃষ্ট হয়। সাম্রাজ্যেশ্বর এবম্বিধ এক সমুচ্চ আলোকাধার নূতন নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তাহার উপরে ৫টি আলোকাধার, এবং প্রত্যেকের শীর্ষভাগে এক একটি জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। কতক গুলি কর্পূরবাসিত বাতি ৩ গজ বা ততোধিক দীর্ঘ। ভিতরে ও বাহিরে উজ্জ্বল জ্যোতিঃসঞ্চারের জন্যও অনেকগুলি আলোক প্রজ্বলিত হয়। চান্দ্র মাসের ১ম, ২য় ও তৃতীয় রজনীতে জ্যোতির অল্পতা হয়, সেই কয় রাত্রিতে ৮টী করিয়া বর্ত্তিকা এক এক দীপাধারে প্রজ্বলিত হয়। ৪র্থ রজনী হইতে দশম রজনী পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া বর্ত্তিকা ন্যূন করা হইয়া থাকে। দশম যামিনীতে সুধাংশুর সুধাধবলিত কৌমুদীমালায় জগৎ সমুদ্ভাসিত হয় বলিয়া একটী মাত্র বর্ত্তিকা সংরক্ষিত হয়। পঞ্চদশ রজনী পর্য্যন্ত দশম রজনীর ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে। ষোড়শ রজনী হইতে উনবিংশ রজনী পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া বর্ত্তিকা বৃদ্ধি করা হয়। উনবিংশ রজনীর তুল্য বিংশ রজনী হইয়া থাকে। একবিংশ ও দ্বাবিংশ রাত্রিতে এক একটী বর্ত্তিকা পরিবর্দ্ধিত হয়। ত্রয়োবিংশ রজনী দ্বাবিংশ রজনীর অনুরূপ। চতুর্ব্বিংশ নিশা হইতে নবচন্দ্রমার উদয় পর্য্যন্ত ৮টী করিয়া বর্ত্তিকা জ্বলিয়া থাকে। প্রত্যেক বর্ত্তিকায় /১ তৈল /॥ নেকড়া ব্যবহৃত হয়। কোন২ স্থলে নেকড়ার বর্ত্তিকার পরিবর্ত্তে কার্পাসপুঞ্জ, তৈলের পরিবর্ত্তে বসা জ্বলিয়া থাকে। ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্বের তুলনায় বর্ত্তিকার ন্যূনাধিক্য হয়। রাজ্যাধিপতি আকবর সভা মণ্ডপে সাধারণ লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য একটি বৃহৎ আলোক প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন। দরবার গৃহের সম্মুখ ভাগে ৮০ হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ এক স্তম্ভ স্থাপিত হয় এবং উহা ১৬টি রজ্জু যোগে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার উপর এক প্রকাণ্ড আলোক জ্বলে। তাহার নাম "আকাশ দিয়া" (আকাশ প্রদীপ)। উহা বহু দূর সমুজ্জ্বল আলোক দান করে। লোক সকল তাহার অনুসরণে দরবারে উপস্থিত হইতে এবং স্ব স্ব গন্তব্য স্থান চিনিয়া লইতে পারে। ইতি পূর্ব্বে মৃগয়াস্থানে ও রণক্ষেত্রে রজনীতে উপযুক্ত আলোকের অভাবে গন্তব্য স্থানে পহুঁছিতে লোকের কষ্ট হইত। আলোক দান কার্য্যে বহুরাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষ নিযুক্ত। সম্রাট্ যে স্থানে পূজা অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকেন সে স্থানে অন্য লোকের প্রবেশাধিকার নাই।"

খ্রীষ্টসম্বন্ধে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কিরূপ মত ছিল।

নব বিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন জগতে প্রচলিত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষবিশেষের কিংবা ধর্ম্ম পুস্তক বিশেষের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি কোন একজন মনুষ্যকে ঈশ্বরাবতার বা ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন নাই, বেদ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি কোন গ্রন্থ বিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত একমাত্র অভ্রান্ত অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মমত সার্ব্বভৌমিক উদার ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তিনি সকল সাধু মহাজনকে তাঁহাদের ঈশ্বরানুগত্য ও সাধুতা অনুসারে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, সকল শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কোন বিশেষ সাধু মহাপুরুষ বা বিশেষ শাস্ত্রে তিনি সম্বদ্ধ কখন ছিলেন না। পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের অনৈসর্গিক ও অবৈজ্ঞানিক মতের প্রতি, লোকপরম্পরাশ্রুত পূর্ব্বতন সাধু মহাজনদিগের অস্বাভাবিক বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতি তিনি কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতেন না। কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টকে যথেষ্ট সম্মান দান করিয়াছেন, আবার শ্রীচৈতন্যকেও ভক্তি করিয়াছেন, হিন্দু যোগী ঋষি শাক্যসিংহ সক্রেটিস মুসা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল মহাজনই যথোপযুক্ত রূপে তাঁহার হৃদয়ে আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। কাহাকেও তিনি পরিত্রাতা বা পরিত্রাণের একমাত্র সহায় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেশবচন্দ্র বাইবেলকে মান্য করিতেন, কোরাণকেও সম্মান করিতেন, এবং যোগ শাস্ত্র উপনিষৎ ভক্তিশাস্ত্র ভাগবতও তাঁহার সমধিক আদরের বস্তু ছিল। কিন্তু কোন শাস্ত্রকে তিনি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেশবচন্দ্র যখন টাউন হলে সহস্র সহস্র পাশ্চাত্য শিক্ষিত মণ্ডলীর সমক্ষে যিশুখ্রীষ্টের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, তখন সাধারণ খ্রীষ্টাবাদিগণ ভাবিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্টের বিশেষ পক্ষপাতী, আবার যখন বীডনপার্কে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া যোগভক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতাদান করিয়াছেন তখন কোন্ হিন্দু তাঁহাকে নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক হিন্দু যোগী বা ভক্ত বলিয়া স্বীকার না

করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশে পৌত্তলিক হিন্দুদিগের উপাস্য দেবতা কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতির নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি যোগভক্তিবিষয়ে কুটীরে যে সকল গূঢ় গভীর উপদেশ দান করিয়াছেন তৎসমুদয়ই হিন্দু ভাবাপন্ন। তিনি দুর্গোৎসবের সময় শারদীয় পূর্ণিমা ইত্যাদির সময় এবং খ্রীষ্টের জন্ম ও স্বর্গারোহণের দিনে সমবিশ্বাসী বন্ধুমণ্ডলীকে লইয়া বিশেষ উৎসব ও উপাসনাদি করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র একমাত্র খ্রীষ্টকে লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিনে সাধু সমাগম করেন নাই, মুসা খ্রীষ্ট মোহম্মদ চৈতন্য সক্রেটিস প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মভাব ও জ্ঞানের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে তাঁহার সাধু সমাগম হইয়াছিল। তিনি হিন্দু যোগী ঋষির ন্যায় যোগ সাধন ও ধ্যান ধারণ এবং শ্রীচৈতন্যের ভাবে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেন। কেশবচন্দ্র বঙ্গদেশে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজে প্রতিপালিত উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাঁহার সাধন প্রণালী আচার ব্যবহার ভোজন পরিচ্ছদাদি স্বদেশীয় স্বজাতীয় ভাবাপন্ন ছিল, তিনি বিজাতীয় বাহ্যিক অনুকরণকে ঘৃণা করিতেন। সকল শাস্ত্র সকল সাধু মহাজন এবং সকল ধর্ম্মভাবের সমন্বয় সাধন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি ঐকদেশিক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মকে আংশিক ধর্ম্মভাবকে কুসংস্কারাকীর্ণ উপধর্ম্মকে মনুষ্যপূজা ও পৌত্তলিকতাকে অন্তর হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, বরং এ সকলের উচ্ছেদসাধনে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে অব্যবহিত গূঢ় যোগ, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে দিব্যচক্ষে দর্শন ও দিব্যকর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ করা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম প্রচার ও সকল সাধন ভজনের মূল এবং জীবনের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যসাধনে তিনি সিদ্ধ ও সফল মনোরথ হইয়াছেন।

সম্প্রতি কোন মাননীয় খ্রীষ্টবাদী বন্ধু বলিয়াছেন, কেশববাবু খ্রীষ্টান ছিলেন, খ্রীষ্টাশ্রিত ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের তুল্য বলিয়াছেন। কি অদ্ভুত কথা। বক্তা কি কেশবচন্দ্রের কোন লেখা বা বক্তৃতা দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন? সামান্য খ্রীষ্টানেরা যেমন ঐতিহাসিক বাহ্যিক খ্রীষ্টকে জীবনের আদর্শ করিয়া চলিতেছেন, ঈশ্বরের প্রাপ্য গৌরব খ্রীষ্টকে দান করিয়া তাঁহার অবমাননা ও প্রকৃত খ্রীষ্টকে ক্রুশে নিহত করিতেছেন, কেশবচন্দ্রের পক্ষে ইহা অসহ্য ছিল। তিনি খ্রীষ্টের চরিত্র ও আধ্যাত্মিক ভাব ও তাঁহার পুত্রত্বকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও আদর করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্রত্ব ও বাধ্যতা, ও তাঁহার শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেমে মত্ততা, এবং তাঁহার শাক্য সিংহ প্রবৃত্তির নির্ব্বাণ ও শুদ্ধতা, মেরীদেবীর পুত্র সাকার ঈশা, শচী দেবীর পুত্র সাকার চৈতন্য এবং মায়াদেবীর গর্ভসম্ভূত সাকার সাক্য সিংহ নহে। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবন ও চরিত্রমাত্র। কেশবচন্দ্র যে ঈশাকে বা অন্য কোন মহাপুরুষকে স্বীয় জীবনের আদর্শ কখন করেন নাই, ঈশ্বর তাঁহার পূর্ণ আদর্শ ছিল, কোন বিশেষ ধর্ম্ম গ্রন্থের যে তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি জীবনবেদে স্পষ্টাক্ষরে স্বয়ং তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এস্থলে জীবনবেদের স্বাধীনতা অধ্যায় হইতে এ বিষয়ে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"কোন পুস্তককে কেন আমি অভ্রান্ত ভাবিব? কেন একটী মানুষকে অবলম্বন করিব? মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না। অহঙ্কারী বলিতে চাও বল, দুরাচার বলিবে তাহাও বল। কিন্তু কোন মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। যেখানে ঈশ্বর আলোক পহুঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোক সে স্থলে প্রকাশ করেন। কোন পুস্তক নাই যাহাতে পূর্ণ জ্ঞান পাইতে পারি, এজন্য বইকে আদর্শ করিয়া লই নাই। ঈশ্বরের পুত্র সকলকে আমি যেমন ভালবাসি কে এমন ভাল বাসিয়া থাকে? অথচ আমিই বলি, তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ ভাবিয়া পিতার অপমান করিব না। আমি বাইবেল পুরাণকে ভালবাসিতে গিয়া পিতার অপমান করিব না। ঈশ্বরের নিকটেই আমি থাকিব। স্বর্গ কি পৃথিবীতে কাহারও দাস হইব না।" ইত্যাদি কেশবচন্দ্রের মত ও বিশ্বাস তাহার শত২ উপদেশ বক্তৃতা ও প্রার্থনাদিতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত। তথাপি লোকে তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত মত প্রচার করেন বড় আক্ষেপের বিষয়।

যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার, তিনি আর ঈশ্বর এক, তিনি জীবের পরিত্রাতা; খ্রীষ্টকে এইরূপে বিশ্বাস করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন না হইবে তাহার জন্য অনন্তনরক ভোগ নির্দ্ধারিত। খ্রীষ্টানদিগের এই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত মতে কেশবচন্দ্রের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। মোসলমানেরা বলেন, একেশ্বরে বিশ্বাসী মাত্রই স্বর্গ লাভ করিবে, যাহারা অনেকেশ্বরবাদী এবং মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বরের অংশী ও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা কাফের, এই কাফেরগণ অনন্তনরক ভোগ করিবে। একেশ্বরে বিশ্বাসীমাত্রই স্বর্গে যাইবে, তবে যে সকল একেশ্বরবাদী মহাপুরুষ মোহম্মদের অনুবর্ত্তী কোরাণের মতাবলম্বী তাঁহাদের জন্য উচ্চ স্বর্গ নির্দ্ধারিত। অতএব দেখা যায় মোসলমানদিগের মতে অনেকেশ্বরবাদী অংশি ও অবতারবাদী খ্রীষ্টানদিগের জন্যই অনন্তনরক নির্দ্দিষ্ট। তাঁহাদের পাপের শাস্তির আর বিরাম নাই। কিন্তু খ্রীষ্টবাদিগণ অপর সম্প্রদায় সম্বন্ধে ইহার ঠিক্ বিপরীত মত প্রচার করিয়া অনন্তনরকের ভয় প্রদর্শন করেন। এক্ষণ কাহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, পাঠকগণ সিদ্ধান্ত করুন। অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বর পাপীর কপালে কখন অনন্তনরক দণ্ড লিখেন নাই, লিখিতে পারেন না। পাপীর সমুচিত দণ্ড হইবে তাহার মঙ্গলের জন্য, সংশোধনের জন্য, পরিত্রাণের জন্য। ঈশ্বর ইহলোকে ঘোর পাপীকেও যেমন আশ্রয় দান করিয়া পিতামাতা অপেক্ষা সমধিক স্নেহ যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন, পরলোকেও তাঁহার সেই

কেহ যত্নের কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। পাপীর পরিত্রাতা একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর, অন্য কেহ নহে। পাপের দণ্ড ও পাপীর প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহারসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের এইরূপ মত ও বিশ্বাস সুস্পষ্ট থাকে। এই অবস্থায় খ্রীষ্টবাদীদিগের ন্যায় তাঁহাকে খ্রীষ্টাশ্রিত বলা অসম সাহসিকতার কার্য্য। মনুষ্যপুত্র ঈশা ঈশ্বর ও অনন্ত নরক প্রচার করিতে খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের লজ্জা ও সঙ্কোচ হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ঈশার আদর্শত্ব।

রবিবার ২৮শে চৈত্র ১৮১৯ শক।

(শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত উপদেশের সার।)

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি ইহা বিশ্বাস করেন যে, একজন দশ জনের পাপ হরণ করিতে পারে? আমাদের কি এবিষয়ে এমন কোন দর্শন ও মত আছে যে, এক জনের গুণে দশজন তরিয়া যায়? এই আজ রবিবার দিনে, এই ঈশার পুনরুত্থান দিনে সমুদয় ইয়োরোপে বিশেষতঃ রোমদেশে মহা মহোৎসব হইতেছে। যাঁহারা এই মহা ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহার গম্ভীরতা ও ব্যাপকতা ও মহত্ত্ব কত। ঈশার মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণ ও অনুযাত্রিগণ ঘোর বিষাদসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু কালে আকাশ যেমন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার শিষ্যগণ এবং তাঁহাতে বিশ্বাসী মণ্ডলীও ঘোর বিষাদ ও দুঃখের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। উপাসনালয়ের শত শত তাড়িতের আলোক সহসা নিভাইয়া দেওয়া হয়। এই শোকজনক ব্যাপার সূচনা করিবার জন্য রোমের ভজনালয়ে এই সময় সেই ব্যাপারের অভিনয় হইয়া থাকে। ভজনালয়ের সহস্র সহস্র তাড়িতের আলো অকস্মাৎ নিভাইয়া দেওয়া হয়, তাহার ভিতরে ঈশার মৃত্যুব্যাপার ব্যাখ্যা করা হয়। দ্বিপ্রহর রজনীতে রোমের প্রকাণ্ড ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয়ে উপাসনা হয়। দশ সহস্র লোক এখানে উপাসনা করেন। ইহাতে এমনি নিস্তব্ধতা হয় যে, এক খান বস্ত্র পড়িলেও তাহার শব্দ শুনা যায়। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে উপাসকমণ্ডলী ডুবিয়া থাকেন। যখন রবিবার প্রভাত হইতে আরম্ভ হয়, অমনি সহসা সহস্র সহস্র তাড়িতের আলো একেবারে জলিয়া উঠে। মহা আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিতে থাকে। ঈশার পুনরাগমনের জন্য এই আনন্দ আহ্লাদ। ঈশার উদ্দেশে এই আনন্দ উৎসবের অভিনয় দেখিলে কাহার না মন উৎফুল্ল হয়? আমি গত শুক্রবার বলিয়াছি ঈশার জীবন মহানুভূতির আদর্শ। আজ বলিতে চাই এক জনের জীবনদ্বারা কেমন করিয়া সহস্র সহস্র লোক পরিত্রাণ পায়। এক ঈশার জীবনের দ্বারা কত কোটি কোটি নরনারীর জীবন সমস্ত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইল, এক ঈশার জীবনের অনুসরণ করিবার জন্য কত কোটি কোটি লোক এখন প্রধাবিত হইতেছে। ঈশার জীবনের পরিত্রাণশক্তির প্রভাব উপলব্ধি করিয়া আজ এত মহোৎসব। সুতরাং বলিতে পারি গভীর মহানুভূতিযোগে ঈশা সমস্ত নরনারীর পরিত্রাণের হেতু হইয়াছিলেন। ঈশা সমস্ত জগতের পাপ অপরাধের দুঃখ সন্তাপের সঙ্গে মহানুভূতি যোগে এক হইয়া তাহা মোচনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সকল পাপী তাপীর পাপ উদ্ধারের সহায় হইয়াছিলেন। এই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণতির অন্তিম সময়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া যখন সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন পূর্ব্বক বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রাধান্য স্থাপন করিলেন, এই শঙ্কর বিজয়কাল স্মরণ করিলে এক জন শত শত জনের জীবনের উন্নতির কারণ হইয়াছিলেন মনে হয় কি না? শঙ্করের নাম কখনও পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে মনে হয় না। দক্ষিণ ভারতে শঙ্করের নিন্দা ও ঈশ্বরের নিন্দা একই। কি জন্য শঙ্করাচার্য্যের এত সম্মান ও প্রতিপত্তি? এখানে কি দেখা যাইতেছে, একজনের জ্ঞান ও ধর্ম্মে শত শত লোক জ্ঞান পাইল, পরিত্রাণের আলোক দেখিতে পাইল, ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? তার পর বঙ্গ দেশে চল। এখানে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কি ব্যাপার হইল। এই বঙ্গদেশ শাক্ত ও বামাচারিগণের অত্যাচারে নিতান্ত অধঃপতিত হইয়াছিল। পাপের আর কোন দৃশ্য অভিনীত হইবার বাকী ছিল না। এক দিকে শাক্ত ও বামাচারিগণের পৈশাচিক ক্রিয়ার অভিনয়, অন্য দিকে মুসলমানগণের তরবারি এই দুইয়ের সংযোগে এই দেশ একেবারে তখন নরকতুল্য হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে একজন মাত্র লোক, যাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য, তিনি আবির্ভূত হইয়া এক প্রেম মহানুভূতির প্রভাবে এই মৃত্যুমুখে পতিত বঙ্গ দেশকে উদ্ধার করিলেন। ভক্তি প্রেমের বিশাল বিক্রমে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের কোন অংশ আন্দোলিত হইল, ভক্তিস্রোতে দেশ ডুবিয়া গেল। এই এক জন লোক দ্বারা কত শত জনের পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইল ভাবিয়া দেখ। এক রাজা রামমোহন রায় এই ভারতের ঘোর কুসংস্কার দুর্নীতি পাপ ও পৌত্তলিকতার বিষম দুর্দিনে তেজোময় সূর্য্যের ন্যায় আপন জীবনের প্রভাবে সকল অন্ধকার দূর করিয়া এই জীবন্ত জাগ্রত এক পরমেশ্বরের পূজা বিধি স্থাপন করিলেন। কত অসত্য অনীতি দলন করিলেন, কত কুসংস্কার বিনাশ করিলেন। ইহাতে কত লোকের পরিত্রাণের উপায় হইল। এইরূপ জগতের সমস্ত বিধানের ঘটনাতে অনুসন্ধান কর এই নিয়ম ও প্রণালী দেখিতে পাইবে। প্রত্যেক মানুষকে যদি নিজের পরিত্রাণের যাবতীয় উপায় নিজে অর্জ্জন করিতে হইত তবে কাহারাও পরিত্রাণ হইত না। হইলেও অতি অল্প লোকের পরিত্রাণ হইত। কিন্তু এই বিশেষ ব্যক্তিতে ও বিশেষ বিধানের ভিতরে নরনারীর পরিত্রাণের উপায় সমস্ত রহিয়াছে বলিয়া সহজেই লোকে তাহা লাভ করিয়া তরিয়া যাইতেছে। যখন কোন মহাপুরুষ অবতরণ করেন তখন তাঁহার জ্ঞানের প্রভাব তাঁহার মনের শক্তি বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত হৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করে। এক জনের উৎসাহে শত জন উৎসাহিত হয়, এক

জনের চেষ্টাতে শত শত লোক চেষ্টাবান্ হয়, এক জনের পরিত্রাণের পথ ধরিয়া সহস্র সহস্র লোক পরিত্রাণপথের পথিক হইয়া পরা সিদ্ধি লাভ করে। এই জন্য দেশে দেশে ধর্ম্মের মহাপুরুষগণের অবতরণ।

এই পৃথিবীর কোন কাজ করিতে হইলে, কোন সমাজ গঠন করিতে হইলে, লোক উদ্ধারের কোন পথ উন্মুক্ত করিতে হইলে দশজনের ভার এক জনের স্কন্ধে বহন করিতে হয়। দশজনের রোগ দূর করিতে হইলে এক জনকে সুস্থতার অবতার হইতে হয়। রাশি রাশি নিন্দা অপমান নির্য্যাতনের ভার বহন করিতে না পারিলে দশজনের জন্য প্রাণ দেওয়ার উপযুক্ত হওয়া যায় না। কোন সত্য ও শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে সর্ব্বদা প্রশংসা ও পুরস্কার সম্ভাবিত নহে। বরং ইহার বিপরীত যাহা তাহাই অধিক ভোগ করিতে হইবে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ঈশা প্রভৃতি সমস্ত মহাপুরুষগণের জীবনে ইহা ঘটিয়াছে, এবং উৎপীড়ন নির্য্যাতন ও সহ্য গুণের অবগুণ্ঠন হইতেই তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরবের সূর্য্য উদিত হইয়াছিল। বাস্তবিক যাঁহারা নির্য্যাতন অত্যাচার সহ্য করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সত্যই জগতের বাঞ্ছনীয় ও অবলম্বনীয় হয়। ঈশা ক্রুশের নিদারুণ আঘাত সহ্য করিলেন বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মের ও আত্মোৎসর্গের এত গৌরব ও বিস্তার। ঈশা জগতের পূজ্য হইতেন না যদি জগতের দুঃখ ভার বহন করিতে ও পাপীর পাপ ভার গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প না হইতেন।

মূল কথা এই যে, ধর্ম্ম কেবল কথা নহে। ধর্ম্মে কথায় চরিত্র ও জীবন যদি এক হয় তবে তাহা জগতের, মঙ্গলের হেতু হয়। রামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরের বৃক্ষতলে গঙ্গার বিচিত্র তরঙ্গমালার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আর অতি সরল উপাদেয় জীবনের সঙ্গে একীভূত ধর্ম্মকথা সমস্ত বলিতেন, আমরা তাহা শুনিয়া যথেষ্টই উপকৃত হইতাম। এক সময়ে তিনি আমাদিগকে সাংসারিকতা হইতে পাপ হইতে দূরে রাখিতে এত সহায়তা করিয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহাকে আমাদের পরিত্রাণের সহায় বলিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। তাঁহার ধর্ম্ম ও আমাদের ধর্ম্ম অনেক স্বতন্ত্র; কিন্তু তথাপি তাঁহা হইতে যে উপকার পাইয়াছি আমরা কখন তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে এই রূপ অনেক উচ্চকথা বলি বলিয়া তাঁহার শিষ্যগণ আমাদিগকে কতই বলেন; কিন্তু তাই বলিয়া কি জীবনে এই ধর্ম্ম উপকার বিস্মৃত হইব? এই রূপে যাঁহারা অসহায়ের সহায় হন, বিধবার অশ্রুজল মুছাইবার উপায় করেন, ভগ্ন পঞ্জরের অবলম্বন যষ্টি হন, পাপীর পরিত্রাণের সহায় হন, বাস্তবিক যাঁহাদের কথা ও কার্য্য জীবনে এক হয়, তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁহাদের অবলম্বিত পথে কোটী কোটী লোক অনুগমন করে। কিন্তু এই সমস্ত কাহারও নিজের শক্তি নহে, কাহারও নিজের কার্য্য নহে। যিনি বিশ্বের রক্ষক ও পালয়িতা, যিনি এই লোকভঙ্গ নিবারণের সেতুস্বরূপ, যিনি এই সমস্ত বিপথগামী গণের সৎপথে পুনরানয়নের মূলাধার, সেই সর্ব্বশক্তিমান, বিশ্ববিধাতার শক্তি ইহার নিদান। সেই অতুল বিভূতিময় যিনি ইহা তাঁহারই গুণ ও গৌরব। পরমেশ্বরের শক্তি ও অভিপ্রায়ই শক্তিরূপে, মহানুভূতিরূপে, প্রেমরূপে, ভক্তিরূপে, পরিত্রাণ ও মুক্তির সমাচার রূপে এই জগতে অবতীর্ণ হয়। তিনি ভিন্ন আর কেহ পরিত্রাতা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ গুরু নাই। কিন্তু তিনি যে একজনকে দশজনের জন্য প্রেরণ করেন, তিনি যে সমস্ত জগতের দুঃখ পাপের সাহনুভূতির আকার দিয়া বিশেষ ব্যক্তি প্রেরণ করেন, ইহা আর অস্বীকার করা যায় না।

এখন শেষ কথা এই বলি, হে বন্ধুগণ, তোমরা কেন কেহ দণ্ডায়মান হইয়া এই ভগ্নমণ্ডলীর ভার গ্রহণ কর না? তোমাদের যুবক দেহে সর্ব্বশক্তিমান্ কত বল দিলেন, তোমাদের প্রাণে কত জ্ঞান ও প্রেম রক্ষা করিলেন, তোমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের কত অতুল ঐশ্বর্য্য স্থাপন করিলেন, সত্য বলিতে তোমাদের অন্তরে কত উৎসাহ দিলেন জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তার করিতে তোমাদিগকে কত শিক্ষাদিলেন, ঈশ্বরের পবিত্র স্বর্গপথে পাপীগণকে আহ্বান করিবার জন্য তোমাদিগকে কত বার ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার অঙ্গীকৃত স্বর্গ রাজ্যের আলোক তোমাদিগের হাতে দিয়া জগতের অন্ধকারপূর্ণ গৃহের দ্বারে ২ ভ্রমণ করিতে তিনি তোমাদিগকে কত বার আদেশ দিয়াছেন। সকলের সঙ্গে একাকার হইবার জন্য তোমাদের অন্তরে কত সহানুভূতি দিলেন, তবে বল তোমরা দুইজন একত্র হইয়া চরিত্রের প্রদীপ কোন উচ্চস্তম্ভের উপর রক্ষা করিয়া কেন পাপী জগতের পবিত্রাণের সাহায্য কর না। তোমাদের বলে আমরা পরিত্রাণ ইচ্ছা করি। তোমাদের সহানুভূতির ও তোমাদের শক্তিতে আমাদের অবসন্ন প্রাণ ও সহায়হীন জীবন সবল হইবে ও আশ্রয় পাইবে। যখন দেখিতে পাইতেছ দশজনের পরিত্রাণের জন্য একজন নির্ব্বাচিত পরিগৃহিত ও পরিচিহ্নিত হয়। প্রত্যেক মানুষেরই দশজনের সাহায্য জন্য আত্মোৎসর্গ বিধি, তখন আর এ বিধি মানিবে না কেন? তোমরাও দশজনের সহায় সহানুভূতি পাইয়া এই জীবন লাভ করিয়াছ; সুতরাং তোমাদের জীবনেও দশজনের অধিকার আছে তাহা কেন মনে করিবে না? অতএব আর নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকিও না। ঈশ্বরের নামে এবং এই পরিত্রাণবিধির বিধানে আপনাদিগকে উৎসর্গ কর। পবিত্রাত্মার বেদীর সম্মুখে আত্ম বলিদান করিয়া জগতের পরিত্রাণের সহায় হও। পরম মঙ্গলময় তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হে পরিত্রাতা, হে পরমেশ্বর, বল জীব যেমন জীবের সহায় এমন আর কে? সন্তানের জন্য মাতা আপনার শরীরের লাল রক্তকে সাদা করিয়া সন্তান প্রতিপালন করেন। একজন নিজের জীবন নিতান্ত তুচ্ছ করিয়া অন্য দশজনের সেবা করেন। তোমার বিধানে এই জগতে প্রত্যেক মানুষ পরস্পরের সহায়। তাহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ ভাব দিয়া তুমি বিশেষ বিশেষ মানুষকে জগতের পরিত্রাণের জন্য প্রেরণ কর। হে মহান্ হে অজানিত, কে তোমাকে জানিত ও তোমাকে পাইত, যদি এ বিষয়ে তোমার

সন্তানগণ দ্বারা তুমি সাহায্য না করিতে? এই জন্য তুমি কত মহাপুরুষ, কত শিক্ষক, কত ত্রাতা এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিলে। যদি ও তোমা ভিন্ন পরিত্রাতা নাই, গুরু নাই, তথাপি এই পৃথিবীতে কত শিক্ষক, কত ধর্ম্মপথে নেতা, কত পথভ্রান্তের জন্য পথ প্রদর্শক আলোক। এই সমস্ত অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা কি তোমার দয়া ভোগ করিয়া নির্দ্দয় ও কঠোর হইব? আমরা কি অকৃতজ্ঞ হইব? তবে বল আমরা তোমায় প্রদত্ত জীবনের ধর্ম্ম ও পুণ্যের প্রভাবে তোমার সন্তানগণকে কেন তোমার কাছে আনিতে পারিব না? হে অগতির গতি, আমাদের মতি গতি ফিরাইয়া দাও। সহানুভূতিতে আমাদের জীবন পূর্ণ কর। আমরা প্রেমদ্বারা সমস্ত অপ্রেমকে যেন জয় করিতে পারি। দোষী দিগকে যেন নিজ জীবনের পবিত্রতা দ্বারা আলিঙ্গন করিতে পারি। আমাদের সমাজকে সহানুভূতির আদর্শ কর। এক জনকে দশ জনের জীবনের সহায় ও সহযাত্রী কর। তোমার পবিত্র আশীর্ব্বাদ লইয়া আমরা তোমাতে একাত্মা হই। এক প্রকাণ্ড মণ্ডলীরূপে সকলে সম্মিলিত হইয়া তোমার পবিত্র চরণে বার ২ নমস্কার করি।

সংবাদ।

হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস রায়, শ্রীমান্ মনোমথন দে, শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ তথায় গমন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন এরূপ সম্ভাবনা।

গত শুক্রবার প্রাতে যিশুখ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের দিন স্মরণার্থ শান্তিকুটীরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে যে উপদেশ হইয়াছিল তাহা আগামী বারে প্রকাশিত হইতে পারে।

বিগত ২০শে চৈত্র রবিবার আমাদের সমবিশ্বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ পরেশরঞ্জন চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় দান উপলক্ষে ডাক্তার বাবুর আহ্বানানুসারে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর সম্মিলিত হইয়াছিলেন। উপাধ্যায় একটি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রার্থনান্তে ফল মিষ্টান্নাদি ভোজন হইয়াছিল।

সম্প্রতি গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজের ষড়্‌বিংশ সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ বাঁকিপুর হইতে ভাই দীননাথ মজুমদার এবং কলিকাতা হইতে শ্রীমান্ মনোমথন দে তথায় গিয়াছিলেন। সপ্তাহকালব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। সমস্ত দিন উৎসব, নারীসমাজ, প্রান্তরগত বক্তৃতা, সামাজিক সম্মিলন, সৎপ্রসঙ্গ, যোগধ্যান ইত্যাদি উৎসবের অন্তর্গত ছিল। মনোমথন দে সঙ্গীতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

যখন শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের তরুণ বয়স, তখন পাদরি ডাইসন সাহেব ও লালবিহারি দে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধমত ও বিশ্বাসকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাদের কথার অযৌক্তিকতা ও অসারতা এবং মতের অমূলকতা বিশদরূপে প্রতিপাদন করেন। তাঁহারা নিরস্ত পরাস্ত হন। তৎপর বহুকাল পর্য্যন্ত কোন খ্যাতনামা খ্রীষ্টবাদী প্রকাশ্য বক্তৃতাদিতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন, শুনিতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি আমাদের মাননীয় খ্রীষ্টবাদী বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন২ প্রসিদ্ধ মত ও বিশ্বাসে দোষারোপ করিয়াছেন, এবং যিশুখ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও অনন্তনরকের মত সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে উপযুক্ত বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৪দিন, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্ এ ৩ দিন এল্‌বার্টহলে খ্রীষ্টবাদী বন্ধুর বক্তৃতার প্রতিবাদস্বরূপ মহাতেজস্বিতা সহকারে বক্তৃতা করিয়া উক্ত বন্ধুর অযুক্ত মত সকল সন্তোষকররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। সেই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এত জনতা হইয়াছে যে স্থানাভাবে অনেক লোক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এ সকল বাদ প্রতিবাদে নগরে মহা আন্দোলন চলিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার বক্তৃতাতে উক্ত মাননীয় খ্রীষ্টবাদী বক্তা এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি আর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না। শুনিলাম ব্রাহ্মবক্তাদ্বয় আরও বক্তৃতা দান করিবেন।

গতকল্য বাঁটরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব প্রিয় ভ্রাতা হরকালী দাসের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, সন্ধ্যাকালে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

আমেরিকা হইতে আগত খ্রীষ্টীয় প্রচারক ডাক্তার হোওয়াইট সাহেব এক বক্তৃতায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ও নববিধানের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অতি উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রদ্ধের খ্রীষ্টবাদী বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক বক্তৃতায় আচার্য্যকে ও নববিধানকে গৌরব দান করিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্ভাব ও সহানুভূতির জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি। তবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন কোন মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কিছু ২ বলিয়াছেন, তাহা অসদ্ভাব বশতঃ বলেন নাই।

আলুপোস্তার বিধানবাদী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু এবং মেটে বুরুজস্থ শ্রীযুক্ত মিহিরলাল রক্ষিতের পণ্যশালায় নববর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী দুই স্থানেই যাইয়া উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় ভগলপুরের উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে পীরপাঁয়তিতে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর নায়কের নবকুমারের নামকরণ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে মানকর একটি প্রসিদ্ধ পণ্ডগ্রাম। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী বর্দ্ধমানের ডিঃ কলেক্টর প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সেখানে যাইয়া ২১চৈত্র রবিবার তত্রত্য স্কুল গৃহে এক বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বহু ভদ্রলোক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন।

হাজারিবাগ হইতে আগত পত্রে জানা গেল,—যে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় তত্রত্য প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র-কুমার গুপ্তের আবাসে নববিধান, আদিসমাজ ও সাধারণ সমাজে ভিন্নতা কি এই প্রশ্ন হওয়ায় তদুত্তরে উপাধ্যায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শুক্রবার ও রবিবারে মন্দিরে উপাসনা হইয়া ছিল। শনিবার অপরাহ্নে কেশবহলে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে। উপাসনা বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদিতে সেখানকার লোকে বিশেষ রূপে আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন।

গত ১৩ই চৈত্র অপরাহ্নে খাঁটুরায় দরিদ্রালয়ের তৃতীয় সাংবৎসরিক সভা তত্রত্য বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহে হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত বৎসর মাসিক চাঁদা ও এককালীন দানে এই দরিদ্রালয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ৬৩৫৲ আয় হইয়াছিল। দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষা অন্ধখঞ্জ অনাথ বিধবা প্রভৃতিকে সাহায্য দানে ও সংস্কৃত শিক্ষাদানে, এবং ইংরেজি শিক্ষা ও অন্য অন্য বিবিধ বিষয়ে মোট ৫২০৲ ব্যয় হইয়াছে। বাৎসরিক বিবরণ পাঠের পরে সভাপতি সভাস্থ ভদ্র লোকদিগের সহিত উক্ত দরিদ্রালয়ের আবশ্যকতা ও উপকারিতাবিষয়ে কথোপকথন করেন। পরে ধর্ম্মবিষয়ে মত ভেদ সত্ত্বেও এ সকল জনহিতকর কার্য্যে সকলের সহানুভূতি রক্ষা ও যোগ দান করা আবশ্যকতাবিষয়ে সৎপরামর্শ দান করিয়াছিলেন।

আরা হইতে ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"গাজীপুরের উৎসবান্তে কয় দিন সেখানে থাকিয়া ডোমরাঁও ব্রজেন্দ্রকুমার বসুর ৪র্থ পুত্রের নামকরণ করিয়া আসিলাম। নাম সত্যবিকাশ রাখা হইল। এখানে (মুনসেক) জ্ঞানের আহ্বানে আসিয়াছি, গত বুধবারে ও গত শুক্রবারে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও বিহারি হাকিম উকীল প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ উপাসনা হয়। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। সঙ্কটময় সংসারে ঈশ্বরই কেবল শান্তির জীবন্ত বিধাতা ও মাতা হইয়া পরিপালন করিতেছেন, এই বিষয়ে উপদেশ হয়। গতকল্য রবিবার নৃত্যগোপাল বাবুর গৃহে সামাজিক উপাসনা হয় ও জ্ঞানের পরিবারে নিত্য উপাসনা হইতেছে। আজ জ্ঞানের দ্বিতীয়পুত্রের নামকরণ হইবে। সপ্তাহকাল এখানে থাকিয়া পরে খাগোল হইয়া বাঁকিপুর যাইবার কথা। পুনশ্চ কল্য সন্ধ্যাকালে নিবারণবাবুর জামাই জ্ঞানের দ্বিতীয়পুত্রের নামকরণ হইল। অনেকগুলিন বাঙ্গালি ভদ্রলোক ও ২টী সম্ভ্রান্ত বিহারী উকীল উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ লোকই আহার করিলেন। পুত্রের নাম শ্রীমান্ অজেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত হইল। নিবারণ বাবু ও উপস্থিত ছিলেন। এখানে ৫। ৬টী ব্রাহ্মপরিবার যুটিয়াছেন।"

অদ্য রমানাথ মজুমদারের লেনস্থ ৩ নং ভবনে নববর্ষের ১ম দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

সামাজিক প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীরাম পুরস্থ মুনসেক বাবুর আহ্বানানুসারে তথায় যাইয়া বৎসরান্ত দিনে ও নববৎসরের প্রথম দিনে বিশেষ উপাসনা করিয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল মিত্রের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে তোজা বস্ত্র ও তৈজসপত্রাদি ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়ে নগদ দান হইয়াছে।

প্রচারভাণ্ডারে ...	২০৲
ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ...	৫৲
অমরাগড়ী সমাজে ...	৪৲
বালেশ্বর সমাজে ...	৪৲
ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ ...	৫৲
শান্তিপুর ঐ ...	৫৲
অনাথাশ্রমে ...	৪৲
মূক ও বধির বিদ্যালয়ে ...	৪৲
বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে ...	৫৲
বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধক ...	১০৲
দরিদ্র ব্রাহ্মপরিবারদিগের জন্য ...	৮৲
ভিক্ষুকদিগের জন্য ...	১০৲
District charitable society ...	৪৲
ভিক্টোরিয়া কলেজে রৌপ্যপদক ...	১টি
নিজগ্রামস্থ স্কুলে রৌপ্যপদক ...	১টি

নিজগ্রামে শবদাহের জন্য নদীতটে পাকা গৃহ নির্ম্মাণ।

বিজ্ঞাপন।

বহু সংখ্যক গ্রাহক হইতে গত বৎসরের ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য ও আমরা প্রাপ্ত হই নাই। সম্প্রতি মূল্য পাঠাইবার জন্য পত্র লেখা গিয়াছিল, দুঃখের বিষয় একজন গ্রাহকও অনুগ্রহ করিয়া মূল্য প্রেরণ করেন নাই। মাসান্তে বিশেষতঃ বাঙ্গালা বৎসরান্তে ছাপাখানার লোকদিগকে মহিয়ানা চুকাইয়া দিতে হয়, তদ্ভিন্ন ছাপাখানা সম্বন্ধীয় অনেক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। আমরা গ্রাহকদিগের দয়ার উপর আশা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

৩৩ ভাগ।
৭ সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷৹
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রভো, তুমি বিনা আমাদের আপনার বলিবার বল কে আছে? আপনার বলি তাহাকে যাহার সঙ্গে কোন কালে কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিবে না। তোমা বিনা, বল, আর কাহার সম্বন্ধে একথা বলিতে পারি? তুমি বলিবে, আমার সন্তানগণ কি তোর আপনার নয়? তুমি যখন বলিতেছ তাঁহারা আমাদের আপনার, তখন তাঁহারা আমাদের আপনার তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বল কয় জনকে আমারা তোমার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? আমরা তো তোমার সন্তানগণকে দেখি না, দেখি কেবল তাঁহাদের রক্ত মাংসের শরীর, সেই শরীরের প্রতি আমাদের মায়া মমতা ভালবাসা যাহা কিছু সকলই। ইহাতে দুঃখের অনেক কারণ আছে। শরীরাসক্ত ব্যক্তিগণের কি কোন কালে শান্তি হয়, না চিরস্থায়ী আত্মীয়তা জন্মে? কবে, হে দেব, আমরা তোমার সন্তানগণের আত্মাকে ভাল বাসিব, আত্মাকে ভাল বাসিয়া বিচ্ছেদের দুঃখ চিরদিনের জন্য অতিক্রম করিব? এ চক্ষু এ কর্ণ যত দিন আছে, তত দিন কিছুতেই আমরা আশা করিতে পারি না, আমরা তোমার সন্তানগণকে গ্রহণ করিতে পারিব। আমাদের চক্ষু সকলের মন্দদিক্‌টা দেখে, আমাদের কর্ণ সকলের মন্দদিক্‌টা শুনে। মন্দদিক্ দেখা শুনাতেই আমাদের আহ্লাদ, কেন না যতই আমরা উহা দেখি ও শুনি, ততই আমরা তেমন নই মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হই। বল, অগতির গতি, এরোগের কি ঔষধ আছে? সাধুগণ আপনাদের মন্দদিক্ অপরের ভালদিক্ দেখেন, আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত। যদিও বা তাঁহারা অপরের মন্দ দিক্ দেখেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হয়, অহঙ্কারে স্ফীত হয় না। কবে আমরা সাধুগণের হৃদয় লাভ করিয়া সেইরূপ হইব? তোমাকে এবং তোমার সন্তানগণকে আপনার জানিয়া আমরা সকল বিচ্ছেদ অতিক্রম করিব, এজন্য তুমি তোমার নবধর্ম্মের আশ্রয়ে আমাদিগকে আনিলে, কিন্তু দেখ আমরা আমাদের নিজদোষে সে আশ্রয়ের যে লাভ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আর যাহাতে আমাদের এ দুর্দ্দশা অধিক কাল না থাকে, তজ্জন্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, হে দেবাদিদেব, তুমি আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার কৃপাগুণে আমরা সেই দিব্য চক্ষু, দিব্য কর্ণ, দিব্য হৃদয় লাভ করিব, যাহাতে কেবলই ভাল দেখিব, ভাল শুনিব, পরের পাপ তাপে

কাতরহৃদয় হইব, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

সত্যস্বরূপের প্রভাব।

ঈশ্বরের স্বরূপের সহিত সম্বন্ধে জীবের স্থিতি ও উন্নতি। ঈশ্বরের স্বরূপের আশ্রয় বিনা জীব মুহূর্ত্ত কালের জন্ম জীবন ধারণ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভব বিনা স্বরূপের প্রভাব কখনই জীবনের উপরে বিস্তৃত হয় না। প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা কেন? স্বরূপের প্রভাব জীবনের উপরে কার্য্য করিবে তজ্জন্য। স্বরূপের প্রভাব জীবনের উপরে কার্য্য করিতেছে, কি লক্ষণে বুঝিতে পারা যায়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। সর্ব্ব প্রথম সত্যস্বরূপ, সেই স্বরূপের প্রভাবের বিষয় অদ্য সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

সত্যমূলক সমুদায় জীব, সমুদায় জগৎ, সমুদায় সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত। সত্য তিনি যিনি নিত্য কাল একই ভাবে থাকিয়া সকলের জন্ম, স্থিতি ও নিত্যোন্নতির কারণ হইতেছেন। অন্য কথায় বলিতে হয়, সত্য হইতে সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি। সত্য হইতে উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি সত্যের শক্তিমত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। সত্য ও শক্তি ফলতঃ অভিন্ন সামগ্রী। শক্তি না বলিয়া তবে সত্য বলি কেন? অবিকারিত্ব প্রদর্শন জন্য। সত্য হইতে সমুদায় হইতেছে অথচ সত্য যেমন তেমনই আছেন, তাঁহাতে হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই। তিনি এক অনন্ত বিদ্যমানতামাত্র। কেবল শক্তি বলিলে কি দোষ পড়ে? ক্রিয়া বিনা শক্তি শক্তিই নহে। ক্রিয়া বলিলেই ক্রিয়ার অবকাশ চাই, অফুরন্ত হইলেও আরম্ভ চাই। তুমি বলিবে, কেবল আরম্ভ কেন শেষও চাই, শেষ বিনা আরম্ভ কি কখন সম্ভবে? কেবল আরম্ভ বলিতেছি এই জন্য যে, যেখানে তুমি শেষ কল্পনা করিতেছ, সেখানে বাস্তবিক আরম্ভ, কেন না এ ক্রিয়া কখন ফুরাইবে না। অবকাশ ও আরম্ভ যদি শক্তির সম্বন্ধে প্রয়োজন হইল, তবে সে অবকাশ ও আরম্ভ কোথায়? সত্যস্বরূপের অনন্ত বক্ষের ভিতরে। তাঁহারই বক্ষের ভিতর অফুরন্ত অশেষ তরঙ্গ তুলিয়া শক্তি বিবিধ বিচিত্র কার্য্য প্রতিনিয়ত সম্পন্ন করিতেছে। তবে সত্য ও শক্তি কি ভিন্ন পদার্থ? না, শক্তি—সত্যব্যাপী শক্তি, সত্য ও শক্তি একই, তবে আমাদের চক্ষে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত।

সত্যস্বরূপের প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া এতগুলি অবান্তর কথা বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—বস্তু যথাযথ হৃদয়ঙ্গম না হইলে তৎপ্রভাব আমাদের জীবনের উপরে কখন কার্য্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাব নিয়ত আমাদের চক্ষুর সন্নিধানে জাগ্রৎ না থাকিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আমাদের জীবনের উপরে ঈশ্বরের যদি সমস্ত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে অগ্রসর হইবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এখন যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, আরও প্রকাশ পাইবে, এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহার নিকটে যাইব কেন? প্রার্থী হইব কেন? সত্যস্বরূপ যিনি তিনি যেমন তেমনি নিত্য আছেন, অথচ তাঁহার শক্তির ক্রমবিকাশ হইতেছে, এটি আমাদের নিশ্চয় জানা চাই। আজ আমার নিকট তাঁহার শক্তি যত প্রকাশ পাইল কল্য আরও প্রকাশ পাইবে। এইরূপে তাঁহার শক্তির স্রোতে ক্রমান্বয়ে ভাসিয়া অনন্ত উন্নতির পথে চলিব। আমি সত্যেতে—কিনা অনন্ত সত্তাতে মগ্ন হইলাম। সেই সত্তা আমার উপরে তাঁহার ক্রিয়া প্রকাশ করিলেন। তাঁহার প্রথম ক্রিয়া কি? প্রাণ মন হৃদয়কে স্তম্ভিত করা। স্তম্ভিত করিলে গতি স্থগিত হইল, উন্নতি কোথায়? উন্নতির আরম্ভ বিস্মিতি হইতে। বিস্মিতি হইতে উন্নতি, সে কি প্রকারের কথা? বিস্মিতি অদ্ভুতরসের প্রধান উপাদান, বিস্মিতি বিনা ঐশ্বর্য্যানুভবজনিত সুখ তুমি কি প্রকারে সম্ভোগ করিবে? বিস্মিতি বা বিস্ময় মহত্ত্বানুভব বিনা কখন হয় না।

প্রকাণ্ড সমুদ্র বা হিমালয়ের নিকটে দাঁড়াও স্বতঃ তুমি বিস্ময়রসে আপ্লুত হইবে! ইহাতে কি হইল? তোমার হৃদয় প্রাশস্ত্য লাভ করিল, ক্ষুদ্রতা চলিয়া গেল।

সত্যস্বরূপের প্রথম প্রভাব কি স্থির হইল? হৃদয়ের ক্ষুদ্রভাবের তিরোধান, মহত্ত্ব ও প্রাশস্ত্য-লাভ। তুমি প্রতিদিন সত্যস্বরূপের আরাধনা করিতেছ, অথচ তোমার হৃদয় যে ক্ষুদ্র সেই ক্ষুদ্রই রহিয়া যাইতেছে, অণুমাত্র প্রাশস্ত্য লাভ হইতেছে না। এ অবস্থায় বুঝিতেছি, তোমার সত্যস্বরূপের আরাধনা হইতেছে না। তুমি সেই অনন্ত সত্তায় জীবন মন প্রাণ সমর্পণ কর নাই, তুমি তোমার মনঃকল্পিত ক্ষুদ্র দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ। যখন তুমি সত্য-স্বরূপে প্রবিষ্ট হও বা আপনাকে প্রবিষ্ট অনুভব কর, তখন সমুদায় জগৎ ও জীব তোমার সহিত তাঁহাতে মিলিত হয়, এ অবস্থায় ভূতদ্বেষ, বা কাহাকেও পর বলিয়া জ্ঞান তোমাতে কি প্রকারে অবস্থান করিবে? সত্যস্বরূপের আরাধনা ঠিক হইতেছে কি না, তৎপ্রভাব তোমার জীবনের উপরে কার্য্য করিতেছে কি না, হৃদয়ের প্রাশস্ত্যলাভ ও অলাভ দ্বারা বুঝিয়া লও। এ প্রাশস্ত্যলাভে তোমার আপনার কোন গুণ নাই, জীবনের উপরে সত্য-স্বরূপের প্রভাব পড়িয়া উহা তোমাতে সংক্রামিত হইতেছে, ইহা জানিয়া তোমার আর এ সম্বন্ধে অভিমান উপস্থিত হইতে পারে না।

সত্যস্বরূপের দ্বিতীয় প্রভাব জীবনকে শক্তি-সম্পন্ন করা, তেজ, উদ্যম ও উৎসাহে পূর্ণ করা। সত্যস্বরূপের প্রথম প্রভাব যোগিগণের উপরে নিরন্তর কার্য্য করিয়াছে ইহার প্রমাণ আছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রভাবসম্বন্ধে প্রমাণ অতি বিরল। ব্রহ্ম সৎ, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু সকলই অসৎ, এ মতও সত্যস্বরূপের প্রথম প্রভাব অপনীত করিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই যে, যে সকলকে যোগিগণ অসৎ বলিতেছেন, সে সকলের সহিত সত্যস্বরূপের সম্বন্ধ তাঁহারা কোনরূপে উড়াইয়া দিতে সমর্থ নহেন। সতের বিদ্যমানতায় অসতের স্থিতি, ইহা না মানিলে অসৎ বলিয়া কোন পদার্থই হৃদয়ঙ্গম হয় না। অধিকন্তু সমুদায় অসতের মধ্যে যোগী স্বয়ংও অসৎ, সৎ একমাত্র ব্রহ্ম, সুতরাং আত্মবৎ সকল অসতের সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের প্রাশস্ত্য অপরিহার্য্য। যাহারা অসৎ তাহারা আপনাদিগকে অসৎ এবং একমাত্র ব্রহ্মকে সৎ জানিতেছে না, এজন্য তাঁহার করুণা উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু উপেক্ষা উপস্থিত হইতে পারে না, কেন না তিনি স্বয়ংও একসময়ে তাহাদের মত মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এখন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার মত তাহাদের জ্ঞানোদয় হয়, যোগী এই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ের প্রাশস্ত্য সাধন করে।

আমরা বলিয়াছি দ্বিতীয় প্রভাবসম্বন্ধে প্রমাণ অতি বিরল। বিরল কেন? এদেশে কি ভক্তির প্রধান্য নাই? আছে সত্য, কিন্তু তাহা স্বরূপান্তর অবলম্বন করিয়া উদিত, সুতরাং সত্যস্বরূপে তাহার সন্নিবেশ কি প্রকারে হইবে? যদি এদেশে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল হইল, তাহা হইলে অন্যদেশ হইতে কেন প্রমাণ সংগৃহীত হউক না? হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এসংগ্রহেতেও আপত্তি এই যে, ঈশ্বরের সহিত রাজা প্রভু পিতা প্রভৃতি সম্বন্ধ অনুভব হইতে এই প্রভাব যখন উৎপন্ন হইয়াছে, তখন উহা খাটি সত্যস্বরূপের প্রভাব কি প্রকারে নির্ণীত হইবে? যোগী ও ভক্ত এ উভয়ের সাধারণ ভূমি সত্যস্বরূপের সাধনা—বর্ত্তমান বিধান ইহা নির্দ্দেশ করিয়া এই অভাব পূরণ করিয়াছেন, কিন্তু সত্যস্বরূপে যোগী ও ভক্তের মিলনবশতঃ বর্ত্তমান সাধকদিগের জীবনের উপরে উক্ত স্বরূপের উভয়বিধ প্রভাব কত দূর পড়িয়াছে তাহার বিচার এখন হইবার নহে, পরবর্ত্তী সময়ে উহার বিচার হইবে। এখন কেবল সাধনের সাহার্য্যার্থ দ্বিতীয় প্রভাবের কার্য্য জীবনের উপরে কিরূপ হয় আমরা কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিতে যত্ন করিব।

সাধক সত্যস্বরূপে মগ্ন হইলেন। তিনি প্রথমতঃ এক নির্ব্বিকার সত্তা অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইলেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার নিদ্রিত শক্তি, উদ্যম, তেজ জাগ্রৎ হইল না। হইল না কেন জান ? এখনও সত্যস্বরূপ হইতে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি সাধকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। তুমি বলিবে, এরূপ অনুভূতি হইতে গেলেইতো তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধানুভব আসিয়া পড়িবে ? সম্বন্ধানুভব আসিলেই স্বরূপান্তরে প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সত্যস্বরূপ হইতে দ্বিতীয় প্রভাব গ্রহণ ঘটিতেছে না। সত্য বটে সত্যস্বরূপমধ্যে স্রষ্টৃত্বসম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহা তত পরিস্ফুট নয়, উহা জ্ঞানস্বরূপে প্রস্ফুট হইবার কথা এখানে কেবল শক্তিমাত্রেরই ক্রিয়াদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই সত্তা হইতে স্বয়ং সাধক ও জগৎ উৎপন্ন, ইহা অনুভূতি গোচর হইলে কেবল শক্তিমাত্রেরই প্রকাশ হইল। উৎপন্ন হইয়া স্থিতি কোথায় ? সেই সত্তাতেই। একবার উৎপত্তি হইয়া কি উৎপত্তির নিবৃত্তি হইল ? না, অবিচ্ছিন্ন উৎপত্তির ব্যাপার চলিতেছে। সাধকের জীবন ক্রমান্বয়ে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাতে আরোহণ করিতেছে, ইহা ক্রমিক উৎপত্তির ব্যাপার বা উন্নতি। এই উন্নতির ব্যাপার যত অনুভূত হইতে থাকে, তত আর সাধকের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। জীবনের ক্রমান্বয়ে এই গতিশীলতা উদ্যম, উৎসাহ, তেজ বলিয়া পরিচিত হয়। আমরা আর এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাই না, কেবল এই চাই যে, বর্ত্তমান সময়ের সাধকগণ আপনাদের জীবনে সত্যস্বরূপের দ্বিতীয় প্রভাবের ক্রিয়া সপ্রমাণ করুন।

নিকটস্থ ও দূরস্থ।

কে আমাদের নিকটস্থ, কে বা আমাদের দূরস্থ, ইহা নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। দেশ ও কালের বিচার দ্বারা নিকটস্থ ও দূরস্থ মনে করা যে, আত্মার সম্বন্ধে ভ্রান্তিসম্ভূত, ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। দেশ কালের সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ অনুভব করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, আত্মা দেশ কালের সহিত ততটুকু সংস্রব রাখিয়া থাকে। এক বস্তু অপর বস্তুর উপরে কত দূর ক্রিয়া প্রকাশ করিবে, তাহা দেশ কালের ব্যবধানের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু এক আত্মা অপর আত্মার উপরে কি প্রকারে ক্রিয়া প্রকাশ করিবে, তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিমেয় হইবার নহে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশ কালে আমাদের সন্নিহিত নন, কিন্তু আমাদের আত্মা যদি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়, তাঁহারা আমাদের আত্মার এত সন্নিহিত হন যে, এক ঘরে একত্র স্থিত ব্যক্তিগণও তত সন্নিহিত নন। তাঁহাদের মনের ভিতরে ভাবের ভিতরে আমরা এমনই প্রবেশ করি যে, তাঁহারা আমরা যেন একেবারে অভিন্ন হইয়া যাই। এ অবস্থায় তাঁহারা যেমন আত্মীয় ও পরিচিত, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আস্পদ, এমন আর কাহাকেও মনে হয় না।

ঋষিগণতো যে দেশে আমরা বাস করিতেছি সেই দেশে এক সময়ে বাস করিতেন। যাঁহারা বিদেশস্থ, বহুদিন হইল পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের ঘরের লোক হইয়া যান। ঈশা মুষা মোহম্মদ প্রভৃতি এ দেশের লোক নন, চিরকাল এদেশের লোক কর্ত্তৃক তাঁহারা ঘৃণিত নিন্দিত ও পরিত্যক্ত। আজ তাঁহাদের মত আমাদের আত্মীয় আর কে আছে ? এরূপ হইল কেন ? ভাবে সত্যে তাঁহাদের আত্মা সন্নিকর্ষ লাভ করিয়াছে এই জন্য। দেশ কাল তবে আত্মাকে দূরস্থ বা নিকটস্থ করিতে পারে না, ভাব ও সত্যের ঐক্যে বা অনৈক্যে আত্মা আত্মার নিকটস্থ বা দূরস্থ হয়। সাধারণ লোকে এ সত্য কখন অনুভব করিতে পারে না। কেন পারে না তাহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। তাহারা তো ভাবে সত্যে একতা চায় না, একতা চায় ভোগে। তোমার

যদি আমি বাহিরের চক্ষু দিয়া তোমায় না দেখিতে পাই আমার মনের তৃপ্তি হয় না, তুমি দূরে রহিয়াছ বলিয়া আমার মন অবসাদগ্রস্ত। এখানে কেবল ভোগের সম্বন্ধ। তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার প্রিয়সম্ভাষণ,তোমার গতিচেষ্টা, এই সকল আমার মনকে সুখী করে; তোমার আত্মার সহিত আমার আত্মার কোন খোঁজ নাই, সুতরাং দেশকালের ব্যবধান উপস্থিত হইলেই বিপদ্। বিচ্ছেদক্লেশ মানুষ আর কয় দিন সহ্য করিতে পারে? শীঘ্র শীঘ্র আর এক জনকে তোমার স্থলে বসাইব, তাহার অভাবে আর এক জনকে, ক্রমান্বয়ে এইরূপে আমার জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা চলিতে থাকিবে, নিবারণ করে কে? কিন্তু যদি আমি তোমার আত্মার প্রতি প্রীতি স্থাপন করি, কাল ও দেশ তোমার সহিত ব্যবধান ঘটাইতে পারে না, আমি নিত্যকাল তোমাতে প্রীত থাকিব।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে নিকটস্থতা ও দূরস্থতার বিষয় ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা কত প্রয়োজন। যদি তুমি আমার সর্ব্বাবস্থায় নিকটস্থ না হও, আমি তোমার প্রতি প্রীতি কখন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব না। অপরে আমার মন দুদিনের মধ্যে হরণ করিয়া লইবে, এবং আমি তোমায় চির দিনের জন্য ভুলিয়া যাইব। এরূপ সম্বন্ধের অনিত্যতা বড়ই ক্লেশকর, জীবনে পাপমালিন্যবর্দ্ধনের হেতু। তুমি যদি আমার চির দিনের না হইলে, আমি যদি তোমার চির-দিনের না হইলাম, তবে তুমি আমার প্রতি আমি তোমার প্রতি চিরবিশ্বস্ত থাকিব কেন? চক্ষুরাদির সম্ভোগ যদি তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের হেতু হয়, সে সম্ভোগ অন্যত্র আরও যদি অধিক হয়, তাহা হইলে তুমি আমায় আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না কেন? এইরূপে ছাড়িয়া দিতে গিয়াই পৃথিবীতে বহুবিধ পাপ প্রবেশ করিয়াছে। যদি বল, আত্মারওতো মুগ্ধকরত্ব-শক্তির তারতম্য আছে। আমা অপেক্ষা যে আত্মার মুগ্ধকরত্বশক্তি অধিক, তাহার প্রতি মুগ্ধ হইয়া তুমি আমায়তো ভুলিয়া যাইতে পার? দেহ অনিত্য, তৎসহ সম্বন্ধ অনিত্য, আত্মা সে প্রকার নহে। অনিত্যের সহিত সম্বন্ধ অনিত্য, নিত্যের সহিত সম্বন্ধ অনিত্য হইবে কি প্রকারে? তোমার আত্মার উপরে যখন প্রীতি স্থাপন করিয়াছি, তখন তুমি সর্ব্বদা সন্নিহিত, কাল বা দেশ তোমা হইতে আমায়তো ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সহস্র কোটী আত্মার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘটিলেও আমার তোমার আত্মার সহিত সম্বন্ধ কাটিয়া যাইবে কি প্রকারে? সকলেই যে আমারা পরমাত্মসূত্রে একত্র গ্রথিত। তোমার আত্মার প্রতি যদি আমার নিস্বার্থ প্রেম জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সকল আত্মার প্রতি ব্যাপ্ত হইবে। উহার ব্যাপ্তিতে উহার গাঢ়তা কমিবে না, আরও বাড়িবে। যেখানে আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ সেখানে ব্যভিচার বা বিশ্বাসঘাতকতার প্রবেশের সম্ভাবনা নাই। ও দুই দুরন্ত পাপ শরীর লইয়া উপস্থিত হয়, আত্মাকে লইয়া নহে। ধনাদির লোভ যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে ব্যভিচার বিশ্বাসঘাতকতা অবশ্যম্ভাবী। ধনাদির লোভ বিদ্যমান থাকিতে আত্মায় আত্মায় সন্নিকর্ষ হয় না, ধনাদি উহা-দের মধ্যে ব্যবধান ঘটায়, ইহা বুঝিলে আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ ঘটিলে আর যে তাহা বিলুপ্ত হয় না কেন, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

ধনাদির লোভ বিদ্যমান থাকিতে আত্মায় আত্মায় সন্নিকর্ষ হয় না, এই কথা বলাতে দূরস্থ কাহারা তাহাও নির্ণীত হইল। তুমি ও আমি একঘরে বাস করিয়াও দূরস্থ, যখন তোমাতে আমাতে সত্যে ও ভাবে মিল নাই। সত্যে ও ভাবে মিল নাই কেন? মিল নাই এই জন্য যে, আমাদের চিত্ত সত্য ও ভাবের উপরে স্থাপিত নহে, স্থাপিত অন্য কোন বিষয়ের উপরে। সে বিষয় ধনাদি ভোগসামগ্রী। ইহারা তোমার ও আমার মধ্যে ব্যবধান উপস্থিত করিয়াছে, সুতরাং

তুমি ও আমি এক ঘরে থাকিয়াও এক ঘরে নহি। ভাগবত ভালই বলিয়াছেন,

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।
একাঃ স্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্ব্বে হ্যরয়ঃ কৃতাঃ॥

"অর্থ এমনই অনর্থকর যে, একটী পয়সার জন্য ভাই, স্ত্রী, পিতা, সুহৃৎ, একপ্রাণ ও অতি প্রিয়গণের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় এবং সকলে শত্রু হইয়া যায়।" এসম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা প্রতিদিন প্রতিগৃহে নিত্যপ্রত্যক্ষ তাহা লইয়া বাক্যব্যয় করা নিষ্ফল। তবে দেখিয়া শুনিয়াও লোকের চৈতন্যোদয় হয় না, এ জন্য মধ্যে মধ্যে এ সকলের উল্লেখ আবশ্যক।'

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমরা সহজে বুঝিব বলিয়া যাহা অবিভক্ত এক, তাহাকে বিভক্ত ও স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাতে উপকার হয়, সময়ে সময়ে সুমহান্ অপকারও হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণা গ্রহণ করিতে পারি। ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণা অবিভক্ত এক, না বিভক্ত ও স্বতন্ত্র? কে বলিবে বিভক্ত ও স্বতন্ত্র? যদি বিভক্ত ও স্বতন্ত্র হয়, এ দুইয়ের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া ঈশ্বরকে চিরবিক্ষিপ্তমনা হইতে হইবে। অন্য কথায় তিনি আর ঈশ্বরপদের বাচ্য থাকিবেন না, সামঞ্জস্য সম্পাদনে অক্ষমতায় তিনি অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন।

ঈশ্বরকে এরূপে অনীশ্বর করিয়া তুলিলে পৃথিবীর মানুষ তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া ন্যায়। দণ্ড প্রাপ্য হইলে দণ্ড দেওয়া, পুরস্কার প্রাপ্য হইলে পুরস্কার দেওয়া, দুইই ন্যায়ের পক্ষে সমান। মা সন্তানকে দণ্ড পুরস্কার উভয়ই দিয়া থাকেন, কিন্তু সে দণ্ডপুরস্কারদানমধ্যে ন্যায় ও প্রেম এক অবিভক্ত সামগ্রী। তুমি বলিবে, মা কি আর সকল সময়ে ঠিক দণ্ড পুরস্কার দিয়া থাকেন? যদি ঠিক না হয়, উহা জ্ঞানের দোষ, ন্যায় ও প্রেমের একত্ব নাই বলিয়া নহে। ঈশার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর; দেখিবে সেখানে ন্যায় ও প্রেম কেমন সমঞ্জস ভাবে অবস্থিত। যখন তিনি পিটরকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর মূলভিত্তি করিলেন, আর যখন তিনি তাঁহাকে সয়তান বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, এই দুইয়ের মধ্যেই ন্যায় ও প্রেম এক অভিন্ন বস্তু, কেন না ন্যায়ের পূর্ণতা প্রেমে প্রদর্শন করা যাঁহার জীবনের কার্য্য তাঁহাতে ন্যায় ও প্রেম এক হয় নাই মনে করা আর তাঁহাকে অস্বীকার করা একই।

অবিভক্ত এক বস্তুকে বিভক্ত ও স্বতন্ত্র করিলে কি ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে, সম্প্রদায়বিশেষের মত চিন্তা করিলে তাহা সহজে প্রতীত হয়। ঈশ্বর পূর্ণ ন্যায়বান্। তিনি আপনার পূর্ণ ন্যায়ের সহিত পূর্ণ করুণার সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া এক অভূতপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। মনুষ্যজাতির তদ্বিরুদ্ধে পাপাচরণ অনন্ত দণ্ডের যোগ্য, কেন না অনন্তস্বরূপের বিরুদ্ধে, তাহার পাপাচরণ ঘটিয়াছে। এদিকে পূর্ণ করুণা পাপীর দুঃখে কাতর। সে কাতরতায় উত্তেজিত হইয়া তিনি আর কি করেন, নির্দ্দোষ মেষশিশুতুল্য আপনার পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া বলিলেন, যাও সন্তান পৃথিবীতে; মনুষ্যজাতির হইয়া তুমি আত্মবলিদান কর, তোমার শোণিতে আমার ন্যায় পরিতৃপ্ত হইবে, এবং আমার করুণার তাহাতে আবদার মিটিবে। করুণার আবদার মিটাইবার জন্য ন্যায়বান ঈশ্বর কি অন্যায় কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইলেন! দণ্ডযোগ্য পাপী দণ্ডিত হইল না, অদণ্ডযোগ্য নির্দ্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হইল। এ কি প্রকারের ন্যায়? আপনার ভিতরকার স্বরূপদ্বয়ের গণ্ডগোল মিটাইতে না পারিয়া ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা ন্যায়ের সন্তোষসাধন, ইহাকেই লোকে বলে গোঁজা মিলন। বস্তুতঃ ঈশ্বরের ন্যায় আগাগোড়া কেবলই প্রেম, অন্যথা এ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র কখন ক্রোধের উল্লেখ না করিয়া পুত্রের মুখ দিয়া এ কথা বলাইত না, "ঈশ্বর এ সংসারকে এমনই ভালবাসেন যে, আপনার একমাত্র আত্মজাত পুত্রকে দিলেন।" বস্তুতঃ এরূপ হইতে দেওয়া ন্যায় চরিতার্থতার জন্য নয়, ন্যায়ের পূর্ণতাসাধক প্রেমের আত্মোৎসর্গস্বভাবের জন্য।

স্বর্গগত শ্রীমান্ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে, আর একটি প্রিয় সন্তান আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রের জন্য মণ্ডলীর হৃদয়স্থ শোক আজও প্রশমিত হয় নাই, ইতোমধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা পরিণতবয়স্ক ভগ্নশরীর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রিয়পুত্র শ্রীমান্ মনোমোহনকে সংসারসম্বন্ধে হারাইলেন। পুত্রশোকে মাতা অধীরা; ভাই ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ সকলেই মর্ম্মাহত। মাতাপিতার শোক সর্ব্বথা গুণসাপেক্ষ না হইলেও, এখানে গুণাধিক্যে শোকাধিক্য হইয়াছে মানিতে হইবে। শ্রীমানের বয়স চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, ইহারই মধ্যে তিনি বি এ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থবর্ষের অধ্যয়ন শেষ করিয়া পঞ্চমবর্ষের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন; পঞ্চমবর্ষের অধ্যয়ন শেষ করিয়া এম এ উপাধি গ্রহণ করার সঙ্কল্প ছিল। মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষার নিয়ম নিতান্ত দৃঢ় হইয়াছে, অথচ ইনি প্রতিবৎসর গুণবত্তা সহকারে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বৃত্তি পাইয়াছেন, মেডাল পাইয়াছেন, এবার শস্ত্রবিদ্যা ও বিকারনির্ণায়ক শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন, এ কথা বলিয়া আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে চাই না, কেন না পরীক্ষার নিয়ম দৃঢ় হউক

বা না হউক, উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান ছিল। যখন তিনি বিবেকের অনুরোধ সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করিতেন, তখন সমুচিত পরিশ্রম বিনা পরীক্ষায় সম্মান অর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে কোন কালেই সম্ভব ছিল না। তাঁহার উজ্জ্বল বিবেকের কথা বলিতে গিয়া আমরা তাঁহার কোমলগুণসমূহের কথা কখন ভুলিব না। তিনি বন্ধুজনপ্রিয় ছিলেন। স্মিতপূর্ব্বক সম্ভাষণ তাঁহার পক্ষে এমনই স্বাভাবিক ছিল যে, তাঁহাতে কখন বিষাদ বা বিরক্তি স্থান পাইত কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ। মনোমোহন শান্ত অনুদ্ধত স্বভাব ছিলেন, কথায় ব্যবহারে সত্য অতিক্রম করিতেন না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই কেহ ব্রাহ্মণলক্ষণাক্রান্ত হয় না; একই কুলে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকল ভাবেরই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মনোমোহনের প্রশান্ত মূর্ত্তি আমরা যখনই দেখিতাম, তখনই ব্রাহ্মণতনয় ভিন্ন অন্য কোন ভাব আমাদের মনে উদিত হয় নাই। তাঁহার পরিচ্ছদাদি আড়ম্বরশূন্য, সামান্য ছিল। তাঁহার পিতা মাতা কখন বলিতে পারেন না, মনোমোহন কখন তাঁহাদের নিকটে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি চাহিয়াছেন। চাওয়া দূরের কথা, অভাব হইলেও কখন ঐ সকল চাহিতেন না, ছিন্ন বসন বা অঙ্গাবরণ-গুলিকেই ভদ্রোচিত ভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার জীবন বস্তুতঃ বৈরাগ্যপ্রধান ছিল। অসময়ে সংসারে প্রবেশসম্বন্ধে যদি তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিরোধী না হইত, তাহা হইলে পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়জনের অনুরোধ পালন করিতে গিয়া আজ আর একজনকে চিরদুঃখে বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হইত। পিতা ভগ্নদেহ অসমর্থ, তাঁহার তত্ত্বাবধানানুরোধে মনোমোহনকে অনেক সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়াও গৃহে থাকিতে হইত। তাঁহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি বাস্তবিকই প্রখর ছিল, অন্যথা মৃত্যু সম্মুখীন জানিয়াও কলেজ হাস্পিটালে তাঁহার তত্ত্বাবধানে যে সকল রোগী ছিল, সহাধ্যায়িগণের নিকটে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের তত্ত্ব কখন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন না। যত টুকু ভার তদপেক্ষা অধিক সময় তিনি রোগীদিগের জন্য ব্যয় করিতেন। যে রোগের কারণ হইতে মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব, উহা আগন্তুক; আত্মকর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া উৎপন্ন। মৃতশরীর পরীক্ষা জন্য ছেদ করিতে গিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ঈষৎ আঁচড় লাগে। এ আঁচড় তিনি বুঝিতেও পারেন নাই, কোন সংবাদও লন নাই। তৎপর যখন ঐ অঙ্গুলি স্ফীত হয়, তখন প্রোফেসর ডাক্তর বার্ড সাহেব শবের দূষিত বিষের প্রভাব বুঝিতে পারেন এবং ঐ স্থানে শস্ত্রপাত করেন। শনিবারে আঁচড় লাগে, মঙ্গলবারে শস্ত্রপাত হয়, বুধবার রজনীতে প্রবলবেগে জ্বর উপস্থিত হয়। তৎপর তিন দিন প্রবল জ্বরে তিনি শয্যাশায়ী থাকেন। ডাক্তর শ্রীযুক্ত প্রাণধন বসু, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এবং সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রাণগত যত্নে চিকিৎসা করেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মনোমোহনের একজন বন্ধু। শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুসমুচিত সুকোমল ব্যবহারে তিনি রোগের প্রতীকার জন্য যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছেন। দূষিত বিষের অনতিক্রমণীয় আক্রমণ অপ্রতিবিধেয়। সকল যত্ন বিফল হইল। রবিবার ২টা ১৪ মিনিটের সময় পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় বন্ধু সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মনোমোহন ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার রোগ অপ্রতিবিধেয়। বন্ধুগণকে তিনি পূর্ব্বেই একথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশান্তস্বভাব শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যখন মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত তখনও তিনি বন্ধুজনের সঙ্গীতে প্রযত্ন সহকারে যোগ দিয়াছিলেন। পৃথিবীর জননীর ক্রোড়শূন্য করিয়া পরমজননীর ক্রোড় তিনি আশ্রয় করিলেন। সেখানে তিনি সুখে বসতি করুন। পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয় বন্ধু সকলে অনন্তধামে তাঁহার সুখে বসতি স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করুন। এখানে তাঁহার যে সকল সদ্গুণ ছিল, সে সকল অবিনাশী; পরজগতে উহাদের সদ্ব্যবহারের বিশেষ অবকাশ আছে, ইহা জানিয়া তাঁহার গুণপক্ষপাতিগণ বীতশোক হউন।

মোগল সম্রাট্ আক্‌বরের সাধুভক্তি।

গত বারে আমরা ভারত সাম্রাজ্যের একাধিপতি জলালোদ্দিন মোহম্মদ আক্‌বরের আচরিত ধর্ম্মপ্রণালীর বিষয় বিবৃত করিয়াছি, এবার তাঁহার সাধুভক্তির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি জীবিত বা মৃত সাধু মহাজনদিগের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, অনেক সময় ছদ্মবেশে ফকির বা সন্ন্যাসীর বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া নগরের ও পল্লীর ইতস্ততঃ যোগী সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কোথাও সদাত্মা যোগী সন্ন্যাসী দর্শন করিতেপাইলে তাঁহাদের নিকটে ভক্তির সহিত উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রমুখাৎ ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন। সময়ে সময়ে মৃগয়ানুসরণচ্ছলে সম্রাট্ রাজধানী হইতে ছদ্মবেশে বাহির হইয়া প্রজারা কোথায় কে কি করিতেছে ও বলিতেছে, কোথায় যোগী ঋষি নির্জ্জন অরণ্যে সাধন ভজন করিতেছেন, সে সকল শুনিয়া ও দেখিয়া বেড়াইতেন। পরলোকগত বিশেষ বিশেষ সাধুর সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। এক দিন রজনীতে তিনি মৃগয়ানুসরণক্রমে রাজধানী আগ্রা হইতে ফতেপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। আগ্রা ও ফতেপুরের মধ্যে স্থলে মণ্ডানামক এক পল্লীগ্রাম আছে। সেই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কতক গুলি লোক মধুরস্বরে হিন্দিভাষায় সুপ্রসিদ্ধ মোসলমান সাধু খাজা মায়েনোদ্দিন চোস্তীর পবিত্র চরিত্র গান করিতেছে। তিনি স্থির ভাবে সমুৎসুক হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত তাহা শ্রবণ করিলেন। পরম সাধু খাজা মায়েনোদ্দিনের অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে সম্রাট্ শ্রবণ করিয়াছিলেন। খাজা বহুকাল পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন, আজমির নগরে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। সুমধুর সঙ্গীতে সেই

সাধুর সদ্‌গুণ ও মহত্ত্ব শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট্ আক্‌বর আজমিরে যাইয়া তাঁহার পবিত্র সমাধি দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এস্থলে খাজা মায়েনোদ্দিন চোস্‌তীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

খাজা মায়েনোদ্দিন সিস্তান নিবাসী ছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গরী বলা হইয়া থাকে। বোধ হয় সিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত সঙ্গর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তদীয় ধর্ম্মপরায়ণ পিতা খাজা হোসেন পরলোক প্রাপ্ত হন। তৎপর তাপসবর শেখ এব্রাহিম মজ্জুব কন্দোজী খাজা মায়নোদ্দিনের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শুভ দৃষ্টির প্রভাবে খাজার অন্তরে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইয়া উঠে। তিনি সমুদায় বৈষয়িক সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া সোমরকন্দে ও বোখারায় চলিয়া যান। তথায় কিছু ব্যবসায়ী বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া খোরাসানে আগমন করেন। খোরাসানেই বয়ঃপ্রাপ্ত হন। পরে নেশাপুরের অন্তর্গত হরুন গ্রামে তাপসপুঙ্গব শেখ ওস্মান হরুণীর নিকটে তিনি তাপসব্রতে দীক্ষিত হইয়া ২০ বৎসর তাঁহার সহবাসে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। অবশেষে খাজা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া শেখ নজমোদ্দিন কোব্‌রা প্রভৃতি অনেক সাধু মহাজনকে দর্শন করেন। চোস্‌তী পরিবারের অন্তর্গত সাধু মহাজনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তজ্জন্য তিনি মায়েনোদ্দিন চোস্‌তী বলিয়া আখ্যাত হন। চোস্তী পরিবারের পরম ধার্ম্মিক খাজা মওদুদ চোস্তীর সঙ্গে তাঁহার দুই পুরুষ এবং বল্‌খাধিপতি রাজ্যৈশ্বর্য্যত্যাগী পরম বৈরাগী তপস্বী এব্রাহিম আধাহমের সঙ্গে ৮পুরুষ ব্যবধান ছিল। গজনি হইতে সোল্‌তান মায়নোদ্দিন সামের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে খাজা মায়নোদ্দিন চোস্তী স্বীয় গুরুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন ভারতের অধিপতি পৃথ্বীরাও আজমিরে স্থিতি করিতেছিলেন, খাজাও তথায় যাইয়া অবস্থান করেন। খাজা মায়নোদ্দিন আজমিরে থাকিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, পার্থিব ভাবের সঙ্গে তাঁহার গুরুতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। খাজা কোতোবদ্দিন ও শামজ্ জানি হেজরি ৫২২ সালে রজব মাসে বগদাদ নগরে এমাম আবু লয়স সোমরকান্দীর মসজেদে সাধুশ্রেষ্ঠ শেখ শাহাবোদ্দিন সহরওর্দ্দী ও শেখ আওদদ্দিন কেরমাণী এবং অপর বহুসাধুর সাক্ষাতে খাজা মায়েনোদ্দিন হইতে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শেখ ফরিদ শকরগঞ্জ যাঁহার সমাধি পত্তন নামক স্থানে বিদ্যমান, তিনি উক্ত খাজা কোতোবোদ্দিনের শিষ্য ছিলেন। আমির খোস্‌রওরের ধর্ম্মাচার্য্য শেখ নেজাম আওলিয়া শেখ ফরিদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

খাজা মায়েনোদ্দিন সম্পর্কীণ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত লিখিয়া নিবৃত্ত থাকিতে হইল। আজমির নগরের একপ্রান্তে তাঁহার সমাধি আজও মহাসম্মানে সংরক্ষিত। নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রিক যাইয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। উহা পবিত্র তীর্থবিশেষ হইয়াছে। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য লোকে সেখানে মানত করে। বিশেষ বিশেষ রজনীতে সহস্র সহস্র দীপালোকে সমাধিক্ষেত্র আলোকিত হয়। খাজার সমাধির জন্য আজমির দ্বিতীয় মক্কাতীর্থস্বরূপ হইয়াছে।

সম্রাট্ আক্‌বর সঙ্গীতে খাজা মায়েনোদ্দিনের গুনানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমাধি দর্শনের জন্য ব্যাকুল অন্তরে আজমিরে চলিয়া যান। তিনি উক্ত সাধুপুঙ্গবের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থ সেখানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মযাজক ও দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে দান করিয়াছিলেন, এবং মনোভীষ্ট সিদ্ধি ও বিপৎসঙ্কট হইতে মুক্তির জন্য খাজার আশীর্ব্বাদও ভিক্ষা করিয়াছিলেন। একবার নয় অনেকবার সম্রাট্ আক্‌বর রাজধানী আগরা হইতে আজমিরে সমাধিবেদিকা দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিয়া বিনয় ও ভক্তি প্রদর্শনার্থ বহুক্রোশ পথ পদব্রজে গিয়াছেন।

ঈশা।

শুক্রবার ২৬এ চৈত্র ১৮১৯ শক।

শান্তি কুটীর—কলিকাতা।

(শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশের সারাংস)

মৃত্যুকালে ঈশা স্বীয় সহযাত্রিগণকে বলিয়া গেলেন, তোমরা অন্তরকে ব্যথিত করিও না, নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হইও না। পরমেশ্বরকে বিশ্বাস কর এবং আমাকে বিশ্বাস কর। আমার পিতার নিকেতনে অনেক ঘর আছে। আমি সেই গৃহে বাস করিতে এবং তোমাদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চলিলাম। আমি যেখানে বাস করিব তোমরাও যাহাতে সেখানে বাস করিতে পার তাহার উপায় করিব। ইহাও জানিও আমি চলিলাম বটে; কিন্তু আবার আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিব। পৃথিবী আমাকে দেখিতে পাইবে না কিন্তু তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবে। কেন না আমি পৃথিবীর নিকট আসিব না, আমি তোমাদের নিকট আসিব। এই রূপ অনেক কথা বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন, যাহাতে ভক্তাধীন হৃদয় উথলিয়া উঠে; অনন্তর ব্যথিতও হয় সান্ত্বনাও পায়। ঈশার যাহা অঙ্গীকার, তিনি তাহা পূর্ণ করিলেন। তিনি বিদায় হইলেন; কিন্তু আবার তাঁহার প্রিয়গণের নিকট আসিলেন। জগৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, তাঁহার প্রিয়গণ তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইলেন। তিনি সাকার নহেন, রক্তমাংসসংযুক্ত নহেন। বাহ্য ইন্দ্রিয়গোচর নহেন। কিন্তু আত্মা যেমন আত্মাকে দেখে, প্রেম যেরূপ প্রেমকে চেনে, বিশ্বাস যেমন বিশ্বাসকে পায়, আত্তগণ যেমন সহানুভূতির স্পর্শ বুঝিতে পারে, সেইরূপ আধ্যাত্ম যোগে প্রেম যোগে, বিশ্বাসের একতায়, আর্ত্ত ও পীড়িত জনের অন্তরে সান্ত্বনার সহানুভূতির যোগে, স্বর্গীয় উচ্চতর সম্বন্ধে স্বর্গারূঢ় আত্মা মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইলেন। ঈশা আসিলে আকাশে বজ্রধ্বনি হইবে, সূর্য্য চন্দ্র রক্তস্রাবী হইবে [illegible] এবং নানা

অসম্ভব ঘটনা ঘটিবে, দিগন্ত মহা আড়ম্বরে পূর্ণ হইবে, এই সমস্ত অসম্ভব কথা আমরা বিশ্বাস করি না। যাহারা এই কথা মানে ও বিশ্বাস করে করুক, আমাদের সঙ্গে তাহাদের এক ভাব হইবে না।

ঈশা আসিলেন, আমরা তাঁহার মত হইব, তাঁহার কাছে তাঁহার দলে নাম লিখাইব, তাঁহার মেষদলের একজন হইব, তাঁহাকে ভাল বাসিব, তাঁহার ভাল বাসা বুঝিব, তাঁহার বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া এই কুদৃষ্টান্তপূর্ণ পৃথিবীতে এমন সেতু এমন পথ পাইব, যাহার আশ্রয়ে অনায়াসে পিতালয়ে চলিয়া যাইতে পারিব। যাঁহার আলয়ে আমাদের জন্য ঘর আছে, আমরা ঈশার অনুগত হইয়া সেই পিতার ভবনে গমন করিব। আমাদের আবাসের নিভৃত গুহায় ঈশার শরীর নাই, তাঁহার কণ্টকে আবৃত কপাল, শূলে বিদ্ধ হস্ত, হাতুড়ীতে চূর্ণ পদদ্বয়, বড়শাতে আহত পঞ্জর, এই সমস্ত কিছুই নাই। এই বিস্ময়কর ও অতি হৃদয়বিদারকারী কথা স্মরণ করিয়া আজ লক্ষ লক্ষ নরনারী দুঃখের জলে আচ্ছন্ন। যাহাই হউক, আমরা আর সে সকল ভাবিতে পারি না। যদিও তাহা মনে আসে তথাপি তাহা অন্তর হইতে সরাইয়া দিয়া আবার বলি আত্মা যেরূপ আত্মাকে চিনে, বিশ্বাস যেরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে সহজে পরিচিত হয়, প্রেম যেরূপ প্রেমের জন্য কোল প্রসারণ করে, এবং আহত যেমন সান্ত্বনার অঞ্চল জড়িয়া ধরে, আর্ত্তগণ যেমন সহানুভূতির স্পর্শে প্রীতি লাভ করে, তেমনি সেই আধ্যাত্মযোগে প্রেমযোগে, সান্ত্বনা সহানুভূতির সঙ্গে মিলিত হইয়া আজ ঈশার সঙ্গে এক হইতেছি।

ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসের ঈশা মানিয়া থাকি। কেন না ইতিহাস ভগবানের লীলাভূমি, ইতিহাস পবিত্রাত্মার বেদী, ইতিহাস এই বিধানরাজ্যরক্ষাকারী বিশ্বরাজ্যের অটল সিংহাসন; ইতিহাস অবিশ্বাসিগণকে বিশ্বাসী করে, অন্বেষণকারীর পথের আলোক হয়। ইতিহাসে ইহা জানিতে পারি, যাহা সম্ভব ছিল, তাহা তোমার আমার পক্ষে সম্ভব আছে, যাহা অন্যের জীবনে সম্ভব হইয়াছে তাহা তোমার আমার জীবনে অসম্ভব নহে। মানুষ হইলে মানুষের পক্ষে পরমেশ্বর যাহা সম্ভাবিত করিয়াছেন ও যাহা সম্ভব করিবার জন্য তাঁহার অঙ্গীকার তাঁহার সাধু পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পাইবার এবং তাহা হইবার সকলের অধিকার ও সম্ভাবনা আছে। আমরা এই সমস্ত সম্ভাবনাকে চরিত্রে আনয়ন করিতে পারিলাম না, এই সমস্ত সম্ভাবনাকে জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ হইলাম না। যিনি এই মানুষে ঈশ্বরে একত্ব, সন্তানত্ব, নরনারীর সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি যোগে একত্ব, স্বর্গীয়তা ও অমরত্বের সম্ভাবনাকে জীবনে ও ইতিহাসে সপ্রমাণ করিয়া নিঃসন্দেহ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে কত ভক্তি করি, ভালবাসি, এমন আর কাহাকে ভাল বাসিব ও ভক্তি করিব?

এই সম্ভাবনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। মানুষে যে দেবত্বের সম্ভাবনা তাহাকে দুই অংশে বিভাগ করি। তাহার এক অংশ ঈশ্বরের সঙ্গে একতা। আমি আরাধনাতে বলিলাম, তাঁহার মন যাহা মানুষের মন তাহা হইলে, তাঁহার অভিপ্রায় যাহা মানুষ তাহার সঙ্গে একীভূত হইলে, মানুষ যোগ ভক্তিতে তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। এই অবস্থাতে সিংহাসনেই হউক আর ক্রুশের উপরেই হউক নির্ব্বিকার চিত্তে মঙ্গলময়ের বক্ষে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করা যায়। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ অনেক কথা বলিয়াছেন। আর এ বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় অংশ মানুষের সঙ্গে মানুষের একতা। ঈশার জীবনের এক অংশ সন্তানত্ব অথবা পিতার সঙ্গে একতা। অন্য অংশ সহানুভূতির পূর্ণতাযোগে যাবতীয় নরনারীর সঙ্গে একতা। ঈশা সমস্ত নরনারীর পাপ, তাপ, দুঃখ শোক নিজ জীবনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিষ্পাপ হইয়াও পাপীর যাতনা অনুভব করিলেন, স্বয়ং দুঃখ যাতনার অতীত হইয়া পরদুঃখ যাতনা বুঝিতে পারিলেন। তাই কথিত হইয়াছে যে, তিনি নিজ পুণ্যের বিনিময়ে জগতের পাপ গ্রহণ করিলেন, নিজ পবিত্র রক্তে জগতের পাপিগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। বাস্তবিক কথা এই, তিনি সহানুভূতিযোগে সকল নরনারীর সঙ্গে এমনিই একাকার হইয়াছিলেন যে, যত পাপী তাপীর জীবনের পাপ তাপের ভার সেই সহানুভূতিযোগে তিনি নিজে ভোগ করিতেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনে দেবত্বসম্ভাবনার দ্বিতীয় অংশ এইটী। মানুষ যে ছাঁচে ঢালা তাহাকে পরিষ্কৃত ও স্বচ্ছ করাকেই এই অংশ প্রমাণ করে। দুই হাজার বৎসর ঈশাকে ব্যাখ্যা করিতেছে। তিন বৎসরের ঈশাকে ১৮৯৭ বৎসর কত বড় করিল। স্রষ্টার দৃষ্টি এতই কালব্যাপী। আত্মার সম্ভাবিত বিষয় এতই গভীর? দুই হাজার বৎসরে ঈশার জীবনের ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে আমরা তাহা ঘুচাইতে পারি না, তাহার পবিত্রতা ও গভীরতা সম্যক্ অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু তথাপি কি মানুষের সঙ্গে মানুষের যে যোগ, মানুষের দেবত্বের সঙ্গে মানুষের দেবপ্রকৃতির যে একতা, তাহা কি ভিন্ন করা যায়? অন্তরে যে পরিমাণে দেবভাব আসে, সেই পরিমাণে দেবভাবাপন্ন মহাপুরুষগণকে চেনা যায় ও বুঝা যায়, এবং তাঁহাদের সঙ্গে এক হইয়া মুক্তিধামে অগ্রসর হওয়া যায়। আজ কোটী কোটী লোক ঈশার চরিত্রের উন্নতির অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু কেহ মনের সাধ অনুরূপ কৃতার্থতা পাইতেছে না, যদি তাঁহার জীবনের অনুরূপ জীবন লাভ করা অসম্ভব হইল, তবে তাঁহার সঙ্গে যোগ রহিল না। যদি এইরূপ আদর্শের অনুকরণ করিয়া তদনুরূপ চরিত্রলাভে বঞ্চিত হওয়া যায়, তবে ঈশা কেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত অগ্রজগণের সঙ্গে যোগ কেন কাটিয়া যায় না, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সম্বন্ধে কুসংস্কার এবং কল্পনা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। সম্বন্ধ কেবল সহানুভূতিতে। সহানুভূতি ব্যতিরেকে কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ সম্ভব নহে। ঈশার সঙ্গে সমস্ত জগতের যোগ হইল এই

জন্য যে, তিনি সমস্ত জগতের বিবিধ অবস্থার সঙ্গে সহানুভূতি দিতে পারিতেন। ঈশ্বরসন্তানত্ব একটী বস্তু, ইহা অখণ্ড বলিলেও বলা যায়। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এই সন্তানত্ব দেবভাব, দেবপ্রকৃতির যে অংশ তাহা একাকার অভিন্ন। এখানে যে সহানুভূতির যোগ তাহাও অবিচ্ছিন্ন।

যদি বল ঈশা ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। তবে ইহাতে কি বুঝায়? এই বুঝা যায় যে, ঈশ্বর মানুষের মত হইলেন। সমস্ত পিতাদিগের পিতৃত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম আপনি তোমার একাকিত্বের সঙ্গী হইলেন। এখানে আমি ও আমার পিতা এক ইহার অর্থ এই মাত্র বুঝা যায় যে, পুত্রের ইচ্ছা পিতার সঙ্গে অভিন্ন। পুত্র পিতার একান্ত আজ্ঞাধীন। এই প্রকার যোগে একত্ব ঈশ্বরে মানুষে এবং মানুষে মানুষে কোনটী অসম্ভব নহে।

ঈশা সহানুভূতি যোগে পাপীর পাপে আপনি দগ্ধ, দুঃখিনী মেরি মার্থার দুঃখে আপনি একান্ত অধীর। সমস্ত জগতের পাপ তার নিজ স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত। তখন ভালবাসাই বল, পরদুঃখে কাতরতা ও সহানুভূতিই বল, এই সকলের পূর্ণতা লইয়া ঈশা অবতীর্ণ—এই বিভিন্ন বিচূর্ণ যে আমরা আমাদের ভিতরও এই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মসন্তান বাস করিতেছেন। আর্ত্তগণ সহানুভূতিকে ও শোকার্ত্তগণ সান্ত্বনা লও, পাপীগণ পরিত্রাণ লও, এই কথা বহুকাল শুনিতেছি। ইহা কাহার কথা আমি বলিতে পারিলাম না। নাই বা জানিলাম, জ্ঞানেত লোক উদ্ধার হয় না, বিশ্বাসেই লোকের পরিত্রাণ। আজ এই ইতিহাসের প্রমাণ লইয়া, এই সহানুভূতির দৃষ্টান্ত লইয়া, মানুষে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে মানুষ এই মহাযোগে যোগী হইয়া ঈশার জীবনের মহত্ব অনুভব করি।

হে ব্রহ্মের স্নেহভাগিগণ, তোমরা নিজের জীবন হইতে ইহার সাক্ষ্যদান কর ও ইহা নিজ জীবনে সপ্রমাণ কর। আর অধিক কথা বলিব না। একটী কথা বলিয়া অদ্যকার বিষয় শেষ করি। এই যে ভালবাসা, আর্ত্তের জন্য আর্ত্ত হওয়া, পাপীর জন্য ব্যথিত হওয়া, মণ্ডলীর জন্য দিনে নিশীথে আর্ত্তনাদ করা, সহানুভূতিতে রোগীর সঙ্গে রোগী হওয়া, শোকগ্রস্তের সঙ্গে শোকে অভিভূত হওয়া, হে মণ্ডলীর ভাই ভগিনীগণ, যদি পার, এই ব্রত গ্রহণ কর; ঈশাকে গ্রহণ কর। যে পরের জন্য কাতর নহে, পরের দুঃখ অভাবে যাহার সহানুভূতি নাই, নরনারী নির্ব্বিশেষে যে প্রেম করিতে অসমর্থ, যে অন্যের বোঝা ঘাড়ে নিতে প্রস্তুত নহে, সে ভালবাসার আকর, প্রেমের পূর্ণ পাত্র, সহানুভূতির জলন্ত আদর্শ ঈশাকে কিরূপে গ্রহণ করিবে? দেখ এই জন্য ঈশাকে গ্রহণ করার ভাবের এত অভাব। বহি লিখা হইল, ছবি টানা হইল, শাস্ত্রের কত ব্যাখ্যা করা হইল, বড় বড় পাদ্রী আসিয়া কত মন্ত্র পাঠ করিলেন। কত বুঝাইলেন, বলিলেন আর্ত্তগণ সান্ত্বনা পাইবে, দুর্ব্বলগণ নিপীড়িত হইবে না, নরনারীর মধ্যে জাতিনির্ব্বিশেষে প্রেম বিস্তার করা হইবে, সকলকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভালবাসা হইবে। আর খ্রীষ্টিয়ান জগত বড় বড় কামানে, বন্দুকে, গোলা গুলিতে সকল শাস্ত্র সমর্থন করিলেন, সপ্রমাণ করিলেন। বড় পাদ্রী যাইয়া গির্জ্জাতে বাইবেল পাঠ করিলেন, এই প্রেমের ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি ও পরিণতি। এই ঈশাকে গ্রহণ করা শেষ হইল। যাহা হউক পরচর্চ্চাতে আর আবশ্যকতা নাই, এখন নিজ চর্চ্চা আলোচনা করি।

যাহাদের মা মরিয়া গিয়াছেন তাহাদের জন্য স্বর্গবাসিনী জননী প্রার্থনা করেন, পিতা স্বর্গে যাইয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন। আচার্য্যগণ ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণের জন্য মঙ্গল কামনা করেন। ঈশা স্বর্গবাসী হইয়া এখনও এই মর্ত্ত্যবাসিগণের জন্য পরিশ্রম ও প্রার্থনা করিতেছেন। আমার জন্য এবং সকলের জন্য তোমরা সেইরূপ প্রার্থনা কর। সন্তানের রোগ হইলে মা যেমন নিজে অভুক্ত থাকিয়া সন্তানের সেবা করেন, এই সমস্তকে ঈশ্বরের ভাব জানিয়া আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর। প্রেমের নিমন্ত্রণ ও প্রেম পরিবেশন কর, সত্যের জলছত্র দাও, চরিত্রের সুশীতল ছায়া দান কর। খ্রীষ্টানগণ যেমন পরস্পরকে ভাল বাসে তেমনি পরস্পরকে ভাল বাস। পরশ্রীতে কাতর হইও না, বরং সন্তুষ্ট হও। সহানুভূতিতে একাকার হও। পরমেশ্বরের সঙ্গে মানুষে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষে এক হইয়া যাও। পবিত্র প্রেম পূর্ণ এক প্রকাণ্ড পরিবার হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন কর।

হে অন্তরাত্মা, হে পরিত্রাতা, তুমি কি যথার্থই আমাদের জন্য দুঃখিত, আমাদের পাপের জন্য তুমি কি যথার্থই ব্যথিত? তবে আর আমরা কেন নিরাশ হইব? কেন অবিশ্বাস করিব? এবং পরস্পরের প্রতি অভিযোগ করিব? তোমার সঙ্গে এক করিবার জন্যই বুঝি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলে, এবং ঘর কন্না ভাঙ্গিয়া দিলে। হে পিতা, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর যেন পরস্পরে তোমার করুণা, তোমার সহানুভূতি গ্রহণ করিয়া আবার একাকার একপরিবার হই। মঙ্গলময়, যেমন সকল মানুষের সঙ্গে ঈশার একত্ব এবং ঈশার সঙ্গে তুমি একাকার, যেমন সকল বৈকুণ্ঠবাসীদিগের সঙ্গে তুমি একাকার, আমাদিগকে সেইরূপ কর। হে ভবভয়হারি, সকল দুঃখপাপের ভার লও; কেন না আমরা তোমার উপাসক। এই ক্লান্ত দেহ মন, এই আর্ত্ত প্রাণ আত্মা তোমাকে সমর্পণ করি, এবং যেমন পর্ব্বতে ঈশা, গুহাতে মোহম্মদ, নিরঞ্জনানদীতীরে শাক্য, নীলাচলে চৈতন্য তোমাতে আচ্ছন্ন, আমাদিগের আচার্য্য যেমন তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, আমরা সকলে তোমাতে আচ্ছন্ন ও তোমাতে তেমনি আত্ম সমর্পণ করিয়া আশা ভক্তির সহিত বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

ঝাঁটরা ব্রহ্মোৎসব।

৩০শে চৈত্র ১৩০৪ শক।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের উপদেশের সার)

প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও নববিধান।

হিন্দুগণ বলেন, রামায়ণ মহাভারত ও উপনিষৎ ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ কর, তোমার আর জ্ঞানলাভের অবশিষ্ট থাকিবে না, সকল তত্ত্বজ্ঞান এ সকল ধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ। কালী দুর্গা শিব প্রভৃতি দেবতাকে ঘটে, পটে বা প্রতিমায় পূজা কর, তুমি মুক্তি পাইবে, মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবে। গঙ্গা নদীতে মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান কর, পবিত্র হইবে, পাপ আর থাকিবে না। ইহলোকে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যায় না, মুর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে, সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্যবান্ হইলে স্বর্গে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে পাইবে। ইহুদী লোকেরা বলেন, মহাপ্রতাপান্বিত জিহোবা (ঈশ্বর) জগতের একাধিপতি, একমাত্র মুসা তাঁহাকে দূর হইতে তেজঃপুঞ্জরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন, বজ্রধ্বনিতে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইয়াছিলেন। সাধারণ লোকের সাধ্য নাই তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার কথা শ্রবণ করে। মুসার সময়ে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ জিহোবার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তোমার আমার সাধ্য কি তাঁহার নিকটে যাই। ধর্ম্মশাস্ত্র তওরাত অধ্যয়ন কর, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালন কর, শাস্ত্রের নিয়ম বিধি অনুসারে হোমাদি ক্রিয়াকলাপে রত থাক, পরলোকে তোমার সুখশান্তি হইবে। খ্রীষ্টানগণ বলেন, বাইবেল গ্রন্থই প্রত্যাদেশপূর্ণ অভ্রান্ত শাস্ত্র, তাহা পড়িলেই জ্ঞানের চরমসীমায় পহুঁছা যায়, অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িবার আর প্রয়োজন করে না, সে সকল ভ্রান্তি-জালে আচ্ছাদিত। মেরীর পুত্র ঈশাকে ঈশ্বর ও পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া জর্ডন জলে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও, তোমার পাপ ক্ষমা হইবে, তুমি স্বর্গে ঈশার সঙ্গে বাস করিতে পারিবে, অন্যথা অনন্ত নরকদণ্ড তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। মোসলমানগণ তেজের সহিত বলেন, কোরাণ একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র, উহা "কলামাল্লা" (ঈশ্বরের বাণী), অর্থ বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক উহা পাঠ করিলেই মহা পুণ্য। ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা অর্চ্চনা না করিলে নিস্তার নাই। হজরত মোহম্মদ সর্ব্বপ্রধান ও শেষ পেগাম্বর। ঈশ্বরবাণী একমাত্র কোরাণে নিঃশেষিত, প্রেরিতত্ব মহাপুরুষ মোহম্মদে পরিসমাপ্ত। কোরাণ গ্রন্থ ও প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে যাহারা মানে না, তাহারাই কাফের, তাহাদের জন্য অনন্ত নরকদণ্ড নির্দ্ধারিত। যাহারা মোসলমান তাহারা পাপী হইলে ও কেয়ামতে (পুনরুত্থানের দিনে) হজরত মোহম্মদের শফায়েতে (অনুরোধে) তাহাদের পাপ ক্ষমা হইবে; তাহারা স্বর্গে যাইবে। কাফেরগণ চিরকাল নরক যাতনা ভোগ করিবে। অতএব তুমি কোরাণের বিধি অনুসারে প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়, কোরাণ পাঠ কর, এবং হজরত মোহম্মদের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস রক্ষা কর। বৌদ্ধগণ আসিয়া বলেন, অন্য কিছুতেই তোমার কিছু হইবে না, তুমি বুদ্ধদেবের শরণাগত হও, বুদ্ধমুর্ত্তি পূজা কর, তাহাতে তোমার আত্মার কল্যাণ হইবে।

প্রাচীন সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছে। জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ও ঈশ্বরবাণী শ্রবণ তাঁহাদের মতে অসম্ভব। তাঁহারা ধর্ম্মের বাহ্য চিহ্ন ও বাহ্য ক্রিয়াকলাপ লইয়াই ব্যস্ত। বিধাতার প্রত্যক্ষ বিদ্যমানতা ও তাঁহার জীবন্ত লীলা ও বিধাতৃত্বে প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস না করিয়া মৃতপুস্তক ও মৃতমহাপুরুষকে ও পুস্তক লিখিত স্মরণাতীত ভূতকালের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঘটনা সকলকে সর্ব্বস্ব করিয়া বসিয়াছে। নিজেরা বিপথগামী হইয়াছে, অন্যকেও বিপথগামী করিয়া থাকে। তাহাদের ধর্ম্মের জীবন নাই, তাহারা ধর্ম্মের শব স্কন্ধে করিয়া বাড়ী বাড়ী দেশে দেশে ফেরি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। নিজেরা শ্মশানভূমিতে বাস করে অন্যকেও ডাকিয়া আনিয়া শ্মশানবাসী করে। জগতের এই ভয়ানক দুঃখ দুরবস্থা ও অন্ধকারের অবস্থা দেখিয়া মঙ্গলময় ঈশ্বর নবযুগধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। নববিধান বলেন, ব্যাকুল অন্তরে ঘোরপাপীও ডাকিলে ঈশ্বরের দর্শন পাইবে, প্রার্থনা করিলে উত্তর লাভ করিবে। তাঁহার শ্রীমুখের বাণীই জীবন্ত শাস্ত্র, তাঁহার দর্শনেই পরিত্রাণ। ভগবান্ নিষ্ক্রিয় হইয়া পুস্তকবিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের উপর জীবের পরিত্রাণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে সপ্তমস্বর্গে বসিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি অবতীর্ণ জীবন্ত জ্বলন্ত সাক্ষাৎ বিদ্যমান ঈশ্বর। তিনি দেখা দেন ও কথা কহেন, দিব্য চক্ষে ও দিব্য কর্ণে তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ হয়। তিনি অবিকৃত ও অপরিবর্ত্তনীয় অথচ নিত্য নূতন। তাঁহার অশব্দ বাণীই অভ্রান্ত সত্য। তিনি যে, দেখা দেন কথা কহেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি অনন্ত ন্যায়বান্ ও প্রেমময়। তুমি জীবন্ত জলন্ত ঈশ্বরকে বিদায় দান করিয়া কতকগুলি নির্জীব বাহ্য বস্তুর শরণাপন্ন হইয়া আছ, তুমি মধ্যবর্ত্তী ও ব্যবধান আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে স্থাপন করিতে চাও তোমাকে ধিক্। আত্মত্যাগ যোগ ভক্তিতে জীবাত্মার ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য স্থিতি হয়, তুমি কি তাহা অস্বীকার কর? তুমি কতক গুলি পুরাতন কথার চর্ব্বিত চর্ব্বন করিতেছ। ভগবানের মুখে নিত্য নূতন তত্ত্ব লাভ কর, জীবন্ত উপাসনাযোগে তাঁহার নিত্য নূতন রূপ দর্শন কর, ধারের পরিত্রাণ ছাড়িয়া ইহলোকে নগদ পরিত্রাণ লাভ কর। নিদ্রিত বা নির্জীব দেবতা দূরস্থ পরোক্ষ ঈশ্বরের সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর। নববিধানে জীবন্ত লীলাময় হরির জীবন্ত লীলা দেখ। সাধুকে ভক্তকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর, কিন্তু ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতে যাইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের তুল্য করিও না, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলকে মান্য করিতে গিয়া তাহার কুসংস্কার ও ভ্রান্তির অনুসরণ করিও না, সর্ব্বোপায়ে

অন্তরস্থ ঐশ্বরিক আলোককে সম্মান দান কর। জীবন্ত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নবজীবন লাভ কর। তুমি নিজে গলে কলসী বাঁধিয়া অগাধ জলে ডুবিবে আর অন্যকেও ডুবাইবে এ কেমন কথা? তোমাদের এক ২ সম্প্রদায় যে, মতভেদে শত ২ শাখা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন সম্প্রদায়ের মতকে সত্য বলিয়া মানিব?

সংবাদ।

হুগলির সিবিলসার্জ্জন লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত মহাশয় স্বীয় এক মাত্র পিতৃহীন শিশু পৌত্র শ্রীমান রঙ্গলাল হুগলিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তৎস্মরণার্থ তথায় ভাগীরথীর উপর একটি রমণীয় দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিগত ৬ই বৈশাখ রঙ্গলালের জন্মদিন ও উক্ত গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় মহাশয় তথায় গিয়াছিলেন। ডাক্তার মহাশয় সেই দিন নগরের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে মহাভোজ দিয়াছিলেন।

উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস রায়, শ্রীমান্ মনোমোহন দে হাজারিবাগের ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

স্বর্গগত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশার্থ শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন গত রবিবার যুবক ছাত্রদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার ছাত্রনিবাসে বিশেষ উপাসনাদি করিয়াছেন। মনোমোহনের বন্ধু মেডিকলকলেজ ও প্রেসিডেন্সিকলেজ ইত্যাদির ৩০।৪০ জন ছাত্র তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। সপ্তাহকাল অনেক শোকার্ত্ত বন্ধু শোকচিহ্ন ধারণ ও সংযমনাদি করিয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত প্রতিদিন এক ২ জন প্রচারক যাইয়া মনোমোহনের পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতিকে লইয়া বিশেষ উপাসনা করিতেছেন।

আমরা আহ্লাদিত যে, হুগলি কলেজের অধ্যাপক নববিধান বিশ্বাসী শ্রীমান্ মোহিত লাল সেন এম এ দুই বৎসর কাল ধর্ম্ম-শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য মার্কেটরের একেশ্বরবাদীদিগের বৃত্তি পাইয়া শীঘ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন। উক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত শ্রীমান্ প্রমথনাথ সেন, এপর্য্যন্ত ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। তিনি শীঘ্রই তথা হইতে আসিয়া মাতৃভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হইবেন।

২রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার হাজারীবাগের জেল রিফরমেটারী সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ ঘোষের পৌত্রীর শুভনামকরণানুষ্ঠান তাঁহার বাসগৃহে সম্পন্ন হয়। উপাধ্যায় পৌত্রীর নাম চারুবালা রাখিয়াছেন। অনেক গুলি স্থানীয় ভদ্রলোকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। দয়াময়ী জননী এই নবকুমারীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সম্প্রতি কলিকাতাতে বিয়ুবনিক মহামারীর সূচনা হইয়াছে। শ্রুত হইল ১০। ১২ জন লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নগররক্ষার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন। যে যে বাড়ীতে এই রোগ প্রকাশ পাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট সেই বাড়ীর গৃহ ও গৃহস্থিত দ্রব্যজাত দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন, রোগ যাহাতে নগরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া না পড়ে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। নগরের এক প্রান্তস্থিত মাণিকতলায় এক চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, উক্ত রোগাক্রান্ত সাধারণ রোগীদিগকে সেস্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কোন ব্রাহ্ম বিশেষতঃ ব্রাহ্মিকা বিয়ুবনিক রোগে আক্রান্ত হইলে সেখানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসিত হইতে পারিবেন। গবর্ণ-মেণ্টের ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মগণ সেই চিকিৎসালয়ের সমুদায় ভার গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে পারিবারিক সম্ভ্রম রক্ষা পাইবে, এবং সুপ্রণালী মতে চিকিৎসা শুশ্রূষাদি হইতে পারিবে। তিন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ২ লোকদিগের এবিষয়ে অবিলম্বে বিশেষ মনোযোগ বিধান করা কর্ত্তব্য। বহু নরনারী ভীত ও চিন্তিত হইয়া কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছেন। এত ভয়ের কোন কারণ নাই। এই সময়ে এখানে মহামারীর তত প্রকোপ না হওয়ারই সম্ভাবনা। ঈশ্বরমাত্র সহায়।

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক ১৭ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
১ সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দুঃখিজনের দুঃখহরণ, তুমি থাকিতে সংসারে কেহ কি দুঃখী থাকিতে পারে? মানুষ যখন দুঃখের আঘাতে অবসন্ন হয়, তখন সে মনে করে, তাহার আর সে দুঃখের অবসান হইবার নহে, কিন্তু অল্প দিন যাইতে না যাইতে সে দুঃখের আর কোন চিহ্ন থাকে না; আবার যে সুখের অবস্থা সেই সুখের অবস্থা ফিরিয়া আইসে। মানুষের প্রকৃতির ভিতরে সুখের স্পৃহা, বাহিরে উহার বিশিষ্ট আয়োজন আছে, সে দুঃখী থাকিবে কি প্রকারে? দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ, এই যে পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখের সমাগম ইহার ভিতরে তোমার দুঃখহরণ মূর্ত্তি নিয়ত প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু ইহাতে তো চিরদিনের জন্য দুঃখহরণ হইল না। তুমি চাও জীবের দুঃখ না থাকে, সে নিয়ত সুখে সংসারে বিচরণ করে, তাহাতো ইহাতে হইল না। প্রকৃতির নিয়মে সুখদুঃখের যে আগম ও অপগম হয়, তাহাতেতো জীব সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার হাত দেখিতে পায় না। অনিবার্য্য নিয়ম অনুভব করিয়া কি হৃদয় কৃতার্থ হয়? তুমি সন্তানদিগকে দুঃখী হইতে দিতেছ না, ইহা যদি প্রত্যক্ষ না করিলাম, তাহা হইলে পিতা মাতার সস্নেহ দৃষ্টির নিম্নে থাকিয়া যে চিত্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহা হইল কোথায়? আমরা বুঝিয়াছি, তোমার প্রসন্ন মুখ না দেখিলে দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ আসিবে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভব কখনই হইবে না। তোমার সঙ্গে যোগ না থাকিলে দুঃখের অবকাশ থাকিয়া গেল, এ অবস্থায় চির শান্তির আশা কোথায়? হে সুখের অনন্ত প্রস্রবণ, যদি জীব তোমার সঙ্গে নিয়ত বাস করে, তাহা হইলে সে দুঃখী হইবে কি প্রকারে? তোমার সাধু সজ্জন সন্তানদিগের সঙ্গে তোমার নিরবচ্ছিন্ন বাস, এজন্য পৃথিবী তাঁহাদিগের প্রতি শত অত্যাচার করিয়াও তাঁহাদিগকে দুঃখী করিতে পারে নাই। শুনিতে পাই, তোমার সন্তান ঈশা নিয়ত দুঃখভারগ্রস্ত ছিলেন। সে দুঃখ তাঁহার নিজের জন্য, না পরের জন্য? পরের জন্য দুঃখ হইলেতো অন্তরের শান্তি কোন কালে যায় না; বরং শান্তি আরও গভীর হইতে গভীর হয়। তুমি যেমন নিজের জন্য ভাব না সকলই তোমার পরের জন্য, সেইরূপ তোমার সন্তানেরা নিজের জন্য ভাবেন না চিন্তা করেন না, তাঁহাদের সকল যত্ন চেষ্টা পরের জন্য। যাহাদের নিজের অন্তরে শান্তি নাই, তাহারা কি কখন অপরের জন্য ক্লেশানুভব করিবার অবকাশ পায়, না সে ক্লেশ স্থায়ী হয়?

হে দেবাদিদেব, আমরা যদি নিজের জন্য দুঃখী না হইয়া পরের জন্য দুঃখী হই, তাহা হইলে কৃতার্থতা মনে করি, কিন্তু কৈ আজও সে অবস্থাতো আমাদের হইল না? আমরা যে এখনও আমাদের নিজের বিষয় লইয়া ব্যস্ত। যদি তুমি আমাদের দুঃখ হরণ করিবে, তাহা হইলে আমাদের নিজের জন্য নিজের দুঃখানুভব হরণ কর, পরের দুঃখে আমাদিগকে দুঃখী কর। হে কৃপাসিন্ধু, যত দিন নিজ দুঃখে দুঃখী থাকিব, পর দুঃখে দুঃখী হইব না, তত দিনতো আমাদের পরিত্রাণ নাই। তাই পরিত্রাণার্থী হইয়া তব পাদপদ্মে ভিক্ষা করিতেছি, আমরা যেন সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর হই, তোমাতে মগ্ন থাকিয়া আত্মসম্বন্ধে সমুদায় ভুলিয়া যাই। তোমার কৃপায় আমাদের এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে, আশা করিয়া তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

জ্ঞানস্বরূপের প্রভাব।

ঈশ্বর আছেন, একথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শক্তি আমাদের হৃদয়ে সহজে প্রতিভাত হয়। শক্তিমত্তা বিনা ঈশ্বর ঈশ্বর হইবেন কি প্রকারে? তাঁহার শক্তি পরিমিত হইলেও চলে না, কেন না যেখানে গিয়া তাঁহার শক্তির শেষ হইল, সেখানে তিনি অনীশ্বর হইয়া গেলেন। যিনি এইরূপে অনীশ্বর হন, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিব কি প্রকারে? ঈশ্বর তিনি যাঁহার কোন স্থলে কোন কালে অনীশ্বর হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের শক্তি বিবিধ বস্তু কেবল সৃজন করিতেছেন তাহা নহে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে এমনই ভাবে নিবদ্ধ করিতেছেন যে, সে সম্বন্ধের কেবল অন্যথা হয় না তাহা নহে, সে সম্বন্ধ বিনা তাহাদের নিত্যোন্নতির কোনই সম্ভাবনা নাই। ঈদৃশ সম্বন্ধনিবন্ধনের মধ্যে কি প্রকাশ পায়? জ্ঞান। যে সকল পদার্থ বিবিধ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছে, তাহারা কি কখন এ জ্ঞানের সংবাদ লয়? চন্দ্র সূর্য্যাদি পদার্থমাত্রেইতো পরস্পর অখণ্ড সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহারা কি সম্বন্ধ বুঝিয়া চলে? কখনই নয়। জ্ঞানই শক্তি অনুভব করে, জ্ঞানই জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকে, জ্ঞান বিনা অর্থযুক্ত হইয়াও সকলেই অর্থশূন্য। জ্ঞানের অস্তিত্ব অন্তরে, জ্ঞানের অস্তিত্ব বাহিরে, জ্ঞান সর্ব্বত্র জ্ঞানের ক্রিয়া অবলোকন করে। আমাদের শক্তি থাকিয়া যদি জ্ঞান না থাকিত, আমরা আমাদের নিজ শক্তি বুঝিতে সমর্থ হইতাম না, বাহিরের শক্তিও আমাদের বোধের বিষয় হইত না, এজন্য বেদান্তবাদিগণ সত্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ গ্রহণ করেন, এমন কি চিৎসত্তাকেই সত্য বলেন।

আমাদের জ্ঞান যখন সর্ব্বত্র জ্ঞানের ক্রিয়া অনুভব করিতেছে, তখনই কি আমাদের উপরে জ্ঞানস্বরূপের প্রভাব বিস্তৃত হইল? না। এরূপ দার্শনিক ভাবে জ্ঞানানুভব করিয়া জ্ঞানস্বরূপের প্রভাব জীবনে উপলব্ধি করা কখন সম্ভবপর নহে। সত্যস্বরূপে যে শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে, উহার ক্রিয়া জীবনে যত প্রকাশ পায় তত উহার প্রভাবে জীবন ভাবান্তরিত হয়, জ্ঞানস্বরূপেও এইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ অনুভূত না হইলে তাহার প্রভাব আমাদের জীবনের উপরে পড়িবে কি প্রকারে? জ্যোতি ও আলোক নামে জ্ঞান অভিহিত হইয়া থাকে। আলোক অন্ধকার হরণ করে, নিগূঢ় বস্তু প্রকাশ করে। আমাদের অন্তরে যাহা কিছু প্রচ্ছন্ন আছে, নিগূঢ় আছে, তাহা আমরা নিজে প্রকাশ করিতে পারি না, সুতরাং তাহার কোন সংবাদও লই না, কিন্তু অন্তরে যদি আলোক নিপতিত হয়, অন্ধকারের যবনিকা অন্তরিত হইয়া যায়, এবং আমার সেখানে কি আছে দেখিতে পাই, তাহা হইলে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মনের অবস্থা দর্শন করিয়া ভীত হই, স্তম্ভিত হই। এত দিন আমাদিগকে আমরা যাহা মনে করিতেছিলাম আমরা তাহা নই, এই প্রথম জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদিগেতে উপস্থিত হয়। জ্ঞানস্বরূপের আলোকে একবার আপনার অবস্থা বুঝিয়া

লইলে জীবন নূতন পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আলোকের সহিত ক্রমিক সম্বন্ধে অসত্য, পাপ সংশয় তিরোহিত হইতে থাকে; সুতরাং সাধকের জীবনের উপরে যে জ্ঞানস্বরূপের প্রভাব নিপতিত হইয়াছে, তাহা আর অবিদিত থাকে না।

অন্তরে আলোকপ্রবেশ করিয়া অন্তরের অন্ধকার হরণ, তত্রত্য নিগূঢ় অবস্থা সমুদায়ের প্রকাশ, এইটি জ্ঞানস্বরূপের প্রথম প্রভাব। দ্বিতীয় প্রভাব অসত্য পাপ সংশয়ের তিরোধান। আলোকের নিকটে অন্ধকার কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। আমাদের হৃদয়ের কবাট বদ্ধ করিয়া এত দিন আলোক প্রবেশ করিতে দিই নাই, অথবা আলোকের সঞ্চার চিরদিন থাকিলেও অন্তশ্চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা গ্রহণ করি নাই। এখন সে কুমতি তিরোহিত হইয়াছে, আলোকলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। জ্ঞানস্বরূপের নিগূঢ় ক্রিয়াতে এই আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি, ইহা আমরা একটু অগ্রসর হইলে তবে বুঝিতে পারি। সে কথা যাউক, আলোকের প্রকাশে অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন নব নব অসত্য পাপ সংশয় প্রকাশ পাইতে দেখিয়া সাধক অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার অসত্য পাপ ও সংশয়ের সহিত সম্বন্ধের শেষ নাই। এক দিকে জ্ঞান অন্য দিকে অজ্ঞান, এক দিকে আলোক অন্য দিকে অন্ধকার ক্রমান্বয়েই প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে অনন্ত নরকতো সত্য হইল! সাধকের চিত্তের এ সংশয় নিবারণ হওয়া সমুচিত। তন্নিরসনের জন্য আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি।

জ্ঞান অনন্ত। জীবের জ্ঞানোপার্জ্জনে কোন দিন বিরতি হইবার নহে। যেখানে অভাব নাই, সেখানে উপার্জ্জন কখন সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর পূর্ণ জ্ঞান, তাঁহার জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয় না। আমরা অপূর্ণ জ্ঞান, আমাদের নিকটে অনন্ত জ্ঞান ক্রমিক আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার জ্ঞান কোন কালে ফুরাইবে না, আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনও কোন কালে ফুরাইবার নহে। আমাদের জ্ঞান যত বাড়িবে, তত আমরা দেখিব যে, আমাদের আরও জানিবার কত অবশিষ্ট আছে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতাবোধ এই জন্য প্রতিদিন ঘনীভূত হইতে থাকে। জ্ঞান আলোক, অজ্ঞান অন্ধকার। জ্ঞানের প্রকাশে গুহানিহিত অন্ধকার আরও ঘনীভূত বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ণজ্ঞান ঈশ্বরের সহিত অন্ধকারের কোন সংস্রব নাই। অপূর্ণজ্ঞান জীবের গুহানিহিত অন্ধকার আলোকের প্রকাশে যত তিরোহিত হইতে থাকে, তত সেই গুহার অন্যতম প্রদেশে অবস্থিত অন্ধকার ঘন বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপে গুহানিহিত অন্ধকার ক্রমান্বয়ে আলোক প্রকাশে অন্তর্হিত হইতে থাকে। আলোক প্রকাশ ও অন্ধকারের তিরোধান কোন কালে নিঃশেষ হয় না।

এখন প্রশ্ন এই, অসত্য পাপ সংশয়, এ সমুদায় অজ্ঞানতামূলক অন্ধকারের সন্ততি। যদি অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াও আবার অন্ধকারের স্থিতি অন্তরের অন্যতম দেশে সম্ভবপর হইল, তাহা হইলে, নিত্যকাল অন্ধতামিস্রে বাসই জীবসম্বন্ধে সত্য হইল। না তাহা হইল না। অসত্য, পাপ ও সংশয় অলোকের সহিত সংস্রবের পূর্ব্বে যে স্বভাবের ছিল, আলোকের সহিত সংস্রবের পর আর সে স্বভাবের নাই। পূর্ব্বে বিরোধী ভাব ছিল, এখন আর সে বিরোধী ভাব কোথায়? যে বিষয়ের জ্ঞান এখনও লাভ হয় নাই, সেই জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন উপস্থিত। ইহাতে যত ক্ষণ সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই তত ক্ষণ পূর্ব্বে যে সত্যের আভাস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অখণ্ড সত্য নহে বলিয়া অসত্যসংস্কৃত। আলোকের সহিত সংস্রবের পূর্ব্বে যাহা যাহা নয়, তাহাকে ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া মূঢ়তা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই মূঢ়তার অপনয়নে কোন যত্ন ছিল না। এখন আর সে ভাব নাই। এখন যাহা সত্যাভাস তাহা সত্যাভাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াই তন্নির-

সনে যত্ন উপস্থিত। আলোকসংস্রবের পর পাপ তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছে, পাপের ভিতরে যে ঘোর বিরোধী ভাব ছিল এখন আর তাহা নাই। আলোকের সহিত নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছেদ পূর্ব্বে ছিল, এখন আলোকদর্শনে একটু অসাবধানতা উপস্থিত হইলেই ঘোর পাপ বলিয়া মনে ক্লেশ উপস্থিত হয়। সংশয় পূর্ব্বে অতি মারাত্মক ছিল। কিছুই জানা যায় না, কিছুই বুঝা যায় না, অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব অন্বেষণ নিষ্ফল, এরূপ সংশয় মৃত্যুর হেতু। এখন আর উহার স্বভাব সেরূপ নাই। এখন সংশয় নূতন আলোকলাভের সোপানমাত্র। সত্যাভাসে চিত্ত যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিত, তাহা হইলে অসত্যসংস্রব বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সত্যাভাসের প্রতি সংশয় অবস্থান করাতেই সত্যলাভের জন্য আলোকলাভের জন্য চির দিন ব্যগ্রতা সমানভাবে অবস্থান করে।

অসত্য পাপ ও সংশয়ের সহিত সংস্রব দিন দিন কি প্রকার রূপান্তর ধারণ করে সেই কথা বলিতে গিয়া আমরা প্রস্তুত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রস্তুত বিষয়সম্বন্ধে গুটী কয়েক কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি। জ্ঞানস্বরূপ যত দিন দার্শনিক আলোচনার বিষয় থাকেন, তত দিন জীবনের উপরে উহার সুস্পষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায় না, কিন্তু নিগূঢ় ভাবে অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে। আলোক প্রকাশের পূর্ব্বে অন্ধকার গাঢ় থাকে, যত আলোক প্রবিষ্ট হইতে থাকে তত অন্ধকার বিরল হইয়া আইসে, পরিশেষে আলোকে সমুদায় দিক্ আলোকিত হইয়া পড়ে। সত্যস্বরূপের প্রভাববিস্তারকালে নিগূঢ় ভাবে অন্তরে আলোক প্রবিষ্ট হইয়া অন্ধকার বিরল করিয়া দিয়াছে, এখন আলোক প্রকাশের সময় উপস্থিত, তাই সাধকের জ্ঞানস্বরূপে প্রবেশ ঘটিয়াছে। আলো আন্ধারে বস্তু একটু একটু দেখা যায়, ভাল করিয়া চিনিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে স্রষ্টৃত্বসম্বন্ধ আলো আন্ধারে অনুভূত হইয়াছে, জ্ঞানালোকে তাহা নিতান্ত পরিস্ফুট হইল। ঈশ্বরের সহিত, জগতের সহিত, আত্মার সহিত সম্বন্ধ যখন জ্ঞানালোকে পরিস্ফুট হইল, তখন স্রষ্টৃত্ব সৃষ্টত্ব সম্বন্ধ অপরিস্ফুট রহিবে কি প্রকারে? অন্যান্য স্বরূপে যে সকল বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইবার কথা জ্ঞানস্বরূপে তাহার কিছু কিছু প্রতিভাত হইল বটে, কিন্তু পরিস্ফুটাকার ধারণ করিল না। এস্বরূপে অন্তরের অবস্থাপরিজ্ঞান এবং অসত্য পাপ ও সংশয়ের ক্রমে তিরোধান হয়, ইহাই প্রধান।

মানব মানবীর প্রতি আদর কেন?

যাঁহারা ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা একমাত্র ব্রহ্মকেই লইয়া থাকিবেন, মানব ও মানবীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কি? প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ মানব ও মানবীকে মায়িক ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন করিয়াছেন, যিনি যে পরিমাণে মানবীয় সম্বন্ধ উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; কি জানি বা মোহ উপস্থিত এই ভয়ে তাঁহারা জনসঙ্গ দূরে পরিহার করিয়াছেন। এ কি এক অদ্ভুত ধর্ম্ম এবার জগতে আসিয়াছে যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরিত পন্থা বিপর্য্যস্ত করিয়া বিপরীত পথে লোকদিগকে বিচরণ করিতে উপদেশ দিতেছে। এ উপদেশ শুনিয়া চলিলে মৃত্যু না নবজীবন ইহা আলোচ্য বিষয়।

হে মানব, হে মানবী, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমরা কোনবংশপ্রসূত? তোমাদের লক্ষ্য কি? তোমাদের জীবনই বা কি? তোমরা কি লইয়া ব্যস্ত? এ সকল প্রশ্নের উত্তর তোমাদিগকে যথাযথ দিতে হইতেছে। বিজ্ঞানবিদেরা তোমাদিগকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, দার্শনিকেরা সে দৃষ্টিতে তোমাদিগকে দেখেন না।

দুঃখ নাই সুখ। কেন এরূপ হইল তাহার কারণ কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? এক জনকে তুমি পূর্ব্বে চিনিতে না, এখন তুমি তাঁহাকে চিনিয়াছ। তাঁহার সঙ্গে তোমার দিবারজনীর সম্বন্ধ। তিনি যেমন তোমার হিতকারী, তিনি যেমন তোমার হিত করিতে পারেন, তিনি যেমন তোমার উৎকৃষ্ট শিক্ষক, তিনি যেমন প্রতিমুহূর্ত্তে জীবন্ত দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া শিক্ষা দিতে পারেন, এমন কেউ পারে না। তাঁহাকে যখন তুমি চিনিয়াছ, তাঁহার সঙ্গে যখন তোমার সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, আমি আহ্লাদিত ও নিশ্চিন্ত হইব না কেন? দেখিও, তাঁহার শিক্ষার প্রতি যেন অনবধান না হও। তিনি বড় ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহার বড় অভিমান। বড় ভাল বাসার বড় অভিমান নিয়ত স্মরণে রাখিয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করিও, তোমার জীবনসম্বন্ধে কোন ভাবনার বিষয় নাই।

স্বর্গগত শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিবার জন্য এ সময়ে বিশ্বাসিগণের আত্মা যেন নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, ও পরলোকগমনের কালব্যবধান যেন দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা সত্বর চলিয়া যাইতেছেন তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে যাঁহারা স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কে কবে আহূত হইবেন, তাহার যখন কোন স্থিরতা নাই, তখন প্রস্তুত হইবার পক্ষে কাহারও আর অনবধান থাকা উচিত নয়। শ্রীমান্ মনোমোহন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তাহার জন্য শোকচিহ্ন ধারণের সময় অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার ভক্তিভাজন পিতৃদেব নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে অচিরে মিলিত হইলেন। চিরজীবন অসাধারণ মানসিক পরিশ্রম করিয়া তিনি মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, ইদানীন্তন ধারাবাহিকরূপে আলাপ বা মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। পুত্রের দেহত্যাগের আঘাতে প্রসুপ্ত মস্তিষ্কশক্তি যেন জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল, শোকাপনয়ন জন্য উপাসনাস্থলে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে বসিয়া থাকিতেন। অগ্রে হইতে সমাহিত ভাবে একাকী যতক্ষণ উপবিষ্ট থাকিতেন সে সময় লইয়া গণনা করিলে প্রায় দুঘণ্টা কাল তিনি উপাসনার ভাবে স্থিতি করিতেন। মস্তিষ্কের এরূপ হঠাৎ অধিক ক্রিয়াপ্রকাশ পুনরায় সমধিক অবসাদের কারণ হইবে, এ আশঙ্কা আমাদের মনে তখন উপস্থিত হইয়াছিল। শেষ দিন আমরা যখন তাঁহার গৃহে উপাসনা করিতে যাই, তখন সেই দিন সেই অবসাদের লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। বিউবনিক প্লেগের ভয়ে চারিদিকের প্রতিবেশিগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন, শোকার্ত্ত পরিবারে বা কোন নূতন বিপৎপাত হয়, এই আশঙ্কায় পরিবারস্থ সকলে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রখর গ্রীষ্মোত্তাপ, বেগগামী বাষ্পশকটের আন্দোলনজনিত ঘাতপ্রতিঘাত, সেই দুর্ব্বল রোগাক্রান্ত দেহ সহ্য করিয়া উঠিতে পারিবে কি না সে বিষয়ে সংশয় সত্ত্বেও নবীনতর বিপদাশঙ্কায় পরিবারবর্গকে অসমসাহসে ভর করিতে হইল। কলিকাতা হইতে যাত্রিকগণের সে কয় দিন রেলওয়ে গমনাগমন যে কি অসহ্য ক্লেশের ব্যাপার হইয়াছিল, যাঁহারা রেলওয়ে স্থলে সে অপরিমেয় জনতা দেখেন নাই, তাঁহাদের তাহা হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই সুকঠিন। এই জনতার ভিতর দিয়া বন্ধুগণের সাহায্যে কষ্টে রেলওয়ে গাড়ীতে উঠা তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কিছুতেই অনুকূল ছিল না। পরিবারবর্গের অতুল যত্নে তিনি নির্ব্বিঘ্নে ভাগলপুরে অবতরণ করিলেন, কিন্তু অবতরণ করিবার পর দিনে জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ইনি বহুদিন হইল মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন, সেই রোগ মূত্রাঘাতে পরিণত হয়। অবরুদ্ধ মূত্রে শোণিত বিষাক্ত হইয়া জ্বর উপস্থিত হইয়াছিল, চিকিৎসকগণ এরূপ অনুমান করেন। সুতরাং যে রোগে তিনি বহু দিন হইল আক্রান্ত ছিলেন, সেই রোগই তাঁহাকে ইহলোক হইতে লইয়া গেল, ইহাই বলিতে হইবে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এক জন অতি কৃতবিদ্য লোক। ইনি সেকালের 'সিনিয়ার স্কলার' ছিলেন। সুতরাং ইংরাজী ভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। ইনি ঢাকার দ্বিতীয় শিক্ষক, তৎপর গয়া, ছাপরা ভাগলপুর হুগলি প্রভৃতি স্থানে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া পরিশেষে পেন্‌সন পাইয়াছিলেন। ইনি পেন্‌সন পাঁচ ছয় বৎসরমাত্র ভোগ করিলেন। যে সময়ে তিনি গয়াতে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জীবনে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সেন, হরি সুন্দর বসু, এ তিন জনের নাম চিরদিন একত্র বাঁধা থাকিবে। যে সময়ে এ তিন ব্যক্তির একত্র মিলন হয়, সে সময়ে প্রথম ব্যক্তি সংশয়ী, দ্বিতীয় ব্যক্তি খ্রীষ্টভাবাপন্ন, তৃতীয় ব্যক্তি বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। এখনও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া অধিকার করে নাই। যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহাদিগের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। একদা শ্রীকৃষ্ণ বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু কার্য্যোপলক্ষে গয়া হইতে বাঁকিপুরে গমন করেন। সে সময়ে রেলওয়ে হয় নাই, সুতরাং সাধারণ শকটযোগে এই দূরতম পথ অতিক্রম করিতে হয়। পথে উভয়ের ঈশ্বরাস্তিত্বসম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই বিতর্কের ফল এই দাঁড়ায় যে, একজন জগতের স্রষ্টা মহান্ পুরুষ আছেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাও যে প্রয়োজন, ইহাও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। গয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক স্বর্গগত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন অতি তর্ককুশল

ছিলেন, দার্শনিক বিষয়গুলি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার বিশ্বাস অতি সুদৃঢ় ছিল, কিন্তু তাহা জ্ঞানভূমির উপরে স্থাপিত। তিনি যখন আপনার উপবীতন ত্যাগের প্রধান শিক্ষকের পরিবর্ত্তিত মন এবং উপাসনায় প্রবৃত্তি দেখিলেন, তখন তাঁহার কার্য্য শেষ হইল, এখন ভক্তিপ্রবণ শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসুর সঙ্গে উপাসনায় তাঁহাকে মিলিত করিয়া দিলেন। এখনও ইঁহার উপাসনার ভাব গাঢ় হয় নাই। উৎসবে সমুদায় দিন উপাসনা প্রার্থনাদি হয়, ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত ছিলেন। এ বিরক্তি আর কত দিন থাকিতে পারে, অল্প দিনের মধ্যে ইনি প্রগাঢ় উপাসনাশীল হইলেন

উপাসনাশীল ব্যক্তি দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া কখন থাকিতে পারেন না। বিহারপ্রদেশের হিতসাধনের জন্য একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির করা ইঁহার নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল। সুতরাং দুই বৎসরের বিদায় (ফার্লো) গ্রহণ করিয়া ইনি বাঁকীপুরে আসিলেন, এবং সেখানে আসিয়া "বিহার হেরাল্ড" পত্রিকা বাহির করিলেন। ইনি কয়েক দিন কমিসনরের আফিসে কার্য্য করিয়াছিলেন, এই সময়ে কি অন্য সময়ে আমরা নিশ্চয় তাহা জানি না। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে এই কার্য্য ইনি গ্রহণ করেন। দুর্গাগতি বাবু শেষ পর্য্যন্ত ইঁহার ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতার ফল ভোগ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই, মনে হয় প্রথমপুত্র শ্রীমান্ ললিত মোহনের জন্মের কিছু দিন পরে ইনি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, অন্যথা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী পুত্রকে লইয়া যখন একা গৃহে পৌত্তলিক বাস করিতেছিলেন তখন পুত্রের যজ্ঞোপবীত দানে আত্মীয়গণ উদ্যত হইলে তিনি তাহাতে বাধা দান করিবেন কেন? যজ্ঞোপবীত দানে স্বামীর যখন অনভিপ্রায় তখন তিনি কখন সে কার্য্যে সায় দিতে পারেন না, ইহা বলিয়া যদি তিনি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ললিতমোহনের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া যাইত। যাহা হউক, ইনি যখন ভাগলপুরে ছিলেন সেই সময়ে ভাই দীননাথ মজুমদারের প্রযত্নে তথায় পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পারিবারিক উপাসনা নিজ পরিবারে যত দিন রোগ দ্বারা অসমর্থ হন নাই, ইনি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন সপত্নীক উপাসনা না করিয়া ইনি অন্নপান গ্রহণ করিতেন না।

পেন্‌সন লইয়া কতক দিন পরে হুগলী হইতে আসিয়া ইনি কলিকাতায় বাস করেন। ইনি নিরুদ্যম থাকিবার লোক ছিলেন না। কলিকাতায় আসার কয়েক দিন পর হইতে আমাদের ইংরাজী পত্রিকায় ইনি নিয়মিতরূপে লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক উচ্চশ্রেণীস্থ বয়স্থা ছাত্রীগণের ইংরাজী শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে যে তিনি কি উৎসাহ প্রকাশ করিতেন বলা যায় না। তাঁহার নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্রীগণ বিশেষ উপকৃত হইতে লাগিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল আর এ সুযোগ তাঁহাদের ভাগ্যে রহিল না। অল্প দিনের মধ্যে মাস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য রোগে ইনি আক্রান্ত হইলেন; ইহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগও প্রবল হইয়া উঠিল। সময়ে সময়ে এরূপ শয্যাগত হইতে লাগিলেন যে অনেক সময়ে তাঁহার জীবনসম্বন্ধে পরিবারমধ্যে আশঙ্কা উপস্থিত হইত। ক্রমে প্রতিদিন পত্নীকে লইয়া উপাসনা পর্য্যন্ত করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। অনুগতা অনুরক্তা পত্নীর সেবায় শরীর ধারণ এত দিন হইয়াছিল, অন্যথা ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন।

ইঁহার পাঁচ পুত্র এক কন্যা। শ্রীমান্ ললিত মোহন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, স্বর্গগত শ্রীমান্ মনোমোহন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রীমান্ করুণা ও হরিদাস, কন্যা পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রীমান্ পুলকচন্দ্র। ইনি এই দীর্ঘজীবনের মধ্যে সন্তানবিয়োগক্লেশ কখন বহন করেন নাই; সুতরাং গুণবান্ উপযুক্ত দ্বিতীয় পুত্রের শোকে তাঁহার হৃদয় শল্যবিদ্ধ হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কতকটা রোগের জন্য কতকটা স্বাভাবিক ধীরতার জন্য যদিও উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ বাহিরে তত প্রকাশ পায় নাই, তথাপি প্রসুপ্তপ্রায় মস্তিষ্কশক্তির পুনরুদ্দীপন সে শোকের গুরুত্ব দেখাইয়া দিতেছে। যাহা হউক এ শোক আর তাঁহাকে এ সংসারে ভোগ করিতে হইল না, অল্প দিনের মধ্যেই তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। যাইবার বেলা পুত্র ও স্বামিবিয়োগজনিত গুরুতর শোকের ভার নিজ জীবনের সহভাগিনীর মস্তকের উপরে রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সান্ত্বনা এখন কোথায়? শ্রীহরির চরণতলে। ভগবৎকৃপায় এখন তিনি সেখানেই হৃদয়ের সান্ত্বনা অন্বেষণ করিতেছেন। স্বামী যে বিশ্বাসধন তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন, এখন তাহাই তাঁহার সম্বল। ভগবানে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন আর যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, এদুইয়েতে কি প্রভেদ এই সময়ে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসী পরিবার ভগবচ্চরণাশ্রিত ইহা যদি আমরা না জানিতাম, আমাদেরও শোকের অবধি থাকিত না। স্বর্গগত ধর্ম্মবন্ধু বিদ্বান্ জ্ঞানী হইয়াও কিরূপে বালকের ন্যায় বিনীত অগর্ব্বিতস্বভাব হইতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। সে দৃষ্টান্ত যেন তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবর্গ হইতে কখন তিরোহিত না হয়। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সে গুণের পক্ষপাতী হউন, পরিবার মধ্যে শান্তি ও কুশল বিরাজ করুক। স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা ভক্তিমতী পত্নী ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ধৈর্য্য সহকারে কাল প্রতীক্ষা করুন, যখন তাঁহার সময় উপস্থিত হইবে, যেখানে স্বামী আছেন, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকে সেখানে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার সহিত তাঁহাকে মিলিত করিবেন।

মহামারীসম্বন্ধে হজরত মোহম্মদের উক্তি।

সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীতে বিউবনিক মহামারী উপস্থিত হওয়ায় মহাত্রাসে দলে দলে নগরবাসিগণ পলায়ন করিয়াছেন ও

ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তোমাদিগকে আরও বিভিন্ন চক্ষে দেখেন, বল আমরা তোমাদিগকে কোন্ চক্ষে দেখিব ? বিজ্ঞানবিদেরা একালে সর্ব্বপ্রধান, অথচ তাঁহারা তোমাদিগের অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে অতিহেয় নীচবংশের লক্ষণ সকল দেখাইয়া দিয়া উপহাস করিয়া বলেন, এমন নীচবংশজাত মনুষ্যসন্তানসকল নীচতা প্রদর্শন করিবে না তো আর কি করিবে ? সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস পাঠ কর, কেবল রক্তারক্তি, হিংসা দ্বেষ, ভীষণ নিপীড়ন ভিন্ন আর কি দেখিতে পাইবে ? সে ইতিহাস পাঠ করিয়া তুমি কোন উচ্চ বিষয় শিক্ষা করিবে আশা করিও না, পাঠ করিয়া তোমার কেবল লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে।

ইতিহাসে পাপ ব্যভিচার অত্যাচার নিপীড়নের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বাস্তবিকই মানবজাতিকে নিতান্ত নীচবংশ অতি ঘৃণার আস্পদ বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞানবিদেরা মানবের শরীর লইয়া ব্যস্ত। রক্ত মাংস তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়, সেখানে তাঁহারা হিংস্র শ্বাপদ মৎস্য সরীসৃপ কীটাদির নিদর্শন ভিন্ন আর কি দেখিতে পাইবেন ? শরীর লইয়া বিচার কর, মানুষ ইহাদের অপেক্ষা কিছুতেই শ্রেষ্ঠ নহে। বরং তাহাদের ভোগের সীমা আছে, সময় আছে, মানুষের তাহাও নাই, সুতরাং তাহাদের হইতে ইহারা সে সম্বন্ধে আরও হীন। দার্শনিকেরা বলিলেন, বিজ্ঞানবিদেরা মানবজাতির উপরে বড়ই অত্যাচার করিয়াছেন। মানুষের মনুষ্যত্ব শরীরসম্বন্ধে নহে, শরীর অপেক্ষা মন বড়। শরীরসম্বন্ধে তাহারা পশুজীবনের সঙ্গে এক, এজন্য হিংসা দ্বেষ শোণিতপাত প্রভৃতি ঘৃণিত ব্যবহারে ইতিহাসপূর্ণ কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু শরীরের ইতিহাসের পার্শ্বে মনের ইতিহাস একবার স্থাপন কর, দেখিবে মানবজাতি কত শ্রেষ্ঠ ? যে মানবজাতি অতি দুর্ব্বল, যাহার আত্মরক্ষার জন্য বিধাতা কোন স্বাভাবিক অস্ত্রশস্ত্র দেন নাই, যে শীত বাতাতপে স্বভাবপ্রদত্ত আচ্ছাদনে প্রাণ বাঁচাইতে অসমর্থ, প্রত্যেক হিংস্র জন্তু যাহা হইতে নিরতিশয় বলবান্, ঝটিকা বৃষ্টি মহামারী প্রভৃতি পৃথিবী হইতে যাহাকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, অতি সামান্য কীটাণুও মুহূর্ত্তের মধ্যে যাহার প্রাণ বিনাশ করে, সেই মানুষ যুগযুগান্তর জীবন ধারণ করিয়া প্রকৃতির উপরে আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে, ইহা দেখিয়া তুমি কি আর তাহাকে তুচ্ছ করিতে পার, না ঘৃণার্হ মনে করিতে পার ? সত্য বটে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বংশীয়গণ আপৎ দুঃখ ক্লেশ বহন করিয়া অতিকষ্টে জীবনাতিপাত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কি সামান্য কথা যে, তাঁহাদের ক্লেশ দুঃখ কষ্টসাধ্য জীবন ভবিষ্যবংশীয়গণের জন্য সুখের পথ খুলিয়া দিয়াছে ! মানবজাতির ভাবী বংশের কল্যাণের জন্য নিস্বার্থ জীবন যাপন কি পশুজীবন অপেক্ষা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে না ?

বিজ্ঞানবিদেরা যাহা বলেন, তাহাও সত্য, দার্শনিকেরা যাহা বলেন তাহাও সত্য। এ দুই একত্র করিলে, মানুষ যে অতি উচ্চ জীব হইয়া দাঁড়াইল তাহা নহে। সকল লোকেই আর কিছু স্বজাতির উন্নতির জন্য জীবন যাপন করে নাই। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে এরূপ দু এক জন লোক ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁহাদের জীবনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে তৎকালের দোষদুর্ব্বলতাশূন্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না। অতএব বিজ্ঞানবিদ্গণের ঘৃণার দৃষ্টি সর্ব্বথা অতিক্রম করিবার উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কি মানবের দেহ মন ছাড়িয়া তাহার আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিব ? ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মানবমানবীর আত্মার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন, আর বলেন, মানবের শ্রেষ্ঠতা শরীরে নহে, মনে নহে, আত্মায়। তাঁহাদের কথা কত দূর সত্য একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

শরীরে, হে মানব, [illegible] পশু হইতে শ্রেষ্ঠ মানিতে পারিলাম না। [illegible] মাতঙ্গের সঙ্গে

কোন ইতরপ্রাণীর মস্তিষ্কের তুলনা হয় না। কোথাও যদি পরিমাণের আধিক্য থাকে, তথাপি উপাদানে তোমার মস্তিষ্ক শ্রেষ্ঠ মানিলাম। কিন্তু যদি এই মস্তিষ্কের জন্য পশুগণ হইতে তুমি দুরাচারাদিতে জিতিয়া যাও, তাহা হইলে বলিব, তোমার মস্তিষ্ক এরূপ শ্রেষ্ঠ না হওয়াই ছিল ভাল। তোমার মানসিক শক্তির আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু ইতর জীবদিগের মধ্যে এক এক বিষয়ে মানসিক শক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি তোমাতে একত্র সংগ্রহ করিলে তোমার প্রশংসা পাইবার ভাগ অতি অল্পই থাকে। পর্য্যায়ক্রমে ইতর প্রাণিগণ তোমার পূর্ব্ব পুরুষ হইয়া সকলের গুণ তোমাকে তাহারা অর্পণ করিয়াছে, একথা বলিলে কি তুমি আর তত সন্তুষ্ট হইবে? অবশ্য এমন কিছু আছে যাহার জন্য বাস্তবিকই তোমার শ্রেষ্ঠত্ব, সেইটি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই। আর অধিক খুঁজিতে হইবে না, বলিতেছি তোমার আত্মার জন্য তুমি শ্রেষ্ঠ। তোমার কোন কালে বিনাশ নাই, এই যে তোমার বোধ আছে, এই বোধই তোমাকে সকল ইতরজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। স্বামিশোকে অধীরা নারী স্বামী আমার মরে নাই, এই জ্ঞানে তাঁহার জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছেন, অথবা সমগ্র জীবন কঠোর ব্রাহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন, এ দৃষ্টান্ত কোন পশুজাতিতে দেখিতে পাইবে না। স্বর্গে গৌরবের মুকুট প্রতীক্ষা করিতেছ, ইহা বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মার্থনিহত ব্যক্তিগণ জ্বলন্ত হুতাশনে, তীক্ষ্ণ শস্ত্রমুখে, বা অন্য ভীষণ নির্যন্ত্রণ যন্ত্রে হাসিতে হাসিতে প্রাণ দান করিতেছেন, ইহা যখন দেখি তখন বলি, হে মানব, সমুদায় জীবজগতে তোমার তুল্য আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না. এবং তোমার ভিতরে যে এই শ্রেষ্ঠ আত্মা বাস করিতেছেন, যিনি জলে ক্লিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, অস্ত্রে হত হন না, যিনি মৃত্যুকে উপহাস করেন, জগতের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে হাসিতে হাসিতে যিনি উহাকে আলিঙ্গন করেন, হে মানবমানবী, তোমাদের সেই আত্মার জন্য আমি তোমাদিগকে প্রণাম করি, এবং প্রাচীন ব্রাহ্মবাদিগণের তোমাদের প্রতি ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তোমাদের প্রতি প্রীতিবন্ধনে ঈশ্বরপ্রীতির উন্নতি জানিয়া তোমাদিগকে আদরের সহিত হৃদয়ে গ্রহণ করি। তবে নিবেদন এই, তোমরা আত্মা, চিদাত্মা, পশু আত্মা নও, এইটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া তদুপযোগী জীবন সংসারে যাপন দ্বারা নিত্য আদরভাজন হও, এই আমাদিগের কামনা ও প্রার্থনা।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

ধনীর ধন দেখিয়া তুমি অসূয়াপরবশ হইও না। তুমি যদি ধনের সহচররূপে কি কি ক্লেশ দুঃখ পাপ লোককে আক্রমণ করে জানিতে, তোমার অসূয়া করিবার কিছুই থাকিত না। দীন-দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গিয়া তোমায় যে বিপদে পড়িতে হয়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন সংগ্রামে ধনিগণ নিপতিত হন। তুমি ইহলোকের সুখে বঞ্চিত হইলে, ধনিগণ যদি ধনের জন্য ইহলোকে অসুখী পরলোকে বিপদ্‌গ্রস্ত হন, তাহা হইলে তোমার তাঁহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কি উচিত নয়?

তুমি ধনী নও দরিদ্র, ইহাতে আমি দুঃখী নই। বরং শ্রেষ্ঠজীবন লাভের জন্য তোমার অবস্থা অনুকূল ইহা দেখিয়া আমি আহ্লাদিত। তুমি বলিবে, তবে তো তুমি আমায় বড়ই ভালবাস? আমার দরিদ্রতা তোমায় ভাল লাগে? বুঝিলাম তুমি আমার মিত্র নও, শত্রু! তুমি শত্রু বলিতে চাও বল, আমি তাহাতে দুঃখী নই। আমি তোমার যে শত্রু, চিরদিন যেন সেই শত্রু থাকি। তুমি দীন হইয়া স্বর্গের মুকুটের অধিকারী হইবে, এই আমি দেখিতে চাই। স্বর্গীয় ধনে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন হইলে, ইহা দেখাতেই আমার আহ্লাদ।

আমি তোমার জন্য দিবারজনী কষ্টের ভাবনা ভাবিতাম, এখন আর তেমন ভাবি না; আমার মন তোমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তুমি নিয়ত আমার স্মরণে আছ, কিন্তু স্মরণে এখন

করিতেছেন। দুই তিন দিনের মধ্যে প্রায় দুইলক্ষ নরনারী নগরত্যাগ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ মহামারী পুরাকালেও এসিয়ার নানা স্থানে ভয়ঙ্কর প্রকোপ প্রকাশ করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ন্যূনাধিক তের শত বৎসর হইল মহামারীসম্বন্ধে আরব্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদ তাঁহার অনুগামীদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, মোসলমানদিগের মহাসম্মানিত ধর্ম্মশাস্ত্র হদিস গ্রন্থে সে সকল অভিব্যক্ত। সুপ্রসিদ্ধ আরব্য হদিস গ্রন্থ মেস্কাতুলমসাবিহ হইতে এবিষয়ের কতিপয় হদিস্ (প্রবচন) ও প্রসিদ্ধ ভাষ্যপুস্তক ও অভিধান হইতে তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল ;—

১। হজরত মোহম্মদের সহচর আনেসের উক্তি।—প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন ;—

"প্রত্যেক মোসলমানসম্বন্ধে তাউনের (মহামারীতে) মৃত্যু শেহাদৎ (ঈশ্বর উদ্দেশে নিহত হওয়া) স্বরূপ হয়।*

২। হজরতের সঙ্গী আবুহোরেয়রার উক্তি ;—

"হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন ;—ঈশ্বর উদ্দেশ্যে প্রাণদান পঞ্চবিধ —(১) তাউনে মৃত্যু, (২) বিসূচিকায় মৃত্যু, *(৩) জলে ডুবিয়া মৃত্যু, এবং (৪) প্রাচীরাদির নিয়ে পতিত হইয়া মৃত্যু (৫) ধর্ম্মবিরোধীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু।"

৩। হজরতের সহধর্ম্মিণী আয়েশা বলিয়াছেন ;—

প্রেরিত পুরুষকে আমি তাউনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে এরূপ জ্ঞাপন করেন যে, "উহা ঈশ্বরের প্রেরিত শাস্তিবিশেষ। পরমেশ্বর যাঁহার প্রতি ইচ্ছা করেন, তৎপ্রতি ইহা প্রেরণ করিয়া থাকেন। নিশ্চয় ঈশ্বর, বিশ্বাসী লোকদিগের জন্য ইহা কৃপাস্বরূপ করিয়াছেন। তাউন উপস্থিত হইয়াছে এমন সময় যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুভ ফলের প্রত্যাশায় স্বীয় নগরে অবস্থিতি করিয়াছে, এবং বিশ্বাস করিয়াছে যে, ঈশ্বর যে বিপদ নিরূপিত করিয়াছেন তদ্ভিন্ন তাহার নিকট উপস্থিত হয় না, ঈশ্বর উদ্দেশ্যে প্রাণদানের সম্বন্ধে যে পুরস্কার নির্দ্ধারিত, তাহার সম্বন্ধেও সে পুরস্কার হইয়া থাকে।"

৪। জয়েদের পুত্র ওসামার উক্তি ;—

"প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন ;—তাউন শাস্তিবিশেষ, উহা এস্রাইল বংশীয় এক সম্প্রদায়ের উপর অথবা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলি লোকের উপর প্রেরিত হইয়াছিল। যখন তোমরা শুনিবে অমুক স্থানে তাহা উপস্থিত, সেই স্থানে যাইও না, কিন্তু তোমরা যে স্থানে স্থিতি করিতেছ, তথায় উহা ঘটিলে পলায়ন করিও না।" †

৫। এতিকের পুত্র জাবের উক্তি ;—

প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন ;—"ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদান ব্যতীত ঈশ্বরোদ্দেশ্যে প্রাণদান সপ্তবিধা। (১) মহামারীতে মৃত ব্যক্তি (২) অকস্মাৎ জলে নিমগ্ন হইয়া মৃত ব্যক্তি। (৩) পার্শ্ব-

* তাউন উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করে, পলায়ন করে না, এবং প্রাণদান করে, সে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রাণদানের ফল ও পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে। তাউন দেশব্যাপী মৃত্যু ও দেশব্যাপী রোগ। এই মহামারীতে বায়ু দূষিত হয়, তাহাতে শারীরিক প্রকৃতি ও শরীর বিকৃত হইয়া যায়। তাউন এরূপ প্রবল বেদনা যে উহাতে জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। উহা ত্বরিত মৃত্যু সংঘটন করে। তাউনসম্বন্ধে চিকিৎসকগণ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শরীরের কোন কোন কোমল অংশ [illegible] কক্ষতল বা কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ, কিংবা জঙ্ঘাদেশ স্ফীত হ[illegible]ঠে। সেই স্ফীত অংশ বেদনাদায়ক, সন্তাপক, এবং বিষাক্ত হয়। উহার চতুর্দিক্ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, কখনও হরিদ্বর্ণ, কখনও রক্তবর্ণ হয়। উহা অঙ্গকে দূষিত করিয়া ফেলে। এই মারাত্মক রোগ উপস্থিত হইলে পলায়ন করা— যে নগরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সেই নগর হইতে বহির্গত হওয়া নিষিদ্ধ। তাহা করিলে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এই মহামারী উপস্থিত হইলে পলায়ন করা আর ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পলায়ন করা তুল্য। তাহাতে ধৈর্য্য ধারণে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হওয়ার ফল লাভ হয়। তাউনকে ওবাও বলে। ওবা অর্থে দেশব্যাপী মৃত্যু বা দেশব্যাপী রোগ। উহা চিকিৎকগণের নির্ণীত সাধারণ রোগ নহে।"—ভাষ্য এশাতুল্লামাৎ।—

গয়াসোল্লোগাৎ নামক প্রসিদ্ধ পারস্য অভিধানে, তাউনের এরূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ;—মুষ্কে বা স্তনে কিংবা কক্ষতলে, অথবা জঙ্ঘার মূলদেশে, এইরোগ ফোস্কার আকারে উৎপন্ন হয়, তাহাতে অঙ্গ বিষাক্ত হইয়া যায়। বমন, বমনোদ্রেক, মূর্চ্ছা, হৃৎকম্প ইহার সঙ্গী। বহরোল্‌জওয়াহের গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, উহা প্রবল প্রদাহ সমন্বিত কৃষ্ণ বর্ণ বা লোহিত বর্ণ ক্ষুদ্র ফোস্কার সদৃশ। হহুদুল্‌ আয়াজ নামক পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উহা বন্ধুকুলের ন্যায় ক্ষুদ্র জ্বর ও প্রদাহযুক্ত নীলাভ ফোস্কাবিশেষ।

* বিসূচিকায় মৃত্যু বা অন্য কোন উদরাময় বিশেষে মৃত্যুর এরূপ ব্যাখ্যাও হইয়াছে যে, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যবশতঃ সন্দিগ্ধ ও অবৈধ বস্তু ভক্ষণে নিবৃত্ত থাকিয়া দারিদ্র্য ও ক্ষুৎপিপাসায় মৃত্যু হওয়া। জলে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু—স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জলে ডুবিয়া মরণ নয়, নৌকা নিমগ্ন হওয়াদি কারণে মৃত্যু হওয়া।

† কোন কোন স্থলে পলায়ন করা বিধেয়। যেমন কেহ গৃহে স্থিতি করিতেছে হঠাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত, কিংবা তাহাতে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে, এমন অবস্থায় গৃহ হইতে সে পলায়ন করিবে। কিন্তু নগরে মহামারী উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে, পলায়ন করা বিধেয় নহে। মহামারীতে আক্রান্ত হইলে মৃত্যু ঘটিবে এই কল্পনায় স্থানান্তরে পলায়ন করা কোন রূপে উচিত নহে। যে ব্যক্তি পলায়ন করে, অপরাধী ও মহাপরাধী এবং অবিশ্বাসী বলিয়া গণ্য। আমরা ঈশ্বরের নিকট শান্তি ও আরাম প্রার্থনা করি।

রোগবিশেষে মৃত ব্যক্তি, * (৪) বিসূচিকা রোগে মৃত ব্যক্তি (৫) অকস্মাৎ অগ্নিদাহে মৃতব্যক্তি, (৬) ভগ্ন গৃহের নিম্নে পতিত হইয়া মৃত্যু ব্যক্তি, (৭) সন্তানপ্রসবের প্রাক্কালে বা পরক্ষণে মৃত নারী ঈশ্বরোদ্দেশ্যে প্রাণদাতৃগণের মধ্যে গণ্য।"

এরবাদের উক্তি;—

প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন;—"ধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত ও সাধারণ রোগশয্যায় মৃত ব্যক্তিগণ পুনরুত্থানের সময় মহামারীতে মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকটে বাদানুবাদ করিবে। ধর্ম্মযুদ্ধে হত লোকেরা বলিবে, 'ইহারা আমাদের ভ্রাতা, আমরা যেরূপ নিহত হইয়াছি ইহারাও সেরূপ নিহত হইয়াছে। সাধারণ রোগশয্যায় মৃত ব্যক্তিগণ বলিবে, ইহারা আমাদের ন্যায় রোগে-মৃত, ইহারা আমাদিগের ভ্রাতা।' তখন আমাদের প্রতিপালক বলিবেন, 'তোমরা ইহাদের আঘাতের প্রতি লক্ষ্য কর, নিশ্চয় ইহাদের আঘাত ধর্ম্মার্থ সংগ্রামে নিহত ব্যক্তিদিগের আঘাতের সদৃশ। অতএব ইহারা তাহাদের সঙ্গী ও তাহাদের অন্তর্গত। তখন অকস্মাৎ তাউনে মৃতব্যক্তিদিগের ক্ষত সকল ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদিগের আঘাতের তুল্যরূপে প্রকাশ পাইবে।

জাবেবের উক্তি;—

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন "মহামারী হইতে পলাতক ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে পালাতক ব্যক্তিসদৃশ, এবং তাহাতে সহিষ্ণু ব্যক্তির ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তির পুরস্কার প্রাপ্য।"

উপাসনাশ্রম।

প্রেমসাধন।

১২ পৌষ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, এই তিনটি দ্বারা ভগবানের লোক চিহ্নিত। যে ব্যক্তিতে এই তিন আছে, তিনি নিঃসংশয় ভগবানের লোক। যেখানে বিশ্বাস আছে সেখানে প্রেম থাকিবে, যেখানে প্রেম আছে সেখানে পবিত্রতা থাকিবে, এ কথা সত্য হইলেও, ইহাদিগের স্বতন্ত্র সত্তন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র সাধন, এই জন্য প্রয়োজন হয় যে, ইহারা মানবহৃদয়ে অল্পে অল্পে প্রকাশ পায়। যেখানে বিশ্বাস নাই, সেখানে প্রেম হয় না, অতএব বিশ্বাস অগ্রে চাই। সর্ব্বপ্রথমে যদি আমার ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে তৎপ্রতি আমার প্রেম জন্মিবে কি প্রকারে? আমি যাঁহাকে বিশ্বাস করি না, তাঁহার উপরে আমি প্রেম স্থাপন করিব, ইহা কি কখন সম্ভব? যাহার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, তাহারই জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। যদি আমি কখন মনে করিতে পারিতাম, আমি দিবারজনী অশ্রু বর্ষণ করি না কেন, তবু অমুকে আমার প্রতি সকরুণ নয়নে তাকাইবে না, তাহা হইলে কি আর আমি তাহার জন্য অশ্রু বর্ষণ করিতে পারি? যাই এরূপ অবিশ্বাস আমার মনে আসিয়া প্রবেশ করে, অমনি আমার নয়নের অশ্রু শুকাইয়া যায়। সে ব্যক্তি আমার প্রতি বিমুখ হইতে পারে না, বিমুখ থাকিতে পারে না, এ বিশ্বাস বিনা প্রেমের আরম্ভ হয় না। অতএব বিশ্বাস লইয়া প্রেমের আরম্ভ। বিশ্বাস যত বাড়ে, প্রেম তত বাড়ে; প্রেম যত বাড়ে বিশ্বাস তত গভীর হয়। বিশ্বাসের পর প্রেমসাধন এজন্যই স্বাভাবিক ক্রম।

আমরা প্রেম সাধন করিব কি প্রকারে? খুব বিশ্বাস বাড়াইব তাহাতেই কি হৃদয়ে প্রেম উপস্থিত হইবে? বিশ্বাসতো অনেক বিষয়ে করিতে পারি, তাহাতে কি প্রেমের উদয় হয়? যাঁহাকে প্রেম দিতে চাই, তাঁহার প্রেমের প্রতি, অন্ততঃ প্রেমপ্রবণতার প্রতি আমার বিশ্বাস চাই। ঈশ্বরের প্রেম অনন্ত অসীম, কোন মুহূর্ত্তের জন্য সে প্রেম অপ্রেমের রেখাপাত দ্বারা কলঙ্কিত হয় না, খর্ব্ব হয় না; সেই প্রেমের প্রতি ঈদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রেম বর্দ্ধিত করা সর্ব্বপ্রধান সাধন। পুনঃ পুনঃ প্রেম চিন্তা করিলে হৃদয় আর্দ্র হয়, এই আর্দ্রতা উত্তরোত্তর প্রেমের গাঢ়তা জন্মায়। নরনারীসম্বন্ধে প্রেমসাধন এ প্রণালীতে হইবার প্রতিবন্ধক আছে। অধিকাংশ নরনারী অন্যের প্রতি উদাসীন, তাহারা আপনাদিগকে লইয়াই ব্যস্ত। তাহাদের প্রেম আমাদের হৃদয়ের প্রেম উদ্দীপন করিবে, ইহা সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না। সময়ে সময়ে অপ্রিয় ঘটনা ঘটিলে আমাদের দুর্ব্বল মনে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, তবে বুঝি ঈশ্বর আমাদিগকে ভাল বাসেন না, অথবা আমাদের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ আশঙ্কা বা অবিশ্বাস স্থায়ী হয় না, কেন না যখন সেই অপ্রিয় ঘটনা হইতে কল্যাণ উপস্থিত হয়, তখন আমাদের মূঢ়তা আমরা নিজে স্বীকার করি, এবং ভবিষ্যতে আর ঈশ্বরের প্রেমের প্রতি অবিশ্বাস করিব না প্রতিজ্ঞা করি। কিন্তু নরনারীসম্বন্ধে এ বিশ্বাসতো আমাদের জন্মায় না। যে স্বার্থপর সে কিছুতেই তাহার স্বার্থপরতা ছাড়িতেছে না, প্রেমের বিনিময়ে সে ক্রমান্বয়ে অত্যাচার বাড়াইতেছে, এ স্থলে তাহাদের প্রেমে প্রেম বাড়িবে দূরে থাকুক, তাহাদের প্রতি নিজের প্রেম স্থির রাখাই কঠিন হইয়া উঠে। নরনারীর চিত্ত প্রেমপ্রবণ এ বিশ্বাসে অপ্রেমের পরিবর্ত্তে প্রেম ক্রমান্বয়ে দেওয়া, ইহা দুর্ব্বল মানবের পক্ষে কয় দিন সম্ভব? কিন্তু প্রেম না পাইয়াও প্রেম যদি আমরা দিতে না পারিলাম তাহা হইল স্বর্গীয় প্রেম সাধন হইল কোথায়? প্রেম পাইলে প্রেম দেওয়া ইহা স্বার্থেরই প্রকারান্তর। ঈশ্বরের প্রেম আমাদের প্রেমের মুখাপেক্ষী হইয়া কখন উদিত হয় না, সহস্র প্রেমের বিরুদ্ধ ব্যবহার পাইয়াও উহা যেমন তেমনি নিত্যকাল থাকে। এখানে ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদের প্রেমপ্রবণতা জানেন বলিয়াই তিনি প্রেম করেন, এ কথা বলা অতিরিক্ত, কেন না যাঁহার স্বভাব নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাঁহার সে স্বভাব হইতে প্রেম ভিন্ন আর কি আসিতে পারে? আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেম জয়লাভ করিবে,

* পার্শ্বরোগবিশেষ অর্থাৎ এক প্রকার প্রসিদ্ধ রোগ আছে যে, হৃৎপিণ্ড ও বক্ষস্থলের সন্নিহিত পার্শ্বভাগে এক প্রকার ক্ষত হয়। তাহার লক্ষণ জ্বর ও শ্বাসকৃচ্ছ্র, এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার লক্ষণ চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

ইহা তিনি অবশ্য জানেন, কিন্তু আমাদের প্রেম যদি তাঁহার প্রেমের ন্যায় কখনও অন্তরিত না হয়, তাহা হইলে কোন না কোন কালে উহারও যে জয়লাভ হইবে, তাহাতে আমরাই বা কেন সংশয় করিব ?

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম স্থাপন সহজ, মানুষের প্রতি নয়, এখন আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। নরনারীর প্রতি প্রেম সাধন অতি কঠিন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম না জন্মিলে তাহাদের প্রতি অক্ষুন্ন প্রেম উৎপন্ন কখনই হইতে পারে না। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মানবজাতির প্রতি প্রেম সাধন করিব, এ ভ্রম কখন আমাদের মনে থাকা উচিত নয়। এরূপে প্রেম সাধন করিতে গেলে ক্রমশঃ নরনারীর দুর্ব্যবহার দেখিয়া আমরা প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণা সঞ্চয় করিব, পরিশেষে সমগ্র নরবিদ্বেষী হইয়া উঠিব। কোন পুরুষ বা নারীকে প্রেমের পাত্র আমরা কখনই মনে করিতাম না, যদি তাহাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস না থাকিত। আমরা একটি আদর্শ চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া নরনারীকে সেই আদর্শের মত মনে করিয়া যদি ভাল বাসি ; সময়ে যখন তাহাদের চরিত্র ও ব্যবহার সে আদর্শের বিপরীত তাহাদিগকে প্রমাণ করিবে, তখন আর কি সে ভালবাসা আমরা রক্ষা করিতে পারিব ? ঈশা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধু মহাজনগণ প্রেমসাধনে যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন আমরা যদি সে পথ না ধরি তাহা হইলে প্রেম সাধন কিছুতেই হইবে না। তাঁহারা আগে নরনারীকে প্রেম করিতে যান নাই, আগে প্রেম করিয়াছেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর যখন তাঁহাদের সমগ্র হৃদয় অধিকার করিলেন, তখন সে হৃদয়ের উপরে আর তাঁহাদের কোন অধিকার রহিল না। পূর্ব্বে যে হৃদয় স্বার্থপর হইয়া আত্মীয় স্বজনে বদ্ধ ছিল, এখন উহা পাপী তাপী সকলের উপরে ছড়াইয়া পড়িল। ঈশ্বরের প্রেম যখন তাঁহাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে তখন এরূপ না হইয়া থাকিবে কিরূপে ?

আমরা যখন সাধক হইয়াছি, তখন আমাদের প্রেম সাধন না করিলেতো কিছুতেই চলিবে না। যে উদার প্রেম সমুদয় নরনারীকে এক সূত্রে বাঁধিবে, সকলকে এক প্রেমের পরিবার করিবে, শত্রুও মিত্র হইয়া যাইবে, কেবল পৃথিবীর নরনারী নহে স্বর্গের সাধু মহাজন দেবগণ সেই প্রেমপরিবারের অন্তর্ভূত হইবে, সে উদার প্রেম কি আমাদের মানবীয় ক্ষুদ্র প্রেম হইতে পারে ? আমরা যদি ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমে আমাদিগকে ডুবাইয়া না দি, তাহা হইলে এ প্রেমের অধিকারী আমরা কিছুতেই হইতে পারি না। আমাদের প্রেমের যে একটা সীমা আছে। কতক দূর গিয়া বাধা পাইলে আর উহা অগ্রসর হয় না। এ সীমা আসিল কোথা হইতে ? বাসনা কামনা হইতে। আমরা বাসনা কামনার দাস, প্রেম করিতে গিয়াও কোন না কোন একটী বাসনা কামনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেই বাসনা কামনা যখন কিছুতেই পূর্ণ হইতেছেনা দেখিতে পাই, তখন আর প্রেম অগ্রসর হয় না, অল্পে অল্পে অপ্রেম আসিয়া প্রেমের স্থান অধিকার করে। যেখানে ক্ষুদ্র বাসনা কামনা প্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে, সেখানে প্রেম অতি অল্পদিনের মধ্যেই চলিয়া যায়। আমাদের বাসনা কামনা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে চির জীবন প্রেম কাহারও প্রতি স্থির রাখা কখনই সম্ভব নহে। নরনারীর প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত বাসনা কামনা কি ? তাহাদের অনন্ত কল্যাণ তাহাদের পরিত্রাণ। আমরা তাহাদিগকে ভাল বাসিব কেন ? তাহাদের কল্যাণ, তাহাদের পরিত্রাণ সাধন জন্য। দিবারজনী কেবলই নরনারীর কল্যাণ চিন্তা করিব। কিসে তাহারা ঈশ্বরকে লইয়া অনন্ত সুখে সুখী হয় ইহারই জন্য হৃদয় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবে। এসম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে নিরাশ হইয়াও হতাশ হইব না, কেন না আমরা জানি, আমরা তাহাদের জন্য যে অভিলাষ করিতেছি, সে অভিলাষ আমাদের নহে ঈশ্বরেরও। আমরা যাহাদিগকে ভাল বাসি তাহাদিগকে যদি এইরূপে ভাল বাসিতে পারি তাহা হইলে আর কি কোন কালে তাহাদের প্রতি আমাদের ভাল বাসা কমিবে ? যদি ভাল বাসিতে হয় তবে যেন ঈশ্বরের ভাল বাসায় আমরা ভাল বাসি। মানুষের মত মানুষকে যদি আমরা ভাল বাসিতে যাই, তবে সে ভাল বাসা কয়েক দিন থাকিবে পরে থাকিবে না। নবধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ এ প্রকার অস্থায়ী ভাল বাসা নরনারীকে কখন দিতে পারেন না। যে ভাল বাসা একবার তাঁহারা দিলেন, সে ভাল বাসা জীবনে মরণে সকল অবস্থায় ঠিক থাকিবে। নরনারীর প্রতি ঈশ্বরের যে ভাল বাসা, সেই ভাল বাসা যদি আমাদের না হয়, তাহা হইলে আমরা চিরস্থায়ী ভাল বাসা কি প্রকারে অন্যকে দিব ? দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, সকলের প্রতি তাঁহার যে ভাল বাসা সেই ভাল বাসা সাধন করিয়া যেন আমরা কৃতার্থ হই।

বিশেষ নিবেদন।

নিম্ন লিখিত পত্র খানিতে আমাদের বিশেষ নিবেদন সংক্ষেপে অভিব্যক্ত। এই পত্র অনেক ব্রাহ্মবন্ধু ও আত্মীয়া মহিলার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। ভরসা করি তাঁহারা কেহই ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না।

"সসম্ভ্রম নিবেদন—

"বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টবিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা যে প্রণালীতে প্রদত্ত হয়, তাহা স্ত্রীজাতির উপযোগী নহে। এজন্য শ্রীমৎকেশবচন্দ্র সেন নবীন প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে ভিক্টোরিয়া কলেজ ও তাহার অন্তর্গত বালিকাবিদ্যালয় অনেক দিন প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মধ্যে কতক দিন স্থগিত ছিল। সম্প্রতি অবার প্রায় তিন বৎসর ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। বালিকাবিদ্যালয় বিভাগে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য সত্ত্বেও অর্থের অসচ্ছলতা জন্য কলেজ ও তৎসংসৃষ্ট বালিকাবিদ্যালয়ের আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। কলেজসংসৃষ্ট ছাত্রীনিবাসে কতকগুলি ছাত্রও আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী ছাত্রীর শিক্ষাদি সম্বন্ধয়

ব্যক্তিগণের দয়াসাপেক্ষ। নারীজাতির যাঁহারা হিতাকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদিগের দয়ার উপর অনাটন নিবারণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব নিবেদন আপনি দয়া করিয়া কিছু নিয়মিত মাসিক সাহায্য দিয়া ঐ কার্য্যের স্থায়িত্বের পক্ষে আনুকূল্য করিবেন।"

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী।
সেক্রেটরী।
২০ নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।"

দুইটী মাতৃহীনা নিরাশ্রয়া দুঃখিনী কন্যাকে ছাত্রীনিবাসে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন ছাত্রীনিবাসাধ্যক্ষা একটী দুঃখিনী বিধবা কন্যার ভরণ পোষণাদির সমগ্র ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পরন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মের এমন ৩টী বালিকা ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছে যে, তাহাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদির জন্য প্রতি মাসে যে ব্যয় হয় তাহাদিগের অভিভাবকগণ সে ব্যয় সমগ্র পূরণ করিতে পারেন না। একটী বালিকার পিতা ব্যয়ের কিয়দংশ মাত্র প্রদান করেন, অবশিষ্ট সমুদয় ব্যয় ছাত্রীনিবাসের অধ্যক্ষ মহাশয় বহন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুই জন প্রচারক সপরিবারে ছাত্রীনিবাসে স্থিতি করিয়া ছাত্রীদিগের তত্ত্বাবধান এবং ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। দরিদ্র ব্রাহ্ম বালিকার স্বল্পব্যয়ে ধর্ম্ম ও নীতি এবং বিদ্যাশিক্ষাদির সুবিধা এস্থান অপেক্ষা অন্যত্র নাই। একটী উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দয়া করিয়া বিনা বেতনে নিয়মিতরূপে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। অপর দুই জন শিক্ষয়িত্রীকে কিছু কিছু সাহায্য দান করিতে হয়। এক জন শিক্ষককে নিয়মিতরূপে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। দুই জন প্রচারক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন। বাড়ীভাড়া এবং ছাত্রীদিগকে প্রতিদিন স্কুলে আনয়ন ও বাড়ীতে প্রেরণে গাড়ী ভাড়ার দরুণ বহু অর্থ ব্যয় হয়। গবর্ণমেণ্টের মাসিক সাহায্য অতি সামান্য, ১২৲ মাত্র। ১৲ করিয়া ছাত্রীবেতন গৃহীত হয়, ছাত্রীবেতনে আয় অধিক হয় না। তাহাতে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া উঠে না। কলেজ বিভাগে বক্তৃতার দিন মহিলাদিগের আনয়নে ও প্রেরণে গাড়ী ভাড়া যোগাইতে হয়। সুযোগ্য বক্তা ও উপদেষ্টা মহোদয়গণ দয়া করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ বিষয়ে উপদেশ ও বক্তৃতা দান করিয়া থাকেন। নারীজাতির উন্নতির জন্য এই বিদ্যালয়। নারীহিতৈষিণী সদাশয়া মহিলাদিগের নিকটে তাঁহারা অধিকতর সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করেন। যিনি এই সৎকার্য্যে মাসিক যাহা দিতে পারেন আশা করি তাহা দান করিয়া ও দানাঙ্গীকার জানাইয়া বিদ্যালয়ের সমুন্নতিবিধানে সহায়তা করিবেন। ১৲ বা ।০ দানও আদরের সহিত গৃহীত হইবে। গৃহিণীরা দৈনিক সাংসারিক খরচ হইতে কিছু কিছু অর্থ বাঁচাইয়া মাসে মাসে অনায়াসে এই পবিত্র কার্য্যে সাহায্য করিতে সুক্ষম, এবং বিবাহ নামকরণাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কিছু কিছু অর্থ একদা দান করিতে পারেন।

সংবাদ।

বিগত ২৫শে বৈশাখ শনিবার ৩নং রমানাথ মজুমদারের লেনে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভার সঙ্গে খিদিরপুরনিবাসী শ্রীমান্ ক্ষেত্রমোহন ঘোষের শুভ পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় পৌরোহিত্য ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রেমময় পরমেশ্বর নবদম্পতীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

আগামী ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় এল্‌বার্ট হলে উপস্থিত মহামারীসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য ব্রাহ্মদিগের এক সভা হইবে। সমুদায় ব্রাহ্মের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আমাদের কার্য্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র ২০ নং পটুয়াটোলা লেন হইতে ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে। সকলে চিঠী পত্রাদি শেষোক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিগত ১৭ই বৈশাখ শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বসুর ৪র্থ পুত্রের জাতকর্ম্ম তাঁহার বহুবাজারস্থ ভবনে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

অগ্রজপাদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সপরিবার ধর্ম্মশৈলে চলিয়া গিয়াছেন। গত রবিবার হইতে সামাজিক উপাসনার কার্য্য উপাধ্যায় সম্পাদন করিতেছেন।

প্রেরিত।

শান্তিপুর ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরনির্ম্মাণার্থ যে সকল মহোদয় অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ধাম ও দানের পরিমাণ ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

এখনও অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। বাবু হরেন্দ্র নারায়ণ মৈত্রেয় মহাশয় এ নিমিত্ত ভাগলপুরে গমন করিয়াছেন।

শান্তিপুর ব্রাহ্মমিশন স্কুলের জন্যও দান সংগৃহীত হইতেছে। অনেক মহাত্মা দান করিতেছেন।

দাতৃগণের নাম ধাম ও দানের পরিমাণ।

শ্রীযুক্ত বাবু	হীরালাল প্রামাণিক,	শান্তিপুর	২০০৲
" "	হরিচরণ প্রামাণিক	ঐ	২০৲
" "	রামগোপাল মুন্সী উকিল	ঐ	৫৲
" "	বসন্তকুমার দে	ঐ	২৲
" "	বিশ্বেশ্বর দাস	ঐ	১৲
" "	শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য	ঐ	২৲
" "	রামগোপাল চক্রবর্ত্তী	ঐ	১৲
" "	দ্বারকানাথ সরকার,	কৃষ্ণনগর	১০৲
" "	কে, সি, গুপ্ত স্কোয়ার	ঐ	১০৲
" "	তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল	ঐ	৫৲
" "	প্রসন্নকুমার বসু, উকিল	ঐ	১০৲

(ক্রমশঃ)

এই পত্রিকা ২০নং পটুয়াটোলা লেন, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক ২রা জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
১০ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে করুণানিলয়, তোমার করুণা তোমার বিরুদ্ধ অভিলাষ হইতে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত নিবৃত্ত করিতে চায়, কিন্তু আমরা কেন সেই অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতে এত ভালবাসি। কৈ সেই বিরুদ্ধ অভিলাষতো একদিনের জন্যও আমাদিগকে সুখী করিতে পারে না, কেবলই তাহাতে অন্তরের জ্বালা বৃদ্ধি হয়। কঠিন প্রস্তরের উপরে যদি মুষ্ট্যাঘাত করা যায়, প্রস্তরের কিছুই হয় না স্বীয় মুষ্টিই ব্যথিত হয়। তোমার ইচ্ছা বজ্রসদৃশ কঠিন ও অনড়, আমাদের অভিলাষ যতবার তাহার প্রতিকূলে আহত হয়, ক্লেশ যন্ত্রণা ও দুঃখ বিনা তাহা হইতে আর কি লাভের সম্ভাবনা। পৃথিবীতে দুঃখ দারিদ্র্য পরীক্ষা বিপৎ লোকদিগকে প্রতিনিয়ত আকুল ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে; তোমার প্রতি যাঁহারা আশ্বস্তবান্ তাঁহারা এ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। যদি তাঁহাদের হৃদয়ে তোমার বিরোধী অভিলাষ অণুমাত্র স্থান পায়, তাঁহারা আপনাদের হৃদয়ে নরকাগ্নি প্রজ্বালিত দেখিতে পান। হে দেব, যে অভিলাষ ধর্ম্মসঙ্গত, বিশুদ্ধ, তাহাও যদি সেই ব্যক্তির পোষণ করা তোমার অভিমত না হয়, কেন না তাহার জীবনের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই, অপরের জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ, তাহা হইলে তাদৃশ অভিলাষও সে ব্যক্তির সম্বন্ধে অবৈধ এবং পতনের মূল। তুমি আমাদের সম্বন্ধে, আমাদিগের আত্মীয়স্বজনসম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা কর, কেবল তাহারই অনুসরণে আমাদিগের জীবনের উন্নতি ও কৃতার্থতা। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের উপযোগী তোমার বিশেষ বিশেষ ইচ্ছা আছে, সে সমুদায় যদি তাহারা পালন করে, জনসমাজ অপূর্ব্ব সুখের অবস্থায় উপস্থিত হয়। সকলে একই কাজ করিলে যেমন জনসমাজ উৎসন্ন যায়, তেমনি সকলের জীবন একই প্রকার হইলে উহা বিচিত্রতার অভাবে জীবনশূন্য হইয়া পড়ে। তোমার ইচ্ছা লোকদিগের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছে, জীবনের গতিও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। জীবনপ্রসূত কার্য্য, কার্য্যসমুদ্ভূত জীবন। জীবনের মূলে আদিতে যে ভাব ও স্বভাব তুমি স্থাপন করিয়াছ, তাহা হইতে কার্য্য উপস্থিত হয়, আবার সেই কার্য্য হইতে জীবন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাহারা ইহা না বুঝিয়া আপনাদের জীবনকে মূলশূন্য মনে করে, এবং জীবনসম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যাইতে পারে, এরূপ কুবুদ্ধির অনুসরণ করে, তাহাদের ইহলোকেও সুখ

হয় না, পরলোকেও সুখ হয় না। হে কৃপানিধান, আশীর্ব্বাদ কর যেন এরূপ কুবুদ্ধি কখন আমাদের উপস্থিত না হয়। যখনই আমরা জানিব, অমুক অভিলাষ বিশুদ্ধ হইলেও তোমার ইচ্ছাসঙ্গত নয়, তখনই যেন তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, এবং উহাকে মনে স্থান না দিই, এই তব পাদপদ্মে ভিক্ষা করিয়া বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি।

অনন্ত স্বরূপের প্রভাব।

শক্তি ও জ্ঞানেতে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ, কেন না এ উভয়ের পার্থক্য করিবার অতি অল্পই হেতু আছে। কিন্তু যখন আমরা অনন্ত স্বরূপে উপস্থিত হই, তখন জীব ও ব্রহ্মে এত প্রভেদ হইয়া পড়ে যে, আর কোন কালে যে এ দুইয়ের একত্ব সাধিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত মনে আইসে না। অনন্ত এই শব্দ উচ্চারণমাত্র তদতিরিক্ত আর সকলের অবকাশ অন্তর্হিত হয়, এক ব্রহ্মমাত্র অবস্থান করেন। অনন্ত ছাড়া আর কিছু আছে ইহা ভাবিতে পারা যায় না, কেন না আর কিছু থাকিলে তদ্দ্বারা অনন্তের অনন্তত্বের ন্যূনতা উপস্থিত হয়। অনন্তে কিঞ্চিন্ন্যূনতা কল্পনা করিলেই আর অনন্তত্ব রহিল না, অনন্ত সীমার ভিতরে আসিয়া পড়িলেন। জ্ঞানের এই অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত অতিক্রম করিবার জন্য অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি, অপরিজ্ঞেয়বাদের সৃষ্টি। অনন্তসম্বন্ধে ঈদৃশ চিন্তা জীবনের উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে প্রথমতঃ তাহাই পর্য্যালোচনা করা যাউক।

অনন্তের নিকটে যখন সমুদায় নিরবকাশ এবং মিথ্যা হইয়া গেল, তখন জগৎ ও জীবের প্রতি প্রথমতঃ অনাস্থা উপস্থিত। ইহারা সকলেই মিথ্যা, ক্ষণিক, দৃশ্যমাত্র, মূলতঃ সত্য নয়, ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধও ক্ষণিক; জলবুদ্বুদের ন্যায় অনন্ত সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া ইহারা আবার ভাঙ্গিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। এই সকল ক্ষণিক মিথ্যাভূত জীবাদি ব্রহ্মভাবলাভের অন্তরায় ও আবরণ, অতএব বলপূর্ব্বক ইহাদের সহিত সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দিয়া সমুদায় সম্বন্ধের অতীত যিনি তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাওয়াই প্রত্যেক সাধকের যত্নের বিষয় হয়। বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ, নির্জ্জনবাস, কৃচ্ছ্রসাধন, দেহত্যাগ ইত্যাদি কঠোর পথ আশ্রয় করিয়া সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগের জন্য এ অবস্থায় প্রযত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বা বৌদ্ধগণ এই পথের পথিক হইয়া কি করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে অনন্তের এই নিরবকাশভাবের প্রভাব জীবনের উপরে কি প্রকার, অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। অতএব এ সম্বন্ধে আর কিছু অধিক বলিবার প্রয়োজন করে না; অনন্তস্বরূপে যে আর একটি ভাব আছে, এখন সেইটির প্রভাব চিন্তা করা যাউক।

অনন্ত জড় নহেন, চৈতন্য। আকৃতি ও বিস্তৃতি বিনা জড় কল্পনা করা যায় না। আকৃতি ও বিস্তৃতি থাকিলেই সীমা অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং অনন্তকে জড় বলিতে পারি না। উহাঁকে চৈতন্য শক্তি বলিতে পারি। শক্তির কোন আকার বা বিস্তৃতি নাই, সুতরাং অনন্ত অনন্তশক্তি ইহা বলিতে পারা যায়, কিন্তু শক্তি যদি নিয়ত পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কার্য্য করেন, তবে ঐ শক্তিকে আমরা চৈতন্যশক্তি বলি। মূলশক্তিতে নিয়ত তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাতে অন্ধত্বের অবকাশ নাই। এই অনন্ত চৈতন্যশক্তি আপন সত্তায় সত্তাবান্, অন্যসাপেক্ষ ইঁহার সত্তা নহে। যদি অন্য-সাপেক্ষ ইঁহার সত্তা না হইল, তাহা হইলে আর যাহা কিছু আছে, তাহার সত্তা ইঁহারই সত্তা-সাপেক্ষ। ইঁহার সত্তাসাপেক্ষ যখন হইল, তখন তাহারা ইঁহার অতিরিক্ত নহে, ইঁহারই অন্তর্ভূত। অন্তর্ভূত হইলে আর তাহারা ইঁহাকে সীমাবিশিষ্ট করিতে পারিল না। এ বিষয় আমরা অনেক বার আলোচনা করিয়াছি, চিন্তার যোগ রক্ষার জন্য আবার পুনরায় উহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

এখন দেখা যাউক এই অনন্তের দ্বিতীয় ভাব আমাদের জীবনের উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

জীব ও জগৎ কোথায়? অনন্তের মধ্যে। অনন্ত স্বয়ং সম্বন্ধবিরহিত হইলেও ইহারা অনন্তের সহিত চিরসম্বন্ধে আবদ্ধ। ইহাদের যখন অনন্তের সহিত সম্বন্ধ আছে, তখন অনন্ত সম্বন্ধবিরহিত আর রহিলেন কোথায়? যদি তিনি সম্বন্ধবান্ হইলেন, তাহা হইলে তদতিরিক্ত পদার্থের চিন্তা মনে উদিত হইয়া পূর্ব্ববৎ সীমাবিশিষ্টত্বের দোষ তাঁহাতে উপস্থিত। অনন্তের অতিরিক্ত ভূমি নাই, সুতরাং তদতিরিক্ত ভূমিস্থ কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটে না, এই অর্থে তিনি সম্বন্ধবিরহিত। কিন্তু আপনার অভ্যন্তরে জীব ও জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ প্রতিযোগীর সহিত সম্বন্ধ নহে বলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধবিরহিতত্ব ঘুচিল না। অনন্তেতে জীব ও জগতের বাস কেবল বাসমাত্র নহে, সেই অনন্ত হইতেই তাহাদের শক্তি জ্ঞান আদি সকলই। অনন্ত হইতে জ্ঞান-শক্ত্যাদির প্রবেশের বিরতি হইতে পারে না, উহা বিরামস্বভাবের বিপরীত; সুতরাং জগৎ ও জীবের নিত্যকাল স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। জীব ও জগতের অনন্তের সহিত নিত্যসম্বন্ধবশতঃ উহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধও নিত্য। যাহাদিগের বাসস্থল এক, এক হইতে পোষণসামগ্রীলাভ, তাহারা কোন কালে পরস্পরের পর হইতে পারে না। অনন্তের নিরবকাশভাবে বৈরাগ্য, সংসারের সকল প্রকার সম্বন্ধের প্রতি ঔদাসীন্য ও তুচ্ছতা, অনন্তের অন্তর্ভাবক ভাবে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে জগৎ ও জীবের সহিত নিত্যসম্বন্ধবশতঃ বৈরাগ্যের স্থল অনুরাগ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। এ পরিবর্ত্তন কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন নহে, এবং ইহার প্রভাবও যে অতি প্রবলতর তাহাতে আর সংশয় কি?

অনন্তের সহিত সম্বন্ধ অনুভব করিয়া জীব আপনার নিত্যত্ব বিষয়ে প্রথমতঃ নিঃসংশয় হয়। দুদিনের জন্য জীবন নয়, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে জীবনের প্রতি আর অনাদর থাকে না। এখন জীবন অপূর্ণ, ক্রমান্বয়ে ইহা পূর্ণ হইতে থাকিবে, এ জ্ঞান যখন সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, তখন এ জীবনের মূল্যবত্তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। ক্ষুদ্র শিশুতে যে সম্ভাবনা আছে, সে সম্ভাবনা কালে উদ্ভিন্ন হইয়া, তাহা হইতে নিউটন গালালিও সেক্সপিয়র ঈশা চৈতন্য প্রভৃতির উদয় হইয়া থাকে। এই ব্যাপার হইতেই সেই সম্ভাবনার ভিতরে আরও যে কত কি আছে, আমরা বিজ্ঞান দৃষ্টিতে বুঝিতে পারি। আদিম মানবজাতি, আর আজকার মানবজাতি জ্ঞানাদিতে যত পৃথক্, এই মানবজাতি সহস্রকোটি বৎসর পরে আরও তদপেক্ষা কত পৃথক্ হইবে, আমাদের বুদ্ধিতে তাহা প্রবেশ করে না। জাতিসম্বন্ধে যাহা প্রত্যেক মানবসম্বন্ধে তাহাই বলিতে হইবে। অনন্তের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যখন নিত্যজীবনবিষয়ে নিঃসংশয় জ্ঞান উপস্থিত, তখন তাহার প্রভাব যে কত দূর জীবনে বিস্তৃত হয় তাহা এই সকল চিন্তায় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

প্রথমতঃ অনন্তশক্তির অনন্তক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাসবশতঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতম পদার্থের অনন্তবিচিত্রতা দেখিবার জন্য কৌতূহল উপস্থিত হয়। এই কৌতূহল হইতে বিজ্ঞানরাজ্যের উন্নতি। বিজ্ঞান যত নূতন নূতন অদ্ভুত অলৌকিক বিচিত্র সৌন্দর্য্য জ্ঞান কৌশল প্রকাশ করিতেছে, ততই আরও কত সৌন্দর্য্য ও জ্ঞান কৌশল জগতে ও জীবে বিরাজমান তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। ইহাতে যেমন জ্ঞানের উন্নতি তেমনি হৃদয়ের উন্নতি। এ বিভাগের উন্নতি কোন কালে শেষ হইতে পারে না। কে কবে অনন্ত শক্তির বিচিত্র ক্রিয়া নিঃশেষরূপে দর্শন করিয়া আর দেখিবার নাই জানিবার নাই, ইহা বলিয়া আপনার মনের গতি স্থগিত করিবে? নূতন নূতন রহস্য উদ্ভেদের সঙ্গে সঙ্গে রহস্য আরও গভীর হইতে গভীর হইয়া থাকে, ইহা কি আমারা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি

না? অনন্তের অনন্তক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত জীবন ক্রমান্বয়ে না দেখিয়া না জানিয়া কখন নিবৃত্ত থাকিতে পারে না। এই জগতের বিচিত্রব্যাপার সমুদায় ক্রমান্বয়ে আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে ও প্রকাশ পাইবে, এবং তজ্জন্য আমাদের জীবনের উপরে অনন্তের প্রভাব কোন কালে বিজ্ঞানরাজ্যেও অন্তর্হিত হইবার নহে।

অনন্ত শক্তির পর অনন্ত জ্ঞান হইতে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিন দিন তাহার নিয়তি বুঝিতেছে। মানবসমাজের জ্ঞানের আদিমাবস্থা চিন্তা কর, আর আজ পৃথিবীর জ্ঞানসম্বন্ধে কত দূর উন্নতি হইয়াছে দেখ, এবং এই জ্ঞানের উন্নতির সম্ভাবনা আরও কত ভাব। উহার সহিত অনন্ত জ্ঞানের বিষয়কে সংযুক্ত কর, দেখিবে অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে সহানুভূতিবশতঃ বিজ্ঞানচক্ষে অনন্ত ভবিষ্যতে তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞান অপার ও অসীম হইয়া গিয়াছে। যদি তোমার প্রাণের অভ্যন্তরে অনন্তের প্রভাব বিরাজমান না থাকিত, তাহা হইলে তুমি আর এরূপ অনন্তজ্ঞানবিস্তারলাভের আশায় কোন দিন আশান্বিত হইতে পারিতে না। ঈশ্বরের সমুদায় স্বরূপের সহিত অনন্তত্ব সংযুক্ত, সুতরাং জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদিতে তোমার অশেষ পরিবৃদ্ধি ইহা যখন তুমি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে, তখন তুমি আর অনন্তের প্রভাব অনন্ত না বলিয়া থাকিতে পারিবে না।

সুস্থ ও অসুস্থ।

কে সুস্থ কে অসুস্থ? এ জ্ঞান থাকা প্রতিজনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না শরীর যখন সুস্থ তখন সুস্থ ব্যক্তির সহিত লোকে যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি কখন সে প্রকার ব্যবহার করে না। সুস্থতা বা অসুস্থতা কেবল শরীরসম্বন্ধেই আছে তাহা নহে, মনের সম্বন্ধেও সুস্থতা ও অসুস্থতা আছে। শরীরের রোগ লোকে সহজে ধরিয়া ফেলে, মনের রোগ সহজে ধরিতে পারে না। পারে না এই জন্য যে, অধিকাংশ লোকেই মানসিক রোগে অসুস্থ। অসুস্থ ব্যক্তিগণের ব্যবহার অন্য অসুস্থ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে দয়াপ্রণোদিত হইবে, ইহা কখন সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ রোগই যখন কেহ বুঝিতে পারিতেছে না, তখন রোগীর প্রতি সুস্থের যে প্রকার, সে প্রকার ব্যবহার হইবে কি প্রকারে?

ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিগণের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান থাকা যে প্রকার প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা তদপেক্ষা অল্প প্রয়োজন নহে। তোমার প্রতিবেশী বা তোমার পরিবারস্থ কেহ যদি রোগাতুর হয়, তজ্জন্য তৎপ্রতি সকরুণ ব্যবহার তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, ইহা তুমি স্বীকার কর, কিন্তু পরিবার ও প্রতিবেশীর মধ্যে কাহাকেও যদি মানসিক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত দেখ, তাহা হইলে তুমি তাহাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা দূরে থাকুক, অতি কঠিন ব্যবহার করিয়া থাক, ইহা কি ধর্ম্মসঙ্গত? তুমি বলিবে, যে ব্যক্তি যে প্রকার ব্যবহার করে তৎপ্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই ন্যায়সঙ্গত। আমি যদি পরিজনবর্গ বা প্রতিবেশীর কাহারও অনুচিত ব্যবহারের জন্য তৎপ্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করি, তুমি আমাকে তজ্জন্য দোষ দিতে পার না, এবং সে ব্যবহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার ইহাও তোমার বলা সমুচিত নয়। আমি বলি, যে সময়ে সমাজের সকল লোক রোগগ্রস্ত, সে সময়ে তাহাদের পরস্পরের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লইয়া তুমি আপনার ব্যবহার নিয়মিত করিতে চাও, ইহাতে তুমি যে উচ্চধর্ম্মাশ্রয়ী, তোমার মন দিন দিন সুস্থ হইতেছে, ইহাতো তুমি প্রমাণ করিতেছ না? "চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু এবং দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত" ইহা সেই সকল লোকের অসুস্থতাবস্থার সময়ের বিধান, কিন্তু সুস্থতার সময়ের বিধান এই, "তোমরা অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না, বরং যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিবে, তাহাকে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া

দিবে।" এরূপে বিধি পরিবর্ত্তিত হইল কেন বলিতে পার ?

তুমি একটু বিচার করিয়া দেখ দেখিবে, যে ব্যক্তি তোমার দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিল, সে ব্যক্তি সুস্থমনা নহে, সে বিকারগ্রস্ত। বিকারগ্রস্ত রোগী যদি তোমায় চপেটাঘাত করে, তুমি কি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রতিঘাত করিবে, না আরও আঘাত বহন করিয়া তাহাকে সুস্থতায় আনিবার জন্য যত্ন করিবে ? অবশ্য তুমি তাহার শত আঘাত সহ্য করিয়া সদয় ব্যবহার দ্বারা তাহাকে প্রশান্ত করিবে। ক্রোধ লোভাদির অধীন হইয়া যে ব্যক্তি বিকারগ্রস্ত, তাহার সহিত তুমিও কি বিকারগ্রস্ত হইবে, না আপনার চিত্ত নিয়ত সংযত রাখিয়া সকরুণ ব্যবহার দ্বারা তাহার মন সুস্থতায় প্রত্যানয়ন করিবে ? তুমি যদি চিরসুস্থ থাকিতে চাও, এ সম্বন্ধে তোমায় সর্ব্বদা সাবহিত থাকিতে হইবে। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই কোন না কোন প্রকার মানসিক বিকারের অধীন। তুমি যদি আপনি সুস্থমনা হও, তাহাদের রোগ সহজে বুঝিতে পারিবে, এবং রোগ বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করা তোমার আর কঠিন হইবে না। অসুস্থগণের সঙ্গে তুমিও যদি অসুস্থ হইলে তোমার দ্বারা দয়াব্রত সাধিত হইল কোথায় ? চারিদিকে ভীষণরোগে আক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে তুমি নিয়ত বাস করিতেছ, ইহা জানিয়া তোমার তাহাদের সেবাব্রতে নিয়ত নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাকে নীরোগ রাখিবার উপায় ভগবচ্চরণাশ্রয়। সে চরণাশ্রয় বিনা তুমি আপনাকে নীরোগ রাখিয়া সকলের সেবা করিতে পারিবে, ইহার কোন সম্ভাবনা নাই।

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শত্রুদিগকে প্রীতি কর, যাহারা তোমাদিগকে অভিশাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, এবং যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদিগের হিতসাধন কর, এবং যাহারা তোমাদিগকে বিদ্বেষ এবং নির্য্যাতন করে, তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা কর।" তাঁহার এ সকল কথা তুমি কি প্রকারে জীবনে প্রতিপালন করিবে, যদি তুমি আপনি সুস্থমনা না হও। সুস্থমনার অর্থ কি জান ? ঈশ্বর ভাবাপন্নতা। যখন তুমি ইচ্ছায় ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তখন তুমি সুস্থ, যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছ তখন তুমি বিকারগ্রস্ত। বোধ হয়, এখন তুমি বুঝিতে পারিলে সুস্থতা ও অসুস্থতা কাহাকে বলে ? সুস্থতা ঈশ্বরেতে বাস, অসুস্থতা নীচবাসনায় স্থিতি। যদি বল এরূপে নিয়ত ঈশ্বরে বাস কি আমাতে সম্ভব ? যদি অসম্ভব না হইল, আপনাতে সুস্থতা স্বীকার করিয়া অপরের সেবায় কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইবে ? শরীরসম্বন্ধে পূর্ণ স্বাস্থ্য অসম্ভব হইলেও স্থূলতঃ সুস্থতা গণনা করিয়া যেরূপ আপনাকে সুস্থ মনে কর, এবং প্রবল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সেবায় কুণ্ঠিত হও না, সেইরূপ মনের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে স্থূলতঃ আপনাতে স্বাস্থ্য দর্শন করিয়া প্রবল মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সেবা করিবে, ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে ? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আপনাকে পাপী রোগী জানিয়াও পরসেবার কর্ত্তব্য হইতে, মানসরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সকরুণ ব্যবহার হইতে, তুমি কোন কারণে নিবৃত্ত থাকিতে পার না।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

তুমি অজস্র পরিশ্রম করিতেছ, সেবা করিতেছ, ইহা দেখিয়া কে না তোমার প্রশংসা করিবে ? যখন পরিশ্রমে সেবায় তোমার মুখে বিরক্তির চিহ্ন নাই, প্রফুল্লচিত্তে সমুদয় কার্য্য করিতেছ, ইহা লোকে দেখিতে পাইতেছে, তখন তাহারা অবশ্য আশ্চর্য্য হইয়া তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। জিজ্ঞাসা করি, কাজ করিয়া আত্মীয়জনের সেবা করিয়া যে আমোদ হয় তাহা হইতে, না আরও কোন গভীর মূল হইতে এই অবিরক্তি ও প্রফুল্লতা উৎপন্ন ? কেবল কাজ করিয়া সেবা করিয়া যে আমোদ তাহা স্থায়ী হয় না। এমন সময় আসে এমন অবস্থা আসে, যে সময়ে যে অবস্থায় আর সে আমোদ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাণের গভীর স্থান হইতে যে অনু-

মোদন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে যে প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহার কোন দিন বিরাম নাই।

পৃথিবীতে অত্যন্ত ভয়ের বিষয় কি? এমন কোন অভিলাষ পোষণ করা যাহার সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই, বা হইবার সম্ভাবনা নাই। এই অভিলাষ নিয়ত কণ্টকের ন্যায় তোমায় বিদ্ধ করিবে, অথচ তুমি উহাকে আর ছাড়িতে পারিবে না। তুমি মনে করিতেছ, কোন একটি নির্দ্দোষ অভিলাষ মনে স্থান দিয়াছি বলিয়া কি আমাতে নিপীড়ন উপস্থিত হইবে? যদি তুমি ঈশ্বরের হইয়া থাক, তাহা হইলে তাদৃশ অভিলাষ তোমায় নিপীড়ন করিবেই করিবে। যাহারা ঈশ্বরের হয় নাই, তাহাদের চিত্ত অভিলাষময়। তাহাদের ক্ষমা আছে, কিন্তু তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত জানিয়া তবে কোন অভিলাষ মনে স্থান দিবে, এই প্রতিজ্ঞায় জীবন আরম্ভ করিয়াছ। তুমি তোমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ক্ষমা পাইবে, এরূপ আশা কেন বৃথা হৃদয়ে পোষণ করিতেছ?

অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞার সূত্র বড়ই সুদৃঢ়। অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা পালনের বল ঈশ্বর হইতে সমাগত হয়। কিন্তু জানিও, যে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরের ইচ্ছা-সঙ্গত নয়, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধি, নিয়ম ও স্বভাবের বিরোধী, সেখানে আশা করিও না যে, তোমার উহা পালন করিবার বল ঈশ্বর হইতে আসিবে। যদি কোন অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা মোহবশতঃ করিয়া থাক, এবং পরে দেখিতে পাও যে, উহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত হয় নাই, তজ্জন্য অনুতপ্ত হও, এবং ঈশ্বরের নিকটে আলোক ভিক্ষা কর যে, কোন্ আকারে সেই প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা-সঙ্গতরূপে প্রতিপালন করিতে পার। ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী অংশ পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশেষ থাকে, তাহা প্রাণপণে পালন করিতে কুণ্ঠিত হইও না। কেন না সেই আংশিক প্রতিপালন সত্যভঙ্গের পাপ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী অংশ পরিত্যাগ করাতে তাঁহার সঙ্গে তোমার সম্মিলনের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।

অজানিতের প্রভাব।

২৫শে মাঘ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

(শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিবৃত)

আমরা অজানিতের ভক্ত, অজানিতকে ভাল বাসি, অজানিতকে একান্ত বিশ্বাস করি, যিনি চির অজানিত, আমরা তাঁহার উপাসনা করি, অজানিতের অব্যক্ত হস্তে আমরা পরিচালিত। কেন না যে যাহা জানে তাহাতে আর বিশ্বাস করিবে কি? যাহা জানা হইয়াছে তাহার জন্য আর নূতন আগ্রহ কি? বিশ্বাস আমাদিগের ধর্ম্মপথের নেতা। বিশ্বাস অদৃশ্য বস্তুর প্রমাণদাতা। বিশ্বাস অজানিতের প্রতি সুদৃঢ় প্রতীতি। যে যাহা জানে না তাহাই জানিবার জন্য এবং যে যাহা পায় নাই তাহাই পাইবার জন্য বিশ্বাস সহকারে অগ্রসর হইবে। বিশ্বাস সহকারে কোন বিষয় জানিবার জন্য এবং কোন বস্তু পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলে এবং প্রতীক্ষা করিলে তাহা জানা এবং পাওয়া হইবে সন্দেহ নাই। আমরা না জানিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। উপাস্য দেবতাকে না দেখিয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কোন অজানিত শক্তির চালনাতে জীবন আরম্ভ করিয়া সেই অজানিতের অদৃশ্য হস্তে ব্যবহৃত হইতে হইতে এই জীবন কাটাইয়া দিলাম। আজ এই জীবনে যদি কোন দেবপ্রসাদ সঞ্চয় করিয়া থাকি, আমাদের এই জীবনে যদি কোন শান্তি ও সৌভাগ্যের লক্ষণ দেখিতে পাইয়া থাকি, তবে তাহা সেই অজানিতের কীর্ত্তি। না জানিয়া যাঁহার অন্বেষণে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আজ তাঁহারই হস্ত আমাদিগকে দৃঢ় রূপে ধরিয়াছে।

এই জন্য আমরা বলি বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান নিকৃষ্ট। যদি বল জ্ঞানের ন্যায় এমন সর্ব্বপ্রকাশক আর কি আছে? জ্ঞানবিরহিত যে বিশ্বাস তাহা আর কি মূল্যবান্? অন্ধ বিশ্বাস নামে যাহা অভিহিত তাহাও কি শ্রেষ্ঠ? না তাহা নহে। জ্ঞানবিহীন বিশ্বাসের পক্ষপাতী হইতেছি না। কিন্তু ইহা বলিতেছি যে, বিশ্বাসশূন্য যে জ্ঞান তাহা নিতান্ত অসার। ইহা কেবল বিচারে সুপটু; কিন্তু কোন গভীর তত্ত্বলাভে সমর্থ নহে। কেবল ধর্ম্মজীবনে কেন, যে কোন কার্য্যে বিশ্বাসকে সম্বল না করিলে কৃতার্থতা অসম্ভব। অজানিত জানিত হন কেবল বিশ্বাসের শক্তিতে। অদৃশ্য দৃশ্যমান হন বিশ্বাস সহকারে ব্রতচর্য্যা সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইলে।

এক দিন এমন ছিল, এই পৃথিবীর চন্দ্র সূর্য্যই কেবল দেখিতাম, আকাশের ঘন নীলিমাই দর্শনের বিষয় ছিল, এখনও দিন দিন জলের শৈত্য ভিন্ন অন্য কিছু জানিতাম না, এমনও দিন ছিল আগুনের উত্তাপ ভিন্ন আর কিছু বুঝিতাম না। এই প্রকাণ্ড সৃষ্টিব্যাপারমধ্যে স্বভাবের নিয়মে অতি সহজে কোন কোন বস্তুর কোন গুণমাত্র প্রত্যক্ষীভূত করিয়া এক সময়ে মানুষনিরস্ত হইত; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। যেমন অণ্ড ভাঙ্গিয়া পক্ষিশাবক বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি এই প্রকাণ্ড সৃষ্টি অণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং এই ভগ্ন স্থানে মহাকীর্ত্তিশালী ভগবানের যত ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই সবিতার প্রকাণ্ড মুখগহ্বর ভেদ করিয়া অসংখ্য অজানিত বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এইক্ষণে চন্দ্র সূর্য্য তারকা সেই মহাজ্যোতির্ম্ময়ের অণ্ড। আকাশের নীলিমার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপতির সৌরভপূর্ণ সিংহাসন। জলে স্থলে ফুলে ফলে তাঁহারই মহাপ্রকাশ। বিহঙ্গগণের কণ্ঠ-রবে তাঁহারই আহ্বান। নরনারীর ব্যাকুল হৃদয় তাঁহারি অন্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া তাঁহাকেই লাভ করত পরম রমণীয় ধর্ম্ম-ভূষণে পরিশোভিত। ধর্ম্মের বীজও ভাঙ্গিয়া গোধূম বীজের মত পড়িয়া গিয়াছে। বীজের কঠিন আবরণ বিনষ্ট হইলে তাহার ভিতর হইতে যেমন সুন্দর সুকোমল অঙ্কুর বাহির

হয়, তেমনি এই ধর্ম্ম অঙ্কুর কঠিন আবরণমুক্ত হইয়া সুন্দর বর্দ্ধিত ধর্ম্মকলেবরে পরিণত হইয়াছে। অজানিতের সংগুপ্ত-বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যে ধর্ম্ম বাহির্গত হইলেন, ইহা মিলনের ধর্ম্ম, ইহা অসাম্প্রদায়িক, বিদ্বেষঘৃণাবিরহিত। প্রভাতে অসংখ্য অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় বস্তু সমুদায় যেমন এক প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকলেবরে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তেমনি এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোক এই মহাধর্ম্মজ্যোতিতে বিলীন হইয়া গেল। স্বপ্রকাশ, জীবন্ত, জাগ্রৎ, ঈশ্বরের আবির্ভাবপূর্ণ এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মজগৎ অজানিত অগম্য অপার মহান্ পরমেশ্বর হইতে প্রকাশিত হইল।

আমরা অজানিতকে বিশ্বাস করিয়া অজানিত ঈশ্বরের সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহাতে অজানিত জানিত হইলেন, অপ্রকাশিত ছিলেন যিনি তিনি প্রকাশিত হইয়া নিজ পরিচয় দান করিলেন। সংগুপ্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী সাধকের হস্ত ধরিলেন। কিন্তু ইহাতেও অজানিত পরিসমাপ্ত হন নাই। এখনও সেই প্রকাণ্ড অবগুণ্ঠন হইতে কত বিস্ময়কর ঘটনা সমস্ত প্রকাশিত হইবে। কত নব নব ভাবে অজানিতের অদৃশ্য হস্ত আমাদিগের কাছে প্রকাশিত হইয়া কত নূতন ভাবে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও পরিচালিত করিবে কে জানে? সামান্য বিশ্বাসের কাণা কড়ি সম্বল করিয়া তাহারা এত সৌভাগ্যবান্, বিশ্বাস ঐশ্বর্য্যে তাহারা যখন পূর্ণ হইবে, তখন কে জানে তাহাদের কত কৃতার্থতা হইবে?

আজ আমরা সেই অজানিতের কৌশল ও শক্তিতে সকলে এই ঘরে একত্র হইয়াছি। কিন্তু ইহা আমাদের গৃহ নহে। এখানে আমরা আমাদের চিরআরাধ্য পরম দেবতার পূজা করিতে আসিলাম, কিন্তু ইহা আমাদের সেই উপাস্য দেবতার পূজা-মন্দির নহে। আমাদের স্থান এখানে নহে। আমাদের স্থান নিশ্চয়ই সেই আমাদের শোণিতদ্বারা নির্ম্মিত সেই ব্রহ্মমন্দিরে। সেই মন্দিরের দেওয়ালে, কপাটে, ভিত্তিতে ও ছাদে আমাদের ধন আছে, শক্তি আছে, পরিশ্রম আছে, আত্মোৎসর্গ ও আত্মবলিদানের স্মৃতি আছে। সেই মন্দিরে আমাদের প্রার্থনা, সাধন ও পরমাত্মা সহবাসের পরিচিহ্নিত স্থান আছে। তথাপি কি জানি কেন আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত? কি জানি অজানিত কেন আপন হস্তে ধরিয়া আজ আমাদিগকে এখানে আনিলেন? এই বিচ্ছিন্ন মেষশাবকগণকে একত্র, জাগ্রত ও বলবান্ করিয়া কি জানি অজানিত আবার কি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিবেন? কি জানি এই ঘটনার মধ্যে তিনি কি মহাশক্তি প্রকাশ করিবেন? যে অজানিতের হস্ত আমাদিগকে ধরিয়া এখানে একত্র করিলেন, তিনিই কেবল জানেন এই সম্মিলন হইতে কি সুফল প্রসব করিবেন। অথবা কিছুই জানি না, জানিবার প্রয়োজনও নাই। তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বন্ধুগণ আজ কোন্ দিন? চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পিতৃসত্য পালন করত গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য সমাগত হইয়া আনন্দে আহ্লাদ করিবার দিন। আমরা গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য এই গৃহ-পথে এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছি। আমরা পিতৃ-সত্য পালনে সক্ষম হইয়াছি, এই জন্য সেই সত্যব্রতপালনে শক্তিদাতা ও সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি এবং সকল সম্মিলিত ভ্রাতাগণ পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া সুখী হই। এই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিয়া কি আমরা মরিয়াছি? আমরা কি উপযুক্ত আহার না পাইয়া দুর্ব্বল হইয়াছি? আমরা কি পিতৃ-সত্য, পিতার আজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া ঠকিয়াছি? কখনও না। যদি এই চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ না করিতাম, তবে পরম পিতাকে কোথায় পাইতাম? বিবিধ অবস্থার মধ্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দিলেন তাহা আমরা কিরূপে পাইতাম? এই চতুর্দ্দশ বৎসর আধ্যাত্ম খনি হইতে অজানিত আপনাকে বাহির করিয়া আমাদের মস্তকের মণিরূপে স্থিতি করিলেন; কত শিখাইলেন, কত বুঝাইলেন। এই সুদীর্ঘ কালে আমাদের মধ্যে যাহার কিছু শিক্ষা হয় নাই, তাহার আর কোন দিন কিছু হইবে না।

হে বন্ধুগণ, এই অজানিত হইতে আজ কি আশীর্ব্বাদ আসিবে আমি ভাবি নাই। এই উৎসবে মিলন হইলে কি হইবে আমি তাহা ভাবি নাই। আজ এই পরের বাড়ীতে আসিলে কি পরমার্থ লাভ হইবে তাহাও ভাবি নাই। কেবল এই জানি যে অজানিতের অঞ্চল আমাকে ধরিয়াছে। সেই অজানিতের জ্যোতি আমার হৃদয়ে পড়িয়াছে। সেই অজানিতের শক্তি আমাকে সবলে এখানে পহুঁছাইয়া দিয়াছে। অজানিত আমার গুরু ও নেতা। জানি না তাঁহার মনে কি ছিল। ইহাও জানি না, তাঁহার মনে আরও কত আছে। এই অদ্যকার উপাসনাতে এত তিনি আত্ম-পরিচয় দিবেন তাহা আমি জানিতাম না।

অতএব বলি, যদি পবিত্রাত্মার হস্ত দৃঢ় বলিয়া জান, তবে কিছু ভয় করিও না। তিন দিনে যিনি সলিমানের পাপ অহঙ্কারপূর্ণ মন্দির বিচূর্ণ করিয়া ঈশার পবিত্র ধর্ম্মমন্দির করিলেন, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। আমাদের মন্দির থাকুক আর নাই থাকুক, পিতার স্নেহ-বক্ষ হইতে আমাদিগকে সরায় কাহার সাধ্য? ব্রহ্ম-সহবাস হইতে কে বঞ্চিত করিতে পারে? পিতার মুখ এই অনন্ত আকাশ, পিতার হস্ত এই দিক্ সকল। পিতার পদচ্ছায়া এই সুবিস্তীর্ণ ধরাতল। পিতার স্নেহ-বক্ষ কত বড় এক বার ভাবিয়া দেখ। এই মহান্ পিতা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। বিশ্বাস, ভক্তি, আশা, ধৈর্য্য ও ব্যাকুলতা সহকারে এই পিতার সেবার্থ প্রস্তুত হও।

হে হরি, অজানিত তোমার প্রকাশ, অবগুণ্ঠন তোমার মূর্ত্তি, আমরা জানি আমাদের কম্পিত দক্ষিণ হস্ত তোমার সুদৃঢ় হস্ত ধরিয়াছে। হে অজানিত সুগভীর, আমরা তোমাকে অতি অল্পই জানিয়াছি; কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এত বৎসর কেবল তোমার অদৃশ্য বক্ষে বাস করিয়াছি, এবং তোমারি অদৃশ্য হস্তে পরিচালিত হইয়াছি। এই জানি তোমার অভিপ্রায় এত দিন আমাদিগকে দেশে বিদেশে, বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়াছে এবং তোমারি অভিপ্রায় নানা পল্লী ও সহর অতিক্রম

করাইয়া আজ আমাদিগকে এখানে উপস্থিত করিয়াছে। তোমার হস্তস্থিত রজ্জু সংযত করিলে, আর এই যূথভ্রষ্ট মেষদল তোমার চরণপ্রান্তে একত্র হইল। আজকার উদ্বোধন আরাধনা প্রার্থনা তোমার প্রভাবে পূর্ণ। তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় আজ জলন্ত ভাবে প্রকাশিত। হে মহান্ অনন্ত, তোমার ভিতরে আমরা মক্কা বারাণসী শ্রীক্ষেত্র তীর্থবাস করি। বল আজ তোমার প্রকাশে এই গৃহ কি তোমার মন্দিরতুল্য মনে করিতে পারি না? এই আশীর্ব্বাদ কর এখানেই আমরা দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইয়া যেন তোমার জয় ঘোষণা করিতে পারি।

পিতা, এই চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাস করিয়া আমরা তোমার অজানিত মূর্ত্তি দেখিয়াছি। আজ সকল দিক্ হইতে তুমি আসিয়া এই অরক্ষিতমণ্ডলীকে রক্ষা কর। তোমার সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে আমরা প্রস্তুত হই। তুমি পরম পবিত্রমুখে আজ শান্তিঃ শান্তিঃ বল। আজ আমাদের পুরাতন ভাইগণকে আমাদের প্রিয়তম যুবক বন্ধুগণকে এবং এই প্রিয়তমা ভগিনীগণকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ কর। নূতন কাজ করিতেছি বলিয়া যেন অভিমানী না হই। দশজন লোক আসিয়াছেন বলিয়া যেন অহঙ্কারে তোমাকে ভুলিয়া না যাই। লোক না আসিলেও যেন নিরাশ না হই। ধনহীন বলিয়াও যেন আমরা নিরাশ ও নিরুদ্যম না হই। আমরা অযোগ্য অধম। আমাদের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যখন কিছুই না জানিয়াও অজানিতের প্রভাবে এত জানিয়াছি, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়াও অনেক পাইয়াছি, তখন কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারি না। হে ভবভয়হারী, তুমি সকল ভয় ভঞ্জন কর। অন্তরের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস তোমার চরণে রাখিয়া আনন্দ, উৎসাহ সহকারে বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

উপাসনাশ্রম।

নববিধান।

১১ পৌষ, রবিবার, ১৮১১ শক।

আজ উৎসবের দ্বিতীয় দিনে নববিধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে কিছুই হয় না, আমরা যে নববিধান গ্রহণ করিয়াছি, অগ্রে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, বিচারের দিনে ঈশার নিকটে অনেকে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোক বলিয়া পরিচয় দিবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে চিনি না। তাহারা বলিবে, প্রভো, আমরা তোমার নামে কত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছি। মুখে প্রভু প্রভু বলিলে কিছু হয় না, এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে অস্বীকার করিবেন। অন্তরে অনুরাগ নাই মুখে নাম গ্রহণ, ইহা ঘোর অপরাধের কারণ। নিরর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিও না, এ নিষেধ ভক্তিশূন্য হইয়া নামগ্রহণসম্বন্ধে। যেখানে ভক্তি নাই, প্রেম নাই, কেবল মৌখিক নাম গ্রহণ, সেখানে নাম গ্রহণে নামীর অবমাননা বিনা আর কি হয়? যাহাকে ভাল বাসি, তাহার নাম লইতে কত সুখ হয়, হৃদয় কেমন আর্দ্র হয়। ঈশ্বর, ভক্ত, বিধান, ইঁহাদের নাম গ্রহণ করিতে গিয়া যদি হৃদয় প্রেমে আর্দ্র না হইল, তাহা হইলে সংসারে যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি তাহাদের অপেক্ষা ইঁহাদিগকে হেয় করা হইল। ঈশ্বর ভক্ত ও বিধান, ইঁহারা আমাদিগের হৃদয়ের সমগ্র ভালবাসা চান। কিছু দিয়া কিছু আপনার বা সংসারের জন্য রাখিলে ইঁহাদের কিছুতেই মন উঠে না। প্রাণ পর্য্যন্ত চাহিলেও অকাতরে প্রাণ দিতে হয়, সে অনুরাগ আমাদের কোথায়? যদি আমাদের বিধানের লোক হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বিধান কি? না জানিলে আমরা বিধানের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিব কি প্রকারে? এ বিধান নূতন বিধান কেন? ইহার পূর্ব্বে যে সকল বিধান হইয়া গিয়াছে, এ বিধানের আগমনে সে সকল কি নিষ্ফল হইয়াছে? পূর্ব্ব বিধানের লোকেরা যেমন স্ব স্ব বিধানের মহিমা গান করিতেন, সেই বিধান দ্বারা আগের বিধান সমুদায় খণ্ডিত হইল বিশ্বাস করিতেন, এ বিধানেও কি তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে? কিরূপে এরূপ বিশ্বাস সম্ভব? ইনি যে ধর্ম্মবিজ্ঞান পৃথিবীতে স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। এক এক বিধান এক একটি উপাদান লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সেই বিধানের লোক সেই সেই উপাদান দ্বারা আপনাদের জীবন গঠন এত দিন করিয়া আসিতেছেন। নিজ নিজ বিধানের উপাদানের প্রতি তাঁহাদের অনুরক্তি। অন্য বিধানের উপাদান তাঁহারা যখন গ্রহণই করিতে পারেন না, তখন তৎপ্রতি তাঁহাদের অনুরাগ কি প্রকারে সম্ভব? অন্য বিধানের উপাদান অধঃকরণ করিয়া স্ব স্ব বিধানের উপাদানের গুণকীর্ত্তন, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যদি তাঁহারা এরূপ না করিতেন, তাহা হইলে প্রতি উপাদানের পরিস্ফুট আকার প্রাপ্তি ও উহার পরিণতি কখন কি সম্ভব হইত? নববিধান যথাসময় আসিয়াছেন, আর দুদিন পূর্ব্বে আসিলেও হইত না, আর দুদিন পরে আসিলেও হইত না। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি তাঁহার আগমনে একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে, মিলিত হইয়া একটি নূতন বিধানদেহ রচিত হইয়াছে। আমাদের প্রতিজনের দেহ যে সকল উপাদানে গঠিত, সে সকল পৃথিবীতে ছড়ান রহিয়াছে, প্রাণের সংস্পর্শ বিনা সে সকল মৃত। তাহাদিগকে এক স্থানে যদি কেহ আনিয়া মিলাইতে চান, তাহারা মিলিবে না, মিশ্রিত করিলেও তাহা হইতে নূতন দেহ গঠিত হইবে না। এক প্রাণশক্তি কেবল আপনার সংস্পর্শদ্বারা জীবের দেহ গঠন করিতে পারে। সেই গঠনের পূর্ব্বে উপাদান চাই, যদি উপাদান না থাকে দেহ হইবে কি প্রকারে? কেবল উপাদান থাকিলেও চলে না, সে সকলকে একীভূত করিয়া অবিরোধিভাবে মিলিত করিয়া দেহগঠন প্রাণশক্তি বিনা কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে। নববিধান

আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার অঙ্গ এক এক বিধান এক এক উপাদান এক এক সম্প্রদায়ে রক্ষা করিলেন। এদেশে এক উপাদান ওদেশে আর এক উপাদান, এজাতি মধ্যে এক উপাদান ওজাতি মধ্যে আর এক উপাদান, এইরূপ উপাদানগুলি প্রাণশক্তিরূপী নববিধানের স্পর্শে আসিয়া একীভূত এবং অবিরোধী ভাবে মিলিত হইয়া নববিধানের দেহ নির্ম্মিত হইল।

নবদেহের উপাদানসমূহ প্রাণযোগে এক অখণ্ড দেহে পরিণত হওয়া যখন তোমার আমার কর্ম্ম নয়, তখন ধর্ম্মরাজ্যের সমুদায় উপাদান এক করিয়া একটি বিধানদেহ রচনা করা কোন এক জন মানুষের আয়ত্তাধীন হইবে কি প্রকারে? প্রাণশক্তি আপনি কোন কার্য্য করিতে পারে না, যদি উহাকে সকল শক্তির নিয়ন্তা নিয়োগ না করেন। প্রাণশক্তি বিধান বিধাতার নিয়োগে যথাসময় পৃথিবীতে উপস্থিত। এই বিধান কি? নরহৃদয়ে ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ। অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল, কিন্তু সেই অভিপ্রায় অনুসারে জীবন গঠন করিবার জন্য শক্তি আইসে কোথা হইতে? পবিত্রাত্মা হইতে। ঈশ্বর কেবল বিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বিরত হইলেন না, তিনি পবিত্রাত্মা হইয়া নেতা হইলেন, এবং তিনিই আত্মক্রিয়ায় বিধানশরীর ক্রমে রচনা করিলেন। যাঁহারা পবিত্রাত্মার অনুসরণ করিলেন, তাঁহারা তাঁহার হস্তের যন্ত্র হইলেন, বিধানশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইলেন। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহাদিগেতে বদ্ধ থাকিল না, ক্রমে সহস্র সহস্র ব্যক্তি উহার অঙ্গীভূত হইল। অল্পে অল্পে সমগ্র নরজাতি সে দেহের অঙ্গ হইয়া নবদুর্গার নবসন্তান উৎপন্ন হইলেন। সহস্র সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র সহস্র তাঁহার বাহু, সহস্র সহস্র তাঁহার পদ। এই বৃহৎ শরীরে পবিত্রাত্মা প্রাণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এক এক ভাবের মানবগণ এক এক যন্ত্র হইয়া সেই নবসন্তানকে পরিবর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও দিন দিন উন্নত করিতেছে। বিবিধ সম্প্রদায় নিজ নিজ সম্পৎ ইঁহাকে দান করিয়াছেন, সে সমুদায় ইঁহার শোণিতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইঁহার বাহিরে আর কেহ নাই। পৃথিবীর সাধু মহাজন ঋষি, স্বর্গের দেব দেবীগণ সকলকে লইয়া ইঁহার দেহ পরিপুষ্ট হইতেছে। নববিধান সমাগমের পূর্ব্বে অঙ্গ সকল বিচ্ছিন্নভাবে ছিল, এখন নূতন কলেবরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। এই দেহের সহিত সংযুক্ত হইলে আমরা জীবিত, আর যদি বিচ্ছিন্ন হই, তাহা হইলে মৃত। আমাদের সাধন ভজন উপাসনা প্রার্থনা এই দেহের সহিত এক হইবার জন্য আমরা জানি, যদি আমরা এই দেহের অঙ্গ হইতে পারি, স্বয়ং ভগবান্ আমাদের প্রাণ, জীবন ও সুখ সম্পদ্ হইবেন, আমাদিগকে চিরজীবন চিরসুখী ও চিরকৃতার্থ করিবেন।

কি হইলে আমরা এই দেহের অঙ্গ হইয়া যাইতে পারি? এ দেহের অঙ্গ না হইলে যখন আমাদের সুখশান্তির সম্ভাবনা নাই, তখন আমাদের সকল যত্ন, সকল সাধন, এই দিকেই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। কেবল যত্ন ও সাধনে কি আমরা এবিষয়ে সিদ্ধ হইব? যত্ন ও সাধন ছাড়া আরও কিছু চাই, যাহা না হইলে বিধানের লোক হওয়া যায় না। বিধানের নিকটে সমগ্র দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে। মহর্ষি ঈশা বলিলেন, তোমাদের যাহা কিছু আছে সকলই ছাড়িয়া আমার অনুবর্ত্তন কর, তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করিবে। একথা কি ঈশার কথা, না স্বয়ং ঈশ্বরের কথা? তিনি যাহা পিতার নিকট শুনিতেন, তাহাই লোকদিগকে বলিতেন। ঈশার পিতা, ঈশার ভিতরে থাকিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ঈশার বিধান অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন, তাই ঈশা তাঁহারই মুখের কথা সকলকে বলিয়াছেন। ঈশ্বরের বিধান না বলিয়া ঈশার বিধান বলিতেছি কেন? সে সময়ে নরজাতিসম্বন্ধে ঈশ্বর যে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেই অভিপ্রায় কিরূপ, পবিত্রাত্মা ঈশার জীবনদ্বারা জগতে ব্যক্ত করিয়াছেন; তাই সে বিধান ঈশার নামে সর্ব্বত্র খ্যাত হইয়াছে। ঈশা সেই বিধান প্রকাশের যন্ত্র, যন্ত্রের নামে বিধান লোকে গ্রহণ করিয়াছে। এবার বিধান অবতরণ করিয়াছেন। অবতরণের প্রণালীও ঠিক আছে, ভগবানের বিশেষ অভিপ্রায় কি তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেখ সেই অভিপ্রায় সমগ্র নরজাতি মধ্যে স্বয়ং পবিত্রাত্মা ক্রিয়াশালী করিয়া তুলিয়াছেন। সকল মানবের মন সেই অভিপ্রায় দ্বারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে চালিত হইতেছে। কেবল ভারতে নয়, সভ্যতম ইউরোপ আমেরিকা এই অভিপ্রায়ের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। পবিত্রাত্মা মানবজাতিকে এই অভিপ্রায়ের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়া লইতেছেন। লোকের মন সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার করিয়া, অন্য ধর্ম্মে অন্য সম্প্রদায়মধ্যে আলোক দেখিতে পাইতেছে। সকল সম্প্রদায় সকল ধর্ম্ম এক সম্প্রদায়ে এক ধর্ম্মে পরিণত হইবে, পৃথিবীর লোক সকল অল্পে অল্পে ইহা বুঝিতে পারিতেছে। সময়ের চিহ্ন দেখিয়া আমরা বর্ত্তমান বিধানের মহিমা বুঝিতে পারিতেছি। তবে আমাদের নিকটে বিধান যখন পরিস্ফুটাকারে প্রকাশ পাইয়াছেন, তখন এই বিধানের জন্য জীবনদান আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। [৫২]

আমাদের সুখ কিসে শান্তি কিসে? এই বিধানে। আমরা কি এই বিধানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারি? আমরা যে এই বিধানের নিকটে সর্ব্বপ্রকারে ঋণী। এখন যদি আমরা বিধান প্রতিপালন না করিয়া সংসারে গিয়া মজি, আমরা সেখানে সুখ পাইব, এ আশা আমাদের দুরাশা। বিধান আমাদিগকে সুখের যে আস্বাদ দিয়াছেন, সে সুখ কি সংসার আমাদিগকে দিতে পারে? যিনি নববিধান প্রাণে একবার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার আর পুরাতন সংসার কিছুতেই ভাল লাগে না। যে সংসারে স্বয়ং জননী গৃহকর্ত্রী হইয়া সমুদায় ব্যবস্থা করেন না, সন্তানদিগকে আপনি আনন্দসুধা পান করান না, সে সংসার আমাদের পক্ষে ঘোর কণ্টকাকীর্ণ। পুরাতন সংসারিগণ সংসারের সকল কার্য্য নিজ কর্ত্তৃত্বে করে, এমন কি শোক দুঃখ সন্তাপ নিজেরা বহন করে। ইহাতে এক এক আঘাতে তাহাদের প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়, নিরাশা বিষাদ আসিয়া তাহাদের

সংসারকে দুঃখের আগার করিয়া তুলে। মার সংসারে যাহারা বাস করে, তাহাদের শোকের সময়ে এক চক্ষে শোকাশ্রু, অন্য চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে। শোক সন্তাপ দুঃখের নিম্নদেশে শান্তিও ঈশ্বরে আরাম এমনই অক্ষুন্ন থাকে যে, শোক সন্তাপ দুঃখে তাহাদের অবসাদ উপস্থিত করিতে পারে না। এ কিছু কথার কথা নয়; আমরা জীবনে ইহা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতেই নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি, বিধানের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আমরা চিরসুখী বই দুঃখী কখন হইব না। আজ নববিধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিনে বিধান আমাদের জীবনে কি অপূর্ব্ব সৌভাগ্য উপস্থিত করিয়াছেন আমরা তাহা ভাল করিয়া স্মরণ করি। আমরা জানি, বিধানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অটল থাকিলে আমাদের মস্তকের একটি কেশও বিনষ্ট হইবে না; আমাদের মঙ্গল বিনা অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। বিধানজননী আজ আমাদের প্রতিজনকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা বিধানের জন্য সমগ্রজীবন সমর্পণ করিয়া চিরজীবন কৃতার্থ হই।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শারদীয় উৎসব।

৬ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৮১৮ শক।

আজ শরৎকালে বাহিরের ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ। পৃথিবী গ্রীষ্মের উত্তাপে দগ্ধ হইতেছিল, আকাশ বারিধারা বর্ষণ করিয়া তাহাকে সুশীতল করিল। বৃক্ষপল্লব লতা বারিসিঞ্চনে ধৌত হইয়া অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিল। তৃষ্ণাতুরা ভূমি আকাশ হইতে বর্ষিত বারিধারা পান করিয়া রসাল হইল; পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইল। দেখিতে দেখিতে শরৎকাল উপস্থিত। আর এখন সে প্রখর উত্তাপ নাই, আকাশ অতি স্বচ্ছ সুনীল বর্ণে সকলের মন হরণ করিতেছে। চন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় সকলের মন হরণ করিতেছে; আজ চন্দ্র পূর্ণ কলায় আকাশে উদিত। বাহিরে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অন্তরে সেরূপ কিছু আছে কি না? বাহিরে সকলই পরিমিত অস্থায়ী, অন্তরে সকলই অপরিমেয় এবং স্থায়ী। বাহিরের আকাশ নির্ম্মল হইল, বৃক্ষ লতা সকল মনোহর বেশ ধারণ করিল। পাখী সকল প্রচুর আহার্য্য লাভ করিয়া আহ্লাদে গানে প্রবৃত্ত হইল, শস্যক্ষেত্র সকল বিবিধ শস্যরাজিতে পূর্ণ হইল, সুনীল আকাশে শুভ্র চন্দ্রমা উদিত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণ ছড়াইতে লাগিল। হৃদয়ের আকাশ কি নির্ম্মল হইয়াছে? যোগ ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি বৃক্ষলতা কি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে? স্বর্গের দেবগণ আসিয়া কলকণ্ঠে মহেশ্বরের গুণকীর্ত্তনে কি প্রবৃত্ত? হৃদয়ক্ষেত্র কি পুণ্যপ্রেমাদি প্রচুর শস্যে পূর্ণ? অনন্ত প্রেমচন্দ্রের উদয়ে প্রাণ মন হৃদয় সমুদায় সুস্নিগ্ধ হইয়াছে কি?

পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রের ধান্যাদি ফলপাকান্তে শুষ্ক হইয়া যায়, শস্য শীঘ্রই নিঃশেষ হয়; হৃদয়ক্ষেত্রের শস্যসম্বন্ধে কখন একথা বলা যাইতে পারে না। এ শস্য অফুরন্ত, ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইতেছে, কৃষক আপনি ভোগ করিতেছে, আর সমুদায় পৃথিবীকে বিতরণ করিতেছে. বিতরণ করিয়াও ইহা নিঃশেষ হয় না; ইহলোক পরলোক উভয়লোকের সম্বল হয়। মহাত্মারা কৃষক হইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ভগবান্ যে ভূখণ্ড কর্ষণ করিতে দিয়াছিলেন, সেই ভূখণ্ড কর্ষণ করিয়া তাঁহারা এমনই উৎকৃষ্ট প্রচুর শস্য উৎপাদন করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে এবং তাঁহাদের সময়ের সকল লোককে তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য দান করিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের শস্যাগারের সঞ্চিত শস্য নিঃশেষ হয় নাই; যত দিন পৃথিবী থাকিবে, এই সকল শস্য ভোগ করিবে। তাঁহারা যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন আপনারা সেই সকল শস্য পরলোকের সম্বল করিয়া লইয়া গেলেন, সেখানে সেই শস্যরাজি নানা বেশ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠ-ধামের উপযোগী পোষণ সামগ্রীতে তাঁহাদিগকে পরিপুষ্ট করিতেছে। ঈশা চৈতন্য নানক কবীর প্রভৃতি সকলেই কৃষিকার্য্যে নিপুণ ছিলেন, সকলেই কৃষক হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতেছে।

আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভূখণ্ড কর্ষণ জন্য আমাদের ঈশ্বর দেন নাই? কৃষিজীবী আমরা, ইহা যদি আমাদের স্মরণে থাকিত, তাহা হইলে আমরা আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রের কর্ষণ করিতে কখন ঈদৃশ অমনোযোগী হইতাম না। আমরা পৃথিবীর সামান্য বিষয় লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি, এ দিকে যে ক্ষেত্রের শস্য আমাদের আত্মার এবং প্রতিবেশীর আত্মার একমাত্র পোষণ ও পরিবর্দ্ধনের হেতু, তৎপ্রতি আমরা একান্ত উদাসীন। আমাদের ক্ষেত্রকে যদি কর্ষণ না করিয়া পতিত রাখি, তাহা হইলে আমরা ঈশ্বর ও মানবজাতির নিকটে অপরাধী হইব আমরাও নিজে ইহলোক পরলোকের জন্য সম্বলবিহীন হইয়া ঘোর দরিদ্রতায় জীবন নিঃশেষ করিব। আমরা কি দেখিতেছি না, যে হৃদয়ক্ষেত্র উৎকৃষ্ট শস্যরাজীতে পূর্ণ হইবে, সেই ক্ষেত্রকে আমরা মরুসদৃশ করিয়া রাখিয়াছি, সমুদায় ক্ষেত্র কণ্টকীলতায় নিতান্ত পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ নব বিধানে নবীন শস্য উৎপাদন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে ভোজ্য দান করিবার জন্য আমাদিগকে ডাকিয়াছেন, তদুপযোগী শস্যক্ষেত্র প্রতিজনকে দিয়াছেন। বর্ত্তমান বংশ এবং ভবিষ্যৎ বংশের কোটী কোটী লোক এই ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য গ্রহণ করিয়া আত্মাকে সুন্দর মনোহর কান্তিযুক্ত এবং স্বর্গের সুখশান্তিসম্ভোগের উপযুক্ত করিবে, ইহলোক পরলোকের চিরসম্বল করিয়া লইবে, আমরা যদি সেই ক্ষেত্রকর্ষণে অলস ও শস্যোৎপাদনে বিমুখ হই, তাহা হইলে আমরা কি নিরপরাধী গণ্য হইব, না গুরুতর দণ্ডভোগে নিষ্কৃতিলাভ করিব? আমাদের প্রতিজনের কি গুরুতর দায়িত্ব আমরা আজ স্মরণ করি। আমরা কৃষকজাতি, কর্ষণ আমাদের ব্যবসায়; শস্যোৎপাদন করিয়া পরিবার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধন করা আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য। ইহলোক পরলোকের জন্য সম্বল করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য পৃথিবীতে বংশপরম্পরানুক্রমে সকলে সম্ভোগ করিতে পারে, এজন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে বাধ্য, ইহা জানিয়া তদনুসারে পরিশ্রম করিতে আমরা আহূত। কৃপানিধান পরমেশ্বর এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

সংবাদ।

ব্রাহ্মগণ এক চিকিৎসালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের লোক উপস্থিত মহামারীতে আক্রান্ত হইলে, উক্ত চিকিৎসালয়ে রাখিয়া স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহাদের চিকিৎসা হইবে। গৃহ, ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারী এবং ঔষধ পথ্যাদির জন্য

যে ব্যয় হইবে তাহা ব্রাহ্মগণ বহন করিবেন। এ বিষয়ের ব্যবস্থার জন্য এল্বার্টহলে কয়েকটি সভা হইয়া গিয়াছে। তিন সমাজের ব্রাহ্মই এই কার্য্যে যোগ দান করিয়াছেন। এই কার্য্য সম্পাদনায় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতি, হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী সভাপতি ও ডিপুটী একাউণ্টেণ্ড জেনরেল শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু,এম,এ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাজ তারযোগে এই অনুষ্ঠানে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

বিগত ৩ জ্যৈষ্ঠ স্বর্গগত শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ভগলপুর নগরে নবসংহিতা মতে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ ললিতমোহনের কনিষ্ঠভ্রাতা স্বর্গগত মনোমোহনের শ্রাদ্ধক্রিয়া ও সেই দিন তথায় সম্পাদিত হইয়াছে।

স্বর্গগত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিম্নলিখিত মতে দান হইয়াছে।

নববিধান প্রচারভাণ্ডার (কলিকাতা) ...	১০৲
কলিকাতা উপাসনালয়ের জন্য	১০৲
ঢাকা প্রচারকমণ্ডলী	১০৲
অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজ	৫৲
ভাগলপুর ঐ	৭৲
অনাথা বিধবা	১০৲
অনাথছাত্র	৫৲
ভাগলপুর কুষ্ঠাশ্রম	১০৲
বৈদ্যনাথ ঐ	৫৲
Prayr Meting (কলিকাতা)	১০৲
আতুরাশ্রম	৫৲
অনাথাশ্রম (কলিকাতা)	৫৲
ভাগলপুর বালিকা বিদ্যালয়	৮৲
	১০০৲

এতদ্ব্যতীত ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয়দিগের জন্য বস্ত্র ও চাদর ১৮ জোড়া, এবং তৈজস, বস্ত্র, ও তণ্ডুলাদি (দানার্থ) ... ... ১০০৲

সর্ব্বশুদ্ধ ২০০৲

বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে মেটিয়াবুরুজস্থ প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মিহিরলাল রক্ষিতের আহ্বানানুসারে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিস শ্রীমান্ মনোমথন দে, এবং আরও কতিপয় ব্রাহ্মযুবা প্রচারার্থ তথায় গিয়াছিলেন। উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন বক্তৃতাদি হইয়াছিল। তাহাতে বহুলোক আসিয়া যোগ দান করিয়াছিলেন।

বিগত ২৩শে বৈশাখ সায়ংকালে বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে সিংহলনিবাসী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল এল্বার্টহলে বক্তৃতা ও উক্ত ধর্ম্মানুমোদিত নানা প্রকার প্রক্রিয়া করিয়াছিলেন। ইংরেজি ভাষায় তিনি একজন সুবক্তা এমেরিকাতেও প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। সেই দিন এল্বার্ট হলে বহু শিক্ষিত লোক তাঁহার বক্তৃতাদি শ্রবনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৪শে মে, (১১ই জ্যৈষ্ঠ) ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। আমাদের মহারাণীর এই অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম আরম্ভ।

কুচবিহারের মহারাজ, মহারাণীর জন্মদিন উপলক্ষে অতি সম্মানিত সি, বি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ গাজিপুরস্থ সুবিখ্যাত যোগী পাহারি (পবনাহারী) বাবা হোমাগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন আমরা তাঁহার জীবন আগামীতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ রঙ্গপুরের স্পেশল সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী সিতাংশু প্রভার জন্মদিন উপলক্ষে ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকদিগের অনুষ্ঠানাদির ব্যয় হিন্দুসমাজ ভুক্ত লোকদিগের তুলনায় অতি সামান্য। এ বিষয়ে তাঁহাদের অতিশয় স্বাধীনতা ও সুবিধা। হিন্দু সমাজের ভদ্র পরিবারের একটী কন্যাকে বিবাহ দান করিতে তাঁহার পিতা ন্যূনকল্পে ২।৩ সহস্র টাকা ব্যয় না করিয়া পারেন না। কিন্তু সে দিন আমাদের একটি ব্রাহ্ম বন্ধুর কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, আহারাদিতে তাঁহার ৩০৲ কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইয়াছে। ৪ টাকায় ও কোন ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুসমাজে আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়ার ন্যূনাকল্পে ৫।৭ শত টাকা ব্যয় না করিলে চলে না। ঋণ করিয়া বা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া হইলেও এরূপ ব্যয় করিতেই হইবে। অবস্থা বিশেষ এক শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার পাঁচ সহস্র বা দশ সহস্র কিংবা ততোধিক মুদ্রা শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্যয় করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে অনেকে ৫।৭ টাকা ব্যয়ে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেন। হিন্দুসমাজে থাকিলে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে যিনি সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হইতেন ব্রাহ্মসমাজে তিনি ২।১ শত টাকায় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। ভদ্র হিন্দুদিগের প্রতি মাসে পূজা পর্ব্বণ ব্রাহ্মণভোজন ব্রতানুষ্ঠানাদিতে বহু অর্থ ব্যয় হয়। একটী গুরু পরিবার বা পুরোহিত পরিবার একটি সম্পন্ন শিষ্য বা যজমান পরিবারের নিয়মিত দানে স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু এরূপ অনেক ব্রাহ্ম আছেন যে সম্বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মার্থ প্রচারার্থ একটি পয়সাও দান করেন না। অনেক ব্রাহ্ম নিজেদের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য সামান্য মূল্যে সমাজের একটি ধর্ম্মপত্রিকা গ্রহণেও কুণ্ঠিত, অনেকে গ্রাহক হইতে বাধ্য হইলে ও

মূল্য দান করিতে চাহেন না। অতএব ব্রাহ্মসমাজে কত সুবিধা। পদস্থ সম্পন্ন ব্রাহ্মগণ প্রতি বৎসর সপরিবারে দেশভ্রমণ ও শৈল বিহারে এবং প্রাত্যহিক বিলাস ভোজন পরিচ্ছদাদিতে অকাতরে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। কোন সদনুষ্ঠানে তাঁহারা ২টী টাকা দান করিতে নিতান্ত কাতর। এইরূপ অনেকের ধর্ম্মোন্নতি ও আত্মোন্নতির অবস্থা দেখিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত।

নূতন পত্রিকা ও পুস্তক।

স্বাস্থ্য;—ইহা মাসিক পত্রিকা, কি কি উপায়ে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে তদ্বিবরণ সরল ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রণালীতে এই পত্রিকায় বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয়। কুচবিহার মহারাজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস গুপ্ত এম্, বি, কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হইতেছে। স্বাস্থ্যের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল আছে; নববর্ষ, স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ, বাসগৃহ, সহরের ধূলা, কলিকাতার প্লেগ, পরিচ্ছন্নতা, রোগী পৃথক্ করণ, রোগবীজ বিনাশ, প্লেগে টীকা গ্রহণ, প্লেগ সম্বন্ধে কয়েকটী সার কথা, প্লেগ বিস্তৃতি নিবারণ বিধি, প্লেগ সংবাদ। সময়ের ও অবস্থার উপযোগী স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয় সকল এই পত্রিকায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হয়। ইহার মূল্য সামান্য বার্ষিক ১৲ মাত্র। কলিকাতা ২৩ নং মদন মিত্রের লেন স্বাস্থ্য কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

ব্রহ্মকন্যা;—ইহা একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক; ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী আপন স্বর্গগতা জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠ্য। ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। ৴৹ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ইহা বিদেশস্থ গ্রাহকগণ পাইতে পারেন।

প্রেরিত।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয়।

সবিনয় নিবেদন;—

ভক্তিভাজন নববিধান আচার্য্য যোগভক্তিবিষয়ে যে সকল উপদেশ দান করেন, দুই একটী ব্যতীত সমস্তই আমা দ্বারা লিখিত হয়। আমি ইংলণ্ডে যাইবার সময় অনবকাশবশতঃ 'প্রবৃত্তিযোগ' সম্পর্কে উপদেশটী কালী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিয়া যাইতে পারি নাই। উপাধ্যায় মহাশয় বহুকষ্টে সংক্ষিপ্ত পেন্সিলের লেখা হইতে লিখিয়া উক্ত উপদেশটী 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' মুদ্রিত করিয়াছেন। লেখার অস্পষ্টতা প্রযুক্ত কোন কোন পাঠক তাহার একস্থানে ভয়ানক অদ্বৈতবাদ সমর্থন বুঝিতে পারেন; কিন্তু নববিধানাচার্য্য অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া যোগে ব্রহ্ম এবং জীবের একত্ব নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্ম জীব হইতে পারেন অথবা জীব ব্রহ্ম হইতে পারে কদাচ তিনি এই ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু মহাযোগে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও ভাবে, স্বভাবে তাঁহারা অভিন্ন হইয়া যান ইহাই তাঁহার উপদেশের সার কথা। দুঃখের বিষয় যে "ব্রহ্মগীতোপনিষদের" দ্বিতীয় সংস্করণেও ঐ ভ্রমটী রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, উপাধ্যায় মহাশয় পেন্সিলের লিখিত উপদেশটী সযত্নে রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একত্র হইয়া ঐ উপদেশটী সংশোধন করিয়াছি। যাঁহারা এই সংশোধিত উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করেন, "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদককে জানাইলে ধর্ম্মতত্ত্বে কিম্বা স্বতন্ত্রভাবে তাহা মুদ্রিত করা যাইবে। অনেকেই জ্ঞাত আছেন আচার্য্যের প্রার্থনা, উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর আমার দ্বারাই লিপিবদ্ধ হয়। যাঁহারা এখন সে সমস্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতেছেন তাঁহারা একবার অন্ততঃ আমাকে দেখাইয়া লইলে অনেক পরিমাণে ঐ সকল পুস্তকে আচার্য্যের প্রকৃত বিশ্বাস ও ভাব রক্ষিত হইবে আমি আশা করি।

১৬ই মে ১৮৯৮ খ্রীঃ। নববিধানমণ্ডলীর দাস

শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী।

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরনির্ম্মাণার্থ যে সকল মহোদয় সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ধাম ও দানের পরিমাণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর;—

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ মিত্র,	কৃষ্ণনগর	১৲
„ „ শিবেন্দ্র নাথ গুপ্ত	ঐ	১৲
মুন্সী মহম্মদ খাঁ	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু অনন্ত কুমার ঘোষ	কালনা	১৲
„ „ মতিলাল সিংহ	ঐ	১৲
„ „ মহেন্দ্র নাথ সিংহ	ঐ	১৲
„ „ বিপিনবিহারী ঘোষ	ঐ	১৲
„ „ বেনোয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ „ সূর্য্যনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী	ঐ	২৲
„ „ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৪৲
লালা ব্রহ্ম দেবনারায়ণ	মুজঃফর পুর	৫৲

ক্রমশঃ

এই পত্রিকা ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ। ১২ সংখ্যা।	১৬ই আষাঢ়, বুধবার, ১৮২০ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তোমাকে প্রিয় বলিয়া কি প্রকারে সম্বোধন করিব, যখন তোমার সন্তানগণ আজও আমাদের প্রিয় হন নাই। তোমার সহিত এক হইয়া আত্মবিস্মৃত হওয়া, এ যোগ এ দেশে হইয়া গিয়াছে এবং সে যোগের ভাব আমাদের শোণিতমধ্যে আজও নিবিষ্ট আছে, কিন্তু তোমাকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করিতে গিয়া তোমার সন্তানগণ যে নিতান্ত প্রিয় হন, সে যোগ এদেশে আজও অসিদ্ধ রহিয়াছে। যোগের এ অংশ যদি আমাদের জীবনে প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে তোমার নবধর্ম্মের অভিপ্রায় আমাদের জীবনে কোথায় সিদ্ধ হইল? হে বিশ্বপতি, এ যোগসাধনের উপায় তুমি আমাদিগকে বলিয়া দাও নাই, এ কথা বলিব কি প্রকারে? কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করিয়া নিরন্তর সাধন কৈ আমাদের মধ্যে চলিতেছে। তোমার সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন এবং যাঁহারা আমাদের স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র, এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। একই সাধনে এ উভয়ের সঙ্গে যোগসাধন, হে দেব, বল কখন কি সম্ভবপর? পাত্রভেদে ভক্তি, পাত্রভেদে মঙ্গল কামনা, এ প্রভেদ যখন তিরোহিত হইবার নহে, তখন সাধ নকি প্রকারে এক হইবে? যদি উভয়ের ভিতরের দেবভাবমাত্র সাধনের বিষয় হয়, তাহা হইলে তোমাতে সকলের সঙ্গে যতটুকু যোগ তাহাই হইল, মানবীয় বিভাগের সঙ্গে যোগের যে বিশেষত্ব আছে, সে বিশেষত্ব ইহাতে কিছুই রহিল না। কেবল জ্ঞানে যোগ পূর্ণ নয়। তোমায় জানিলে কি তোমার সহিত পূর্ণ যোগ হয়। তোমার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ যদি না জন্মে, তুমি যদি আমাদের প্রিয় না হও, তাহা হইলে সে যোগ নিতান্ত দুর্ব্বল। তোমার সন্তানদিগের সম্বন্ধে সেই একই কথা। তোমার সহিত যে যোগ তন্মধ্যে ভাবের ভিন্নতা নাই, মানবের সহিত যোগে ভিন্নতা আছে। এই ভিন্নতা অনুসারে সাধনেরও তো ভিন্নতা হইবে। অতএব হে পরম দেব, এক সময়ে ভিন্ন সাধন গ্রহণ করিয়া কিপ্রকারে সাধন করিতে হইবে, আমাদিগকে শিক্ষা দাও। তুমি না শিখাইলে ইহাতো আর কেহ আমাদিগকে শিখাইতে পারে না। সাধন সঙ্কুচিত সীমা মধ্যে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে বিস্তৃত ভূমিতে উহার প্রয়োগ করিতে হয়। কোন্ সঙ্কুচিত ভূমিতে সাধনের আরম্ভ হইবে, তুমি যদি আমাদিগকে না দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে বল আমরা সাধন করিতে গিয়া যে নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইব। এই

জন্য আজ তব চরণে ভিক্ষা করিতেছি, আমাদের প্রতিজনকে সেই ভূমি দেখাইয়া দাও, যেখান হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া আমরা সিদ্ধমনোরথ হইব। তোমার কৃপায় আমাদের নিকটে সাধনের পথ প্রকাশ পাইবে, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

অদ্বিতীয় ও অদ্বৈতস্বরূপের প্রভাব।

অদ্বিতীয় ও অদ্বৈত, এ দুই শব্দ এক অর্থ প্রকাশ করে না। অদ্বিতীয় শব্দে অপরের সহিত সম্বন্ধ, অদ্বৈত শব্দে আপনার সহিত আপনার সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে। ঈশ্বরের আর দ্বিতীয় নাই, এজন্য তিনি অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের যদি প্রতিদ্বন্দী আর কেহ থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব খর্ব্ব হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাধনকালে অদ্বিতীয়স্বরূপ সাধনের বিষয় ছিল। ইহাতে জগৎ জীব ও অন্য দেবতা উড়াইয়া দিয়া একমাত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধির বিষয় করিতে হইত। যাঁহারা এ সাধনে অসমর্থ ছিলেন, তাঁহারা জগৎ ও জীব হইতে কারণরূপী ব্রহ্ম অনুমান করিয়া উদ্দেশে তাঁহার চিন্তা করিতেন। অনন্তস্বরূপের প্রথম গতির ন্যায় অদ্বিতীয় স্বরূপের গতি, প্রভাবও সুতরাং সেইরূপ।

ঈশ্বর দুই ভাববর্জ্জিত, একভাবাপন্ন; অদ্বৈতস্বরূপ ইহাই বুঝাইয়া থাকে; ঈশ্বর যদি একভাবাপন্ন না হন, তবে তিনি বিকারী হইলেন। শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, নামে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ হইলেও বস্তুতঃ এক। এই সমুদায় স্বরূপের প্রকাশ বিবিধ প্রকার হইলেও মূলে সে সমুদায়ই এক। জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইলেও জীবের দৃষ্টির ভিন্নতা ভিন্ন ব্রহ্মে সম্বন্ধজনিত কোন ভিন্নতা নাই, অদ্বৈতস্বরূপ ইহাই আমাদিগের নিকটে নিয়ত প্রকাশ করিয়া থাকে। অদ্বিতীয়স্বরূপের প্রভাব অনন্তস্বরূপের প্রথমগতির ন্যায় হইলেও শব্দের ভিন্নতাবশতঃ কিঞ্চিৎ ভিন্নতা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপরে উহার কি বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহা বিচার করিয়া অদ্বৈতস্বরূপের প্রভাব তৎপর বিচার করা যাউক।

অদ্বিতীয়স্বরূপের অবশ্যম্ভাবী ফল অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় হয় নাই, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ বলিয়াই বরং তখন গৃহীত হইয়াছিল। যে সময়ে অদ্বৈতবাদের * প্রতিবাদ হয়, সেই সময়ে অদ্বৈতস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এরূপ প্রতিবাদ করিয়াও ব্রাহ্মসমাজ কি অদ্বৈতবাদের হস্ত হইতে প্রমুক্ত হইয়াছেন? কখনই না। ব্রহ্ম ভিন্ন পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, একমাত্র তিনিই ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের মতের মূলে যখন এই সত্য স্বীকৃত রহিয়াছে, তখনই জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম যে একই অখণ্ড বস্তু, ভিন্ন প্রতীতি হওয়া অজ্ঞানতামূলক, ইহা কোন না কোন আকারে ব্রাহ্মসমাজমধ্যে সময়ে সময়ে দেখা দিবেই দিবে। অন্য দিকে আবার যিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী তাঁহাকেও "কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য" ইত্যাদি সত্য স্বীকার করিয়া অদ্বৈতে দ্বৈত স্বীকার করিতেই হইবে। "কারণ ব্রহ্মের যে প্রকার ত্রিকালে সত্তার ব্যভিচার নাই, কার্য্য জগতেরও সেই রূপ ত্রিকালে সত্তার ব্যভিচার নাই," "উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে অসৎ বলা অত্যন্ত অসত্ত্ব অভিপ্রায়ে নয়, তবে যে অসৎ বলা সে কেবল নামরূপের প্রকাশরূপ ধর্ম্ম হইতে নামরূপের অপ্রকাশ ধর্ম্মান্তর এই জন্য। সেই ধর্ম্মান্তর আশ্রয় করিয়াই কারণরূপে অনন্য সৎ কার্য্যকেই উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ বলা হইয়া থাকে।" "প্রলীয়মান এই জগৎ শক্ত্যবশেষই প্রলীন হয়,

---

* অদ্বৈতবাদ এই শব্দমধ্যে যে অদ্বৈত কথাটী দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ব্রহ্মের স্বরূপ আশ্রয় করিয়া প্রযুক্ত নহে। যাহা কিছু দুই ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা দুই ভাবাপন্ন নহে একই, এই অর্থে অদ্বৈতশব্দ গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

শক্তিমূলকই আবার উৎপন্ন হইয়া থাকে।" এই সকল কথা বলিয়া শঙ্কর ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তিকে অভিন্ন এক বস্তু স্বীকার করিয়া তদুৎপন্ন জগতের সত্যত্ব স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু ছিল না, এ কথা বলিতে গিয়া ব্রহ্মের জগৎ উৎপাদনে শক্তি অস্বীকার করিলেই অদ্বৈতবাদের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অনেকের জীবনে এই অনিষ্ট মতদোষরূপে প্রকাশ পায়, এবং তজ্জন্য নীতি শৈথিল্য উপস্থিত হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ জগৎ অস্বীকার করা আজ পর্য্যন্ত কোন অদ্বৈতবাদীর সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় নাই।

"কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য" "কার্য্যেরও ত্রিকালে সত্তার ব্যভিচার নাই", এ সত্য স্মরণে রাখিলে জগৎসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদের দোষ পরিহৃত হইল, কিন্তু জীবসম্বন্ধে দোষ তদবস্থ রহিয়া গেল। "অবিকৃত পরব্রহ্মই উপধিসম্বন্ধবশতঃ জীবভাবে অবস্থান করেন" একথা যোগের অনুকূল হইলেও জীবনের পক্ষে অনুকূল নহে, কেন না উহা পূর্ণ সত্য নহে। "কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য" এ স্থলে ভগবদ্গীতার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে জীবকেও ইহার অন্তর্ভূত করিয়া লইতে হইবে। 'অপরা প্রকৃতি' 'পরা প্রকৃতি' এইরূপ প্রভেদ করিয়া জীবকে শ্রেষ্ঠত্ব দানপূর্ব্বক ভোগ্যরূপে জগৎকে তাহার সহিত সম্বদ্ধ করা কোন কালে অদার্শনিক নহে, বরং ইহাই সত্য দর্শনশাস্ত্র। এ মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ যোগের অন্তরায় উপস্থিত হয়, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না, কেন না 'কারণের অনন্য কার্য্য' এমত এতদ্দ্বারা পরিহৃত হয় না *। জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অথচ জগৎ ও জীব ব্রহ্ম নহে, কার্য্য ও কারণসম্বন্ধে এ সত্য স্মরণে রাখিলে জীবনে অদ্বিতীয়স্বরূপের প্রভাব যথাযথ কার্য্য করিতে পারে। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, কেন না জগৎ ও জীব কোনরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না সর্ব্বথা ইহারা ব্রহ্মাধীন। ব্রহ্ম ইহাদিগের নিয়ন্তা, ব্রহ্মের ইহারা চিরনিয়ম্য, এ সত্য অস্বীকার করিয়াই ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। নিয়ন্তার সহিত নিয়ম্যের একান্ত ঐক্য অক্ষুণ্ণ আনুগত্যে যখন সাধিত হইয়া থাকে, তখন যোগের ভাণ করিয়া যাহা সত্য তাহা অস্বীকার কখনই শ্রেয়স্কর নহে। অদ্বিতীয়স্বরূপের প্রভাব আমাদের জীবনে যথাযথ কার্য্য করিতে পারে, এজন্য ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব, জীবের নিয়ম্যত্ব, এবং ব্রহ্মের একান্ত আনুগত্যে জীবের তৎসহ ঐক্য, সর্ব্বদা আমাদের মানসচক্ষে প্রতিভাত রাখা প্রয়োজন। এ পথ বেদান্তসম্মত পথ নহে, ইহা কেহ বলিতে পারেন না।

ব্রহ্মের স্বরূপগত ভেদ স্বীকার না করিয়া অদ্বৈতস্বরূপের প্রভাব আমাদিগের জীবনে কি প্রকার কার্য্য করে, এখন একবার দেখা যাউক। আমরা প্রথম হইতেই বলিয়া আসিয়াছি, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, এ তিন স্বরূপ একই স্বরূপ, তবে সাধনের সৌকর্য্যার্থ এ তিনকে ভিন্নরূপে আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। অদ্বৈতস্বরূপ সমুদায় স্বরূপের একতা আমাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিতেছে। ঈশ্বর স্বরূপতঃ এক, ইহা জানিলে জীবনের উপরে কি প্রভাব বিস্তৃত হয়, ইহা বিবেচনা করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এক স্বরূপ যেমন অন্য স্বরূপের বিপরীত নহে, তেমনি প্রতিস্বরূপের যাহা বিপরীত তাহা কোন কালে তৎসম্বন্ধে সম্ভবপর নহে। শক্তির বিপরীত অশক্তি। জীবেতে শক্তি আছে অশক্তি আছে; ব্রহ্মেতে কেবলই শক্তি, অশক্তির তাঁহাতে অত্যন্তাভাব। শক্তি ও প্রেম এ দুইয়ের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিয়া কোন এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত জগতের দুঃখনিরসনে ঈশ্বরের হয় শক্তির অল্পতা নয় প্রেমের অল্পতা মানিয়া লইয়াছেন। আমরা বলি জ্ঞানের অল্পতাও ইহাতে মানিতে হয়; কেন না জ্ঞান যদি এরূপে বিষয় সমুদায়কে নিয়োগ

* এই সকল মতের জটিলতা ভেদ করিতে না পারিলে কেশবচন্দ্রকে এক জন ঘোর অদ্বৈতবাদিরূপে যে কেহ গ্রহণ করিতে পারেন।

করিতে না পারে যাহাতে দুঃখ নিরসন হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞান কখন পূর্ণ জ্ঞান নহে। যেখানে ভেদ নাই সেখানে ভেদ কল্পনা করিলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই অপরিহার্য্য।

যাউক, অবান্তর বিষয়ের আলোচনা না করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য রক্ষা করিতে গিয়া জীবের উপরে উহার প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইল, অদ্বৈতস্বরূপের সহিত একতা তাহার সম্যক্ নিদর্শন। সংসারসংগ্রামে যদি অশক্তি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন শক্তির আধার ঈশ্বরের সহিত যোগ ঘটিয়াছে কি প্রকারে স্বীকার করিব? জীবনে যে পথ অবলম্বিত হইয়াছে সে পথে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সে জ্ঞান যদি অজ্ঞানতা দ্বারা প্রতিহত হয়, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের আধার ঈশ্বরের সহিত একতা হইয়াছে কোথায়? প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে যদি অপ্রেমের অবকাশ থাকে, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন প্রেম ঈশ্বরের সহিত যোগ কৈ রক্ষা পাইল? শক্তি অশক্তি, জ্ঞান অজ্ঞান, প্রেম অপ্রেম, এ সমুদায়ের প্রথম প্রথমটি ঈশ্বরেতে সম্ভব, দ্বিতীয় দ্বিতীয়টি নয়, ইহা জানিয়া সাধকের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, এবং স্বরূপের প্রতি অভিনিবেশবশতঃ দ্বিতীয় দ্বিতীয়টির তিরোধান হইয়া কেবল প্রথম প্রথমটির আবেশ সাধকের জীবনে সংঘটিত হয়। অদ্বৈতস্বরূপের প্রভাবে আর একটি বিশেষ ভাব সাধকে প্রস্ফুটিত হয়। যখন সকল স্বরূপই এক, তখন সাধকেতে উহাদের একতাই লক্ষিত হইবে। শক্তি আছে জ্ঞান নাই, জ্ঞান আছে শক্তি নাই, শক্তি জ্ঞান আছে, প্রেম নাই, প্রেম আছে শক্তি জ্ঞান নাই, এসকল স্বরূপের বিরোধ ও অভাব আর তাঁহার জীবনে সম্ভবপর হইবে না।

অদ্বৈতস্বরূপে একটি অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, সে সম্ভাবনা যে ভিন্নভাবে স্বরূপ গ্রহণে অভিন্ন ভাবে নহে, ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। মনে কর, ঈশ্বরেতে প্রেম ভিন্ন অপ্রেম অর্থাৎ ক্রোধাদি কদাপি সম্ভবপর নহে, ইহা জানিয়া জীব অনায়াসে প্রশ্রয় লইতে পারে। আমি যেরূপ কেন আচরণ করি না, ঈশ্বর কখন আপনার প্রেম প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে প্রতিনিয়ত প্রেম করিতেই হইবে, ইহা মনে করিয়া আমি আশু-সুখের অনুসরণে দিন দিন পাপের পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতে পারি এবং ভাবিতে পারি, ঈশ্বরের আমার প্রতি প্রেম যখন কোন কালে যাইবার নহে, তখন এখন পাপ করিলামই বা। ঈশ্বর প্রেম, তিনি কখন অপ্রেম হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রেম কি পুণ্য নয়? এক স্বরূপ হইতে অন্য স্বরূপ অত্যন্ত ভিন্ন করিয়া লইয়া ভাবাতে যে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, অদ্বৈতস্বরূপ ভাল করিয়া সাধনের বিষয় করিলে তাহা সহজে তিরোহিত হয়।

অদ্বিতীয়স্বরূপের সঙ্গে যে একটি অনিষ্ট নিয়ত লাগিয়া থাকে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। ঈশ্বর কর্ত্তা, তিনি ভিন্ন আর কেহ কর্ত্তা নাই, অদ্বিতীয়স্বরূপ সহজে আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস উৎপাদন করে। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অতিক্রম করিয়া কর্ত্তা থাকা বাস্তবিকই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্বরূপবিরোধী। যে কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর, ইহা স্বীকার করিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম নীতি অনীতির উচ্ছেদ ঘটিল। অদ্বৈতবাদের এই মহাদোষ দেখিয়াই পাশ্চাত্যগণ উহার একান্ত বিরোধী। এখানেও অদ্বিতীয় ঈশ্বর যে স্বয়ং অদ্বৈত ইহা বিশ্বাস না করিয়াই এরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। পাপী পাপাচরণ করিতে গিয়া যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সে ক্রিয়ার উপকরণসমূহ ঈশ্বরের শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং তন্মধ্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে কে অস্বীকার করিবে? পাপীর যে ইচ্ছাশক্তি এই ক্রিয়াতে সংসৃষ্ট আছে, সে ইচ্ছাশক্তিও ঈশ্বরশক্তি নিরপেক্ষ নহে, সুতরাং এ ক্রিয়াকে পাপ বলিলেই ঈশ্বরকে তাহা স্পর্শ করিল এবং তাঁহার অপাপবিদ্ধত্ব বিদূরিত হইল। ঈশ্বরের শক্তি পুণ্যশক্তি কদাপি পুণ্যবিরহিত নয়,

ইহা স্মরণে রাখিলে এবং সেই ক্রিয়া পাপীর জীবনে পরসময়ে কি উৎপাদন করে ইহা জানিলেই আর এখানে অদ্বৈতবাদসম্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম, নীতি অনীতির প্রভেদ উড়িয়া যায় না। কোন কোন ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল শান্তি, আরাম ও নিত্য সুখ, কোন কোন ক্রিয়ার অপরিহার্য্য ফল তদ্বিপরীত, ইহা মনে থাকিলে অনিষ্টপাত হইবে কি প্রকারে ?

আমি—অপ্রেম।

ঈশ্বর শক্তি, আমি অশক্তি, ঈশ্বর আলোক আমি অন্ধকার; ঈশ্বর প্রেম আমি অপ্রেম। সৎ ও অসতে যে প্রভেদ আমাতে ও ঈশ্বরেতে সেই প্রভেদ। তবে তো ঘোর অদ্বৈতবাদ সত্য হইল, তাহার বিরুদ্ধে লেখনীচালনা কেন? সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না, অসতের সন্নিরপেক্ষ সত্তা নাই তাই বিরোধ। এসকল দার্শনিক বিচারে প্রয়োজন নাই। আমি অপ্রেম বাস্তবিক অপ্রেম, এখানে কবির কবিত্ব নাই, সত্য সত্যই অপ্রেম তাই দেখাইতে অগ্রসর।

আমি কে? একথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমায় নির্ব্বোধ, মূর্খ, ধৃষ্ট বলিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিব। আমি কে? তুমি জান না? বল, আমি না থাকিলে তুমি থাকিতে, না এই জগৎ থাকিত, না ব্রহ্ম থাকিতেন? আমি আছি বলিয়া তুমি আছ, জগৎ আছে, ব্রহ্ম আছেন। আমি থাকা না থাকার উপর যখন সব, তখন আমি কে? এ জিজ্ঞাসা নির্ব্বুদ্ধিতা নয়, মূর্খতা নয়, ধৃষ্টতা নয় কেমন করিয়া বলিব? এই আকাশ দেখিতেছি, বৃক্ষ লতা দেখিতেছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করিতেছি, ব্রহ্ম আছেন নির্দ্ধারণ করিতেছি, আমি যদি না থাকি, তবে এসকল করে কে? চিন্তা করিবার কেউ না থাকিলে চিন্তিত বিষয় থাকিবে কি প্রকারে? তবে আমি সকলের চেয়ে বড়। ধন জন, ঐশ্বর্য্য, সসাগরা পৃথিবী, এমন কি ত্রিভুবন-পতি আমার জন্য, আমি না থাকিলে সব অন্ধকার। সৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজন, সৃষ্ট না থাকিলে স্রষ্টাতেই বা প্রয়োজন কি?

শুনিলে, গর্ব্বিত আমির কথা শুনিলে? এ গর্ব্বিত আমি কে? তুমি আমি সকলেই এই গর্ব্বিত আমি। ঘর করা, সংসার করা, এমন কি ধর্ম্ম কর্ম্ম করা সকলই এই আমির জন্য। আমি না থাকিলে কে কি করে? আমিটা তবে বড় শক্ত, বড় জমাট। যাঁহারা এই আমিটাকে বিদায় করিয়া দিয়া ঘর খালি করিতে চান লোকে তাঁহাদিগকে যোগী বলে। যোগীদের এই আমির উপর যত চোট? এত চোট ব্রহ্মকে ঘরে আনিবার জন্য, ব্রহ্মতনয়তনয়াদিগের দ্বারা ঘর পূর্ণ করিবার জন্য। কেন? আমি থাকিলে কি তাঁহারা আসিতে পারেন না। আমির উপরে তাঁহাদের এত বিরক্তি কেন? আমি না থাকিলে তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে নেয় কে? কি বলিতেছ! আমি কি আদর অভ্যর্থনা করিতে জানে? সে যে বড় নীচ, সে যে আপনাকে বৈ আর কাকেও জানে না! সে আবার অভ্যর্থনা করিবে কারে?

আমির সম্বন্ধে কি এসব মিথ্যা অভিযোগ করিতেছি? আমার সবই ভাল, আর সকলের সে সব মন্দ, এরূপ মনে করে না কয় জন বলিতে পার? তুমি বলিবে, এ তোমার অতিরিক্ত কথা! কে আর আপনাকে সব বিষয়ে সকলের চেয়ে বড় মনে করিয়া থাকে? আমি বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায়, এমএ, বিএ নই, আমি কি আর বিদ্যাসাগর বলিয়া কোন দিন গর্ব্ব করিয়া থাকি? না, তা কর না সত্য, কিন্তু তাঁরা কিছু নন, এটা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কি তোমার ভারি চেষ্টা নয়? আমি কিছু নই বলিয়া যখন তুমি বিনয় প্রদর্শন কর, তখন তার মূলে আমি খুব বড় এটা কি সব সময়ে থাকে না? তোমার বিদ্যা নাই, ধর্ম্ম আছে, এ মনে করিয়া তুমি কি অপরের বিদ্যার উপরে আপনার ধর্ম্মকে বাড়াও না? ধর্ম্মও যদি

না থাকে, সংসারের কার্য্যে তোমার দক্ষতা আছে, সেই দক্ষতার দোহাই দিয়া আর সকলের সে সম্বন্ধে মূর্খতা ব্যাখ্যা করা কি তোমার আহ্লাদের বিষয় নয়! যাই বল, আর তাই বল, তোমার আপনাকে সকলের চেয়ে বড় জানিবার কিছু না কিছু একটা বিষয় তুমি ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছ, নৈলে তোমার আমি বাঁচে কৈ? এরূপ না করিলে সে যে মরিয়া যায়, ঘর খালি হয়, আর উহা পাঁচ জনের অধিকারে আইসে।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন করে না, আমি যে অপ্রেম, আমি আর কাহার গন্ধ সহিতে পারি না, এমন কি স্বয়ং ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আমার কাছে আসেন আমি ভাল বাসি না, প্রতিদিনের জীবন তাহার সাক্ষী। প্রেম প্রেম বলিয়া চিৎকার করিয়া কি করিব? যত দিন আমি আছি, এ ঘরে প্রেমের স্থান কোন কালে হইবে না। আমি আমার বিষয় ভাবি, না তোমার বিষয় ভাবি, না জগতের বিষয় ভাবি, না ব্রহ্মের বিষয় ভাবি? যদি বল স্ত্রী পুত্র সন্তানসন্ততির বিষয় যখন ভাবিয়া থাকি, তখন অপরের বিষয় ভাবি না কে বলিল? তোমার স্ত্রী পুত্র সন্তান সন্ততি যদি তুমি না হইতে তাহা হইলে যত ভাবিতে তাহা বিলক্ষণ বুঝা গিয়াছে। ইহারা যখন তোমার নিকট হইতে সরিয়া পড়ে, মৃত্যুতেই হউক, বা অসদ্ভাবেই হউক, তখন তুমি দিনের মধ্যে কয়বার ইহাদের জন্য ভাব? ইহাদের স্থান শীঘ্র শীঘ্র আর পাঁচ জনের দ্বারা—যাহারা তোমার সুখবৃদ্ধি করে—তাহাদের দ্বারা পূরণ করিয়া লও কি না? স্ত্রীপুত্র পরিবারাদি সবই ফাঁকি, তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি কাহাকেও ভালবাস না, আপনাকে আপনি ভাল বাস, অন্য কথায় আপনার প্রতি আপনি শত্রুতা কর, কেন না ইহাতে তোমার পরিণামে সর্ব্বনাশ। খাঁটি প্রেম তোমার আপনার প্রতি নাই, কাহারও প্রতি নাই, ইহাই সত্য। কেন না প্রেম আদিতে মিষ্ট, মধ্যে মিষ্ট, অন্তে মিষ্ট, চিরসুমিষ্ট, তাহা হইতে কদাপি তিক্তরস উৎপন্ন হয় না।

তুমি বলিতেছ, আমি বড় ধার্ম্মিক, ঈশ্বরানুরক্ত। দেখ কেমন আমি ত্রিসন্ধ্যা ভগবানের আরাধনা করি! হাঁ দেখিতে তুমি ধার্ম্মিক ঈশ্বরানুরক্ত বট, কিন্তু বাস্তবিক কি তুমি তাই? আজ যদি তোমার ভগবান্ তোমার হাতে ধরিয়া তোমায় ঘরের বাহির করিয়া রাস্তায় দাঁড় করান, বিবিধ রোগ শোকে তোমায় পরীক্ষায় ফেলেন, তাহা হইলে কি তুমি তাঁহার ত্রিসন্ধ্যা ভজনা কর, না একতন্ত্রী বাজাইয়া তাঁহার গুণগান কর? ভাব, ভাবিয়া দেখ পার কি না? যদি না পার, তবে তুমি ভগবান্‌কে ভাল বাস না, তুমি আপনাকে লইয়া ব্যস্ত। যত দিন ভগবান্ তোমার মনের মত চলিবেন, তত দিন পূজা অর্চ্চনা পাইবেন, তাঁহার প্রেমের কত প্রশংসাই তুমি করিবে, যাই তিনি আর তোমার মনের মত রহিলেন না, অমনি তিনি তোমার বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। ইহাকে কি প্রেম বলে? তাকেই বলি প্রেম, যাতে মানুষ প্রেমাস্পদের জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে, জলে ডুবিতে পারে, তীক্ষ্ণ তরবারির অগ্রে জীবন দিতে পারে। একবার ঈশা চৈতন্য শাক্য প্রভৃতির দিকে তাকাও, তাঁহাদের জীবনে দেখিবে প্রেম কাহাকে বলে!

তুমি কি প্রেমিক হইতে চাও? যদি চাও, তবে আপনার হাত ধরিয়া আপনাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দাও, পাঁচ জন অতিথিকে, সর্ব্বোপরি ভগবান্‌কে আনিয়া ঘর পূর্ণ করিয়া লও। ধন, মান, বিদ্যা বুদ্ধি, ধর্ম্ম, অর্থ, কিছুরই অভিমান শেষ রাখিও না, সে সকল প্রেমের শত্রু। প্রেম প্রেমাস্পদ বিনা আর কাহারও গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। তুমি বলিবে, এ কথা আমায় বলিতেছ কেন? আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহা ছাড়া আর কাহারও গন্ধ সহিতে পারি না, বাড়ীর কাছে আসিতে দি না। তুমি যাকে প্রেম বল আমার তাহা আছে। এ তোমার প্রেম নয়। একের

প্রতি প্রেমে যদি সকল জগৎ প্রেমাস্পদ না হয়, এক প্রেমাস্পদকেই যদি সর্ব্বত্র সকলেতে না দেখ, তাহা হইলে তোমার ও প্রেম আপনাকে লইয়া আপনার ব্যস্ততা। এক ছেলেকে ভালবাসিয়া যে পৃথিবীর সকল ছেলেকে ভালবাসিতে পারিল না, তার ভালবাসা কি আর ভালবাসা। 'আমি' 'আমার' থাকিলে সেখানে ভালবাসা, সেখানে প্রেম জন্মাইবে কি প্রকারে? আমিকে বিদায় কর, দেখি প্রেম সেখানে জন্মায় কি না? বলিতে বলিতে অনেক বলা হইল, আর নয়। আমি—অপ্রেম, ইহা জানিয়া আমিকে বিদায় করিয়া দাও, ঈশ্বরেতে সকল নরনারীতে আপনাকে মিশাইয়া ফেলিয়া আপনি তাঁহাদের ভিতর অদৃশ্য হইয়া যাও, দেখিবে অপ্রেমের স্থান প্রেম আসিয়া অধিকার করিয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আত্মাকে বাড়াইতে গিয়া শরীরকে এত অনাদর করা কি সত্যসঙ্গত? শরীর ও আত্মার যখন একত্র বাস, শরীরের ভিতর দিয়া যখন আত্মার প্রকাশ, তখন শরীরের অনাদরের সঙ্গে সঙ্গে কি আত্মার অনাদর হয় না? আত্মার সৌন্দর্য্য, সাধুতা, নির্দ্দোষ প্রকৃতি কি সৎ নরনারীর মুখশ্রীতে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায় না? অপরের আত্মার আবির্ভাব কি শরীরযোগে এ পৃথিবীতে আমাদিগের নিকট প্রকাশ পায় না? আত্মার প্রতি সমাদরে কি দেহের প্রতি সমাদর বাড়ে না? তোমার এ প্রশ্ন সমুদায়ই ঠিক। পৃথিবীর লোকে শরীর শরীর বলিয়া সারা হইল, এজন্য কতক দিন আত্মা আত্মা বলিয়া চিৎকার করা প্রয়োজন; তাই কেবল এখন জপ করিতেছি, আত্মা আত্মা আত্মা।

শরীর পরিশ্রম হইতে অবসর লাভ করিল ভাল, মনেরও কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামসুখসম্ভোগ আকাঙ্ক্ষণীয়? শরীর অল্পে অবসন্ন হইয়া পড়ে, আর নড়িতে চায় না, মনও কি তাই করে? মনের অর্থ—মনন চিন্তা ভাবনা, তাহা ছাড়া মন যে মনই নয়। তুমি বলিবে, আমি যখন ঘুমাই, মনতো তখন চিন্তা করে না। তখন কি আর তবে মন নাই? আমি বলি শরীর ঘুমায়, মন কখন ঘুমায় না, সে কোন না কোন চিন্তায় থাকে। তবে অযত্নে চিন্তা করিলে পূর্ব্বের চিন্তা মন হইতে সরিয়া পড়ে আর দেখা দেয় না; তাই মনে হয় ইহার পূর্ব্বে তুমি কিছু চিন্তা কর নাই। প্রতিদিন যে স্তোত্র পাঠ কর, তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব শব্দ উচ্চারণ করিয়া যখন পর পর শব্দে আইস, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলে কি না, তাহা কিছুমাত্র মনে পড়ে না; ঘুমন্ত অবস্থায় ঠিক তাই। তবে স্বপ্ন যে মনে থাকে, তাহা মনের অতিমাত্র উত্তেজিত অবস্থায় ঘটে বলিয়া। তাই বলি শরীর বিশ্রাম পাইয়াছে বলিয়া মন যেন বিশ্রাম না পায়। অবসরের সময়ে জ্ঞান, প্রেম পুণ্য সঞ্চয়ে সমধিক যত্নশীল হও।

যে শিক্ষকের হাতে আপনাকে রাখিয়াছ, সে শিক্ষকের শিক্ষাপ্রণালীর মধুরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ কি? পৃথিবীর শিক্ষকেরা শিক্ষার ভার চাপাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সে ভারে যে শিক্ষার্থীর প্রাণ যায়, সে দিকে তাঁহাদের দৃক্‌পাত নাই। দৃক্‌পাত করিয়া কি করিবেন? তাঁহারা ভার দিতে পারেন, কিন্তু ভার বহনের সামর্থ্য তো তাঁহারা দিতে পারেন না। তুমি সম্প্রতি যে শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তিনি শিক্ষার বড় বড় গুরুভার যদি চাপাইয়া দেন, তাহাতে শিক্ষার্থীর মনে ভয় হয় না, এ গুরুভার বহিব কি প্রকারে? কেন না শিক্ষার্থী জানেন যে, শিক্ষক ভার বহিবার সামর্থ্যও যোগাইবেন। দেখ, এ জন্যই এ শিক্ষক যত ভার চাপান তত আহ্লাদ হয়, কারণ শিক্ষার্থী বিলক্ষণ জানেন, ইহাতে তাঁহার নূতন সামর্থ্য বাড়িবে। তোমারও শিক্ষক যিনি, আমারও শিক্ষক তিনি। এই জন্য বিশ্বাস করি, এ সম্বন্ধে তোমার আমার সমান বিশ্বাস হইবে, কেন না আমরা দুজনে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমার নিকটে যাহা সত্য, তোমারও নিকটে তাহা সত্য এই জন্যই বিশ্বাস করি, আর সেই বিশ্বাসেই, যাহা শিখিয়াছি বা শিখিতেছি, তাহা তোমার সঙ্গে বিনিময় করিতে আমার এত সাহস।

বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ।

রবিবার ৯ই ফাল্গুন ১৮১৯ শক।

(শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিবৃত।)

বেদান্ত বিজ্ঞানে দুইটী মত আছে। একটী বিবর্ত্তবাদ, অপর পরিণামবাদ। বিবর্ত্তবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত, পরিণামবাদ শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত। বিবর্ত্তবাদ কি,—সমুদয় সৃষ্টবস্তু এবং ব্রহ্ম একরূপ। সৃষ্টবস্তু ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং একাকার—এক। কেবল ভ্রমবশতঃ আমরা নানা রূপ দেখি এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্ট বস্তু স্বতন্ত্র মনে করি। ব্রহ্মে কোন পরিবর্ত্তন নাই; সুতরাং সৃষ্ট জগতেও কোন পরিবর্ত্তন নাই। আর পরিণামবাদ কি?—যদিও সকল সৃষ্ট বস্তুর নিম্নে ও গভীর প্রদেশে ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব আছে বটে, কিন্তু সেই একত্ব ব্রহ্মের ইচ্ছাতে নানা রূপ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ উন্নতির পর উন্নতি পরিণামের পর পরিণাম আছে। সৃষ্ট আত্মা এই নিয়মের অধীন হইয়া উন্নতিলাভ করিতে করিতে ব্রহ্মলাভ করে ও ব্রহ্ম সহ একাকার হয়। সংক্ষেপে এই দুই মতের সার মীমাংসা এই। এইক্ষণে দেখা যাউক আমাদের জীবনে এই

দুই মতের প্রভাব কত দূর। আমরা একরূপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত মানি। কারণ আমরাও স্বীকার করি, ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয়, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, তুরীয় ও কূটস্থ। ব্রহ্ম পূর্ব্বেও যাহা, পরেও তাহা। ব্রহ্ম, জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আপনার রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করেন না। তিনি নির্ব্বিকল্প ও একরূপ। কিন্তু ইহা মানি বলিয়া ব্রহ্ম ও সৃষ্টজগৎ এক ও অভিন্ন ইহা আর মানি না। অথবা সৃষ্টির কোন উন্নতি নাই তাহাও স্বীকার করি না। অধিকন্তু আমরা পরিবর্ত্তনবাদী; আমরা আত্মারও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ও অনন্ত উন্নতি মানি। ক্রমাগত মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাতে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, উন্নতির পর উন্নতি হইতেছে। এই প্রকার অসীম পরিবর্ত্তন ও উন্নতির প্রভাবে মানুষ যতই ভ্রম ও মায়াবর্জ্জিত হইবে, ব্রহ্ম দর্শন ও ব্রহ্মে অবস্থিতির যাবতীয় অন্তরায় যতই চলিয়া যাইবে, ততই জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদ ও নিত্য যোগের উপায় হইবে। ইহাই আমাদের মত। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমরা ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সঙ্গে এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্টজগৎ-সম্বন্ধে শ্রীরামানুচার্য্যের মতের সঙ্গে অধিকাংশ বিষয়ে ঐক্য হইতেছি। মতের সঙ্গে মতের ঐক্য হইল বটে, কিন্তু আমাদের জীবন ও মত কত দূর এক হইয়াছে তাহা আলোচনার বিষয়।

আমরা সৃষ্ট আত্মাতে অসংখ্য পরিবর্ত্তন ও অনন্ত উন্নতি স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের জীবনে কি উন্নতি দেখা যাইতেছে? এই গত চতুর্দ্দশ বৎসরে আমাদের জীবন কত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে? আমরা জীবনের পরিণতিতে গেলাম, না বিবর্ত্তের পথে পড়িয়া যাহা ছিলাম, তাহাই রহিলাম? পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, আমরা প্রকৃতির এই শক্তিকে নিজ নিজ শক্তিতে প্রতিহত করিতে পারি নাই; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে উন্নতি কই? কালের ভীষণ আঘাতে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল—চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। কিন্তু আমাদের সুবুদ্ধি, সুকৌশল, নিষ্ঠাপূর্ণ যত্ন ও আত্মত্যাগ সেই বিচূর্ণের ভস্ম সংগ্রহ করিয়া আরও সুন্দর, সুগঠিত, সুরঞ্জিত, সৌষ্ঠবসম্পন্ন, বিচিত্র জীবন অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছে ইহাত দেখিতে পাইতেছি না। এই পৃথিবীতে যদি আমাদের উন্নতি না হইল তবে পরে যে উন্নতি হইবে তাহারই বা প্রমাণ কি?

পৃথিবীতে তিন প্রকার উন্নতি দেখা যায়। প্রথম প্রকার উন্নতি স্বভাব-শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতজনিত। এই উন্নতির ক্রম অনন্ত উন্নতির অন্তর্গত নহে। যেমন পর্ব্বত, সাগর, নদ, নদী। দ্বিতীয় প্রকার উন্নতি স্বভাবের সীমাবদ্ধ উন্মেষ। ইহার ক্রমও অনন্ত উন্নতির অন্তর্নিবিষ্ট নহে। যথা পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় ইতর প্রাণী। গো-বৎস দিন দিন বড় হয় বটে; কিন্তু এমন অবস্থায় তাহার যাইতে হয়, যখন আর তাহার উন্নতি হয় না। অণ্ড ভাঙ্গিয়া যখন পাখী বাহির হয়, তখন তাহার গান করিবার শক্তি থাকে না। ক্রমে তাহার পাখা দৃঢ় হয়, আকাশে বিচরণ করিয়া সঙ্গীত করিতে পারে; কিন্তু ইহাদের এই সীমাবদ্ধ উন্নতির ভিতরে কোন বৈচিত্র্য নাই। ইহার জাতীয় পাখীদের যেমন পাখা, যেমন চলাফিরা, যেমন সঙ্গীত ইহার তাহাই হয়। কোকিলের গান কখনও অন্য রকম হয় না। স্বর্গীয় হোমা পাখী কখনও আপন পাখা পরিবর্ত্তন করে না। অর্থাৎ পশু পক্ষীদিগের উন্নতি চিরকাল যাহা ও যেমন হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত কিছু হয় না।

তৃতীয় প্রকার উন্নতি অনন্ত উন্নতিশীল। স্বভাবের পূর্ণবিকাশময় মানবাত্মাই এই উন্নতির অধিকারী। আত্মার উন্নতি অতি বিচিত্র। ইহাতে এত পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি দেখা যায়, যাহা মানুষের ভাবনা ও সাধারণ ধারণার অতীত। প্রত্যেক জীবনে ইহার ক্রম নূতন, সম্ভাবনা নূতন, সিদ্ধি নূতন। মানবজগতের ইতিহাস ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু কতকগুলি কেন অধিকাংশ মানুষের ভিতর দেখা যায় তাহারা এক বার যে উন্নতি লাভ করে তাহা আর ঊর্দ্ধমুখী হয় না, বরং ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া অনেকে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হন, মানুষের ভিতরে নিত্য পরিবর্ত্তন ও অনন্ত উন্নতির যে মত তাহা ভ্রান্তিমূলক। পশুপক্ষীদিগের মত মানুষেরও যত দূর উন্নতি হইবার তাহা হইয়া উন্নতির দ্বার চির অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

তোমরাও যদি মনে কর যে, যে উপাসনা করিয়াছ তাহার আর পরিবর্ত্তন ও উন্নতি নাই, যে চরিত্র লাভ করিয়াছ তাহাতে আর বিকসিত হইবার কোন অংশই অবশিষ্ট নাই, যে মত ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ তাহা চির অপরিবর্ত্তনীয়, যে বৈরাগ্য সাধন করিয়াছ তাহা পূর্ণ বৈরাগ্য, যে ব্রহ্মকে দেখিয়াছ তাহাই ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ; এই যদি তোমাদের ব্রহ্মলাভ হয় তবে তোমরা আর কি লাভ করিলে? ব্রহ্ম স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের জীবনের পথ দেখাইয়া দিলেন, তোমরা ব্রহ্মের কৃপাতে পবিত্র ব্রহ্মপরিচয় পাইলে, যদি ইহা চির উন্নতিশীল না হয় তবে তোমরা এই বিধানে কেন আসিলে?

যাহা হইয়াছে তাহাই যদি তোমাদের জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয়, যে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছ, তাহাই যদি পূর্ণ ধর্ম্ম হয়, যে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে, তাহাই যদি বিশ্বাসের পূর্ণ আলেখ্য হয়, তবে তোমাদের ভিতরে নববিধানের বীজ নিহিত ছিল এ কথা স্বীকার করিতে পারি না, এবং তোমরা যে নবধর্ম্মের গৌরব কর তাহাও নিতান্ত অসার মনে করি। কারণ ইহাতে পুরাতন ধর্ম্মবিধানের লোক হইতে তোমাদের এমন শ্রেষ্ঠতা কিছুই হয় নাই। তোমাদের অপেক্ষা অনেক শিখ, ও বৈষ্ণবের বৈরাগ্য কি অধিক নহে? তোমাদের অপেক্ষা অনেক সন্ন্যাসীর আত্মত্যাগ কি শ্রেষ্ঠ নহে? তোমাদের অপেক্ষা শত শত হিন্দু নারীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে বহু পরিমাণে অধিক নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতা কি দেখা যায় না? কত কত খ্রীষ্টান তোমাদের অপেক্ষা শত গুণ মনের অনুরাগে কি পরসেবাব্রত পালন করে না? তবে তোমাদের অধিক গৌরব কি? হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা প্রতিদিন সত্য, জাগ্রত, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময়, সুখময় ঈশ্বরের কথা বল; কিন্তু তোমাদের

জীবনে ইহার প্রভাবে যে অমৃত সঞ্চয় হইবার কথা, নিত্য প্রেমাধারের প্রেমসহবাসে জীবন যে নিত্য নূতন ও উন্নত হইবার কথা, পুণ্যময়ের পুণ্যজলে বিধৌত চরিত্র যে সুন্দর ও পবিত্র হইবার কথা, তাহার কত দূর হইল বল?

১৪ বৎসরে শরীরের রক্ত, মাংস, অস্থি কি নূতন হয় নাই? যুগান্তের উন্নতি ধর্ম্ম ইতিহাসের নূতন এক অধ্যায় পূর্ণ করে, তবে তোমরা কেন একভাবে পড়িয়া রহিলে? কোন উন্নতি কেন হইল না? তবে বুঝি সর্ব্বোত্তম সার যিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই, তবে বুঝি আমরা যে উপাসনা করি, তাহা সত্য উপাসনা নহে, তবে বুঝি আমরা যাহাকে সত্য বলি তাহা বুঝি নাই, তবে বুঝি আমরা যে উচ্চ ও চির উন্নতিশীল ধর্ম্মবিধানের কথা বলি, তাহার আশ্রয় আমরা পাই নাই। অগ্নিস্পর্শে বস্ত্ররাশি দগ্ধ হয়, পুণ্যময়ের পুণ্যাগ্নিতে কেন তুমি দগ্ধ হইলে না? ভিজা দেয়াশলাই একশত বার টান আগুন বাহির হইবে না। তোমার জীবন তেমনি হইয়াছে; পুণ্যাগ্নি তাহাতে জ্বলিবে না। যদি উন্নতির পথে না যাও, যদি অনন্তের জন্য ব্যাকুল হইতে না চাও, যদি পরিবর্ত্তনে এত ভীত হও, তবে কাষ্ঠ লোষ্ট্র হইলে না কেন? যদি চিরউন্নতি বিমুখ হইবে তবে পশু পক্ষীর জীবন লাভ করিতে অভিলাষী হইলে না কেন?

ব্রহ্ম ২০ বৎসরেও তোমাদের জীবনে দেবস্বভাব দিতে পারিলেন না, তোমাদের চরিত্রে দেবচরিত্র সংযোগ করিতে পারিলেন না, পবিত্রতার আগুনে তোমাদের পাপ দগ্ধ হইয়া গেল না। তোমরা কোন একটী প্রবলশক্তির প্রভাবে যেন কতক দূর পরিচালিত হইয়া সেখানেই জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলে, ইহা কত দূর পরিতাপের বিষয় একবার চিন্তা কর। হিন্দু, মুসলমান সকলেই ভবপারে চলিয়া গেল, অনন্তের পথে পথিক, অনন্তের ভাবনায় ভাবুক, অনন্তের প্রেমপ্রয়াসী হইবার অঙ্গীকার করিয়াও, হে ব্রাহ্ম, তুমি কেন নিরাশ হইয়া পড়িয়া রহিলে? তোমরা যদি যাহা হইয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে চাও, অথবা কেবল এই বক্তৃতা শুনিয়াই চলিয়া যাইতে চাও, যদি উপাসনাতে উন্নতি না হয়, ব্রহ্ম আরাধনাতে নূতন সত্য, নূতন আনন্দ, নূতন ধন না চাও, যদি নব নব অনুরাগে ব্রহ্ম পূজা না কর, নূতন উৎসাহ উদ্যমে জগতের সেবা না কর, তবে আমার প্রাণ তোমাদের সঙ্গে এক হইবে কি রূপে? যদি উন্নতি না চাও, যদি জীবনকে ব্রহ্মের ইচ্ছাস্রোতে ভাসাইয়া না দাও, তবে এই মিলন থাকিবে না। ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদ পাইয়া যদি তোমরা তাহার ফল জীবনে ফলিতে না দাও, তবে তাঁহার অভিসম্পাতের ভাগী হইবে। যদি আর অগ্রসর হইতে না চাও, যদি নূতন কিছু না কর, যেমন ছিলে, তেমনি থাকিবে মনে করিয়া থাক, তবে আমাকে বিদায় দাও। মিলন ইহা নহে। বৃদ্ধের শীতল রক্তে যুবকের উষ্ণ রক্তের মিলন না হইলে মিলন হইল না। শক্তি শক্তিতে মিলিয়া প্রবল শক্তি না হইলে মিলন হইল না। যাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আকারে গঠন না করিলে মিলন হইল না। মিলনের উদ্দেশ্য উন্নতি। দুইটী শক্তির মিলনের উদ্দেশ্য প্রবল শক্তি হওয়া। যদি তাহা না হইল তবে মিলন কি? এবং মিলন স্থায়ী হইবে কি রূপে? ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া, ভাব লইয়া, বাসনা লইয়া অনেক লোক মিলিত থাকা সম্ভবপর নহে। যাহারা মিলিত থাকিবে তাহাদের প্রাণগত চেষ্টা, প্রাণগত আগ্রহ এক হওয়া আবশ্যক, প্রত্যেকের বিভিন্ন কার্য্য থাকিলেও সকল কাজের মূল এক স্থানে নিহিত রাখিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড সৌরজগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের কার্য্য স্বতন্ত্র, তথাপি তাহারা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যথার্থ মিলন এইরূপ হইবে। যদি সম্পূর্ণ মিল না চাও, তবে মিলনে কি ফল? একাকী ব্রহ্মসহবাসসুখসম্ভোগের ন্যায় প্রীতিকর, আনন্দজনক, শান্তিময় কি আছে? মিলনের যথার্থ উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হইল তবে একাকিত্বই চিরবাঞ্ছনীয়।

আমি অনেক কাল তোমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এখন আমার পরলোকে অবস্থিতির সময়। সেই দিন আমার নিকটবর্ত্তী যে দিনে অনেক মিলন, অনেক সহানুভূতি, সম্পূর্ণ একপ্রাণতা না হইলে আর মন উঠে না। এখন এতটুকু মিলনে, সামান্য সহানুভূতিতে সুখী হইতে পারি না। অতএব হয় এস পরিবর্ত্তনের পথে থাকিয়া অনন্ত উন্নতির স্রোতে ভেসে যাই, নতুবা সব ছাড়িয়া একাকী হই। হয় নবধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, নবধর্ম্মের আলোক হস্তে করিয়া জগতের সমস্ত নরনারীর পথপ্রদর্শক হই, উদার মনে জগতের সেবা করি, না হয় চল পুরাতন ধর্ম্ম-বিধানের আদেশ স্বীকার করিয়া নিজ নিজ জীবনের অভ্যন্তরে জীবন-সখার সঙ্গে অভেদ্য যোগে আচ্ছন্ন হই। আমার আশা অতি উচ্চ। সকলকে সঙ্গে করিয়া অনন্ত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে মন ব্যাকুল। সুতরাং আবারও বলি, জীবনে বিবর্ত্তবাদ পরিত্যাগ কর, পরিণামবাদী হও। পরিণাম ও পরিণতি কত দূরে জান না। অতএব নিত্য পরিবর্ত্তন ও তাহাতে উন্নতির যে বিধি পরমেশ্বর বিধান করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর। কৃপাময় ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাউন।

হে ব্রহ্মসনাতন, এক অবিনাশী পিতা, বিবর্ত্তবাদী হইয়া যেন আপনাকে হারাইয়া না ফেলি, আমার নিজ অস্তিত্ব যদি ভুলিয়া যাই তবে তোমাকে দেখিয়া সুখী হইবে কে? যদি তোমার জগতের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির বিধি স্বীকার না করি তবে তোমার দর্শন কোথায় পাইব? যাহারা তোমাকে যথার্থ ডাকে তাহারা কখনও অলস হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে না। অতএব যাহারা তোমাকে প্রাণে আগ্রহে যথার্থ ডাকে তাহাদের সঙ্গে আমাকে মিলিত কর। স্বর্গীয়গণ তোমার গভীর প্রেমে মগ্ন আছেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি আমাকে তোমার নিকটস্থ করে। সেই চিরউন্নতিশীল আত্মাসকলের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া দাও।

হে লোকভঙ্গনিবারণ, অনেক দিনের চেষ্টাতে যে মিলন হয়, এক দিনে এক জনের কথাতে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, অনেক দিন খুঁজিয়া যে দ্বীপ প্রাপ্ত হই, কি জানি কি স্রোতের আঘাতে তাহা

ভাঙ্গিয়া যায়, উচ্চ আকাশে উড্ডীয়মান নিশান যেন সামান্য বায়ুর আঘাতে ভূতলে পতিত হয়। পিতা, তোমার মনে যাহা আছে তাহা কর। কেবল এই প্রার্থনা করি বৃদ্ধগণের সাধনের অহঙ্কার, যুবকগণের আত্ম-জ্ঞানের অহঙ্কার, বিচূর্ণ কর। সকলের চরিত্রকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা কর, শাসন কর, উন্নতির দ্বারের সুদৃঢ় অর্গল ভগ্ন করিয়া দাও। সকলের হৃদয়ের দ্বার যদি ভাঙ্গিয়া না দাও, তবে ইহা এক প্রকাণ্ড হৃদয় হইবে না, প্রত্যেক স্বতন্ত্র মতের বন্ধনী যদি ছিন্ন না কর তবে একমত হইবে না। যদি বহুপরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া থাকে তাহা তুমি প্রবল শক্তিতে সম্পাদন কর। যদি এইবার কোন মণ্ডলী হইয়া থাকে, তবে এই মণ্ডলী সমবেত শক্তিতে তোমার আশীর্ব্বাদ লইয়া যেন পরস্পরকে শাসন করে, পরস্পরের সহায় হয়, পরস্পরকে যথার্থ প্রেমে যেন ভালবাসে। এই মণ্ডলীকে অখণ্ড ও চিরঅবিচ্ছিন্ন ও চিরউন্নতি-শীল কর। প্রেমময়, তুমি আমাদের আশা ভরসা, তোমাতে একান্ত বিশ্বাস ভক্তি সমর্পণ করিয়া আশাপূর্ণ অন্তরে বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

উপাসনাবাস।

জ্ঞানযোগ।

রবিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৮২০ শক।

জানা আর না জানা, এই দুইটি শব্দ কত পৃথক্, কত দূর স্বতন্ত্র, ইহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। জানা এবং না জানা, এ দুইটিই নরজাতির মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা কতক গুলি বিষয় জানি কতকগুলি বিষয় জানি না। এই অনন্ত সৃষ্টি-ব্যাপার মধ্যে সমস্ত বিষয় ভাবিতে গেলে আমাদের জানিত বিষয় এত অল্প হয় যে, অজানিত বিষয়ের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র তুলনা হয় না। সুতরাং জানা ও না জানা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, আমরা যাহা জানি তাহা যত, যাহা জানি না তাহা তদপেক্ষা কম নহে, বরং অসংখ্য গুণে অধিক।

আমরা যাহা জানি না তাহার প্রভাব ও প্রক্রিয়া আমাদের উপর কার্য্যকারী হইতেছে না তাহাও নহে। জগতের মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে যখন কেহ জানিত না, তখনও তাহা জীবের উপরে কার্য্য-কারী ছিল। তখন না জানিয়াও ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইলে হস্ত-পদ ভাঙ্গিয়া যাইত; তখন এই শক্তিসম্বন্ধে কেহ কিছু জানিত না তথাপি বৃক্ষশাখাবিচ্যুত ফল ভূতলে পতিত হইত, জল নিম্ন-গামী ছিল, এখনও তাহাই হইতেছে। তেমনি আধ্যাত্মরাজ্যেও অসংখ্য ক্রিয়া আছে যাহার শক্তি না জানিয়াও আত্মাতে উহা কার্য্যকারী হইয়াছে ও হইতেছে। চারি দিকে জ্ঞানের রাজ্যবিস্তার হইয়াছে, তুমি ঘোর অজ্ঞানী হইলেও তাহার প্রভাবে তোমার অজ্ঞানতার অন্ধকার অনেক তরল হইবে। সমস্ত পৃথিবীতে উন্নতি-স্রোত বহিতেছে, তুমি একাকী নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবে না। চারিদিগের স্রোতের প্রতিঘাতে তোমাকে কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত ও চেষ্টাবান্ করিবেই করিবে। তুমি কিছুই জান না, তথাপি তোমাকে কোন অদৃশ্যশক্তি আঘাত করিতে করিতে উন্নতির পথে চালিত করিতেছে। যে জ্ঞান তোমার হয় নাই সে জ্ঞান তোমায় অর্জ্জন করিতেই হইবে। যে পথে তুমি যাইবে না স্থির করিয়াছিলে, কোন অজানিত শক্তির বলে তুমি চলিয়া যাইতেছ দেখিয়া অবাক্ হইবে। যিনি সমস্ত জগৎকে চালাইতেছেন, তিনি তোমাকে যত্ন চেষ্টার অধীন করিয়াছেন। জগতে তুমি যদি একাকী হইতে, তবে তুমি হয়ত সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতে; কিন্তু তোমার উন্নতির সঙ্গে যখন শত সহস্র লোকের উন্নতির সংস্রব আছে, তখন তোমার চির অলসতার তুমি কোথায়?

অসভ্য জগৎ কিরূপে সুসভ্য হইল এক বার ভাবিয়া দেখ। পৃথিবীর অসংখ্য নরনারীর মধ্যে কয় জন ঈশা, কয় জন শাক্য, কয় জন গৌরাঙ্গ, কয় জন মোহম্মদ! কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের বিস্তার কত! কত অসভ্য, অজ্ঞানী তাঁহাদের জন্য ধর্ম্মরত্নে বিভূষিত ও জ্ঞানমঞ্চে সমুত্থিত। এক এক জন কত হাজার হাজার লোক সঙ্গে লইয়া মুক্তিমার্গে আরোহণ করিলেন। ঈশা বৃথা আপনার কোমল বক্ষে কঠিন ক্রুশ ধারণ করেন নাই। রাজপুত্র শাক্য অনর্থক অপরিমিত রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্গ, উদাসী, সন্ন্যাসী হন নাই। ইঁহাদের এক এক জনের মধ্যে বিকসিত শক্তি অসংখ্য লোকের আত্মাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। অগ্নি-কুণ্ডের পার্শ্বস্থ যাবতীয়বস্তু যেমন অজানিতভাবে উত্তপ্ত হয়, মহাপুরুষগণের প্রভাব তেমনি পার্শ্ববর্ত্তী সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবানের কার্য্যসিদ্ধি করে। সুতরাং দেখ, না জানিয়াও মানুষ কত ফলভোগী হয়। কিন্তু ইহা হয় বলিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার না যে, তবে আর চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম কেন? যদি আপনা আপনি উন্নতি ও মুক্তি সম্ভব হয়, তবে বৃথা আয়াস কেন? জানিও, জ্ঞানের ফল ও অজ্ঞানতার ফল একরূপ নহে। এতদুভয় মধ্যে স্বর্গও মর্ত্তের প্রভেদ।

এই বায়ুমণ্ডলী আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বায়ুমণ্ডলী হইতে পৃথিবীতে আমাদের প্রতি কার্য্যকারী যত শক্তি আসিতেছে, আমরা জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই সমভাবে তাহার ফল ভোগ করিতেছি, কিন্তু যাহারা বায়ুমণ্ডলীর বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ তাহারা জানে না তাহাতে কি আছে এবং কিরূপে সেই দূরতর রাজ্যের শক্তি তাহাদের উপর কার্য্যকারী হইতেছে। যদি এক জন বিজ্ঞানবিৎ যন্ত্রাদিযোগে এই বায়ুমণ্ডলীর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করান, তবে তাহারা একান্ত বিস্ময়সাগরে ডুবিবে, এবং অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে ভগবান্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিবে। অজ্ঞানী অসভ্য জাতিরা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ করিতে সুক্ষম হয় না। তাহাদিগকে একটী ঘড়ি দেখাইলে তাহারা হয়ত উহার শব্দ শুনিয়া মনে করিবে ঐ ঘড়ি তাহাদিগকে ক্রোধে বধ করিতে যাইতেছে।

এক সময় কোন বিজ্ঞানবিৎ কোন জলাশয় হইতে প্রতিদিন

জাল দিয়া মাছ ধরিতেন। কিন্তু মাছগুলি ছাড়িয়া দিয়া জালের মধ্যে কাঠ কুটা ইত্যাদি যাহা থাকিত তাহাই সংগ্রহ করিতেন। এক জন কৃষক প্রতিদিন তাঁহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে পাগল মনে করিয়াছিল। এক দিন সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পাগল হয়েছ যে, প্রতিদিন মাছ ছাড়িয়া কতকগুলি আবর্জ্জনা গ্রহণ কর? তখন তিনি সে দিন কিছু না বলিয়া পর দিন যন্ত্র-যোগে সেই সমস্ত আবর্জ্জনামধ্যে বিচিত্র কীটাণু সমুদায় দেখাইয়া দিলেন। ইহাতে সে বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং বিজ্ঞানবিদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। যন্ত্রযোগে এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া না দিলে সে চাষা কখনও কি কিছু বুঝিত? এইরূপে কি জড়জগতে কি প্রাণিজগতে অসংখ্য অসংখ্য ঘটনা আছে যাহার বিষয় আমরা কিছুই জানি না, অথচ এই সমস্ত যতই জানা যায় ততই আমাদের জীবনে অপরিসীম উপকার হইয়া থাকে। প্রতিদিন আমাদের জীবনে যাহা ঘটিতেছে আমরা তাহার বিষয় অতি অল্পই অবগত হই। কিন্তু ঐ সকল আমরা যত অবগত হইতে থাকি, তত ভগবানের মহিমা ও করুণা আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়। জানা ও না জানাতে, জ্ঞান ও অজ্ঞানতাতে এত আসে যায় বলিয়াই জ্ঞান যোগের এত প্রশংসা। জ্ঞান ভিন্ন ভগবানের ক্রিয়া কিছুই বুঝা যায় না। মাধ্যাকর্ষণসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে যেমন উহা দ্বারা কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে তাহা বুঝা যায় না, ঈশ্বরজ্ঞান না থাকিলে তেমনি ভগবানের অস্তিত্ব ও কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা জীবনে যে সুখ ও আনন্দ সম্ভব তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। আচার্য্য বলিয়াছেন, ঈশ্বরের করুণা সকলের উপর আছে, তথাপি তাঁহার বিশেষ করুণা আছে। বিশেষ করুণার অর্থ আর কিছু নহে, যে তাঁহার করুণা বোঝে সে মনে করে যে তাঁহাকে তিনি শতগুণ করুণা করেন। এইরূপে যে যত অধিক জানে ও বোঝে সে ততই অধিক মনে করে। ঈশ্বরের কথা ও শাসন সর্ব্বত্র সমান। এই যে মহামারি প্লেগ আসিয়াছে আমরা ঈশ্বরের অনুগত বলিয়া ইহা আমাদের অনিষ্ট করিবে না, এমন কিছু মনে করা যায় না। আমরা যদি মনে করি, ইহা কেবল দুরাচারিগণের শাসন জন্য সমাগত, তাহা হইলে বড়ই ভুল মনে করা হইবে। পাপী দণ্ড পাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার প্রতি ভগবানের করুণা কম হইবে, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাহারা বোঝে ও জানে তাহারা আপনাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা অধিক মনে করে। যত বুঝিবে যত জানিবে ততই অধিক মনে হইবে। জানা ও না জানার এই ভিন্নতা।

আর একটী কথা এই যে,—যতই ঈশ্বরের করুণা ও অভিপ্রায় জানা যায়, বুঝা যায়, ততই নির্ভয় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরকে জানিলে মানুষের হৃদয় অপার আনন্দসাগরে দিন দিন নিমগ্ন হয়। আরও একটী কথা এই যে, যে একবার ভগবানের করুণা বুঝিতে পারে, এবং কিঞ্চিৎ ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করে, সে দুরাচারী ও বিপথগামী হইলেও সহজে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে। কারণ তাহার যে জ্ঞান হইয়াছিল তাহা কখন বিনষ্ট হইবার নহে।

আজ জ্ঞানযোগের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, এবং কিছু বলাও হইল। অনন্ত ঈশ্বরের এই অনন্ত সৃষ্টজগতে যত জানিবার বিষয় আছে আমরা তাহার অতি অল্পই জানি। কিন্তু যাহা জানি না তাহাও আমাদের উপর কার্য্যকারী হইতেছে। আমরা যাহা জানিয়াছি, তাহাতে আমাদের জীবন উন্নত হইয়াছে, কত উপকার বোধ করিতেছি, ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিতেছি। এখন বক্তব্য এই যে, আমাদের অসংখ্য জানিবার বিষয় অবশিষ্ট আছে, সে সকল জানিবার জন্য যেন আমরা সর্ব্বদা উৎসাহশীল ও চেষ্টাবান্ থাকি। যত জানিব ততই আনন্দিত হইব, সুখী হইব, কৃতার্থ হইব, ইহা মনে করিয়া আমরা এই পথে দিন দিন অধিক পরিমাণে অগ্রসর হই, কৃপানিধান পরমেশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হে কৃপানিধান, তোমাকে জানিলে আলোক পাই, তোমাকে না জানিলে অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকি। তোমাকে যদি না বুঝি তবে জগতের কোন বিষয় বুঝিতে পারি না। অতএব আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়া দাও; আবরণ উন্মোচন কর। আমরা তোমাকে দেখি এবং তোমার জীব ও জগতে তোমার বিচিত্র কার্য্য সন্দর্শন করি। তোমাকে জগতে দেখিতে না পাইলে প্রত্যেক বস্তুতে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে তোমার দর্শন সত্য দর্শন হয় না। হে পিতা, আমরা তোমাকে ভালবাসি, আর তোমার সৃষ্টবস্তু ভালবাসি না, ইহাতে কোন সত্য নাই। আমাদিগকে জ্ঞান পূর্ণ কর এবং এই আশীর্ব্বাদ কর যেন দিব্য-নয়নে সর্ব্বত্র তোমাকে দর্শন করিয়া আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া চিরসুখী হই।

সংবাদ।

গত রবিবার হইতে নববিধান সমাজের সামাজিক উপাসনার কার্য্য উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহার পায়ের আঘাতস্থান ক্রমে আরোগ্য হইতেছে।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলিকাতায় আসিবেন এরূপ সংবাদ আসিয়াছে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে পাঠকদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনসংবাদ দিতেছি। ইনি এক জন উৎসাহী পরিশ্রমপ্রিয় কর্ম্মশীল ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল ভাল কার্য্যেই ইঁহার উৎসাহ প্রবল দেখা গিয়াছে। গত ২৬এ জুন রাত্রি ৪ঘটিকার সময় ইনি আত্মীয় স্বজন সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মহামারীর প্রতীকার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ মিলিত হইয়া যে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, ইনিই তাহার প্রথম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইঁহার অভাবে সভা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। গত সোমবার উক্ত সভার যে অধিবেশন হইবার কথা ছিল, মাননীয়

জজ শ্রীযুক্ত বি, এল, গুপ্ত, এক্‌সাইজ কমিসনর শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত, সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনী নাথ রায় প্রভৃতি আরও কয়েক জন সভ্য সভায় উপস্থিত হইয়া পরলোকগত ব্যক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করত তাঁহার উদ্দেশে একটি প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়া সভার কার্য্য সে দিনের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। দ্বারিক বাবু কয়েকটি অবগণ্ড ছেলে মেয়ে ও পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই দারুণ শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর পরলোকগত আত্মাকে লইয়া গিয়া যেমন শান্তি ও সুখ বিধান করিতেছেন, তেমনি তাঁহার পরিত্যক্ত ইহ পৃথিবীবাসী আত্মীয় স্বজনের প্রাণে শান্তি ও সুখ বিধান করুন।

ভাই বলদেব নারায়ণ বাঁকিপুরে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র করিয়া সেখানে একটি লিথোপ্রেস আনিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার সাধু ইচ্ছা সম্পাদনে সাহায্য করুন।

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণার্থ যেসকল মহোদয় সাহায্য দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম ধাম ও দানের পরিমাণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ;—

শ্রীযুক্ত আর, এল, দত্ত স্কোয়ার	হুগলী	৫৲
Mrs H. Srv Lady Doctor	Chinsurah	১৲
শ্রীযুক্ত অঘোর চন্দ্র ঘোষ	চন্দননগর	১৲
„ গোবর্দ্ধন শীল	ঐ	১৲
„ পি, সি, রায় স্কোয়ার	কলিকাতা	১০৲
„ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য	ঐ	২৲
„ গোপাল চন্দ্র মল্লিক	ঐ	২৲
„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	বরানগর	২৲
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরি	ঐ	১৲
„ উমেশ চন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	১৲
„ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২০৲
„ A. Rashmi	বহরমপুর	৪৲
„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ হীরালাল হালদার	ঐ	১৲
„ গোবর্দ্ধন চৌধুরি	ঐ	৫৲

ক্রমশঃ

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, সি, দে কর্ত্তৃক, ১৭ই আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
১৩ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ, শনিবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸৹
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা

হে জীবনের উৎস, তুমি থাকিতে আমরা আমাদের জীবনসম্বন্ধে কেন নিরাশ হই? আমাদের জীবনে নূতন নূতন অভাব উপস্থিত হয়, ইহাতেও তো কোন ভয়ের কারণ নাই। আজ যত দিন হইল তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, ক্রমান্বয়ে দেখিয়া আসিতেছি, অভাব আসিলেই তোমার নূতন করুণা প্রকাশ পায়। যাঁহারা চতুর সাধক, তাঁহারা অভাবে ভীত নহেন। যখনই কোন বিষয়ে তাঁহারা অভাব অনুভব করেন, তখনই বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের নিকটে নূতন বেশে তুমি প্রকাশিত হইবে। আমরাও যে তোমার নূতন নূতন বেশ দেখি নাই তাহা নহে, কিন্তু আমরা পুণ্যের অভাবে অভাব আসিলেই নূতন বেশ প্রকাশ পাইবে, এ ভাবিয়া আনন্দিত হইতে পারি না। পাপ বিশ্বাসচক্ষু মলিন করিয়া ফেলে, আশা সঙ্কুচিত করে, মনে বিবিধ সংশয় উৎপাদন করে, তোমার করুণায় পর্য্যন্ত অবিশ্বাস জন্মায়। জীবনসম্বন্ধে নিরাশা কোন কালে উপস্থিত হইত না, যদি আমরা জীবনে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ পোষণ না করিতাম। মন যদি প্রকৃতিস্থ না থাকিল, তাহা হইলে, বল, তোমাতে আনন্দলাভ কি প্রকারে সম্ভবিবে? যে হৃদয়ে আনন্দ নাই, সে হৃদয় তোমার লীলাদর্শনে একান্ত অনুপযোগী। লীলা না দেখিলে কি আর তোমার নিত্য নূতন বেশ কেহ দেখিতে পায়? নিত্য নূতন বেশ না দেখিলেই বা জীবন সরস থাকিবে কি প্রকারে? অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হইলেই চক্ষে আন্ধার না দেখা কি এ অবস্থায় সম্ভবপর? হে রসস্বরূপ, জীবন সরস না হইলে দেখিতেছি, সংসারের বিবিধ গণ্ডগোলের ভিতরে কেহই আপনাকে স্থির রাখিতে পারে না। মতে তোমার নবধর্ম্ম মানিলে কি হইবে? এ ধর্ম্ম যেমন চিরসরস, তেমনই ইহার আশ্রয়ে যাহাদের জীবন গড়িবে, তাহারাও চিরসরসচিত্ত হইবে। যাহাদের নয়ন চিরসুপ্রসন্ন নয়, মুখশ্রী উৎসাহপূর্ণ নয়, তাহারা তোমার নবধর্ম্মের লোক বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নহে। সংসারে থাকিলেই বিবিধ পরীক্ষা আছে, পরীক্ষা থাকিলেই দুঃখ ক্লেশ উপস্থিত হইবারও কারণ বিদ্যমান। সমুদায় পরীক্ষা সমুদায় দুঃখ ক্লেশ জয় করিয়া অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসম্ভোগ এ সংসারে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, কচিৎ কদাচিৎ দু এক জন ক্ষণজন্মা পুরুষ তাদৃশ অবস্থার অধিকারী হইয়াছিলেন। সাধারণ লোকদিগকে সেই অবস্থায়

অবস্থাপন্ন করিবার জন্য তোমার নবধর্ম্মের যত্ন। আমাদের দ্বারা যদি উহা বিফল হয়, তাহা হইলে আমাদের তো পরিত্রাণ হইলই না, পৃথিবীরও ঘোর অকল্যাণ হইল। অতএব, হে আনন্দ, আমরা তব চরণে এই ভিক্ষা করি, আমাদের প্রতিদিনের আরাধনা যেন আমাদের জীবনে নিষ্ফল না হয়; আরাধনা আনন্দে পর্য্যবসান করিয়া যেন আমাদের জীবন আনন্দপূর্ণ হয়, এবং আনন্দমধ্যে তোমার নব নব বেশ দেখিয়া যেন কোন অভাবকে আমরা অভাব বলিয়া না জানি। হে দেব, তব আশীর্ব্বাদে আমাদের এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে, আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

পুণ্যস্বরূপের প্রভাব।

কর্ম্মের সহিত চিত্তশুদ্ধির যোগ, এ দেশের লোক বহু দিন হইল মানিয়া আসিতেছেন। সাধারণের এ বিশ্বাস যে সত্যমূলক, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে কর্ম্মের সহিত পুণ্যস্বরূপের কি যোগ, সর্ব্বাগ্রে বিচার করিয়া দেখা সমুচিত। আমাদের সমগ্র জীবন কর্ম্মময়, মুহূর্ত্তের জন্য আমরা কর্ম্মশূন্য হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না। নিমেষ উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্যান ধারণা পর্য্যন্ত কর্ম্মমধ্যে গণ্য। সুতরাং কর্ম্মের অধিকার সমগ্রজীবনব্যাপী। কর্ম্মের মূল কি? আমাদের ইচ্ছা। পুণ্যস্বরূপ স্বরূপতঃ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা। পুণ্যস্বরূপ ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক কেন, ইহা বিচার্য্য।

পুণ্যশব্দ সর্ব্বপ্রথমে বিকারহীনতা বুঝায়। যেখানে বিকার আছে, বিমিশ্রভাব আছে, সেখানে পুণ্যের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। এ সিদ্ধান্ত অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। পুণ্যের বিরোধী পাপ: পাপ স্বভাবসিদ্ধ নয়। যাহা স্বভাবসিদ্ধ নয়, তাহা প্রকৃতি নয় বিকৃতি। পাপ যখন বিকার তখন তাহার বিপরীত পুণ্য সুতরাং বিকারহীন। ঈশ্বরেতে পাপ কখন সম্ভবে না, তিনি চিরপুণ্য। তাঁহার প্রেমের প্রকাশ যেরূপ আমরা জগতে ও জীবে নিয়ত দেখিতে পাই, তেমনি তাঁহার পুণ্যের প্রকাশ দেখিতে পাই কি না? প্রেম প্রকাশ পায় কিসে? ক্রিয়াতে। প্রেম কোন কালে নিষ্ক্রিয় নয়, প্রেমাস্পদের জন্য নিরন্তর ক্রিয়াশীলতা উহার স্বভাব। এই ক্রিয়ার মধ্যে বিমিশ্রভাব, বা বৈষম্য প্রভৃতি দোষ আসিতে পারে না, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। পৃথিবীতে মাতৃস্নেহের তুল্য বিশুদ্ধ প্রেমের প্রকাশ অতি বিরল, কিন্তু এ স্নেহ নিয়ত নির্দ্দোষ নহে, ইহাতে বৈষম্য দোষ আছে। যে প্রেম এক স্থানে বদ্ধ হইল বলিয়া আর কোথাও উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইল না, বরং অন্যের সম্বন্ধে উপেক্ষার আকার ধারণ করিল, সে প্রেম প্রিয়পাত্রে যতই কেন প্রগাঢ় হউক না, ঈশ্বরের প্রেমের সহিত উহার কোন তুলনা হইতে পারে না। প্রেমের বিকার উপেক্ষা বা ঘৃণা, উহা ঈশ্বরেতে কোন কালে সম্ভবপর নহে।

বিকারবিরহিত প্রেম, এই কথা বলাতেই প্রেমের ভিতরে পুণ্যের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাইলাম। বিকারবিরহিতাই যদি পুণ্য হইল, তাহা হইলে পুণ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর থাকিল কোথায়? যাহা কিছু বিকারহীন তাহারই ভিতরে পুণ্য অন্তর্ভূত হইয়া গেল। অশক্তির রেখাবর্জ্জিত শক্তি, অজ্ঞানের রেখাবর্জ্জিত জ্ঞান, অপ্রেমের রেখাবর্জ্জিত প্রেম, তবে পুণ্যনামে অভিহিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় পুণ্য বলিয়া একটি স্বতন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন? হাঁ, এক দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু আর একদিক্ দিয়া ভাব, দেখিবে পুণ্যস্বরূপেতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, এবং জীব ও ঈশ্বরে ভিন্নতা কেবল এই পুণ্যস্বরূপে। এ অর্থে পুণ্য শব্দ পূর্ণতাবাচক। পূর্ণতা অভাবাত্মক শব্দ বলিয়া তুমি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পার না;

কেন না পূর্ণতা না থাকিলে ঈশ্বর ঈশ্বরই হন না; পূর্ণতা না থাকিলে জীবের প্রাপ্য বিষয়ও কিছু থাকে না। অতএব পুণ্যশব্দের ভাবপরিগ্রহের জন্য আমরা অভাবপক্ষ ও ভাবপক্ষ উভয় দিক্ দিয়াই উহাকে চিন্তার বিষয় করিতে পারি। অভাবপক্ষে পুণ্যশব্দে বিকারহীনতা, ভাবপক্ষে পূর্ণতা বুঝায়। মহর্ষি ঈশার জীবন পুণ্যস্বরূপপ্রধান, অন্য কথায় পুণ্যস্বরূপে তাঁহার জীবন গঠিত। তিনি কি বলিয়াছেন দেখিলেই পুণ্যস্বরূপের ভাবপরিগ্রহ আমাদিগের পক্ষে সহজ হইবে।

ঈশা বলিয়াছেন,"তোমরা শুনিয়াছ ইহা কথিত আছে, তুমি আপন প্রতিবাসীকে প্রীতি করিবে, কিন্তু শত্রুকে ঘৃণা করিবে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি শত্রুদিগকে প্রীতি কর, যাহারা তোমাদিগকে অভিশাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, এবং যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদিগের হিতসাধন কর, এবং যাহারা তোমাদিগকে বিদ্বেষ ও নির্য্যাতন করে তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা কর। ইহা হইলে তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার উপযুক্ত সন্তান হইবে, যে হেতুক তিনি স্বীয় সূর্য্যকে সাধু এবং অসাধু সকলের উপর উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সকলের উপর বারি বর্ষণ করেন। কারণ যদি তোমরা তাহাদিগকে ভাল বাস যাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে, তাহা হইলে তোমাদের বিশেষত্ব হইল কি? সাধারণ লোকেও কি সেরূপ করে না? যদি তোমরা তোমাদের ভাইদেরই সম্ভাষণ করিলে অপর লোকদিগের অপেক্ষা তোমরা অধিক কি করিলে? সাধারণ লোকেও কি সেরূপ করে না?" এই বলিয়াই অব্যবহিত পরে বলিতেছেন, "অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ, তোমরাও সেইরূপ পূর্ণ হও।"

আমরা ঈশার কথার ভিতরে দেখিতেছি, অবিকারী প্রেমের ভিতরে পুণ্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। যদি বলা হয়, কৈ ইহার ভিতরে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রেমেরই উল্লেখ আছে, পুণ্যের একবারও তো উল্লেখ নাই? হাঁ, একয়েকটী কথার ভিতরে পুণ্যের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু যে প্রকরণের অন্তর্গত এই কথাগুলি, সে প্রকরণটি পুণ্য কি, তাহাই প্রদর্শন করে। কেন না প্রকরণের আরম্ভে দীনাত্মতার উল্লেখ করিয়া মধ্যে মুষার প্রাচীন বিধি সমুদায়কে তিনি নিম্নভূমি হইতে উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় করিয়াছেন, পরিশেষে প্রেমের ভিতরে পুণ্যের উচ্চতম প্রকাশ হয়, এজন্য প্রেমের উল্লেখ করিয়া উহাই পূর্ণতা ইহা প্রদর্শন জন্য বলিয়াছেন, "স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ সেইরূপ পূর্ণ হও।" গতবারে অদ্বৈতস্বরূপের প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া স্বরূপসমুদায়ের একত্ব আমরা উল্লেখ করিয়াছি, এবার এই একত্ব প্রেম ও পুণ্যের একতায় আরও পরিস্ফুট হইতেছে। গভীররূপে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেম হৃদয়ের আর্দ্রভাব বা অনুকূলতা। এই অনুকূলতা যখন কেবল ভাবমাত্রে বদ্ধ থাকে, তখন ইহা প্রেম, আবার যখন উহা ব্যবহারে পরিণত হয় তখন উহা পুণ্য। মহর্ষি ঈশা এ জন্যই কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহারই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রীতির আস্পদের প্রতি ব্যবহার সহজেই পুণ্যের অনুসরণ করে, কিন্তু শত্রু ও অত্যাচারীর প্রতি সেরূপ হয় না, এজন্য তিনি প্রীতির আস্পদের প্রতি প্রীতিকে উপেক্ষা করিয়া শত্রু ও অত্যাচারীর প্রতি প্রীতিকেই বিশেষত্ব দান করিয়াছেন। প্রীতি যথার্থ প্রীতি কি না অর্থাৎ উহা পুণ্য বা পূর্ণতা কি না, উহা এই রূপেই প্রকাশ পায়, এজন্য ঈশার তৎপ্রতি এত সমাদর।

এখন বোধ হয় পুণ্যস্বরূপের প্রভাব কি, বলিবার অবসর হইয়াছে। প্রভাব কি বলিবার পূর্ব্বে পুণ্যস্বরূপ ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক কেন এখনও বলা হয় নাই, অগ্রে তাহাই বলা যাউক। ঈশ্বরে প্রেম ও পুণ্য এক। তিনি আমাদের প্রতি চির অনুকূল অতএব তিনি প্রেমস্বরূপ। এই অনুকূলতা হইতে যে ব্যবহার উপস্থিত হয় তাহাই পুণ্য।

পুণ্য ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তিকে আমরা ইচ্ছা বলি, সুতরাং ইচ্ছা ও পুণ্য এক হইতেছে। আমাদের ইচ্ছা যখন অনুকূলভাবে প্রণোদিত হইয়া বিকারশূন্য ভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করে, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত একতাবশতঃ আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপ প্রকাশ পায়; এই পুণ্যস্বরূপের প্রভাবে ঈশার কথাগুলি যত্ন চেষ্টা করিয়া প্রতিপালন করিতে হয় না, সহজে স্বভাবতঃ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সেইগুলি জীবনে প্রকাশ পায়। আমরা একথা বলিতেছি কেন? ঈশার একটী পার্থিব বিধির বিরুদ্ধ কথার পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহা পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিব। ঈশা বলিতেছেন "অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না," এ বিধি পার্থিব বিধির সম্পূর্ণ বিরোধী। "চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত" এই ব্যবহারের উপরে পার্থিব বিধি সকল সংস্থাপিত। ঈশার উচ্চতম বিধির উচ্চত্ব স্বীকার করিয়াও সর্ব্বসাধারণের জন্য মুষার বিধিই কোরাণে গৃহীত হইয়াছে। সাধারণ লোকে অত্যাচারের প্রতিরোধ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে। অত্যাচারের প্রতিরোধ না করিলে অত্যাচারী ব্যক্তি দিন দিন আরও পাপে নিপতিত হইবে, এজন্য তাহার অত্যাচারের প্রতিরোধ করা সমুচিত, এ যুক্তিতে ধার্ম্মিকেরাও অত্যাচারের প্রতিরোধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঈশা এরূপ সর্ব্বজনবিরোধী বিধি কেন প্রচার করিলেন? এতদ্দারা কি পাপের প্রশ্রয় ও পুণ্যের খণ্ডন হইতেছে না?

প্রশ্ন গুরুতর, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখিলে অতি সহজ বলিয়া প্রতীত হয়। পুণ্যের প্রভাব তখনই জীবনে উচ্চতম ভাবে প্রকাশ পায়, যখন দুঃখ যন্ত্রণা ক্লেশাদিতে অপরাজিত থাকিয়া আত্মা সে সকলের উপরে আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। প্রেমসম্বন্ধেও এই কথা বটে, কিন্তু পুণ্য সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ কথা আছে। হৃদয় হইতে সকল প্রকারের বিকার অপসারণ পুণ্যের কার্য্য। যে ব্যক্তি অত্যাচার করে, তৎপ্রতি অবিকার চিত্ত রক্ষা করা সহজসাধ্য নহে, অথচ এস্থলে যে আপনার চিত্ত অবিকৃত রাখিতে না পারিল তাহার জীবনে পুণ্যসঞ্চার হয় নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অত্যাচারের প্রতিরোধ না করিয়া নিজের চিত্তের অবিকারত্ব বাড়িল, কিন্তু তদ্দারা অত্যাচারীর অনিষ্ট নিবারণ হইল কোথায়? নিবারণ হইল প্রেমে। এ পুণ্য প্রেমপ্রণোদিত। প্রেম অত্যাচার বহন করে, বহন করিয়া সুকোমল ব্যবহারে অত্যাচারীর অত্যাচারকে পরাজয় করিয়া থাকে। "প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে এবং দয়ালু; প্রীতি পরদ্বেষ করে না, প্রীতি আত্মশ্লাঘা করে না এবং স্ফীত হয় না। ইহা অনুচিত ব্যবহার করে না, স্বার্থ অন্বেষণ করে না, সহজে ক্রদ্ধ হয় না, অনিষ্ট চিন্তা করে না, অধর্ম্মে আনন্দিত হয় না, কিন্তু সহজেই আনন্দিত হয়, তাবৎ বহন করে, তাবৎ বিশ্বাস করে, তাবৎ আশা করে এবং তাবৎ সহ্য করে।" পলের এই কথার মধ্যে এই প্রহেলিকার সুন্দর মীমাংসা রহিয়াছে।

তোমার এত ভয় কেন?

আত্মন্, আজও তোমার ভয় ঘুচিল না কেন? তুমি না ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছ, তাঁহার বিবিধ করুণা সম্ভোগ করিয়াছ, তোমার প্রতি তিনি বিশেষ প্রসন্নতা দেখাইয়াছেন, তবু তুমি ভয়ে ভয়ে দিন কাটাও, ইহার অর্থ কি? মনে হয়, তবে তুমি ঈশ্বরের শরণাগত হও নাই। তুমি আপনার হাতে আপনাকে রাখিয়াছ। অন্য দশজন সংসারীর যে দশা তোমারও সেই দশা। অর্দ্ধেক ঈশ্বরের অর্দ্ধেক সংসারের, এরূপ জীবন কি কখনও সম্ভবপর? সংসারে ঘোর মায়ায় আচ্ছন্ন যারা, তারা দুঃখ পায় ক্লেশ পায় সংসারেই পড়িয়া থাকে। তারা তো আর কোন উচ্চ জীবনের স্বাদ পায় নাই যে, তার জন্য ব্যাকুল হইবে? সুতরাং কখন কান্না কখন হাসি, এই ভাবে তাদের

দিন যায়। কেবল হাসি, কান্না নাই; সংসারে এরূপ জীবন সম্ভবপর, বল, এ কথায় বিশ্বাস করে কয় জন?

ভিতরে ভিতরে তুমিও একথায় বিশ্বাস কর না, তাই দেখিতেছি তোমার ভয় ঘোচে নাই। কি জানি বা দুঃখ আসে, বিপদ্ আসে, এই বলিয়া, বুঝিতেছি, তুমি ভয় পাও। বাহিরে বীরত্ব দেখাইলে কি হইবে? সাহস দেখাইলে কি হইবে? যার জীবনে নিত্য বলসঞ্চয়ের উপায় নাই, সে সাহসী বীর হইবে কি প্রকারে? দেহে প্রচুর পোষণসামগ্রী সঞ্চিত থাকিলে বলপ্রকাশ স্বাভাবিক। যেখানে উপচয় নাই কেবল ক্ষয়, সেখানে এক দিন দেহে বল ছিল বলিয়া কি আর সাহস দেখান যাইতে পারে? তোমার যখন ধর্ম্মজীবনের নবীন উদ্যম ছিল, সে সময়ে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলে, সে বীরত্ব প্রকাশ বস্তুর নূতনত্বে ঘটিয়াছিল। এখন সবই পুরাতন হইয়া আসিয়াছে, আর উৎসাহ থাকিবে কেন? বাল্যকালে দুর্ব্বল ছেলেও কত উদ্যম প্রকাশ করে। একটু বড় হউক, আর সে উদ্যম থাকে না। তোমার ধর্ম্মজীবনের শৈশব ফুরাইতে ফুরাইতে দেখিতেছি তোমার আশা উদ্যম ফুরাইয়া আসিতেছে।

হে আত্মন্, নিত্য নূতন বলসঞ্চয়ের উপায় কি তোমার নিকটস্থ নয়? তোমায় কি তোমার পিতা জন্মদান করিয়া একাকী নির্জ্জন মরুভূমিতে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছেন? তুমি কি একান্ত অসহায় ও অসম্বল? তুমি কি একান্ত দীন? তোমার বাস্তবিকই কি দিন চলে না? তুমি দ্বারের ভিখারী হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছ? সংসারের অনুগ্রহের উপর তোমার জীবন ধারণ নির্ভর করে? বল, এখন তুমি কার মুখের দিকে তাকাইয়া জীবন ধারণ করিতেছ? এক মুষ্টি অন্নের জন্য এখন তুমি কার উপাসনা করিতেছ? তোমাকে আহার পান যোগায়, এমন কেহ কি সংসারে আছে? বড় বড় মহাজনগণ কি সাহস করিয়া এ কথা বলিতে পারেন, তোমার অন্নপানের ভার তাঁহারা গ্রহণ করিলেন, আর এ বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না, সকল ভার তাঁহাদের উপরে রহিল? তোমার ভার বহন করিতে পারেন, আমি তো এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না।

কেন? পূর্ব্বে যে সকল মহাজন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তো পরের আত্মার ভার গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, "সকল ছাড়িয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমায় উদ্ধার করিব, শোক করিও না।" মনে হয়, তুমি তাঁদের মনের ভাব বুঝিতে পার নাই। তাঁরা আপনারা কাহাকেও পরিত্রাণ দিতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস করিতেন না। এদেশে যাঁরা ওরূপ কথা বলিয়াছেন, তাঁরা ঈশ্বরের মুখের কথা বলিতেছেন, সে কথা তাঁদের নিজের মুখের কথা নয়, এই ভাবে ভাবাপন্ন ছিলেন। অন্য দেশের মহাজনগণ আপনারা ভগবানের কাছে যাহা শুনিতেন তদনুসারে জীবন গড়িতেন, আর সেই জীবন অন্য লোক সকলের সম্মুখে ধরিয়া বলিতেন, দেখ আমাদের জীবন দেখ, এই জীবন তোমাদের জীবন হউক, তোমাদের নিশ্চয় পরিত্রাণ হইবে। কবে তুমি শুনিয়াছ, মহাজনের জীবন না পাইয়া কেবল মুখে 'প্রভু' 'প্রভু' বলিলে জীব পরিত্রাণ পায়। তাঁদের জীবনের মত জীবন হওয়ার অর্থ কি? তাঁরা যেমন সব ছাড়িয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তেমনি তোমাকেও হইতে হইবে।

তুমি ভাব, ভাবিয়া দেখ, তুমি দীন নও দরিদ্র নও, পিতৃহীন মাতৃহীন অনাথ নও, তুমি কাহারও দ্বারের ভিখারী নও, কাহারও মুখাপেক্ষী নও। এক জন তোমার পিতা এক জন তোমার মাতা, তাঁর সম্পদ অতুল, ঐশ্বর্য্য অপার। কিসে তোমার এ কুবুদ্ধি ঘটিল যে, তুমি মনে কর তোমায় জন্ম দিয়া তোমার নিত্যকালের পিতা তোমায় একাকী নির্জ্জন মরুভূমিতে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছেন? তিনি পলাইয়াছেন, অথচ তুমি বাঁচিয়া আছ? এ কি পৃথিবীর বাপ মা যে, তুমি আর তাঁরা সম্পূর্ণ পৃথক্, ছাড়িয়া পালাইলেও

তোমার জীবন যায় না? যিনি আকাশের চন্দ্র সূর্য্যকে ধরিয়া রহিয়াছেন, তিনি তোমার জীবন ধরিয়া রহিয়াছেন, ইহা কি তুমি জান না? তোমার নিজের কুবুদ্ধি তোমার নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আর এ কুবুদ্ধির দাস থাকিও না। উঠ, তুমি কে, আপনাকে চেন? আপনার পিতা মাতাকে স্বীকার কর। দীনতা দরিদ্রতা দূরে পরিহার কর, অতুল সম্পদ্ তোমার গৃহে দেখ, দেখিয়া আপনার সৌভাগ্যে কৃতার্থ হও।

তোমার কি আবার বলের অভাব, জ্ঞানের অভাব, সম্পদের অভাব? তুমি বীর, জন্মবীর। তুমি জীবনে বীরত্বের পরিচয় দান করিবে তার উপযুক্ত ভূমিতে তোমার পিতা তোমাকে রাখিয়াছেন। অস্ত্রশস্ত্র তুলিয়া লও, বিশ্বাস কবচে আবৃত হও, দেখিবে তোমার প্রতিপক্ষ হইবার যোগ্য কেহ নাই। অনন্ত ব্রহ্মবলে তুমি বলী, অনন্ত ব্রহ্মসম্পদে তুমি সম্পন্ন। তোমায় পরাজয় করিতে পারে কে? তোমার আবার অন্ন পানের অভাব? তুমি কি শুন নাই, ঈশ্বরপুত্র ঈশা সামেরিতান নারীকে কি বলিয়াছিলেন? "এ জল যে পান করে, তাহার আবার তৃষ্ণা উপস্থিত হয়; কিন্তু আমি যে জল দিব, সে জল যে পান করিবে, তার আর তৃষ্ণা থাকিবে না। আমি যে জল দিব, সে জল তাহার ভিতরে একটি জলের উৎস হইবে, এবং তাহা হইতে অনন্তজীবন উৎপাদিত হইবে।" এ জল কি? ঈশ্বরপুত্রের জীবন। কেবল কি সে জীবন তৃষ্ণানিবারণের জল? না, অন্নও। তিনি বলিয়াছেন, "আমিই জীবনের অন্ন। এ অন্ন স্বর্গ হইতে সমাগত হইয়াছে যে, মানুষ খাইয়া আর মরিবে না।" তবে কি ঈশা আপনার শোণিত-মাংসের কথা বলিয়াছেন? না। তিনি তৎসম্বন্ধে আপনিই বলিয়াছেন, "ভাবেই জীবন দান করে; মাংস কোন কাজে আসে না। আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা কহিতেছি, এ সকল ভাব এবং এ সকল জীবন।" যে কথা জীবন, সে কথা তুমি আজ কোথায় পাইবে? ঈশা যেখান হইতে পাইয়াছিলেন, সেখান হইতে পাইবে। ঈশার পিতা যিনি, তোমার পিতা তিনি, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর না? ঈশা ঈশ্বরের অবতার নহেন, তিনি কথার অবতার। যে ঈশার সহিত এক হইবে, তাহার ভিতরে আসিয়া ঈশ্বরের কথা বাস করিবেন। তুমি কি ঈশ্বরের কথা শুন নাই? যদি শুনিয়া থাক, ঈশার সহিত তুমি এক হইয়াছ ও তুমি ঈশ্বরের তনয় হইয়াছ। বল, হে আত্মন্, বল, তোমার ভিতরে ঈশ্বরের বাণী অবতরণ করিয়াছেন কি না? তোমাতে বাণী অবতরণ করিয়াছেন শুনিলে প্রাণ শীতল হইবে, দুঃখের দিনের অবসান হইবে, আর আমায় হা হতোস্মি করিতে হইবে না। তুমি ভিতরের কথা শুনাইয়া উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিবে, এ অনুরোধ কি অধিক হইল?

আত্মন্, বল, আবার বল, তুমি ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছ। সে কথা শুনিলে আর তোমারও ভয় থাকিবে না, আমারও ভয় থাকিবে না। ভয়ে ভয়ে আর সংসারে বাস করা যায় না। আইস, একবার সে অভয়পদ আশ্রয় করিয়া চিরদিনের জন্য অভয় প্রাপ্ত হই। তুমি কাণ পাতিয়া থাক, নিরন্তর কাণ পাতিয়া থাক। তোমার পিতা তোমায় কি বলেন, মন দিয়া শোন। তাঁর কথা শুনিয়া চলিলে তোমার প্রাণে একটুও ভয় থাকিবে না। সে কথা শুনিলে, বিষ, অগ্নি, শস্ত্র, ক্রুশ কিছুতেই আর তোমায় ভয় দেখাইতে পারিবে না। তোমার জয়, সেই কথা শুনিয়া চলাতে। এই যে রণভূমিতে তুমি বিচরণ করিতেছ, এখানে শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশের মূল মন্ত্র সেই কথাশ্রবণ। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, কথাশ্রবণে অমনোযোগী হইও না। অনন্ত জীবন, অমরত্ব সেই কথায়। স্বর্গ হইতে যে কথা আইসে, তার মূল্য কেবল পুত্রই বোঝেন, আর কে বুঝিবে? যখন আমি তোমার সে কথার উপরে আদর দেখি, বিশ্বাস দেখি, আমার মৃত প্রাণে জীবন আইসে; আমি মরি নাই, কেবল এই জন্য যে, আমি তোমার মুখে এই সুসংবাদ শুনিব, তোমার ভিতরে ঈশ্বরের কথা

অনন্ত জীবনের উৎস হইয়া উৎসারিত হইতেছেন দেখিব। তোমার এত ভয় কেন ? সে কথা শুনিলে তোমার ভয় দূর হইবে। শোন, শোন, আরও শোন। তোমার ভয় গেল, কান্না থামিল, নিত্য হাসিতে তোমার মুখের শোভা বর্দ্ধিত হইল, দেখি, দেখিয়া কৃতার্থ হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তুমি যে কথা ভগবানের মুখে শুনিয়াছ, শুনিয়া নিঃসংশয় হইয়াছ, অপাত্রের নিকটে সে কথা প্রকাশ করিও না। যাহারা ভগবানের কথার আদর বোঝে না, তাহাদের নিকটে ভগবানের কথা বলিয়া কোন কথা প্রকাশ করিলে তাহারা উপহাস করিবে। ইহাতে তোমার ক্ষতি হইতে না পারে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কেন না তদ্দ্বারা তাহাদের অবিশ্বাস বাড়িবে, ভবিষ্যতের সুপথ বন্ধ হইবে। সে কথা তাঁহাদের নিকটে বল, যাঁহারা সে কথার আদর বোঝেন।

মৌন থাকিবারও স্থল আছে, আবার কথা কহিবারও স্থল আছে। যেখানে মৌন থাকিলে সত্যের অপলাপ হয়, সেখানে মৌন থাকা কখনই উচিত নয়। দেখ, কোন কথায় যদি কেহ মৌন থাকে, তাহা হইলে লোকে তাহাতে সম্মতি বুঝিয়া লয়। মানুষের এরূপ মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। লজ্জা, সম্ভ্রম, বিনয়, অনেক সময়ে আমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। সুতরাং যখন আমরা মৌন থাকি, তখন লোকে মনে করে, লজ্জা, সম্ভ্রম বা বিনয়ের জন্য আমরা তাহাদের কথার উত্তর দিতেছি না, অবশ্য সে কথায় সম্মতি আছে, অন্যথা সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ করিতাম। সত্যের প্রতি মানুষের যে এই গূঢ় আদর, তৎপ্রতি সম্ভ্রমবশতঃ কোথায় মৌন থাকিতে হইবে, কোথায় কথা কহিতে হইবে, সে বিষয়ে যেন তোমার অনবধান না হয়।

আমার স্বার্থ, তোমার স্বার্থ হউক, অন্যথা তোমার আমার মিল হইবে কি প্রকারে ? স্বার্থ—একথায় পৃথিবীর স্বার্থ বুঝিও না। পৃথিবীতে একই স্বার্থের অনুসরণে ঝগড়া বাড়ে, কোন কালে মিল হয় না। তুমিও যদি টাকা চাও, আমিও যদি টাকা চাই, দুদিনের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইবে, এবং কিসে তোমাকে অধঃপাত করিয়া আমি সম্পন্ন হইয়া উঠি, তার জন্য আমি চেষ্টা করিবই করিব। পার্থিব স্বার্থ লইয়া এক ঘরের লোকেরও মিল রাখা দায়, কেন না এ স্বার্থে দিন দিন নীচতা বাড়ে, আর এক জন অপর জনের স্বার্থ পূরণ করিতে না পারিলে বিষদৃষ্টিতে পড়ে। আমি যে স্বার্থের কথা বলিতেছি, উহা স্ব—আত্মা, তাহার প্রয়োজন। আত্মার যাহাতে প্রয়োজন তাহা লইয়া যেখানে মিল হইয়াছে, সেখানে ঝগড়া হইবার অবসর নাই। আত্মার প্রয়োজন অনন্ত, তুমিও তাঁহাকে ফুরাইতে পার না, আমিও তাঁহাকে ফুরাইতে পারি না, ঝগড়া হইবে তবে কেন ? সংসারের স্বার্থ ফুরন্ত ; তাই এক জনের কিছু বেশী হইল আর এক জনের সেই পরিমাণে উহা কমিয়া যায়, সুতরাং এখানে ঝগড়া হইবে না তো কি ?

ধর্ম্মমণ্ডলী :

রবিবার ১৬ই ফাল্গুন ১৮১৯ শক।

(শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিবৃত।)

ঈশা তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকে বলিয়া গেলেন তোমরা যখন দুই তিন জন মিলিত হইয়া স্বর্গীয়পিতাকে ডাকিবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যে আসিব এবং তোমাদের উপাসনাতে যোগ দিব। বৈরাগিগণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গকে আহ্বান করেন। ইদের দিনে দিল্লীর জুমামসজিদে হাজার হাজার লোক এক ইঙ্গিতে উঠে বসে, এক ইঙ্গিতে প্রার্থনার ভাব গ্রহণ করে, এক সঙ্গে প্রার্থনা আরম্ভ করে। ঈশ্বরের পূজাতে, ঈশ্বরারাধনাতে এইরূপ দশ জনের, শত জনের, হাজার জনের দল বদ্ধ হইবার তাৎপর্য্য কি ? ঈশাই বা কেন তাঁহার পরিত্যক্ত মণ্ডলীতে পুনঃ পুনঃ আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন ? ঈশ্বরের নামে যাঁহারা মিলিত হন তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্ক কি ? এই সমবেত দলের নাম কি ? এইরূপে যাহারা দলবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকে, এইরূপে যাহারা প্রাণের এক আগ্রহে পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ে মিশিয়া যায়, তাহাদের সমবেত দলের নাম ধর্ম্মমণ্ডলী। এই মণ্ডলীগত যোগ ও একতা চির অচ্ছেদ্য। ইহারা যখন জীবনের বিবিধ কার্য্যে বিব্রত থাকে, আমোদ আহ্লাদ করে, তখন ইহারা পরস্পর মতে ভিন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের পূজার জন্য তাঁহার পবিত্র বেদীর পার্শ্বে যখন ইহারা একত্র হয় তখন পরস্পরের হৃদয় এক হয়, একাত্মা হইয়া ইহাদের ধর্ম্মগত মিলনরজ্জু সুদৃঢ় হয়। ইহাকেই ঈশ্বরের পরিবার বলা যায়। ধর্ম্মমণ্ডলী কেবল ইহলোকস্থ সমবিশ্বাসিগণের একতার ভূমি নহে। এই মণ্ডলীর ভিতরে ইহপরলোকস্থ সমবিশ্বাসী সমস্ত আত্মার সম্মিলন, যোগ ও একতা সন্নিবিষ্ট। সুতরাং ধর্ম্মমণ্ডলী কত সুদূর ব্যাপী এবং ইহার শক্তি কত প্রবল এক বার ভাবিয়া দেখ।

সে দিন মণ্ডলীর বিষয় অনেক আলোচনা করিয়াছি। মণ্ডলীর জীবনে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি এবং তাহাতে পরব্রহ্মের শক্তি ও কার্য্য দেখাইলাম। ঈশ্বর বীজ হইতে অরণ্য উৎপাদন করেন, অল্পসংখ্যক মনুষ্য হইতে এত বড় মনুষ্য-জগৎ রচনা করিয়াছেন, এক ঈশা হইতে কত প্রকাণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলী হইল, এক শাক্য হইতে কত প্রকাণ্ড বৌদ্ধসংঘ প্রস্তুত হইল। ঈশ্বরের

ইচ্ছা ও শক্তিতে এই সকল অসম্ভব কার্য্য হইয়াছে ও হইতেছে। আজ বলিতে চাই, ইহাতে মানুষের কর্ত্তব্য কি? ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু আমাদের জীবনে কোন সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠান করিতে কেবল তাঁহার চেষ্টা প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহা মনে হয়, ইহাতে অর্দ্ধেক তাঁহার কার্য্য অর্দ্ধেক মানুষের কার্য্য। কোন কার্য্য সেই অসীম করুনানিলয়ের করুণা ভিন্ন হয় না বটে; কিন্তু তোমার নিজের চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ না থাকিলে বল কি হইতে পারে? ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কাহার প্রতি নাই? অনন্ত স্নেহময় কাহাকে স্নেহ করেন না? কাহার চরিত্র ভাল হয়, উচ্চ হয় তিনি ইচ্ছা করেন না? কিন্তু কত জন দেবচরিত্র লাভ করে? কত জন ধর্ম্মমণ্ডলীর শক্তিসম্পন্ন অঙ্গ হইয়া মণ্ডলীর কল্যান সাধন করেন? এই প্রকার বৈষম্যের কারণ কি? ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার সঙ্গে, মানুষের আত্মজীবন উন্নত করিবার চেষ্টার যোগ না থাকা, ঈশ্বরের প্রেম গ্রহণ করিবার জন্য মানুষের হৃদয় বিমুখ থাকাই কি ইহার কারণ নহে? নিজ নিজ চরিত্র ও জীবন উন্নত ও পবিত্র ও স্বর্গীয় করিবার জন্য যেমন প্রত্যেক মানুষের যত্ন চেষ্টার আবশ্যক, মণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও পবিত্রতা সাধন জন্যও তেমনি মণ্ডলীস্থ প্রত্যেকের যত্ন, চেষ্টা, ও আগ্রহ প্রয়োজন। তোমার এক জনের জীবনের কল্যাণ সাধন জন্য যদি এত আয়াস স্বীকার প্রয়োজন হয়, তবে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলীর কল্যাণের বিষয় ভাবিতে আরও কত গুণে অধিক যত্ন আবশ্যক ভাবিয়া দেখ। মণ্ডলীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির পরস্পরের সঙ্গে অতি গভীর সম্পর্ক এবং পরস্পরের দায়িত্ব অতি গুরুতর। এক জনের উন্নতি অবনতির সঙ্গে শত জনের উন্নতি অবনতির মূল সংযুক্ত। শত শত জনের জীবনের শক্তি ও পবিত্রতা দ্বারা প্রত্যেক জন উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন। এই উপাসনাতে যদি তোমরা সকলে না আস, তবে এক জন কি করিতে পারে? আবার দেখ তোমারা যদি সরল ভাবে, প্রাণের আগ্রহে উপাসনাতে যোগদান না কর, ভাবের ঘরে চুরি কর, ধ্যানের ঘরে তন্দ্রা ভোগ কর, প্রার্থনার দ্বার কপটতার জালে আবৃত রাখ, তবে তোমাদের লইয়াই বা কি হইবে? মনের অভিপ্রায়, আগ্রহ, বাক্য ও কার্য্য এক না হইলে তেমন কোন একটি জীবন প্রস্তুত হয় না। তেমনি মণ্ডলী সম্বন্ধে অভিপ্রায় আগ্রহ, প্রত্যেকের বাক্য ও কার্য্য যতক্ষণ একভাব ধারণ না করিবে ততক্ষণ মণ্ডলীর শক্তিসম্পন্ন জীবন গঠিত হইবে না। প্রত্যেক মানুষের জীবন প্রস্তুত জন্য উহার উপাদান সমস্ত মধ্যে পবিত্রতা যেমন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন, মণ্ডলীর জীবনেও পবিত্রতা তেমনি সর্ব্বোপরি প্রয়োজন। যেখানে সামান্য অপবিত্রতাও বিদ্যমান, সেখানে সিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে মণ্ডলীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য তোমরা যত্নবান্ হও। প্রত্যেকের নিজ নিজ জীবনের পবিত্রতা ও সমবেত মণ্ডলীর পবিত্রতা যদি পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, তবে এই মণ্ডলী পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমণ্ডলী অপেক্ষা বলবান্ হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চার্চ্চ শব্দ আমাদের মণ্ডলী শব্দের নামান্তর মাত্র। তাহারা এই চার্চ্চকে কখনও ঈশ্বরের শরীর বলেন, কখনও বলেন চার্চ্চ ঈশ্বরের বিবাহিতা পত্নী, কখনও বলেন চার্চ্চ ঈশ্বরের আবাস গৃহ, কখনও বলেন ইহা আত্মাসকলের বাসভূমি। ইহার প্রত্যেক কথাই সত্য। কারণ ধর্ম্মমণ্ডলী ও ঈশ্বরের মণ্ডলীতে কোন তফাৎ নাই। ঈশ্বর তাঁহার এই মণ্ডলীর সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমসম্বন্ধ যাহাতে বুঝায় সেই প্রকার সম্বন্ধে, সংবদ্ধ, এবং ধর্ম্মমণ্ডলীরূপ সুখদ গৃহেই যে আত্মা সকল বাস করেন ইহাতেও আর কোন সন্দেহ নাই। আবার প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলী এক এক জন মহাত্মার আকার, এবং এই মহাত্মাদিগের ধর্ম্মের অবয়ব লইয়া আত্মাসকলের আকার গঠিত হয়। যাবতীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, এক এক জন মহাত্মার জীবনের সমস্ত শক্তি, যত্ন, আগ্রহ, উৎসাহ, কার্য্য, মণ্ডলীর রক্ত মাংস হইয়া উহার আকার দান করিয়াছে।

অতএব প্রথম কথা এই যে, যাঁহারা এখানে আসিয়া এক মণ্ডলীরূপে পরিণত হইতেছেন তাঁহারা প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে বাক্যে ও কার্য্যে এক হইয়া যাইবেন, এবং এই মণ্ডলী ঈশ্বরের সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সম্বন্ধে সংবদ্ধ, ইহা বিশ্বাস করিবেন; অপিচ এই মণ্ডলীর অবয়বের ভিত্তি কোন এক জন মহাপুরুষের সমস্ত জীবনের পরিণতির উপর সংস্থিত দেখিতে পাইবেন।

তৎপরের কথা এই যে, প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলীর ভজনালয় আছে। খ্রীষ্টানদিগের চার্চ্চ, মুসলমানদিগের মসজিদ, ব্রাহ্মদিগের মন্দির আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। ইহাতে লোকের এত আকর্ষণ থাকে যে, এই জন্য প্রাণ দিতেও লোকে ভয় করে না ও কুণ্ঠিত হয় না। জান ত সে দিন টালার একটী সামান্য মসজিদ রক্ষার জন্য কত রক্তপাত হইল। আমাদেরও মন্দির ছিল। এই মন্দিরের পরিণাম কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। যাহা হউক মন্দির একটি বাহিরের বিষয়। মানুষের ধর্ম্মভাব যদি প্রবল হয়, যথার্থ ধর্ম্মপিপাসাতে কোন ধর্ম্মমণ্ডলীর জীবন যদি উন্নত হয়, তবে মন্দির নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব কিছুই নহে। ঈশ্বরের পূজামন্দির সর্ব্বাগ্রে জীবনে রচিত হয়, তৎপরে উহার বাহ্য আকার পৃথিবীর ভূমিতে দেখা যায় মাত্র। পূজার গৃহ হইলেই যে, ধর্ম্ম হইল তাহাও নহে। অনেক মন্দির দেবালয় ডাকাতের আড্ডা হয়, নর্ত্তক নর্ত্তকীর অভিনয়ক্ষেত্র হয়। তোমরা কি জান না সলিমানের ধর্ম্মমন্দির হইতে ঈশা কত দুরাচারী দস্যুকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন?

অতএব কেবল মন্দির হইলেই হইল তাহা নহে। কতকগুলি লোক চাই, যাহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিবে। ধর্ম্মমণ্ডলীতে বিশেষ লোকের স্থান অনেকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সকলের সমান স্থান, ইঁহারা অভিলাষ করেন। পৌরোহিত্যের প্রতি অনেকে বিরক্ত। নানা কারণে এই বিরক্তির হেতুও আছে। কিন্তু অন্য পক্ষে যথেষ্ট বলিবার অবকাশ আছে যে, এই প্রকার কতকগুলি

লোক নিতান্ত আবশ্যক। সাধারণে ইঁহাদিগকে মণ্ডলীর আসনে ভিন্ন স্থান দিন আর না দিন, ইঁহাদের স্থান স্বভাবতঃ ভিন্ন হইবে। ইহা সম্ভব নহে যে, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়মধ্যে সমস্ত লোক আত্ম-ত্যাগী, বৈরাগী, এবং ধর্ম্মের জন্য প্রাণ, মন, শক্তি, কার্য্য, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে। মণ্ডলীর সমস্ত লোক পবিত্রচরিত্র, সাধুজীবন-সম্পন্ন ও পরস্পর হিতসাধনেচ্ছু, এবং যথাসাধ্য উপাসনাশীল হইতে পারেন; কিন্তু সমস্ত লোক আত্মত্যাগী হইবে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু কতকগুলি সর্ব্বত্যাগী লোক ভিন্ন ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সংসিদ্ধ হয় না। সুতরাং যাঁহারা এই প্রকারের জীবন ধারণ করেন তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থান না দিয়া সাধ্য কি? যদি ইহা অস্বীকার কর, ধর্ম্ম থাকে না। যাহারা ইহার বিরোধী, তাহাদিগকে নাস্তিক বলি আর না বলি, ধর্ম্মের অনিষ্টকারী অবশ্যই বলিব। ঈশার ধর্ম্মে, মোহম্মদের ধর্ম্মে, শাক্যের ধর্ম্মে, চৈতন্য ও নানকের ধর্ম্মে এই প্রকারে প্রথমে মহাপুরুষ তৎপরে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী কতকগুলি চিহ্নিত লোক স্বীকৃত হইয়াছেন। ইঁহাদের স্থান এইসকল ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত। আমরা যদি মণ্ডলীগত ধর্ম্ম স্বীকার করি, তবে আমরা ইহা না মানিয়া কোথায় যাইব? আমাদের আচার্য্য এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের স্থান অনেকে অস্বীকার করেন, কেহ কেহ নিতান্ত অনুরোধে যেন বলেন কেশব বাবু এক জন ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু আমি কেবল যে কেশবচন্দ্রকে স্বীকার করি তাহা নহে, তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত আর কতকগুলি লোক মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ও এই সকল লোকের মিলন হইতে এই মণ্ডলী উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করি। যদি এই ধর্ম্মে ইহা অস্বীকার কর, তবে স্বীকার করিবে কি? অতএব কোথায় কাহার স্থান দেখিয়া লও, এবং নিজের স্থান কোথায় তাহাও নির্ণয় কর। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান জানিয়া যদি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তবে আর কাহাকেও কাহারও কার্য্যের পরিপন্থী হইতে হইবে না।

এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল, আরও কিছু বলি। প্রেম ও ধর্ম্ম গাঢ় হইয়া পরিবার রচিত হয়, এবং এই ধর্ম্মপরিবারই সকলের একত্র কার্য্যক্ষেত্র। যদি তোমরা এই প্রেমপূর্ণ সমাজ না কর, তবে তোমাদের কমিটী হইবে, সভা হইবে, ধর্ম্মমণ্ডলী কখনও হইবে না। পরিবার না হইলে ধর্ম্মের ফল কোথায় বসিয়া ভোগ করিবে? ঈশা বলিয়াছিলেন, কে আমার পিতা, কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা জানি না; যাহারা আমার পিতার ইচ্ছা প্রতিপালন করে তাহারাই আমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী। পরিবারের পূর্ণ আদর্শ এইটী। পিতার ইচ্ছা পালনে একপ্রাণ একহৃদয় না হইয়া যে পরিবার, উহা কেবল নরকের দৃশ্যমাত্র। আমরাও পরিবার করিয়াছিলাম; কিন্তু ধর্ম্মের অভাবে, পিতার ইচ্ছা পালনে ঐকমত্যের অভাবে, প্রেমের অভাবে, স্বার্থত্যাগের অভাবে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। তোমরা আবার একত্র হইয়াছ, তাই আবার সেই সকল কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া, ধর্ম্মে একব্রতী হইয়া, পিতার ইচ্ছানুগত হইয়া, প্রেমবান্ ও স্বার্থত্যাগী হইয়া এই ধর্ম্মপরিবার রচনা কর এবং ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রধানতম উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ কর। সকলে মিলিয়া এক ক্ষেত্রে কার্য্য কর, কাহার কি কাজ বুঝিয়া লও। হে ঈশ্বরের পুত্রগণ, এস আমরা ঈশ্বরের পরিবার হই। পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা, একাত্মতা স্থাপন কর, ধর্ম্মের সাধন, পরিবারের শিক্ষা এবং যাবতীয় জীবনের কার্য্যে পরমেশ্বরের কৃপাজালে আবৃত হইয়া সকলে এক স্থানে দণ্ডায়মান হই এবং অনন্ত মহান্ পরমেশ্বরের মহাশান্তি পূর্ণপাত্ররূপে পরিণত হই।

ধর্ম্মমণ্ডলী কাহাকে বলে, ইহার শক্তি ও সম্বন্ধ এবং ইহাতে যাহা যাহা থাকা প্রয়োজন বলা হইল। মণ্ডলীর জীবন উন্নত ও মণ্ডলীকে শক্তিসম্পন্ন করা যে নিতান্ত প্রয়োজন ইহা বুঝিতে পারিলে। গতবারে নিজ নিজ জীবনের উন্নতির বিষয় বলিয়াছি, এই সমস্ত বিশেষরূপে চিন্তা কর এবং যাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা কর। শেষ কথা এই যে, আমরা যে উদ্দেশ্য লইয়া জীবনের ব্রতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল অতি সামান্য দেখিতেছি। কেন না একটী ধর্ম্মমণ্ডলী প্রস্তুত করাই আমাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। এইক্ষণে যাহাতে তাহা হয় তজ্জন্য সকলের যত্নবান্ হওয়া উচিত। দয়াময় পরমেশ্বর এই জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত ও শক্তিমান্ করুন।

হে পরমাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান্, সত্যই কি তুমি সকল আত্মার প্রভু হইয়া ধর্ম্মদণ্ড হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছ? সত্যই কি দুর্ব্বল সন্তানের পশ্চাতে মাতা যেমন দণ্ডায়মান থাকেন, তুমি সেই-রূপ আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছ? এই বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া পরস্পরের স্বার্থে পরস্পরে, পরস্পরের ধর্ম্ম ও পুণ্যে পরস্পরে সমভাগী হইয়া যদি তোমার পরিবার হইতে আদেশ করিয়া থাক তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। হে পরম পিতা, যদি এই একশত লোক কটিবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকে তোমার ইচ্ছা পালন করিবে ও পরস্পরের সহায় হইবে মনে করে এবং এই মণ্ডলীর মধ্যে যাহার যে কার্য্য বুঝিয়া নেয়, তবে কি না হয়? তিন দিনে তুমি সলিমানের মন্দির চূর্ণ করিয়া তোমার মন্দির স্থাপন করিলে, আর এই সকল লোক তোমার কৃপার ভিখারী হইলে কি অসম্ভব থাকে? অতএব হে পিতা, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছাধীন করিয়া তোমার কার্য্যে সকলকে ব্যবহার কর এবং আমরা এই জীবনের আরব্ধব্রত সাধনে সিদ্ধকাম হইব এজন্য তুমি আমাদের সাহায্য কর। তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই ভিক্ষা করিয়া আশা ভক্তিভরে তোমাকে নমস্কার করি।

উপাসনাশ্রম।

অজ্ঞেয়বাদ ও অদ্বৈতবাদ।

রবিবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮২০ শক।

আমরা যাঁহার আরাধনা করি, আমরা যাঁহার পূজা বন্দনা করি, আমরা যাঁহাকে দেখা যায়, যাঁহার কথা শুনা যায়, এবং পরম প্রিয়তমরূপে যাঁহার সহবাস সুখে সুখী হওয়া যায় বিশ্বাস করি, তাঁহাকে অনেকে অজানিত, অজ্ঞাত, বোধাতীত, অপ্রাপ্য, অগম্য, বলিয়া থাকেন। তিনি যদি চির অজানিত, অজ্ঞেয়, বুদ্ধিমনের অগোচর হইলেন, তবে তাঁহার পূজা বন্দনা, ও সাধনাতে ফল কি? তিনি কি আপনাকে কোন দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না? অনেকে বলেন, ঈশ্বর আপনাকে এমন এক কঠিন আবরণে আবৃত রাখেন যে, অনেক ধার্ম্মিক অনেক সাধকও এই আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হন না। যে সমস্ত ব্যাকুল আত্মা সর্ব্বদা তাঁহার অন্বেষণে ব্যস্ত তাঁহারাও সর্ব্বদা তাঁহার দর্শন পান না। তবে কখন কখন এমন শুভ দিন হয় যে, সাধক তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন। সে দিন তাঁহার জীবনের বিশেষ দিন এবং সে দিন সাধক একান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। এরূপ ঘটনা বিরল এবং এ প্রকার ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অতি অল্প। সুতরাং ইহা দ্বারা অজ্ঞেয়বাদ নিরসন হয় না। এই অজ্ঞেয়বাদ কোন কোন আকারে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এক দিকে তাঁহাকে অজানিত, অজ্ঞেয়, বোধাতীত, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কেহ তাঁহার কথা শোনে না, কাহার তাঁহার সঙ্গে আলাপ করা অসম্ভব, এই বলিয়া কেহ তাঁহাকে দূরে তাড়াইয়া দেয়, অপর দিকে আবার এ সমস্তই মায়া, যাহা সৃষ্টি বলিয়া মনে করা হইতেছে ইহা কিছুই নহে মনের ভ্রান্তি মাত্র, এই বলিয়া কেহ বা সমস্ত সৃষ্টি উড়াইয়া দেয়। এতদ্দ্বারা কেবল ব্রহ্মই সার এবং ব্রহ্ম এক মাত্র, এই মত স্থাপিত হইল। এইমত এ দেশে প্রবল; পাশ্চাত্য দেশে এইমত একটু স্বতন্ত্র আকারে বর্ত্তমান। তথায় জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া গিয়াছে। এই উভয় প্রকার মতই অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত। একদিকে সৃষ্টি সম্পূর্ণ অস্বীকার, অন্যদিকে সৃষ্টির স্বতন্ত্রতা অস্বীকারমাত্র।

অতএব এক দিকে ব্রহ্ম অজানিত অজ্ঞেয়, বোধাতীত, অপ্রাপ্য অন্য দিকে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই; একদিকে সৃষ্টির আবরণে ব্রহ্ম আবৃত, অন্য দিকে সৃষ্টির বর্ত্তমানতাই অস্বীকার। যেমন যেখানে আলোক, সেখানেই অন্ধকার, তেমনি এই অজ্ঞেয়বাদ ও অদ্বৈতবাদ। আমরা এই উভয় মতের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। আমরা জ্ঞানযোগের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সময় ঈশ্বর এক দিকে জ্ঞান ও বুদ্ধি মনের অগোচর, অন্য দিকে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই, এই উভয় মতের নিগূঢ় অভিপ্রায় কি আমাদিগকে আলোচনা করিতেই হইবে। কারণ ইহা জ্ঞানযোগের অন্তর্গত। এই অজ্ঞেয়বাদ ও অদ্বৈতবাদের মূল কি তাহা জানিতে না পারিলে আলোচ্য বিষয় সম্যক্ আয়ত্তাধীন হইবে না। সুতরাং অগ্রে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

আমরা দেখিতে পাই, বিষয়চিন্তা, বিষয়মত্ততা, ও সংসারাসক্তি অন্তরকে বহির্ম্মুখ করে। মানসিক প্রবৃত্তির গতি যতই বহির্ম্মুখ হইবে ততই মন চঞ্চল হয়। নানা বিষয়ে ব্যাপৃত ও নানা পথে ধাবমান হওয়াতে মন কোথাও স্থির হয় না। অন্তর আমাদের স্থিরতা ও তাবৎ গভীর চিন্তার আধার। যতই আমাদের প্রবৃত্তি বাসনা অন্তর্ম্মুখী হইয়া গভীর চিন্তাযোগে অন্তরেই একান্ত স্থিতি করে, ততই আমরা বিষয়চিন্তার বিক্ষিপ্ত অবস্থা ও সংসার বাসনার অতিমাত্র চঞ্চলতা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকি। ফলতঃ এই বিষয়ানুরাগ ও সংসারাসক্তিই মানুষকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনের গতি আত্মাতে ঈশ্বর-বিচ্যুতি সংঘটন করে। এইরূপে যাঁহারা জড় লইয়া বিষয় লইয়া, জনসমাজের পার্থিব উন্নতি লইয়া নিত্য ব্যাপৃত, তাঁহারা নিয়ত বহির্বিষয়ে অনুরক্তিবশতঃ অন্তরে স্থির গভীর চিন্তাযোগে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইবার অবসর পান না। সুতরাং ইঁহাদের কাছে ঈশ্বর অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয়, অজানিত, অপ্রাপ্য প্রভৃতি নামে অভিহিত না হইয়া আর কি হইবেন? বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এবং এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা বিজ্ঞানবিষয়ে তত অভিজ্ঞ নহেন অথচ মনে করেন ঈশ্বর হয়ত একবার সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু এইক্ষণে এই সৃষ্ট পদার্থের নানা সংযোগ ও নানা রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন দ্বারা যাবতীয় বিষয় সম্পন্ন হইতেছে। ইঁহারাও ঈশ্বরকে জানিতে সুযোগ পান না। সুতরাং ইঁহাদের কাছেও তিনি অজ্ঞেয় অপরিচিত, অজানিত।

এই সমস্ত কারণেই পুরাকালে যাঁহারা ঈশ্বরগতপ্রাণ, তাঁহারা বিষয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, জনসমাজের উন্নতি অবনতি কিছু না ভাবিয়া সংসার পরিত্যাগ করিতেন, অসঙ্গ উদাসী হইয়া নির্জ্জন গিরিগুহা আশ্রয় করিতেন। ইদানীন্তনও অনেকে এই পথের পথিক হন। কিন্তু সময়ের গতি কে অবরোধ করিবে? পূর্ব্বেও যেমন লোকে জগৎ মায়া, সৃষ্টি মানসিক প্রবৃত্তির ভ্রান্তি-মাত্র মনে করিয়া সমস্ত কিছুই নহে, ব্রহ্মই কেবল সার এই ভাবিয়া অদ্বৈতবাদী হইত, এখনও তাহাই হইতেছে। অজ্ঞেয়-বাদ যেমন ঈশ্বর হইতে মানুষকে বঞ্চিত রাখে, স্ত্রী পুত্র সংসার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড কিছুই নহে স্থির করিয়া অদ্বৈতবাদী হইলেও তাহাদের কাছে সত্য ঈশ্বর প্রকাশিত হইতে পারেন না। কারণ এই সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যাহা নিত্য রহিয়াছে তাহাকে নাই বলা সম্ভব হয় না; সুতরাং অন্য কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বর আছেন, ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া সমস্ত সৃষ্টিকে ঈশ্বর বলিতে হয়। কিন্তু সৃষ্টি কদাপি ঈশ্বর নহে, সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের নিকট সমস্ত জগৎ যেমন মায়া ও ছায়া, তাহাদের ঈশ্বরও তাহাদের কাছে তেমনই মায়া ও ছায়া; জগতও ভ্রান্তি, ঈশ্বরও ভ্রান্তি। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, সংসারাসক্তি ও

মায়ার বন্ধন বলিয়া সংসারপরিবর্জ্জন, দুইই আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে এবং অজ্ঞেয় অজানিত অবোধ্য বলিয়া ঈশ্বরান্বেষণে আমাদিগকে বিরত করে। অতএব যদি সত্য পথে চলিতে হয়, সত্যে স্থিতি করিতে হয়, তবে যাহা সত্য আমাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সংসার ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদিগকে তিনি এই সংসারে রাখিয়াছেন, আমাদের স্ত্রী পুত্র, সংসার, যাহার যাহা আছে তাহা তাঁহার প্রদত্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার কিছু পরিত্যাগ করা কিংবা কিছুতে আসক্ত হওয়া, আমাদের পক্ষে উচিত নহে। যদি সংসারে আসক্ত না হই, চিত্ত শুদ্ধ থাকে, চিত্ত কখনও ধনে, কখন জনে, কখনও বিষয়সম্ভোগে প্রলুব্ধ হইয়া বায়ুবিতাড়িত লঘু সূত্রের ন্যায় চঞ্চল না হয়, তবে আমরা ঈশ্বরকে হারাই না। মনকে বহু বিষয়ে ব্যাপৃত করা ঈশ্বরবিচ্যুতির একটি প্রবল কারণ। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য চিত্তকে বহু বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া এক বিষয়ে স্থির করা। বিজ্ঞানবিদ্গণ যখন অন্য সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া মনকে এক বিষয়ে নিবিষ্ট করেন, তখন তাঁহাদের নিকট তৎসম্পর্কীয় একটি নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। মনঃসংযোগের এই বিধি। জ্ঞানযোগের ইহাই মূল সূত্র। আমাদের সমস্ত কার্য্য, ভাবনা, অনুষ্ঠান, সকলের মূল ঈশ্বরপ্রাপ্তি। সর্ব্বোপরি ইহা স্থির রাখিয়া যাহা করি, যেমন করিয়া জীবন চালাই, তাহাতে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না। সৃষ্টি ও ঈশ্বর চিরকাল স্বতন্ত্র। সৃষ্টি ঈশ্বরের আবরণ নহে কিংবা সৃষ্টি মায়া ও ভ্রান্তি নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া যদি জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকি, তবে সহজে ব্রহ্মসহবাসে আমরা সুখী হইতে পারি। ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় অবলম্বন, তিনি স্রষ্টা, তিনি বিবিধ অবস্থাতে আত্মপ্রকাশ করেন, ইহা জানিয়া যদি তাঁহাতে হৃদয় মন সমর্পণ করি, তিনি আমাদের এক মাত্র প্রার্থনীয়, তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই চাহি না, এই ভাবে যদি একাগ্রতা সহকারে তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করি, তবে সকল বাসনা সিদ্ধ হয়। তিনি আর কিছুই চাহেন না। কঠোর সাধনা, সর্ব্বত্যাগ তিনি ইচ্ছা করেন না। তাঁহাকে চাহিলেই তিনি প্রকাশিত হন, অজানিত থাকেন না; বার বার আত্মপ্রকাশ করেন।

ঈশ্বর আমাদের সকল অবস্থা অবগত আছেন। যখন আমরা আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিয়া সত্য পথে উপস্থিত হই, তখন তিনি আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবার সুযোগ লাভ করেন এবং প্রকাশিত হইয়া হাস্যবদনে বলেন, "সন্তান, এত দিন তুমি আমাকে দেখ নাই, আমাকে ভাব নাই, আমাকে অজানিত, অজ্ঞেয় বলিয়া দূরে রাখিয়াছিলে, সংসারে অসাড় হইয়া আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে, যখন দেখিলে সংসারে সুখ নাই, জল বুদ্বুদের মত বিষয়সুখ কালসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে, অন্তরের অশান্তিতে যখন একান্ত নিপীড়িত হইলে, তখন তুমি আমার কাছে আসিলে। সংসারে আমি নাই ইহা তোমার ভুল। আমি সর্ব্বত্র আছি, তুমিই মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আমাকে দেখিতে পাও নাই; সুতরাং আমার বস্তুসমূহকে তুমি একান্ত দুঃখের কারণ মনে করিয়াছিলে। এখন দেখ চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন সকলই তোমার কাছে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমি রসস্বরূপ। সমস্ত সংসার আমার রসে পরিপূর্ণ। যতই আমাকে ভাবিবে আমাতে অনুরাগী হইবে, ততই আমার প্রকাশে সমস্ত সুন্দর ও হৃদয়রঞ্জন দেখিতে পাইবে।"

এইরূপে ব্রহ্মকে যদি আমরা অন্বেষণ করি,—অন্বেষণ করা কথাটা ভাল হইল না, কারণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া কেহ পায় না—তিনি সহজেই প্রকাশিত হন, সহজহৃদয় সহজপ্রাণ হইয়া তাঁহাকে সহজে প্রকাশিত হইতে দিলেই হইল। তিনি যে অভিমান করিয়া আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না তাহা নহে। এ সংসারে যে যাহা চায় সে তাহা পায়, না চাহিলে কেহ কিছু পায় না। এই নিয়ম না থাকিলে সংসার চলিত না। তিনি যে নিয়ম আপনি করিয়াছেন সে নিয়ম ভাঙ্গিবেন কি প্রকারে? তাই ঈশ্বরকে সরল অন্তরে দেখিতে চাহিলেই তিনি সহজে দেখা দেন।

আর এক দিকে আবার যে যাহা চাহে তাহার মন ঠিক সেইরূপ হয়, যে যাহা অভিলাষ করে সে সর্ব্বত্র তাহা দেখে। ঈশ্বর বলিলেন, 'তোমার অভিলাষকে আমি বলবান্ করিয়াছি। যদি আমাকে অভিলাষ কর, ব্রহ্মাভিলাষী হও, তবেই আমাকে পাইবে।' অভিলাষ যাহা সিদ্ধিও তাহা। অতএব আমাদের প্রবৃত্তি, বাসনা, অভিলাষ যদি পবিত্র ও ঈশ্বরপ্রার্থী এবং ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তবে ঈশ্বর ক্ষণকালের জন্যও দূরে থাকেন না; পরমাত্মার যোগ ও সংস্পর্শে এই পৃথিবী আর এক আকার ধারণ করে; অন্ন ও পানীয় এবং সংসারে যাহা ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে তিনি অধিকার দিয়াছেন, তাহার সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়া প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে। আমরা যদি ব্রহ্মসন্তান হইতে ইচ্ছা করি, তবে আর আমাদের কোন দুঃখ থাকে না; দেবপ্রসাদে সমস্ত সুখকর, শান্তিপ্রদ ও রসময় হয়। ইহাতে আর অজ্ঞেয়বাদের অজানিত, বোধাতীত প্রভৃতি ভাব কিরূপে থাকিতে পারে?

ঈশ্বর ও সৃষ্টজগৎ কখনও এক নহে। যত ক্ষণ আমরা এ দুই স্বতন্ত্র, অথচ উভয়মধ্যে অচ্ছেদ্যযোগ দেখিতে পাই, তত ক্ষণ আমাদের দৃষ্টি নির্ম্মল আছে মনে করিতে হইবে। এ বিষয় পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। অতএব এক্ষণ এই প্রমাণ হইতেছে যে, যত ক্ষণ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসার ও বিষয়ে ব্যাপৃত থাকা যায়, তত ক্ষণ এই সংসারের সঙ্গে বিবাদ এবং যত ক্ষণ সৃষ্টজগৎ ছাড়িয়া ঈশ্বরকে লাভ করিতে চেষ্টা করা যায়, তত ক্ষণ প্রকৃত ঈশ্বরলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। তখন বৃক্ষ, প্রস্তর, পশু, মনুষ্য সকলই ঈশ্বর হইয়া মায়াকে আরও শতগুণ মায়া করিয়া তোলে। এই অজ্ঞেয়বাদ ও অদ্বৈতবাদ, উভয়কে পরিত্যাগ করিলে আর কোন গোল থাকে না; সহজ সত্য যাহা তাহাই প্রকাশিত হয়। কৃপানিধান পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা এই উভয় প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া সহজ সত্য পথে সরল অন্তরে তাঁহাকে লাভ করিয়া চিরসুখী হই।

হে করুণাময়, বলিতে বাসনাও হয়, আবার বলিতে ভয়ও হয়। তোমাকে লইয়া যাহারা সংসার করে, তাহাদের কত সুখ! চক্ষু দিয়াছ দেখিতে, কর্ণ দিয়াছ শুনিতে, প্রবৃত্তি বাসনা দিয়াছ নানা বিষয় সম্ভোগ করিতে। যদি এই সমস্তকে পরিত্যাগ করি, তবে যে অন্ধকারে বাস করি, সমস্ত সংসার অসার হয়। আবার যদি বাসনা, কামনা ও অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে ভুলিয়া যাই তাহা হ'লেও সর্ব্বনাশ। তোমাকে ছাড়িলেও বিপদ এবং তোমার সৃষ্টজগৎ ছাড়িলেও বিপদ। আমরা যদি তোমার সন্তান হইতে ইচ্ছা করি, তবে হে পিতা, তোমাকে এবং তোমার জগৎকে আমরা যুগপৎ লাভ করি। তুমি প্রাণস্থ, তুমি নিকটস্থ, তুমি আত্মস্থ ইহা বুঝিতে পারিলে, কত সুখ, কত আরাম! তুমি শরীরস্থ এবং তুমি সমস্ত জগদ্ব্যাপী ইহা জানিলে শরীরের দ্বারা জগতের কোথাও পাপ করিবার স্থান থাকে না। হে কৃপানিধান বল আমরা কি এই ঘোর অজ্ঞেয়বাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে পড়িতে পারি? শ্রীহরি, দেখিলামবুঝিলাম যে, যদি তোমাকে চাহি, তোমাতে চিত্ত নিহিত থাকে, তবে আর কোন বিপদ থাকে না; কেহ আবরণ হইয়া তোমার মুখ ঢাকিতে পারে না। সৃষ্টি ছাড়া, ঐশ্বর্য্য ছাড়া, অসঙ্গ উদাসী, মায়ামমতাশূন্য এমন কোন ঈশ্বর আমাদের ঈশ্বর নন। হে দয়াল হরি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমাকে লইয়া চিরসুখী হই, তোমাকে তোমার সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করি।

সংবাদ।

বিগত ১৩ই জুন বালেশ্বরনিবাসী শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ নাথ দাসের দ্বিতীয় কন্যার শুভ নামকরণ নবসংহিতা অনুসারে হইয়াছে। ভাই নন্দ লাল আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। আচার্য্য কর্ত্তৃক কন্যা প্রশান্ত কুমারী নাম পাইয়াছেন। দয়াময় ভগবান্ কন্যা এবং উহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাগলপুরে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরি সুন্দর বসুর দ্বিতীয় কন্যার নাম ভাই দীননাথ মজুমদার কর্ত্তৃক শ্রীমতী সন্ন্যাসিনী প্রদত্ত হইয়াছে। দয়াময়ী জননী নবকুমারীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই দীননাথ মজুমদার প্রায় এক মাস কাল ভাগলপুরে থাকিয়া ব্রাহ্ম পরিবারে বিশেষ ভাবে উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়াছেন। ভাই দীননাথ ভাগলপুরের ব্রাহ্মমণ্ডলীর একজন বিশেষ পরিচিত। ইনি অনেক বৎসর হইতে ঐ স্থানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ।

আমরা আমাদের উপকারী গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট অতি কাতর ভাবে তাঁহাদের দেয় মূল্য ভিক্ষাস্বরূপ চাহিতেছি। এই কলিকাতায় মহামারীর সময় অধিকাংশ লোকই কলিকাতা পরিত্যাগ করায় আমাদের আয়সংখ্যা বড়ই কম হইয়া গিয়াছে, পত্রিকা প্রভৃতির কাগজের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় ও মাসুল প্রভৃতি সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এ সকল ব্যতীত আমাদের প্রকাণ্ড পরিবারের প্রায় সকলেই কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। জানি না কি কৌশলে দয়াবান্ ভগবান্ তাঁহার আশ্রিতদিগকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সকলকে আমাদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত করা উচিত বোধে জ্ঞাত করিলাম। এক্ষণে যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আমাদিগকে সহায়তা প্রদান করুন।

ভিক্টোরিয়া কলেজে আপততঃ যে কয়েকটি ছাত্রীবাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উপাধ্যায় মহাশয়ই শিক্ষা দিতেছেন। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ইহার অন্য রূপ ব্যবস্থা করা যাইবে। যাঁহারা আমাদের নিকট কন্যা কিংবা আত্মীয়দিগকে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদিগকে এখানে পাঠাইয়া দেন।

বিগত ২৭এ আষাঢ় রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মঙ্গল পাড়ায় শ্রীযুক্ত বাবু গৌরী নাথ বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ নন্দনের কন্যা শ্রীমতী হরিদাসী বসু প্রায় দুই বৎসরকাল ক্ষয়কাস রোগে কষ্টভোগ করিয়া শান্তিদায়িনী জননীর কোলে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। হরিদাসী এই দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণার মধ্যে আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামীও পত্নীর সেবাব্রতে বিশেষ যত্ন দেখাইয়াছেন। হরিদাসী ৪ বৎসরের একটীমাত্র কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছেন। দয়াময়ী জননী শ্রীমান্ গৌরীনাথের এবং শ্রীমতীর জন্য শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন।

ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় প্রায় এক পক্ষকাল গত হইল পাবনায় আসিয়া তত্রস্থ জজ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় মহাশয়ের শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা ও উপাসনাদি দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন। কেদার বাবু সম্প্রতি তাঁহার একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া মাতৃহীন কন্যাকে হারাইয়া বিশেষ শোক পাইয়াছেন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের পায়ের আঘাত স্থান ভাল হইয়াছে। তিনি এক্ষণে নিয়মিত রূপে নববিধান সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। কল্য হইতে ৪৫ নং বেনেটোলার বাড়ীতে সন্ধ্যা ৭।০ সসাতটার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে।

যুবাদিগের প্রার্থনা সমাজের ৫ম সাংবৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। কল্য রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হইবে।

এই পত্রিকা ৩ নং রমানাথমজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" পি, কে, নাথ কর্ত্তৃক, ২রা শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৩৩ ভাগ ।
১৪ সংখ্যা ।

১৬ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৮২০ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা ;

হে পুণ্যের অনন্ত প্রস্রবণ, তোমার ইচ্ছা অনুবর্ত্তন করা আমাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য । যে বিষয়ে তুমি তোমার ইচ্ছা আমাদের নিকটে প্রকাশ কর নাই, সে বিষয়ে আমাদের মনোভি- নিবেশ করা, সুতরাং মহাপরাধের কারণ । আমা- দের মনে কত সময়ে কত বিষয়ে অভিলাষ উপস্থিত হয়, অথচ আমরা সে সকল যেন কিছুই নয় এইরূপ অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দি । আমাদের প্রত্যেক চিন্তার জন্য যদি আমরা দায়ী হই, তাহার ভাল বা মন্দ ফল যদি আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের অভিলাষের জন্য তো আমরা আরও অধিকতর দায়ী, কেন না চিন্তা আসে আর চলিয়া যায়, অভিলাষ হৃদয় হইতে উত্থিত হয়, উহার একটা স্থায়ী মূল আছে, যে মূল জীবনের সঙ্গে গ্রথিত, এবং উন্মূলিত করা কখন সহজসাধ্য নহে । কোন একটি অভিলাষ প্রবল হইলে অন্য অভিলাষ কেবল কতকক্ষণ লুকাইয়া থাকে কিন্তু পরে, আবার সময় হইলেই আসিয়া উৎপাত করে । প্রত্যেক চিন্তার মূলেও যখন এক একটি অভিলাষ থাকে, এবং সেই অভিলাষেই চিন্তার ভাল মন্দ ফল জীবনে ঘটে, তখন, হে পুণ্য- ময়, এই অভিলাষই আমাদিগকে স্বর্গে ও নরকে লইয়া যায় ? জীবনক্ষেত্রে' তবে এই অভিলাষের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম । তুমি এ সংগ্রামে সেনাপতি । আমরা যদি তোমার অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া তোমারই ইঙ্গিত বুঝিয়া এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকি, অভিলাষগুলি কখন আমাদিগকে পরাজয় করিতে পারে না, উহারা ভৃত্য হইয়া আমাদিগকে তোমার পুণ্য- রাজ্যের দিকে লইয়া যাইবার সহায় হয় । হে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার বশে সর্ব্বদা রক্ষা কর, তাহা হইলে আর আমরা, যাহারা আমাদের দাস হইয়া সেবা করিবে তাহাদের দাস হইয়া, আমাদের জীবনকে হেয়, কলঙ্কিত ও পাপে নিমগ্ন করিতে পারিব না । দেখিয়াছি সংগ্রাম করিতে করিতে যখন অবসন্ন- প্রায়, তখন শত্রুদিগকে সমরক্ষেত্র হইতে তুমি অপসারিত করিয়াছ, কি কৌশলে তুমি তাহা করিলে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এ ব্যাপার অনেক বার দেখিয়াছি । নিঃসংশয় বুঝিয়াছি, এসম্বন্ধে তোমার অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র বল ও ভরসা । তাই তব পাদপদ্মে পড়িয়া এই ভিক্ষা করিতেছি, তুমি তোমার ইচ্ছার সাম্রাজ্য আমাদের হৃদয়ে স্থাপন

কর,আমরা সকল অভিলাষের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করি। তোমার কৃপায় এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইবে, এই আশা করিয়া বার বার তব শ্রীচরণে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

—–—

রসস্বরূপ।

ঈশ্বরের অন্যান্য স্বরূপ চিন্তা ও অনুধ্যানের বিষয় করা যাইতে পারে, জগতে ও জীবে সেই সকল স্বরূপের ক্রিয়া দর্শন করিয়া কতক পরিমাণে উহারা জ্ঞানে অনুভূত হইতে পারে, এবং আমাদের জীবনের উপরে প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে যখন আমরা রসস্বরূপ তৃপ্তির হেতু বলি, তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বাদ পরিগ্রহ না করিয়া আর আমরা এ কথা বলিতে পারি না। অতএব বলিতে হইবে, রসস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইল না, অথচ আমরা বলিলাম, হে ঈশ্বর, তুমি রসস্বরূপ, ইহা শূন্যগর্ভ বাক্য বিনা আর কিছুই নহে। যাঁহারা ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের আনন্দ সম্ভোগ করিয়া প্রমত্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবনে যে সকল ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, সেই সকল দেখিয়া আমরা তাহার বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে ব্যর্থ বাক্যব্যয় ও কপটাচরণ ভিন্ন আর কিছুই লাভ নাই।

রসস্বরূপ তবে কি? যিনি ভক্তের আস্বাদ্য, যোগীর আস্বাদ্য, তিনিই রসস্বরূপ। রস আস্বাদন করিলে তুষ্টি পুষ্টি তখন তখনই উপস্থিত হয়। এখন রস পান করিলাম, স্বাদপরিগ্রহ হইবে দশ দিন পরে, ইহা রসসম্বন্ধে কখনই সম্ভবে না। ঈশ্বরের প্রেমের কথা বলিতে বলিতে শুনিতে শুনিতে চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করিল, হৃদয়মন পুলকিত হইল,আশা বিশ্বাস বাড়িল, সংসারমেঘ কাটিয়া গেল, জ্ঞান পরিষ্কৃত হইল, এ সকল কি প্রত্যক্ষ আস্বাদের ফল নহে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রেমই রস, এবং প্রেম সাক্ষাৎ অনুভবগোচর না হইলেও জগৎ ও জীবের ভিতর দিয়া যে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তদ্দর্শনেই আমাদের রসপরিগ্রহ হইল বলিতে হইবে। প্রেম সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকাশ না পাইলেও জগতে ও জীবে তাহার প্রকাশ দর্শন করিয়া আমরা আনন্দানুভব করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমরা ঈশ্বরকে কখন রসস্বরূপ বলিতে পারি না। জগৎ ও জীবে নিয়ত যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা দর্শন করিয়া প্রভূত আনন্দ উপস্থিত হয়, এবং অনেক সাধক এই সৌন্দর্য্য দর্শনে যে ভাবোদয় হয়, সেই ভাবেই আপনাদিগকে নিতান্ত কৃতার্থ মনে করেন। এ কৃতার্থতা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরদর্শনে অনুকূল না হইয়া অনেক সময়ে প্রতিকূলই হয়। কেন না মানুষের স্বভাব এই যে, কোন প্রকারে তাহাদের ভাব চরিতার্থ হইলে আর তাহারা বড় অগ্রসর হইতে চাহে না, সেই ভাবজনিত সুখ লইয়াই তাহারা পড়িয়া থাকে।

ভক্তিপথাবলম্বিগণ রসস্বরূপের উপাসক। ঈশ্বরের নব নব রস আস্বাদ না করিলে ভক্তি চরিতার্থ হয় না, এজন্য ঈশ্বরের নিত্য নূতন লীলাদর্শনের জন্য ভক্ত ব্যাকুল। লীলাদর্শন ও রসাস্বাদ কি তবে একই? না, তাহাও বলিতে পারি না, কেন না লীলাদর্শন বাহিরের ব্যাপার হইতে পারে, ঈশ্বরের প্রেমপ্রকাশক বিবিধ ঘটনা লীলারূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর যে দূরে সেই দূরেই রহিলেন। যদি তিনি দূরে রহিলেন, তবে তিনি স্বয়ং রসাস্বাদের বিষয় হইলেন কোথায়? প্রাণের গভীরতম স্থানে ঈশ্বরকে দেখিয়া যে এক অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয়, এবং তাহাতে প্রাণ মন হৃদয় আহ্লাদে আপ্লুত হয়, তাহাকেই বলি রসস্বরূপের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। যখন এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, তখন সমুদায় গুণ গুণ ঝঙ্কার পরিহার করিয়া ভ্রমর যেমন মধুরস পানে নিমগ্ন হয়, সাধকেরও তখন সেই দশা উপস্থিত। ধ্যান, মৌনাবলম্বন, গভীর সমাধি তবে রসস্বরূপের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, এখানে বাক্যাড়ম্বর

চিরদিনের জন্য বদ্ধ। যেখানে বাক্যাড়ম্বর আছে, সেখানে রসাস্বাদ হয় নাই, রসাস্বাদ করিতে গিয়া কে আর রসাস্বাদ না ছাড়িয়া কথা বলিবার অবসর পাইয়া থাকে ?

যদি এইরূপই হইল, তবে আর রসস্বরূপকে লইয়া আমরা পাঁচ জনে একত্র মিলিত হইতে পারি না, কেন না উহা প্রতিব্যক্তির আস্বাদ্য বিষয়। আস্বাদ্য বিষয় হইলেও সহস্র ব্যক্তি আস্বাদগ্রহণার্থ মিলিত হইতে পারে, যদি তাহা না হয়, বুঝা গেল রসস্বরূপের স্বাদ-পরিগ্রহের আরম্ভ হয় নাই। মধুচক্রে সহস্র মধুমক্ষিকা একত্র মধুপান করে, এবং এইরূপে মধুপানে আহ্লাদ শতগুণ বৃদ্ধি পায়। একাকী রসাস্বাদে স্বাদের পরি পুষ্টি হয় না, এই জন্যই যেখানে স্বাদগ্রহণের ব্যাপার আছে, সেখানে বহুলোক আপনা হইতে আসিয়া যোটে। তুমি যখন ঘরে বসিয়া একাকী অন্নপান ভোজন কর, তাহাতে তোমার সুখ হয় না, বা দেহপুষ্টি হয় না, এ কথা বলিতেছি না, কিন্তু যখন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া ভোজন কর, তখনকার সুখের নিকট একাকী ভোজনসুখ কি আর সুখ বলিয়া মনে হয়। দশ জনে মিলিয়া ভগবন্নামকীর্ত্তন করিবার সময়ে প্রতিজন অন্তরে ভগবদাবির্ভাব অনুভব করিতেছেন, তাঁহার সহবাস সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, অথচ এত জনে মিলিত হইয়া সে সুখ সম্ভোগ করিতেছেন বলিয়া সে সুখের আরও আধিক্য হইতেছে। পরস্পরের বিশ্বাস ভক্তি অনুরাগ এবং রসাস্বাদজনিত প্রফুল্ল মুখ পরস্পরের স্বাদগ্রহণে আগ্রহ বাড়াইয়া দেয়, ইহা কিছু সামান্য লাভের বিষয় নহে।

রসাস্বাদ করিবার সময় সকল কথা বন্ধ হয়, ইহা সাময়িক ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু রসাস্বাদে কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পায়, ইহাও সকলে জানেন। রসগ্রাহীর কথা ভাবপূর্ণ, স্বাভাবিক কবিতায় মাখা। যে রাজ্যে রসের আধিপত্য, সে রাজ্যে গদ্য প্রবেশ করিতে পারে না। রসাত্মক বাক্য কাব্য, আলঙ্কারিকেরা এ কথার উপর দোষ দেখাইলে দেখাইতে পারেন, কিন্তু যে কথার কোন স্বাদ নাই, হৃদয়ের ভাব উদ্দীপন করে না, সে কথা কবিতা নামের যোগ্য হইতে পারে না। রসস্বরূপে যিনি নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কবিতার আধার হইয়াছে। তিনি যত্ন করিয়া কবিতা গাঁথেন না, কিন্তু তিনি রসস্বরূপের রসাস্বাদকালে যাহা কিছু বলেন, তাহা অনুপম কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়, শ্রোতৃবর্গের হৃদয় গিয়া স্পর্শ করে, তাহাতে তাঁহাদের প্রাণের তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, রসস্বরূপের সঙ্গে ভক্তি এই জন্য চিরসংযুক্ত হইয়া আছেন। কাব্য ভক্তির প্রাণ, কাব্য বিনা তিনি ক্ষণকালও জীবিত থাকেন না।

রসস্বরূপের স্পর্শে কাব্য উপস্থিত হয় কেন ? রসস্বরূপ যিনি তিনি স্বয়ং কবি। তাঁহার বিশ্বরচনার মধ্যে গদ্য নাই, সকলই পদ্য। "ছন্দে উঠে রবি শশী ছন্দে অস্ত যায়" এ কথা কিছু অত্যুক্তি নহে। সমুদয় বিশ্ব তালে তালে নৃত্য করিতেছে, কোন দিন তার তাল ভঙ্গ হয় না, লয়ের অভাব হয় না। বিজ্ঞানবিদ্গণ জাগতিক মহাশক্তির ক্রিয়ার ভিতরে নিরন্তর তাল লয় দর্শন করিয়া থাকেন। এই বিচিত্র বিশ্ব একখানি অখণ্ড প্রকাণ্ড কাব্য বলিয়াই তদ্দর্শনে কবিগণের হৃদয়ে কাব্যোচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়। একখানি কাব্যের ছিন্ন একখানি পত্র লইয়া পাঠ কর, উহা কাব্য হইলেও পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে বলিয়া পূর্ণ রসাস্বাদ হয় না, সেইরূপ এই বিশ্ব কাব্যের কোন এক অংশ অপর অংশসমূহের সহিত অসংযুক্ত করিয়া পাঠ করিলে উহা গদ্য-পদ্য-বিমিশ্র বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, উহার আদ্যোপান্ত কেবলই পদ্য। যিনি ভক্ত, ভক্তবৎসলে যাঁহার চিত্ত নিমগ্ন, তাঁহার সমগ্র জীবন এক দৃষ্টিতে না দেখিতে পাইলে ইহা গদ্য-পদ্য-বিমিশ্র বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া দেখ, মহাকবি তাঁহার জীবনকে একখানি মহাকাব্য রচনা করিতেছেন।

কম্প, অশ্রু, পুলক, হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য, গীত প্রভৃতি বিবিধ বিকার যেখানে প্রকাশ পায়, সেখানে যোগজনিত শান্তভাব কোথায়, নির্ব্বাণ কোথায়? প্রাণের ভিতরে ব্রহ্মের আবির্ভাব সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া ভক্ত আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়াছেন ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যোগীর প্রশান্তভাব ও নির্ব্বাণ তাঁহাতে লক্ষিত হইবে না কেন? মধুরসপানে প্রমত্ত ভ্রমর কি একেবারে নিস্পন্দ হইয়া যায় না? সুরাপায়ী অল্প পরিমাণ সুরা পান করিয়া বক্তা হয় বটে,এবং সে বক্তৃতার ভিতরে কবিতাও দৃষ্ট হয়, কিন্তু সুরা অধিক মাত্রায় চড়াইলে কি আর বাক্‌পটুত্ব থাকে? হাঁ, দৃষ্টান্তটি মন্দ নয়, কিন্তু ভোগাবস্থা এবং মূর্চ্ছিতাবস্থা এ দুই এক নহে। যেখানে ভোগ আছে, সেখানে চৈতন্য আছে; চৈতন্য ছাড়া রস পরিগ্রহ হয় না, ভক্ত চির চৈতন্য। অযোগী কোন কালে ভক্ত হইতে পারেন না, যোগ না থাকিলে পরা ভক্তির উদয় অসম্ভব। ভক্ত যোগী, অথচ তাঁহাতে হাস্য ক্রন্দনাদি বিবিধ বিকার দৃষ্ট হয়, ইহার মর্ম্ম যে তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, তুমি প্রকৃত যোগ ভক্তি কি আজও হৃদয়ঙ্গম কর নাই।

ভগবান্ স্বয়ং প্রশান্ত অনন্তজলধি। তাঁহার ভিতরে একটুও আন্দোলনা নাই, কিন্তু তাঁহার শক্তিপ্রকাশের ভূমির দিকে একবার তাকাইয়া দেখ, কি মহাধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। ভিতরে তিনি যোগী, বাহিরে তিনি কর্ম্মী কেন, জান? আপনার প্রেমের জন্য। প্রেম জীবের নিমিত্ত মহাব্যস্ত, সেই ব্যস্ততা হইতে সকল সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইতেছে। এই দৃষ্টান্তটি এক বার যোগী ভক্তের সম্বন্ধে সংলগ্ন কর, দেখিবে যোগ ভক্তি দুইই তাঁহাতে সম্মিলিত রহিয়াছে। যোগী ভক্তের ভিতরটা প্রশান্তসাগরসদৃশ স্থির, বাহিরটা ভগবদিচ্ছার প্রেরণায় সদা চঞ্চল। ভিতরে যে রসাস্বাদ হইতেছে তাহার আবেগ অশ্রু আদির আকারে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। তুমি বলিতেছ, এখানে নির্ব্বাণ কোথায়? নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে হৃদয় প্রস্তরবৎ, কিন্তু নির্ব্বাণে সিদ্ধ হইলে হৃদয়ের আবেগে সমস্ত পৃথিবী আন্দোলিত। শাক্যের প্রাণ জীবের জন্য কাঁদিতেছে, অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, শিষ্যগণের বিরোধ কলহ মিটাইতে না পারিয়া তিনি বিষাদে মগ্ন, ইহাতে কি আর তাঁহার অন্তরের নির্ব্বাণ বিলুপ্ত হইয়াছে? নির্ব্বাণ আত্মসম্বন্ধে চিরপ্রশান্ত, পরসম্বন্ধে মহাব্যস্ত ইহাই প্রকৃত নির্ব্বাণের লক্ষণ।

রসস্বরূপের সংস্পর্শে কবিতার স্ফূর্ত্তি পাইল, অন্তর অগাধ জলধিসদৃশ হইল। সেখান হইতে ক্রমান্বয়ে ভাব ও কবিতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া, বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ অন্তরের গভীর স্থান চিরপ্রশান্ত। ব্রহ্মসংসর্গজনিত সুখের আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে, তাহার উপরে বিষয়সুখের অধিকার ঘুচিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার ভিতর সর্ব্বদা প্রশান্ত থাকিবে, ইহা আর একটা আশ্চর্য্য বিষয় কি? বিষয়সুখকামনা আমাদিগের সমুদায় অশান্তির মূল, রসস্বরূপের সংস্পর্শে সে কামনা যদি না থাকে, তাহা হইলে চঞ্চলতার কারণ আর থাকিল না। যদি চঞ্চলতার কারণ না থাকিল, তবে আর উপরিভাগে চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় কেন? নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধ যদি শিষ্যগণের বিরোধে বিক্ষুব্ধহৃদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাণ হারাইলেন, ইহাই বলিতে হইবে কি? না তিনি নির্ব্বাণ হারান নাই, তিনি আপনার জন্য ক্ষুব্ধ হন নাই, ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন শিষ্যগণের দুর্গতি দর্শন করিয়া। তাহাদিগের দুর্গতি দর্শনে যদি তাঁহার ক্ষোভ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে তাঁহার জীবের প্রতি করুণা নির্ব্বাণে উদিত হইয়াছে, ইহা কখন প্রমাণিত হইত না। অতএব অন্তরে অক্ষুব্ধভাবে স্থিতি, বাহিরে পরের জন্য ঈষৎ তরঙ্গায়িত, এরূপ ভাবাপন্ন হইলে রসস্বরূপের রসপানে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির রসপান অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

প্রেম ছাড়িতে পারে না কেন ?

বৎস, তুমি যদি প্রেমিক হইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে তোমার পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকিলে চলিবে না, তোমায় পৃথিবী ছাড়িয়া একটু উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে। প্রেম পৃথিবীতে জন্মায় না, যদি পৃথিবীর বস্তুমধ্যে উহাকে অন্বেষণ কর, ঠকিতে হইবে। প্রেম অন্ন-বস্ত্র চায় না, সুখ স্বচ্ছন্দ চায় না, কণ্টক শয্যা সুকোমল শয্যা উহার পক্ষে উভয়ই সমান। যে ব্যক্তিতে প্রেম অবতীর্ণ হয়, সেও প্রেমের স্বভাব পাইয়া শরীরের সুখসাধন বিষয়সমূহের প্রতি উদাসীন হয়। কত পাইলাম বা পাইব, ইহা দেখিয়া যে প্রেম দেয়, সে ব্যক্তির প্রেম প্রেম নয়, উহা বণিগ্জাতির দেওয়া লওয়ার ব্যবসায় মাত্র। প্রেম সমুদায় ক্ষুদ্রভাবের অতীত, ক্ষুদ্রবিষয়ে উহা কখন আপনাকে বদ্ধ রাখে না। যে বক্ষে উহার স্থান, যে বক্ষ হইতে উহার পৃথিবীতে অবতরণ, সে বক্ষে উহার যে স্বভাব ছিল সে স্বভাব ছাড়িয়া উহা তোমার বক্ষে বাস করিবে, ইহা তুমি কি প্রকারে কামনা করিবে? ঠিক সেখানে উহার যে স্বভাব, এখানেও সেই স্বভাব। ঈশ্বরপ্রেমে যদি আত্ম-সুখাভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে মনে করিবে যে, তোমাতে প্রবেশ করিল বলিয়া নীচ আধারের গুণে উহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইলে, সে বস্তু আর সে বস্তু থাকে না, ইহাতো তুমি জান? তবে আর কেন যাহা প্রেম নয় তাহাকে প্রেম বলিয়া বৃথা প্রবঞ্চিত হও।

ঈশ্বরের স্বভাব প্রেমের ভিতরে আছে, এজন্য একবার যে ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে আপনার হৃদয়ে প্রেম স্থাপন করিল, সে ব্যক্তি চিরদিন প্রেমের পাত্র হইয়া রহিল, আর তাহার সহিত ছাড়াছাড়ি হওয়া একেবারে অসম্ভব। কি বলিতেছ? আর ছাড়াছাড়ি হইতে পারে না? কৈ, পৃথিবীতে এমন প্রেম তো কোথাও দেখা যায় না? তুমি কি বলিবে পৃথিবী প্রেমশূন্য? তুমি যে প্রেমের কথা বলিতেছ সে প্রেম যদি কোথাও না রহিল, তাহা হইলে তোমার এ প্রেমের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি হিব্রু ভাষা জানি না, আমার নিকটে যদি কেহ হিব্রু ভাষা বলে, আমার কিছুই বোধগম্য হইবে না, তোমার এ প্রেমও সেইরূপ। যাহা কোন দিন কোন ব্যক্তিতে দেখা যায় নাই, যার সম্বন্ধে কিছুমাত্র কাহার জ্ঞান নাই, সে বিষয় কি আর কথার আড়ম্বর করিয়া বুঝাইতে গেলেই বুঝা যায়? যে বস্তু যে কোন দিন দেখে নাই, যে বস্তুর অনুরূপ কিছুই চোখে পড়ে নাই, সে বস্তু ভাষা দিয়া তুমি তাহাকে বুঝাইবে কি প্রকারে? যে প্রেমের কথা তুমি বলিতেছ, সে প্রেম যদি পৃথিবী যাহাকে প্রেম বলে তাহার অনুরূপ বস্তু না হয়, তোমার এ প্রেম আর হিব্রু ভাষা একই, এ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা না করাই ভাল।

আমি যে প্রেমের কথা তোমায় বলিতেছি, তাহার নিদর্শন কোন দিন পৃথিবীতে কেহ দেখে নাই, এ কথা কি কোথাও বলিয়াছি? পূর্ব্বেও তো প্রেমসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, সে সকল পড়িয়া কি তোমার এরূপ মনে হইয়াছে, প্রেম কোন এক প্রকার অবোধ্য সামগ্রী? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই মুখে না তোলা ভাল। পূর্ব্বে প্রেমসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে তুমি প্রেমের স্বরূপ ও লক্ষণ অনেকটা বুঝিয়াছ, আজ কেবল তাহার একটা যে বিশেষ দিক্ আছে, তাহাই বলিবার জন্য তোমায় সম্বোধন করিয়া গুটিকতক কথা বলিতেছি। ঈশ্বরের স্বভাব ও প্রেমের স্বভাব এক এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিয়াছি, এরূপ কথা আরম্ভের প্রয়োজন আছে। প্রেম সুখাদিনিরপেক্ষ প্রথমে বলিয়াছি, কথা কিছু নূতন নয়, উহা অনেকবার শুনিয়াছ। প্রেমের স্বভাব ও ঈশ্বরের স্বভাব এক, এ কথা যদি তোমায় স্পষ্ট কখন নাও বলিয়া থাকি, এমন অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি যাহার ভাব ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহাহউক,

প্রেম যে কেন প্রেমের পাত্রকে কোন কারণে ছাড়িতে পারে না তাহার প্রথম কারণ ঈশ্বরের স্বভাব উহার স্বভাব। ঈশ্বরের প্রেম কাহাকেও ছাড়ে না, এ ভাব তোমার এ প্রেমের মধ্যেও আছে, তাই বলিয়াছি, 'একবার যে ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে আপনার হৃদয়ে প্রেম স্থাপন করিল, সে ব্যক্তি চিরদিন প্রেমের পাত্র হইয়া রহিল, আর তাহার সহিত ছাড়াছাড়ি হওয়া একেবারে অসম্ভব।' তুমি এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, তাই এ সম্বন্ধে মন খুলিয়া গুটিকয়েক কথা বলা আবশ্যক।

বৎস, আমি যে দিন তোমায় প্রথম ভালবাসি, সে দিন সে ভালবাসার ভিতরে পৃথিবীর সম্বন্ধ-জনিত সংমিশ্রণ ছিল না, কি করিয়া বলিব? কিন্তু দেখিতে দেখিতে, প্রেম সমুদায় সংমিশ্রণ ঘুচাইয়া দিয়া উহা আপনার স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ে প্রকাশ করিল। তখন বুঝিলাম, এ ভালবাসা পৃথিবীতে জন্মে না, স্বর্গ হইতে ইহার অবতরণ। কেবল সংমিশ্রণ গেল বলিয়াই যে এরূপ বুঝিলাম তাহা নয়, দেখিতে পাইলাম, ইহা প্রাণের মূল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে, ইহাকে ছাড়িতে গেলে সমস্ত অধ্যাত্ম জীবনে পর্য্যন্ত টান পড়ে। পৃথিবীতে মিশ্রিত ভালবাসার জন্য অনেকে প্রাণ দিয়াছে, দিতেছে, কোন কোন মৎস্যজাতীয় প্রাণীও সন্তানের জন্য প্রাণ দিয়া থাকে, ভালবাসার পাত্রকে বাঁচাইবার জন্য, এমন কি, গুলির সম্মুখে দাঁড়ায়। ভাবিলাম, তবে এ ভালবাসা কি সেই জাতীয়? যত দিন মিশ্রিত ভাব ছিল, তত দিন এইরূপই মনে হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি জীবনে উহার প্রভাবে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি, উহা পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে কিছুতেই মিশিতে চায় না। উহা আপনার স্বর্গীয় স্বভাব প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। যখন বলি, প্রেম তুমি বিদায় হও, তখন দেখি আমার জীবন মূলশূন্য হইয়াছে, উহার উৎস হইতে উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, অমনি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, প্রভো, এ স্বর্গের দান হইতে দাসকে বঞ্চিত করিও না; তাহা হইলে ইহার অধ্যাত্ম জীবন নিঃশেষ হইবে।

প্রেম বাহিরে প্রকাশ পাইতে চায় না, ইহা ইহার পিতার স্বভাব। এ স্বভাব ঈশ্বরেতেই দেখিতে পাই। তিনি আমাদের জন্য কি না করিতেছেন, অথচ সকলই লুকাইয়া লুকাইয়া করিতেছেন। যাঁহাদের চক্ষু নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহারাই কেবল এ প্রেম দেখিতে পান, তদ্ভিন্ন অন্যের নিকটে এ প্রেম চিরপ্রচ্ছন্ন। প্রেম অপবিত্র হস্তের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তাই বুঝি এত এ লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে? প্রেম লুকাইয়া সকল করে, এতেই ইহার এত মাধুর্য্য! প্রেম যাহার প্রতি ধাবিত হইল, সে যদি বিশ্বাস-ঘাতক হয়, প্রেম তাহাকে তখনও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করে। ঈশা এই জন্যই বুঝি ঘাতক জুডাকে, তাঁহাকে ধরাইয়া দেওয়ার সময়ও, প্রথমে সে নিকটে আসিবামাত্র, বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঈশার প্রেম স্বর্গীয়, এক বার যাহাকে বন্ধুশ্রেণীতে গণ্য করিয়া লইয়াছেন, আর তাহাকে কি অন্য কোন শব্দে সম্বোধন করিতে পারেন। যাহাকে বন্ধু বলিয়াছেন, সে যে তাঁহার চিরদিনের বন্ধু, এখন শত্রুতা করিল বলিয়া কি তিনি শত্রু হইতে পারেন? তিনি যদি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এ দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া যাইতেন তাহা হইলে "শত্রুকে ভাল বাস" এ উপদেশ কথার কথা থাকিয়া যাইত। তিনি জানিতেন, এখানে জুডাস বিশ্বাসঘাতক হইল, স্বর্গে গিয়া তিনি তাহাকে বন্ধুর শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন। ঈশাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি, স্বর্গীয় প্রেম পরলোকে অনন্ত-কালের সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত করিয়া এখানকার সকল অত্যাচার ভুলিয়া যায়। যত পার তাহার উপরে অত্যাচার কর, সে লুকাইয়া লুকাইয়া তোমার সুখ ও কল্যাণ বাড়াইতে যত্ন করিবে। প্রেম ছাড়িতে পারে না কেন, ঈশার দৃষ্টান্তে এখন বুঝিতে পারিলে তো? তবে আর বলিও না, এ প্রেমের পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত নাই, বোঝা দুঃসাধ্য, আজ এই পর্য্যন্ত।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ঈশ্বর তোমাকে গোপনে যাহা বলেন, যাঁহার তাহার নিকটে তাহা বলিও না, এ কথা তোমায় বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিবার আছে, মন দিয়া শুন। ঈশ্বর যাহা বলেন, তাহা কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে, তাহার উপায় তিনি আপনি করিয়া দেন; এ জন্য কোন কথা শুনিয়া ব্যস্ত বা উতলা হইয়া পড়া উচিত নয়। যিনি বলিলেন তিনি উপায় করিয়া দিবেন, এজন্য বিশ্বাস ও ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া থাক। তোমার ধৈর্য্য ও বিশ্বাস দেখিয়া তোমার পথ তিনি আপনি সহজ করিয়া দিবেন।

তুমি ও আমি এক গুরুর শিষ্য, ইহা একবার বলিয়াছি, এক গুরুর শিষ্যের এবার একটি প্রার্থনা শ্রবণ কর। দেখ, এক গুরুর শিষ্য হইলে, একটা মনে অন্ধ বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে হয় যখন আমরা দুজনে এক গুরুর কথা শুনিয়া চলিতেছি, তখন আমাদের কোন দিন অমিল হইবে না, আর আমাদের মধ্যে কেহ পথভ্রষ্ট হইব না, কেন না আমাদের দুজনেরই মধ্যে গুরুভক্তি প্রবল। এক জন সহযোগী শিষ্য আর এক জন সহযোগী শিষ্যের মর্ম্মচ্ছেদী বেদনা সেই দিন দেন, যে দিন এই বিশ্বাসের বিপরীত আচরণ তাঁহাতে প্রকাশ পায়। তুমি বলিবে, এরূপ বটা অন্ধ-বিশ্বাসের প্রতিফল। এরূপ বলিও না, এক গুরুর প্রতি ভক্তিবশতঃ যে হৃদয়ে সুকুমার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, সে হৃদয়ে বিষাক্তবাণ নিক্ষেপ করিও না। আইস, আমরা দুজনে চিরজীবন এক পরম গুরুর শিষ্য থাকিয়া বিশ্বাসব্রত পালন করি, ঈশ্বর এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

যেখানে এক গুরুর শিষ্য বলিয়া সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে, সেখানে এক জন আর এক জনের নিকটে সকল কথা কহিবেন, কিছু গোপন রাখিবেন না, পৃথিবীর বন্ধুতার হিসাব দেখিয়া, এইরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু আমি তোমায় বলিতেছি, আমি এরূপ মনে করি না। এক গুরুর শিষ্য হইলেও গুরু দুজনকেই সকল কথা কহেন না, প্রতিশিষ্য সম্বন্ধে যাহা সাধারণ তাহা সাধারণভাবে সকল শিষ্যকে বলেন, কিন্তু যাহার সম্বন্ধে যিটি বিশেষ, গোপনে তাহাকে তাহা বলিয়া থাকেন। গুরুর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস থাকিলে, ইহাতে ঈর্ষা উপস্থিত হয় না, কেন না যে শিষ্য সে কথা শুনিলেন না, তিনি বিশ্বাস করেন, এখন একথা শুনিলে তাঁহার কল্যাণ হইবে না, জীবনে কার্য্যকর হইবে না, এজন্য গুরু গোপনে অন্য শিষ্যকে তাহার জীবনের উপযোগী জানিয়া উহা বলিয়াছেন, আমার তাহা জানিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিবার কি প্রয়োজন? বল, আমি যাহা বলিলাম, তাহা ঠিক কি না? যদি ঠিক হয় তাহা হইলে তোমার আমার মধ্যে গুরুর বিশেষ কথা লইয়া কোন দিন মনোমালিন্য জন্মিবার সম্ভাবনা রহিল না। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বাড়িতে থাকুক। সংশয় সন্দেহ যেন কখন আমাদের মনে স্থান না পায়।

এসলাম ধর্ম্মে ত্রিবিধ দাতব্য বিধি।

মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে জকাত, সদকা, খয়রাত, এই ত্রিবিধ দাতব্যের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে এই ত্রিবিধ দাতব্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য। ন্যূনকল্পে আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্মপ্রচারার্থ দান করা জকাত, ঈশ্বরোদ্দেশে দুঃখী দরিদ্রদিগকে যাহা প্রদত্ত হয় তাহাকে সদকা বলে, কোনরূপ চিরকর কীর্ত্তি স্থাপন জন্য যাহা দান হয় তাহার নাম খয়রাত। হদিস শাস্ত্রে এই ত্রিবিধ দানের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বিবৃত। ধর্ম্মভীরু বিশ্বাসী মোসলমান-মাত্রেই উৎসাহ অনুরাগের সহিত এই ত্রিবিধদানে মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। ন্যূনকল্পে আয়ের ৪০ ভাগের ১ এক ভাগ ধর্ম্মপ্রচারার্থ নিয়মিতরূপে মাসিক বা বার্ষিক দানসম্বন্ধে অর্থাৎ জকাতসম্বন্ধে উদাহরণ এ স্থলে প্রদর্শন করিতে চাহি না। কেন না ইহা সাধারণ নিয়মিত দান, ইহাতে বিশেষত্ব নাই, এ বিষয়ের উদাহরণ অপ্রয়োজন। তবে ৪০৲ আয় হইলে ন্যূনকল্পে একটী টাকা ধর্ম্মপ্রচারার্থ দান করিতেই হইবে সহজ কথা নয়। ব্রাহ্মসমাজে কয়জন দাতা এমন আছেন যে, এরূপ দান করিতে সমর্থ? সদকা ও খয়রাত বিষয়ে ২। ৩ জন দাতার দৃষ্টান্ত এ স্থলে প্রদর্শন করিতেছি। এস্লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদের নিকটে এক সময়ে দুর্ভিক্ষনিপীড়িত একান্ত দুর্ব্বল ও দুরবস্থাপন্ন কতিপয় নর নারী সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া হজরত দয়ার্দ্র হইয়া আপন ধর্ম্মবন্ধুদিগকে বলেন, "কে অন্নবস্ত্র ও অর্থ দানে এই দুঃখী দুঃস্থদিগের দুঃখ দুরবস্থা মোচনে সহায়তা করিতে প্রস্তুত? তোমাদের মধ্যে যাঁহারা সমর্থ তাঁহারা ইহাদিগকে যথাশক্তি দান করিয়া পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করুন।" এই কথা শুনিয়া হজরতের সহচর ওমর নিজগৃহে দৌড়িয়া গিয়া অনেক ধন সম্পত্তি লইয়া আসিলেন। তখন হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওমর, নিজের পরিবার বর্গের ভরণ পোষণ জন্য কি রাখিয়াছ?" ওমর বলিলেন, "অর্দ্ধ সম্পত্তি তাহাদের জন্য রাখিয়াছি, অর্দ্ধ এই দীনদুঃখীদিগের সাহায্যার্থ আনয়ন করিয়াছি।" তখন হজরত বলিলেন, "ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।" অতঃপর অন্যতর সহচর আবুবেকর প্রচুর অন্ন বস্ত্র ও তৈজস পত্রাদি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হজরত মোহম্মদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিজের পরিবার বর্গের জন্য কি রাখিয়াছ?" তিনি উত্তর দান করিলেন, "তাহাদের জন্য পার্থিব সম্পত্তি কিছুই রাখি নাই। তৎসমুদায় এই দুঃখী কাঙ্গালদিগকে দান করিবার।

জন্য আনিয়াছি। স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্ত কেবল আল্লা ও রসুলকে অর্থাৎ পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে রাখিয়াছি।" হজরত এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার এই উদার দান ও বিশ্বাসের জন্য তাঁহাকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একদা নিদারুণ গ্রীষ্মকালে মদিনা নগরে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও অন্ন কষ্টের সময়ে প্রবল শত্রু সেনাবৃন্দকে বাধা দিবার জন্য তুরস্ক রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে হজরত মোহম্মদ সহস্র সৈন্য পাঠাইতে উদ্যত হইয়া মন্দিরের বেদীর উপর হইতে সাধারণের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন মহিলাগণ অর্থাভাবে আপনাদের প্রিয় বস্ত্রালঙ্কারাদি সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য উৎসাহের সহিত আনিয়া দেন। হজরতের সহচর ওস্মান সেই সঙ্কটের সময় তিন শত উষ্ট্র দান করিয়া সাহায্য করেন। হজরত মোহম্মদের সহচরদিগের মধ্যে ওস্মানই ধনসম্পত্তিশালী ছিলেন, তিনি মুক্তহস্তে অকাতরে আপন ধন দানও বিতরণ করিতেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ যখন মক্কা হইতে মদিনা নগরে আসিয়া স্থিতি করেন, তখন বিশুদ্ধপানীয় জলের অভাবে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। রোমা নামক ইঁদারার জল ভিন্ন সেই সময়ে সুরস নির্ম্মল জল মদিনায় ছিল না। উক্ত কূপের জল তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়াছিল। ওস্মান ন্যূনাধিক বার সহস্র মুদ্রামূল্যে হজরত ও তাঁহার পরিবার এবং বন্ধুবর্গের পানীয় জলের জন্য সেই রোমা ইঁদারা ক্রয় করেন তাহাতে তাঁহাদের জলকষ্ট নিবারিত হয়, কিন্তু ওস্মান নিজে বিস্বাদ লবণাক্ত জল পান করিতেন। মদিনাস্থ মন্দিরে উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান হইয়া উঠিতেছিল না। মন্দিরের পার্শ্বস্থ ভূমি ক্রয় করিয়া মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধিপূর্ব্বক উপাসকদিগের ক্লেশ নিবারণ করা ওস্মান আবশ্যক বোধ করেন। তিনি এ কার্য্যসম্পাদনার্থ সত্বর হইয়া স্বয়ং ৭ কি ৮ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আর কাহাকেও দ্বারে২ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় নাই। এক্ষণও অন্যদীয় সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া এক এক জন মোসলমান সাধারণের ঈশ্বরোপাসনার্থ বড় বড় মসজেদ নির্ম্মাণ করিতেছেন। কলিকাতা মোসলমানপ্রধান নগর নয়, তথাপি এই নগরের প্রায় প্রত্যেক দেশীয় পল্লীতে অন্ততঃ ২।১টি বহুব্যয়সাধ্য মোহম্মদীয় ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে ৫ শত টাকা ব্যয়ে এ দেশের কোন নগরে একটি ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইলে ভিক্ষার ঝুলি হস্তে করিয়া নগরে২ গ্রামে২ গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে পাঁচ বৎসর ভিক্ষা করিয়াও সেই টাকা তোলা যায় না। এক টাকা বা আট আনা অনেকে স্বাক্ষর করিয়া পরে আর তাহা দিতে চাহেন না। এইতো ব্রাহ্মদিগের খয়রাত ও বদান্যতা! আমরা মোসলমানদিগকে ভোগী, বিলাসী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি; কিন্তু এক এক জন মোসলমানের খয়রাত দেখিলে নিজদিগকে ধিক্কার দিতে হয়। অতিথিশালা স্থাপন ও সরোবর খনন ইত্যাদি কার্য্যে ধনসম্পন্ন বিশ্বাসী মোসলমানদিগকে প্রমুক্ত হৃদয় ও প্রমুক্তহস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা স্বীকার করি, ব্রাহ্মগণ তাদৃশ ধনসম্পত্তিশালী নহেন, কিন্তু নিজেদের অবস্থানুরূপ ধর্ম্মার্থ জনহিতার্থ নিয়মিত দান গৃহস্থ ব্রাহ্ম করিবেন না, এ কেমন কথা? তাহা হইলে তাঁহারা কি সদ্দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে রাখিয়া যাইবেন, তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম কিরূপে তবে গৌরবান্বিত হইবে? অন্ততঃ দুই চারি আনার পয়সাও নিয়মিতরূপে ঈশ্বরোদ্দেশে নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা দান করিতে অপারগ, ২।৪ টাকা সময়ে সময়ে খয়রাত করিতে অসমর্থ, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ইহা নিজেদের ভোগ বিলাস খর্ব্ব না করিয়াও পারা যায়। কোন ব্রহ্মের যদি সদ্বিষয়ে হৃদয়হীনতা কৃপণতা নীচ সঙ্কীর্ণতা সাংসারিকতা দেখা যায়, মন বড়ই ব্যথিত হয়। তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের অবনতি ও পবিত্র ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগশূন্যতাই প্রকাশ পায়। অসাধারণ ধর্ম্মের আশ্রিত হইয়া জীবনে কার্য্যতঃ অসাধারণত্ব প্রকাশ না পাইলে কেবল বাক্যে অসাধারণ হইলে কোন ফল হয় না। এ সকল বিষয়ে কি আমরা সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মাবলম্বিদিগের নিকটে পরাস্ত হইব? সকল ব্রাহ্মবন্ধু আমাদের এ কথার লক্ষ্য নহেন। বিশ্বাসী হৃদয়বান্ আত্মত্যাগী বদান্য লোক যে, ব্রাহ্মসমাজে একেবারে নাই ইহা আমরা বলি না। আছেন, কিন্তু একান্ত অল্প, তাঁহারা আমাদের নমস্য। কোন বিধানের নব অভ্যুদয়ের সময়ে সেই বিধানাশ্রিত ও ধর্ম্মাশ্রিত অধিকাংশ লোকের ভোগপরায়ণতা ও নির্জ্জীবতা নিষ্ক্রিয়তা দেখিলে মন বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। উপধর্ম্মাবলম্বী এক এক জন ধনবান্ জৈন অকাতরে পঞ্চাশ সহস্র বা লক্ষ দুই লক্ষ টাকা জৈনমন্দির নির্ম্মাণার্থ এবং অতিথিশালাস্থাপনার্থ দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজেদের ভোজন পরিচ্ছদাদিতে অতি সামান্য ভাবে চলেন। আমাদের তাহার ঠিক বিপরীত অবস্থা, ভোজনপরিচ্ছদাদিতে ব্যয় বাহুল্য ও আড়ম্বর; সৎকার্য্যে আর কিছুতেই হস্তপ্রসারিত হয় না। জৈনদিগের ১ লক্ষ টাকা দান স্থলে সামান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মের ১০৲টি টাকা ধর্ম্মার্থ দানও কি যুক্তিযুক্ত নয়? ধর্ম্মার্থদানবিষয়ে হিন্দুদিগের অপেক্ষা ব্রাহ্মগণ কি নিকৃষ্ট নহেন?

আত্মার আহার ও পানীয়।

৩০এ ফাল্গুন ১৮১৯ শক

আমরা প্রতি রবিবার এখানে কেন সমাগত হই? কি উদ্দেশ্যে আমাদের একত্র সম্মিলন? উপাসনা দ্বারা জীবনে কি লাভ হয়? কত লোক রহিয়াছে, যাহারা উপাসনা করে না। আমাদের প্রাণ কেন উপাসনার জন্য ব্যাকুল? এই কথার উত্তর কে দিবে? কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে, ভগবানের কোন্ বিশেষ কৃপাযোগে আত্মাতে উপাসনার ভাব ও বীজ অঙ্কুরিত হইল, কি শুভযোগে আত্মা উপাসনার ভাবে ভাবুক হইল, প্রাণ মন কেন উপাসনার জন্য শত

কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তুত হয়, আমরা বা[illegible]কই জানি না। আমরা জানি মনুষ্যের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে[illegible]াহার প্রেরণাতে তাহারা অন্নজল গ্রহণ করে। ক্ষুধা তৃষ্ণার অর্থ এই যে, শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অভাব পূরণার্থ যাহা চাহে, প্রকৃতি তাহা আহরণে আমাদিগকে ব্যস্ত করে। যখন জলের প্রয়োজন তখন জল পানের জন্য, এবং যখন শরীরের ক্ষয় হয় তখন সেই ক্ষতি পূরণার্থ আহারের জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হয়। শরীরের সম্বন্ধে এই ক্ষুধাতৃষ্ণাতত্ত্ব আমরা কতকটা অবগত হইয়াছি। কিন্তু আত্মা কেন এই প্রকার কিছু চাহে? শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, অন্ন জলের দ্বারা তাহা পূর্ণ হয়। কিন্তু আত্মারও যে ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে ইহা কিরূপে বুঝিব? ক্ষুধার সময় শরীর যেমন অন্ন গ্রহণ করিয়া নিজ অভাব পূর্ণ করে, তেমন আত্মাও এমন কোন বস্তু চাহে যাহা গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারে। আত্মার এই আহার কি? উপাসনা, ঈশ্বরের নাম গ্রহণ আত্মার ক্ষুধার অন্ন, ভগবৎকৃপা সম্ভোগ এবং পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ, আত্মার তৃষ্ণানিবারণকারী উৎকৃষ্ট পানীয়। আমরা ২।৩ ঘণ্টা উপাসনা করি, উপাসনা যোগে কিছু পাওয়া না গেলে এত ক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। উপাসনাযোগে কিছু কিছু আহার করি, তাহাতেই এত ক্ষণ থাকা যায়। আহার ও পানীয়ের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকিলে যেমন অনেকক্ষণ বসিয়া আহার পান করা যায়, উপাসনাতে যত প্রগাঢ় যোগ হয় আত্মা ততই ব্রহ্মের প্রেমামৃত অবিচলিত ভাবে দীর্ঘকাল পান করে। উপাসনাই বাস্তবিক আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণানিবারক উপাদেয় অন্ন ও পানীয়। আত্মা শিশু হইয়া পরমমাতার স্তন্য পান করে, ইহাই তাহার উপাসনা। উপাসনাযোগে জ্ঞানের অভাব, পুণ্যের অভাব যত অনুভব করা যায়, ততই উপাসনা ঘনীভূত হয়। ক্ষুধার তীব্রতা অনুসারে যেমন আহার্য্য বস্তু সুমিষ্ট হয় এবং অধিক আহার্য্য গ্রহণ করা যায়, তৃষ্ণার তীব্রতা অনুসারে পানীয় বস্তু যেমন অত্যন্ত প্রিয়তর হয়, তেমনি যতই জ্ঞানের অভাব, ভক্তির অভাব, পুণ্যের অভাব অনুভূত হইবে, উপাসনা সেই পরিমাণে তৃপ্তিকর হইবে। পক্ষান্তরে ক্ষুধামন্দ হইলে যেমন আহারে রুচি হয় না, অনাহার পর্য্যাপ্ত মনে হয়, তেমনি আত্মা যে দিন কুভাবে ক্লিষ্ট, পাপে রুগ্ন, সে দিন উপাসনাও ভাল হয় না। রোগের সময় অন্নগ্রহণ করিতে শরীর যেমন অভিলাষ করে না, পাপে রুগ্ন আত্মা তেমনিই উপাসনাতে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয় না, সুতরাং উপাসনাবিমুখ হয়। যখন উপাসনার জন্য ব্যাকুলতা থাকে না, তখন উপাসনাবিরতদিগের মনে তদ্বিরুদ্ধে নানা বিতর্ক উপস্থিত হয়। মনে হয় সূর্য্য যখন উত্তাপ দান করিতেছে, চন্দ্র যখন স্নিগ্ধ আলোক দ্বারা প্রাণকে সুখী করিতেছে, সুশীতল বায়ু যখন সমস্ত জ্বালা নিবারণ করিয়া শরীর শীতল করিতেছে, জল তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে, প্রকৃতি আবশ্যক অনুসারে সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতেছে, তখন উপাসনার আর প্রয়োজন কি? যাহারা অতি দুর্ব্বল, যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই অন্যের সাহায্য গ্রহণ করে, তাহারাই উপাসনার জন্য ব্যস্ত হয়, আমরা নিজ শক্তিতে আপনাকে রক্ষা করিতেছি, আমরা কেন উপাসনা করিব? উপাসনার জন্য ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা হয় না, আমরা কেন উপাসনা করিব? সেই দাতার হস্ত হইতে প্রতিদিন প্রসাদ আসিতেছে ও আসিবেই, এ জন্য উপাসনার প্রয়োজন কি? এইরূপে যাহারা বিষয়বাসনাতে আচ্ছন্ন হইয়া বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা হারাইয়া ফেলে তাহাদের আত্মার উপাসনাতৃষ্ণা প্রকাশ পায় না, তাহারা আত্মার ক্ষুধা বুঝিতে পারে না; উপাসনার আবশ্যকতা বিস্মৃত হয়। কিন্তু আমাদের ক্ষুধা আছে, এই জন্য আমরা প্রতি দিন উপাসনার্থ ব্যাকুল হই। কোন্ শিশু সর্ব্বদা মাতৃস্তন্যপানে প্রয়াসী নহে? শিশু জননীর স্তন্যসুধা পান করে, তাহাতে তাহার কলেবর বৃদ্ধি হয়। আমরা তেমনি উপাসনাযোগে ঈশ্বর হইতে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দ লাভ করিয়া আত্মার কলেবর বৃদ্ধি করি।

এখানে গ্রহণই কেবল বিধি নহে, ত্যাগেরও বিধি আছে। গ্রহণ ও ত্যাগ এই দুইটী যুগপৎ কার্য্যকারী হয়। উৎকৃষ্ট বস্তু সমস্ত গ্রহণ করিতে হয় এবং অসার বস্তু পরিত্যাগ করিতে হয়। ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা এক দিকে জ্ঞান, প্রেম পুণ্য শান্তি লাভ করিব, অন্যদিকে অজ্ঞানতা, পাপ, কু ভাব, কু অভ্যাস সমস্ত পরিত্যাগ করি। পাপ ও বিষয়তৃষ্ণা যত কমিবে ততই উপাসনার জন্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও শান্তি লাভ করিবার জন্য আত্মা অধিকতর ক্ষুধিত হইবে। শরীরসম্বন্ধে যেমন অনেক সময় অনাহার করিতে হয় এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি ও উদরস্থ অসার বস্তু বাহির করিবার জন্য বিবিধ উপায় গ্রহণ করিতে হয়, আত্মার সম্বন্ধেও অনেক সময় তাহা করিতে হয়। এই প্রকার বিধিগ্রহণব্যতীত নিজের এবং অন্যের উপাসনাতে যোগ দান করা সুবিধাজনক হয় না। ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি সর্ব্বদা পূর্ণ ভাবে এবং অপরিমিতরূপে আসিতেছে। আমাদের দুর্ব্বল আত্মা যে ইহা সর্ব্বদা পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে তাহা নহে। মাতৃস্তনে যখন দুগ্ধের আধিক্য হয়, তখন শিশু তাহা সম্যক্ পান করিতে পারে না, কতক পরিত্যাগ করিতে হয়। তেমনি অনন্তের প্রেম পুণ্য আনন্দ শান্তি আমরা সম্পূর্ণ আত্মস্থ করিতে পারি না। কিছু গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ গ্রহণে বিরত থাকিতে হয়। আমাদের প্রয়োজন অপেক্ষা ঈশ্বরের দান অধিক, সুতরাং তাহা একেবারে গ্রহণ না করিয়া ক্রমে ক্রমে আত্মাতে গ্রহণ করিতে হয়।

উপাসনার অধিকারভেদ লইয়া অনেকে নানা তর্কে উপস্থিত হন। কে উপাসনা করিতে সমর্থ, কে সমর্থ নহে, এই বিচার করা বিড়ম্বনা। আহারসম্বন্ধে যেমন শারীরিক অবস্থার সঙ্গে আহার্য্য বস্তুর পরিমাণের তারতম্য আছে, কিন্তু অনাহারে থাকা কাহারও প্রতি ব্যবস্থা নহে, তেমনি উপাসনাতে সকলের অধিকার আছে এবং সকলের উপাসনার আবশ্যক আছে। উপযুক্ততা ও ক্ষুধা অনুসারে প্রত্যেকে উপাসনাযোগে আত্মার আহার লাভ করেন। যাহার যেমন দরকার তেমনি তাহার লাভ হয়। আমাদের ব্যবস্থাতে ভুল হইতে পারে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে কখনও ভুল হয় না।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন; শরীর যাহা চাহে তাহা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা শরীর রক্ষা হইবে না। আত্মাও যাহা চাহে তাহা তাহাকে না দিলে আত্মা বাঁচিবে কেন? আত্মার আকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মের প্রেম পুণ্য শান্তি সম্ভোগ। এই জন্য নির্জ্জনে বার বার ব্রহ্মের নিকট যাইতে হইবে। একাকী নির্জ্জনে ব্রহ্মের প্রেম সম্ভোগ যেমন আবশ্যক, সমবিশ্বাসিগণের সমবেত ব্রহ্মপূজা ব্রহ্মারাধনাতেও তেমনি প্রয়োজন আছে। একাকী ভোজন সর্ব্বদা তৃপ্তিকর নহে, এই জন্য যেমন ভোজের ব্যবস্থা; সকল সমধর্ম্মাবলম্বিগণ মিলিত হইয়া ব্রহ্মপূজাভোজে নিযুক্ত হইবারও তেমনি ব্যবস্থা আছে। উৎসবাদিতে ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে মহাভোজে নিমন্ত্রণ করেন। এই সময় অনন্তের অনন্ত জ্ঞান প্রেম, পুণ্য শান্তি আনন্দ প্রকাশিত হয়। এই সমস্তই যে আমরা গ্রহণ করিতে পারি তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইল। অতএব ভোজেরও প্রয়োজন আছে, এবং শাকান্নেরও প্রয়োজন আছে। সকলে একত্র হইয়া ব্রহ্মপূজা করিবে, আবার একাকী অসঙ্গ হইয়া নির্জ্জনে ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিবে। শরীর রক্ষার জন্য যেমন অন্নজলের প্রয়োজন, আত্মার জীবন রক্ষা করিবার জন্য তেমনি উপাসনা ও নির্জ্জনে ব্রহ্মযোগ অত্যন্ত আবশ্যক। উপযুক্ত আহার পাইলে শরীর যেমন সুন্দর শ্রীসম্পন্ন হয়, রীতিমত উপাসনা ও ব্রহ্মযোগ পাইলে আত্মা তেমনি পরম সুন্দর অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। উপাসনা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। উপাসনা ভিন্ন আনন্দ নাই, শান্তি নাই, আরাম নাই। উপাসনা ব্যতীত আত্মার রোগ যায় না, পাপ যায় না, মৃত্যু ভয় যায় না। উপাসনার অভাবে ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মসহবাস ও মুক্তি লাভ হয় না। উপাসনশীল আত্মা অসীমশক্তিসম্পন্ন, উপাসনাবিবর্জ্জিত আত্মা অতি দুর্ব্বল, নিতান্ত ভয়াকুল এবং মৃত্যুর কবলস্থ। অতএব উপাসনা আমাদের অতি প্রয়োজনীয়। কোন অবস্থাতে উপাসনা পরিত্যাগ করা যায় না। কৃপানিধান পরমেশ্বর এই উপাসনাতে আমাদিগকে বিশেষ অনুরাগী করুন। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু বলিয়া এই উপাসনা আশ্রয় করি।

হে কৃপাময়, তোমার উপাসনা বন্দনার ন্যায় আর কি শ্রেষ্ঠ কার্য্য আছে বল? এমন শান্তিময়, এমন আনন্দময় আরতো কিছু দেখি না। কিন্তু যদি অনুরাগ না থাকে, যদি প্রেমভক্তি না থাকে, তবে কেন উপাসনা ভাল হইবে? তোমার জন্য আত্মাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবতঃ রহিয়াছে। বিবিধ পাপরোগে আমরা এই ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝিতে পারি না। দয়াময় পিতা, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা ব্যাকুল অন্তরে সর্ব্বদা তোমার পূজা করিতে পারি; নির্জ্জনে তোমার প্রেম পাইয়া মুগ্ধ হই; সমবিশ্বাসী ভাই ভগিনীর সঙ্গে মিলিত হইয়াও তোমার প্রেমামৃত পান করি। উপাসনা ভিন্ন, এক তোমাতে একান্তচিত্ত হওয়া ভিন্ন, আমাদের অন্য গতি নাই। হে পিতা, তাই আমরাও ভিক্ষা করি, উপাসনাযোগে তোমার প্রেম পুণ্য শান্তি আনন্দ পাইয়া যাহাতে আমরা চিরসুখী হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

উপাসনাশ্রম।

দেহশুদ্ধি।

২৬ পৌষ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

এদেশের ভক্তগণের মত এই, যাঁহারা সাধু তাঁহাদের তনু শুদ্ধসত্ত্ব। কবীর, নানক চৈতন্য প্রভৃতির তনু ভাগবতী তনু, সে তনুতে অশুদ্ধতার সংস্রব নাই। অশুদ্ধ দেহে বিশুদ্ধ মন, বিশুদ্ধ আত্মা বাস করিবে কি প্রকারে? কেহ যদি মনে করেন, সাধুগণ শরীরকে অবজ্ঞা করিতেন, শরীরের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় অযত্ন ছিল, তাহা হইলে তাঁহাদের ভুল। তাঁহারা দেহের প্রতি অযত্ন করিতেন না, দেহকে শাসন করিতেন, ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতেন। দেহশুদ্ধি মনঃশুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের যত্নের বিষয় ছিল। ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিষয় হইতে দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করাতে তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না, বরং বিশেষ যত্নই প্রকাশ পায়। দেহ যদি অবিশুদ্ধ হয়, অবিশুদ্ধ বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকে, তবে উহা আত্মবিনাশের পথে চলিতেছে, ইহা কি আমরা জানি না? শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের শাসনে প্রবৃত্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন, সাধুগণ ইহাদের প্রতি বড়ই অযত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত যত্ন কি বোঝেন না। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের শুদ্ধিতে কেবল তাহাদের হিত সাধিত হয় তাহা নহে, সমগ্র ধর্ম্মজীবন সহ দেহশুদ্ধির নিতান্ত ঘনিষ্ঠ যোগ। ধর্ম্মসাধনে বিশ্বাস ও প্রেমের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আগে শুদ্ধির আবশ্যক। চরিত্র যদি মন্দ হয়, সকল প্রকারের নীচ কামনা আসিয়া মনকে অধিকার করে; বিশ্বাস ও প্রেমের অবকাশ থাকে কোথায়? কত লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিল, কতক দিন থাকিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু যখন চলিয়া গেল তখন কি জন্য চলিয়া গেল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, চরিত্রের দোষে সেই সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যেখানেই দেখি কোন এক ব্যক্তি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা, অমনি বুঝিয়া লই, তাঁহার চরিত্রে গোল পড়িয়াছে, তাঁহার দেহশুদ্ধি হয় নাই, দেহের অশুদ্ধি তাঁহার ধর্ম্মত্যাগের কারণ।

ফলতঃ শরীরকে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। যদি শরীরের মালিন্য না যায়, ধর্ম্মরাজ্যে স্থিরপদ লাভ করিতে পারা যায় না। পুণ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিলাষ থাকিলে দেহ শুদ্ধ করা উচিত। পুণ্য না আসিলে প্রেম আসে না, প্রেম না আসিলে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। দৈহিক প্রবৃত্তি স্বার্থ উৎপাদন করে, স্বার্থ প্রেমের পথ অবরোধ করিয়া বসে। প্রেমের পথ অবরুদ্ধ হইলে পুণ্যেরও পথ অবরুদ্ধ হয়, কেন না ভগবানে স্বরূপ সমুদায় যেমন এক অভিন্ন, আমাদিগেতেও উহারা তেমনি। কোনটিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনটি

আমাদের জীবনে প্রকাশ পায় না। প্রেম ও পুণ্যের কত ঘনিষ্ঠ যোগ পুণ্যের স্বরূপ কি, ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি। প্রেম আমাদিগকে যাহা করিতে বলে, তৎপ্রতি বিশ্বাসঘাতক না হইলে, প্রেমের নিয়ম সকল পালন করিলে,আমাদিগেতে পুণ্য উপস্থিত হয়। প্রেম দেখিতে অধীনতা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহা অধীনতা নয়, আত্মস্বরূপের প্রতি বিশ্বস্ততা। প্রেমের আত্মস্বরূপ কি? পুণ্য, শুদ্ধতা, অবিমিশ্রভাব। প্রেমের সহিত মলিন বাসনার কোন সংস্রব নাই, উহা শুদ্ধ নির্ম্মল। প্রেমের অবিমিশ্র ভাব যতই মানবে সংক্রামিত হয়, ততই উহাতে শুদ্ধতা, নির্ম্মলতা, পুণ্য বাড়িতে থাকে। প্রেমজনিত বিশ্বস্ততাতে আপনার বলিবার আর কিছুই থাকিল না, প্রেমিক একেবারে ভগবানের হইয়া গেলেন, যাই তিনি ভগবানের হইলেন অমনি তাঁহাতে প্রেমপুণ্যের আবির্ভাব হইল। ভগবান্ কেবল বলিতেছেন, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন কর। প্রেমিক যে পরিমাণে এই কথা শুনিয়া চলিতেছেন, তত পুণ্যের পর পুণ্য, প্রেমের প্রেম তাঁহাতে উদিত হইতেছে। ক্রমে তিনি একেবারে অনন্ত প্রেম পুণ্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেন। যখন দেখিতে পাই, পরের জন্য শোণিত পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে পারি, তখনই প্রেমপুণ্যের অবির্ভাব হৃদয়ে স্পষ্ট অনুভব করি। বিশ্বাস, প্রেম, পুণ্য, এ তিন এক সূত্রে গাঁথা। যাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহার প্রতি আমাদের কি কখন প্রেম হয়? বিশুদ্ধ প্রেম বিনা পুণ্যই বা কি প্রকারে সম্ভবে? দেহ যদি এ তিনের ধারণের যোগ্য না হয়, তবে ধর্ম্মসাধন হইবে কি প্রকারে? যে দেহের ভিতরে আত্মার সমুদায় সদ্গুণ প্রকাশ পাইবে, সে যদি বিরোধী হয়, তাহা হইলে সে সমুদায়ের প্রকাশের অবকাশ কোথায়?

দেহ অবিরোধী হয় কখন? যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা দেহতারে আসিয়া বাজে, তখন দেহ হইতে সুতান বাহির হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়, সমগ্র দেহ শুদ্ধ হয়, মন আর কলুষিত বাসনায় দূষিত হয় না। চক্ষু যদি সমুদায় পদার্থ পবিত্র ভাবে দেখে, কর্ণ যদি পবিত্র ভাবে শ্রবণ করে, রসনা যদি অসত্য উচ্চারণ না করে, ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তনে আপনাকে নিরন্তর নিযুক্ত রাখে, নিষিদ্ধ বস্তুর রসাস্বাদে নিবৃত্ত থাকে, হস্তাদি লোভবশতঃ ধনাদি স্পর্শ না করে, পদ অসৎ সঙ্গস্থলে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে কায়শুদ্ধি সিদ্ধ হইল। দেহের প্রীতি নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রীতি যেখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেখানে সকল প্রকারের স্বার্থের গন্ধ তিরোহিত হইয়াছে, সংসারের সকল বস্তু পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। যে তনু সম্যক্ ভগবানের ইচ্ছাধীন, সেই তনু ভাগবতী তনু। ভক্তগণ মহাজনগণ যদি ঈদৃশ বস্তু লাভ না করিতেন, তাহা হইলে পরের জন্য উহা কখনই উৎসর্গ করিতে পারিতেন না। আমরা অভক্ত, আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র, আমাদের ভাগবতী তনুতে কি প্রয়োজন, ইহা বলিয়া দেহশুদ্ধি হইতে আমারা বিরত থাকিতে পারি না। আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের ইচ্ছাধীন হইব, ইহা আমাদের ওতো জীবনের নিয়তি। কি প্রকারে আমরা ঈশ্বরের হইব, তাহাই নিজ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভক্ত মহাজনগণ দেখাইয়াছেন, যদি সে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মত না হই, তাহা হইলে তাঁহাদের আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? ভগবান্ স্বয়ং যদি এই দেহযন্ত্রে বিরাজমান থাকিয়া, ইহাকে চালিত না করেন, তাহা হইলে উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে, সামান্য ধর্ম্মসাধনই হইবে না। তাই আমরা সাধনার্থিগণ এই প্রার্থনা করি যে, দেহ শুদ্ধ করিয়া যেন আমরা মনকে উন্নত করিতে পারি, আমাদের আত্মাকে সাধু মহাজনগণের আত্মার মত সর্ব্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত করিতে পারি; পরমদেব পরমেশ্বর আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সংবাদ।

শোকের পর শোক। বিগত ২৪শে জুলাই রাত্রি ২টার সময় ভাগলপুরে শ্রীমান্ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ২৫বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুমোহন, ৩৬ দিন নানা প্রকার রোগ যন্ত্রণা কষ্ট পাইয়া শান্তিদায়িনী জননীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিন মাসের মধ্যে স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারে তিনটি বিষম শোকের ব্যাপার ঘটিল। জানি না এই সকল ঘটনার মধ্যে বিধাতার কি গূঢ় অভিপ্রায় আছে। যিনি এই সকল ঘটনার প্রেরয়িতা, তিনি তাঁহার শোকদগ্ধ সন্তানগণের হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত একহৃদয় হইয়া শোক দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ভাই দীননাথ মজুমদার এক মাসের অধিক কাল এই পরিবার মধ্যে থাকিয়া বিধিমতে সেবা, উপাসনা ও উপদেশ দ্বারায় তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছেন।

আমাদের পরম উপকারী বন্ধুবর কাশীপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়গত ১৭ই জুলাই রবিবার বেলা ১১টার সময় তাঁহার একবৎসরের প্রিয়তমা কন্যা শ্রীমতী সুরমাকে ইহলোকসম্বন্ধে হারাইয়াছেন। তাহার কল্যাণ উদ্দেশে ২৪শে জুলাই তারিখে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হইয়াছিল, শোকসন্তাপহারিণী জননী ঈশ্বরনিষ্ঠ পরিবারে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অল্প দিন হইল পাহাড় হইতে কলিকাতায় আসিয়া নববিধান সমাজের সামাজিক উপাসনার কার্য্যভার পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন। ৪৫ নং বেনেটোলার বাড়িতে এখন সন্ধ্যা ৭ সাতটার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে।

অমরাগড়ীর শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ও শ্রীমান্ অখিল চন্দ্র রায়, যথাবিধি প্রচারব্রত গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীদরবারে আবেদন পাঠাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয় ভাষ্য সংস্কৃত এবং বাঙ্গালায় তিন তিন ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। প্রত্যেকের আরও ৫ ফর্ম্মা করিয়া ছাপা হইলেই গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হইবে। আশা করা যায় শীঘ্রই সকলে পাইতে পারিবেন।

নববিধান প্রচার ভাণ্ডারের ১৮৯৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাৎসরিক আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত ফণ্ড	১৭॥০
ঐ ভুবনমোহন ঘোষ ফণ্ড	৮৸০
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্ত ফণ্ড	৫০৲
মাসিক দান	৭২৩৸৶৫
এককালীন দান	৫৫০৲
শুভকর্ম্মের দান	১১৫৴
আনুষ্ঠানিক দান	১৪৫॥০
বিশেষ ভিক্ষা	১৯৶
উৎসবে	২৫৯৻৫
পাথেয়	৩৫১৸০
দাতব্য	২০৲
ক্ষুদ্র আয়	১৭৷৶০
পুস্তক বিক্রয়	৩৪০॥৶৫
ধর্ম্মতত্ত্ব	৬৮৮৸৶০
মহিলা	৪১৩৴০
ছাত্রাবাস	১০৭৬৶১৫
ভিক্টোরিয়া কলেজ	৭৫০।১৫
বাটীভাড়া	১২০৲
শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায়	৫৮৲
অপরের গচ্ছিত	৩৪৫৶১০
* হাওলাৎ	৬০০॥১৫
মোট	৬৬৭১৶১০

ব্যয়

উপজীবিকা	২০৯১।৶
বস্ত্রখরিদ	১০০।৴১০
বিনামা	৫৷০
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	৭৭৻১৫
ঔষধপথ্য	৭৫৸৶১০
বস্ত্রধোলাই	১৬৲
ভিক্টোরিয়াকলেজ	৯৮১৸৶০
উৎসবে	৪৩৮০
পাথেয়	৩৫৮৸৶৫
ক্ষুদ্রব্যয় (নববৃন্দাবননাটক প্রভৃতি)	১৭৩৸৶১৫
দাতব্য	৬৮৶৫
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন — কাগজ ৮৬।১৫, ছাপাখানা ৫০৲, পুস্তক বাঁধাই ৩৪৲	১৭০।১৫
কর্ম্মচারীর বেতন, পাচক, বেহারা, দপ্তরী প্রভৃতি	২৬০॥৶০
মিউনিসিপাল ট্যাক্স্	২৯॥৶১০
বাটী ভাড়া	৯৮৯৲
ধর্ম্মতত্ত্ব— কাগজ ও ডাকমাসুল ১৮৬॥১৫, ছাপাখানা ২৮৪৲	৪৭০॥১৫
মহিলা— কাগজ মাসুল ও ছাপাখানা	৩৪০।১০
উপাসনা ভৃতিতে যাতায়াতের গাড়িভাড়া	১৪৶০
তৈজস ৎ বদ	১৸৶০
বাটী মেরামত	৭৲
মোট	৬৬৭১৶১০

* দুর্ভিক্ষ জন্য দ্রব্যাদির মূল্য অনেক বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যয় সংখ্যা অধিক হইয়াছে, অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা পুস্তক বিক্রয় অতি সামান্য পরিমাণে হইয়াছে ইহার কারণও দুর্ভিক্ষ বলিতে হইবে। পরিবারের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং তাঁহাদের ভরণ পোষণব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ আয় বৃদ্ধি হয় নাই। এই সকল কারণেই অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ঋণ কিছু বেশী হইয়াছে। প্রতিবৎসরই নূতন পুস্তক ছাপা হইয়া (Stock) স্থিতি বৃদ্ধি হইতেছে। অনেকের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব, মহিলা এবং পুস্তকের মূল্য বাকি আছে। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উহা পাঠাইলে এবং আহারীয় দ্রব্যের মূল্য স্বল্প হইলে অধিক পরিমাণে পুস্তক বিক্রয় করিয়া বর্ত্তমান ঋণ অনেক শোধ দেওয়া যাইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়।

এই বৎসর ইংরাজী কাগজের (ইউনিটিও ও মিনিষ্টারের) মোট ৮৪৬৷৶১০ ব্যয় হইয়াছে ঐ হিসাবে ১৬২৲ টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ গ্রাহক ঐ বৎসরের মূল্য না দেওয়ায় ঐ হিসাবে ৬৮৪।৶১০ ঋণ হইয়াছে। এই নামে অপর এক খানি কাগজ বাহির হওয়াতেই এই গোলযোগ ঘটিয়াছিল।

প্রকাশক—শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

এই পত্রিকা ৩ নং রমানাথমজুমদারের ষ্ট্রীট্, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক, ১৬ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REGISTERED No C. 37

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৩৩ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দেব, আমরা প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধে যখন প্রবৃত্ত হই, তখন মনে করি, আমাদের বিরোধ তাঁহাদিগেরই সঙ্গে, তোমার সঙ্গে নহে। তাঁহারা আমাদের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছেন, অথবা কোন প্রকার অনিষ্ট করিয়াছেন, তাই আমরা তাঁহাদিগের সহিত কলহ করিতেছি। যদি কলহের কারণ আমাদের আপনার ভিতরে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কি কখন কলহে প্রবৃত্ত হইতাম? আমাদের কোন প্রবল বাসনার তাঁহারা অন্তরায় হইয়াছেন, তৎপূরণে বিঘ্ন জন্মাইয়াছেন, তাই তাঁহাদের প্রতি আমাদের ক্রোধ উপস্থিত। যখন আরও একটু তলাইয়া বুঝি তখন দেখি, এ আর কাহারও সঙ্গে বিবাদ নয়, তোমারই সঙ্গে বিবাদ। আমাদের প্রত্যেক বাসনাবিকার তোমার ইচ্ছার বিরোধী। তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যদি এইরূপে আমাদের ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহা হইলে এ বিরোধে প্রতিবেশীও কেহ নন, আমাদের বাসনাবিকারও কিছু নয়, আমরাই তোমার বিরোধী। বাসনাবিকারের যখন আমরা অধীন হইয়া পড়িয়াছি, উহার দাস হইয়াছি, আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়াছি, তখন উহার নিকটে আমাদের স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া আমরা তোমার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছি ইহা বলিতেই হইবে, কেন না বাসনার সাধ্য কি আমাদিগকে দাস করে, যদি না আমরা নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার দাসত্ব স্বীকার করি। হে প্রভো, এইরূপে তোমার বিরুদ্ধাচারী হইয়া আমরা কত কাল পাপজীবন কাটাইব? যে সকল বাসনাবিকার হইতে পাপ হয়, তোমার পুণ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়, তাহা যদি আমাদের জীবনে চির দিন থাকে, তাহা হইলে তোমার আশ্রিত সন্তানদিগের পাপকলুষনিবারণ হয়, তাহারা মুক্তিলাভ করে, একথা সত্য হইল কোথায়? শক্তির সহিত অশক্তির, জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানতার, প্রেমের সহিত অপ্রেমের, পুণ্যের সহিত পাপের, আনন্দের সহিত বিষাদের সংগ্রাম চলিতেছে, ইহা নিয়ত দেখিতে পাই, ইহার নিবৃত্তি হইবে না, ক্রমান্বয়ে চলিবে, এই কথায় কি, নাথ, বিশ্বাস করিব? এ সংগ্রামে আমাদের পরাজয়, তোমার জয়, ইহা আমাদের পক্ষে অতীব শুভ সংবাদ। তোমার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ও আনন্দ যদি আমাদের উপরে নিত্য জয়লাভ না করিত, তাহা হইলে আমাদের কি না দুর্দ্দশাই হইত! আমরা অশক্তি, অজ্ঞানতা ও পাপনিবন্ধন রিপুগণের বশীভূত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু

তুমি আমাদিগকে পরাজিত কর, আর দেখি, সেই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে বলের সঞ্চার হয়, জ্ঞানালোকে হৃদয় পূর্ণ হয়, স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন হইয়া প্রেম উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে, হৃদয়ে পুণ্যের সমীরণ বহিতে থাকে, শান্তি আনন্দে চিত্ত উৎফুল্ল হয়। হে কৃপাসিন্ধু, সংগ্রাম যদি নব নব শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দলাভের একটি প্রণালী হয়, তাহা হইলে সংগ্রামে বিমুখ হইতে চাই না, কিন্তু এই চাই যে, অবিশ্বাস, নিরাশা, নাস্তিকতা যেন আমাদিগকে তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না করে। অজ্ঞানতার উচ্ছেদ হইবে, প্রেমের জয় হইবে, পুণ্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, স্বর্গের আনন্দ অবতরণ করিবে, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে যেন আমরা সংগ্রামক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি, এই প্রার্থনা করিয়া বিনীতভাবে তব পাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

দুঃখ ও পাপ কোথা হইতে ?

ঈশ্বর যদি অচল ও অটল না হইতেন, তাঁহাকে যদি আমরা ইচ্ছামত টলাইতে পারিতাম, পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকিত কোথায়? যিনি আপনি কিছুতে পরিবর্ত্তিত হন না, তিনিই কেবল অপরকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। সমুদায় জগৎ ও জীবের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর কেবল ইহার স্রষ্টার অপরিবর্ত্তনীয়তাতে। অতএব আমরা প্রার্থনা, রোদন, আবেদনের বলে, ঈশ্বরের ইচ্ছার অণুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটাইব, এরূপ বাসনা এক বিন্দুও হৃদয়ে পোষণ করি না, কেন না তাঁহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে আমাদের তাহাতে অনন্ত জীবনের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই, আপাততঃ একটু অপবিত্র বাসনা চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অনন্ত জীবনের ক্ষতি। সুতরাং আমরা চাই, ঈশ্বর যেমন অচল ও অটল আছেন, তেমনই থাকুন, আমরা সেই অটল অচলে প্রতিনিয়ত প্রতিহত হইয়া, আমাদের বিপরীত গতি ফিরাইয়া আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছার গতি যে দিকে সেই দিকে গিয়া, ইচ্ছায় তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া যাই।

সকল জগতের গতি, ঈশ্বরের ইচ্ছার গতির সঙ্গে মিলিয়া রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, ভূমি, জল, বাতাস, বৃক্ষ, লতা, ইতর প্রাণী সকলেই অবশ ভাবে সেই ইচ্ছাশক্তির নিয়মনাধীনে স্ব স্ব গতি ও স্থিতিতে অবস্থান করিতেছে। কেবল এক মানুষেরই গতি, একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, সেই প্রবলতম ইচ্ছার বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে। এই বিপরীত গতি হইতে দুঃখ ও পাপের উৎপত্তি। কেবল দুঃখ নহে, দুঃখ ও পাপের যুগপৎ উৎপত্তি। দুঃখ ও পাপের একই সময়ে উৎপত্তি বলিতেছি কেন জান ? ইতরপ্রাণীর দুঃখ আছে কিন্তু পাপ নাই এই জন্য। যেখানে দুঃখ সেখানে পাপ, এরূপ মতের আমরা অনুমোদন করি না। যেখানে চেতনা আছে, সেখানে সুখদুঃখানুভব আছে। ইতর প্রাণিগণের প্রাণশক্তিতে চৈতন্যের ঈষদভিব্যক্তি যখন আছে, তখন সুখদুঃখানুভব তাহাদের থাকিবেই। তবে তাহাদের সুখদুঃখানুভব, সুখ অন্বেষণ দুঃখ পরিহার করিবার জন্য, দেহধর্ম্মরূপে তাহাদিগের মধ্যে স্থাপিত, মানুষের সুখদুঃখবোধমধ্যে দেহধর্ম্মাপেক্ষা আরও কিছু অধিক আছে। দৈহিক সুখদুঃখ অপেক্ষা মানসিক সুখদুঃখ মানুষে অধিক প্রবল। এমন কি মানসশক্তি তাহাতে এতই প্রবল যে, অনেক সময়ে দৈহিক সুখদুঃখও মানসিক সুখদুঃখের অধীন। মানসিক সুখদুঃখের প্রাবল্য মানুষে কোথা হইতে উপস্থিত হয়, তাহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারিলেই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

ইতর প্রাণীকে তাহার চারিদিকের অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। কি জড় কি চেতন, প্রকৃতির সকল পদার্থই স্ব স্ব স্বভাবে অনড় হইয়া অবস্থিত। সুতরাং ইতর প্রাণীরও জীবন ধারণ করিতে গিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে

আসিতে হয়। মনে কর, কোন একটি ইতর প্রাণী প্রস্তরে ঈষৎ আঘাত পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাতে শৃঙ্গাঘাত করিতে প্রবৃত্ত, প্রত্যেক আঘাতে সে আপনি ব্যথিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, প্রস্তরের কিছু হয় না। প্রস্তরের সহিত এইরূপে তাহার সম্বন্ধ স্থির হইয়া ভবিষ্যতে প্রস্তররাশিময় স্থানে সে সাবহিত হইয়া চলে। কেবল প্রস্তর কেন তাহার চারিদিকের অন্যান্য পদার্থের সঙ্গেও সে এই প্রকারে দুঃখ বা সুখ পাইয়া অজ্ঞাতসারে আপনার সম্বন্ধ নিয়মিত করিয়া লয়, এবং সেই সম্বন্ধানুসারে চলিতে পারিলে তাহার জীবন সহজে সুখে নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। মানুষেরও চারিদিকে ঘাতপ্রতিঘাত পাইবার উপযোগী চেতনাচেতন পদার্থ আছে; তাহাদের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে সেও সুখ দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু মানুষের দৃষ্টি দৃশ্য স্পৃশ্য পদার্থসমূহে আবদ্ধ নহে, তাহার অতীত স্থলে সে একজন শাস্তাকে অবলোকন করে, যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে গিয়া তাহার ঘোরতর মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। মানুষ এই শাস্তাকে অন্তরে ও বাহিরে নিয়ত দেখিতে পায়, সুতরাং কি প্রকৃতিতে, কি জীবে, কি আপনাতে সর্ব্বত্র সেই একেরই শাসন বিদ্যমান দর্শন করিয়া প্রাকৃতিকনিয়মসমূহভঙ্গে, জীবগণের সহিত সেই শাস্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ব্যবহারে, এবং আপনার হৃদয়ে মুদ্রিত বিধিসকলের বিপরীত আচরণে, মানুষ ঘোর ক্লেশানুভব করে এবং আপনাকে অপরাধী দেখিতে পায়। এইরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে মানুষের দুঃখ ও পাপ চিরসংযুক্ত। ইতরপ্রাণিগণ শাস্তাকে দেখিতে পায় না, তাঁহার শাসনে তাহারা শাসিত হইতেছে, এ জ্ঞান তাহাদের নাই, সুতরাং তাহাদের দুঃখের সঙ্গে পাপসংযুক্ত নহে।

য়িহুদিগণের ধর্ম্মগ্রন্থে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতিতে পাপের প্রবেশ যে বর্ণিত আছে, তাহা এইরূপে সত্য হইতেছে। মানুষের জ্ঞান যত বাড়িতে থাকে, তত তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাপবোধ বাড়িতে থাকে। জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বে আগে যাহা পাপ বলিয়া মনে হইত না, জ্ঞানোন্মেষের পর তাহা তীব্র পাপ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহা তাহার পক্ষে ভাল, না মন্দ, তাহার পক্ষে আশীর্ব্বাদ, না অভিশাপ? প্রাচীন য়িহুদিগ্রন্থে ইহাকে অভিশাপ বলিয়াছে, আমরা বলি, ইহা অভিশাপ নহে আশীর্ব্বাদ। যদি মানুষের পাপবোধ না জন্মিত, তাহা হইলে ইতরপ্রাণী অপেক্ষা তাহার আর কিছু বিশেষত্ব থাকিত না। উন্নত হইতে উন্নত সোপানে আরোহণ পাপবোধের তীব্রতানুসারে সম্ভবপর হয়। যিনি শাস্তা হইয়া অন্তরে বাহিরে বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাসন বুঝিবার সামর্থ্য যত বাড়ে, তত আমাদের আত্মা এক দিকে আপনার হীনতা, অপর দিকে উঁহার উচ্চতা প্রত্যক্ষ করে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকগুণে তাহাতে শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য শান্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু ঐ সকলের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, যাহা লাভ হইয়াছে তাহা এতই সামান্য বলিয়া মনে হয় যে তদ্দ্বারা উঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই শান্ত হয় না। ইহা উন্নতি না অবনতি? অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত শান্তি সুখ, যাহাদিগের পাপ্য তাহাদিগের যে বর্ত্তমানলব্ধ বিষয় অতি সামান্য বলিয়া মনে হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

আমরা এখন যাহা বলিলাম তাহাতে কি এই বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পাপবোধ ক্রমান্বয়ে বাড়িবে, জীবনে এমন কোন সময় উপস্থিত হইবে না, যে সময়ে আমাদের জীবনে আর পাপও থাকিবে না, পাপবোধও থাকিবে না। যেখানে পাপ ও পাপবোধ আছে, সেখানে চিরশান্তি চিরসুখ কখনই হইতে পারে না। অনন্তকে অধিকার করিতে গিয়া আমাদিগের শক্তি আদিকে চির দিন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে হইবে, এবং অনন্তকে অধিকার করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের প্রয়াস প্রযত্নও বাড়িবে, ইহা সত্য, কিন্তু অনন্তকাল পাপের স্থিতি, এবং একটি

পাপ অতিক্রম করিলে আর একটি নূতন পাপ দেখা দিবে, এইরূপে পাপবোধ নিত্যকাল থাকিবে, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। অনন্ত ইচ্ছা ক্রমে আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পাইবে সত্য, কিন্তু সেই ইচ্ছার বিরোধাচরণ করিবার বাসনা যদি আমাদের না থাকে, ইচ্ছা প্রকাশ পাইবামাত্রই যদি আমরা উহার বশবর্ত্তী হই, তাহা হইলে পাপ ও দুঃখের মূলচ্ছেদ হইয়া যায়। যত দিন সেই ইচ্ছার বিরোধে আমাদের মনের গতি আছে, তত দিন আমাদের দুঃখ ও পাপ আছে, ইচ্ছার বিরোধী ভাব গেলে অভাব ও উন্নতি থাকিবে, কিন্ত সে অভাবে মন নিপীড়িত হইবে না, তাহাতে অগ্রসর হইবার স্পৃহা কেবল বাড়িতে থাকিবে।

প্রেম মিলাইয়া লয়।

তুমি কি মনে কর, তোমার কোন কথা বা আচরণে তোমার প্রতি আমার প্রেম অন্তর্হিত হইবে? যদি অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে আজও প্রেম জন্মায় নাই। যে প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, উহা প্রেম নহে প্রেমাভাসমাত্র। এমন হইতে পারে যে, তোমার কথা বা আচরণ বজ্রের ন্যায় হৃদয়ে বাধিয়াছে এবং দিবা রজনী তাহার জন্য ছটফট করিতেছি। কিন্তু তোমার কথা বা আচরণ হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় বাধুক, আর আমি দিবারাত্রি ছটফটই করি, তবুও সেই কথা ও আচরণের মধ্য হইতে একটা কিছু ভাল বাহির করিয়া লইবার জন্য যত্ন কিছুতেই মন হইতে অন্তর্হিত হয় না। কথা ও আচরণের একবার এ অর্থ করিতেছি, আর একবার ও অর্থ করিতেছি, কিন্তু একটাও এমন অর্থে মন সায় দিতে চায় না, যাহাতে প্রেম অন্তর্হিত হইতে পারে। যাহাকে ভাল বাসি, সে যে প্রকার ভাবে যে কথা বলুক না কেন, যে ভাবে যে আচরণ করুক না কেন, প্রেম তাহার সেই দিক্ দেখে, যে দিক্ দেখিলে প্রেম-পাত্রের প্রতি মন আরও আকৃষ্ট হয়। আপাততঃ মনে হইতে পারে, ইহা প্রেমের দৌর্ব্বল্য, কিন্ত জানিও ইহা দৌর্ব্বল্য নহে, ইহাই প্রেমের প্রবল বল।

মন্দের ভিতর হইতে ভাল বাহির করিয়া লওয়া কাহার কাজ জান তো? এ কাজ স্বয়ং ঈশ্বরের। প্রেম মানবহৃদয়ে ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ, সে যে মন্দ হইতে ভাল বাহির করিয়া লইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তুমি বলিবে, ঈশ্বর মন্দ হইতে ভাল বাহির করেন তাহার অর্থ এই যে, মন্দ যাহা মন্দই রহিল, কিন্তু তাহা হইতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, সেই পরিবর্ত্তন হইতে এমন কিছু ব্যাপার উপস্থিত হইল যাহাতে জনসমাজের উন্নতি, জ্ঞানবৃদ্ধি ও সুখের সমাগম হইল। ঝটিকা বৃষ্টি, দেশবিপ্লব, শোণিতপাতে পরদেশ জয়, এ সকল হইতে আপাততঃ বহুজনের ক্লেশ ও অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, কিন্ত পরিশেষে তাহাই আবার কল্যাণ ও উন্নতির হেতু হইয়া থাকে। অনিষ্ট হইতে এইরূপে যে ইষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, তাহা ঈশ্বরের মঙ্গলনিয়মে, সমুদায় শক্তির মঙ্গলের দিকে গতিতে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যিনি আমার প্রেমের পাত্র, তিনি মন্দ করিবার জন্য মন্দ করিয়াছেন, অনুচিত আচরণে হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন, যে কথা বলা উচিত ছিল না তাহা বলিয়া মর্ম্মাহত করিয়াছেন, ইহা হইতে ভাল বাহির হইবে কি প্রকারে? যদি প্রেম থাকে, প্রেম ভাল বাহির করিবেই করিবে, করিয়া প্রেমপাত্রের প্রতি উহা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

প্রেমিক যখন বাক্য বা আচরণের আঘাতে আহত হন, তখন তিনি মৌনাবলম্বন করেন, দুঃখ প্রকাশ করেন না, লোকের নিকটে আর্ত্তনাদ করেন না, গোপনে সকল ক্লেশ বহন করেন। দুঃখ প্রকাশ করিলে, আর্ত্তনাদ করিলে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য লোক আসিয়া জুটে, তাহারা নানা জনে নানা কথা বলিয়া হৃদয় বিক্ষিপ্ত ও সংশয়াপন্ন করিয়া দেয়, চিত্ত সংযত করিয়া অন্তরে প্রবেশ

বিধাতৃনিয়মিত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে উহার স্থান কোথায়, তিনি ঐ ঘটনাকে কোন্ মঙ্গলে অন্তে পরিণত করিবেন, প্রার্থনা রোদন ও আবেদন সহকারে যদি জানিবার জন্য নিয়ত যত্ন করিলে অচিরে হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিয়া যায়, বর্ত্তমান অপ্রিয় আচরণের ভবিষ্যতের কল্যাণের সঙ্গে যোগ দর্শন করিয়া হৃদয় আশ্বস্ত হয়, আবার যদি সে আচরণ কেবল আপাত নিষ্ঠুর মাত্র হয়, উহার সঙ্গে অপুণ্য বা অধর্ম্মের কোন যোগ না থাকে,তাহা হইলে প্রেমিকের চিত্ত সেই অপ্রিয় নিষ্ঠুর আচরণের জন্য কৃতজ্ঞ হয়, এবং পূর্ব্বে যে পরিমাণ প্রেম ছিল, তদপেক্ষা আরও অধিক উহা বর্দ্ধিত হয়। বর্দ্ধিত হয় কেন জান ? এই জন্য যে, প্রিয়পাত্র তাদৃশ আচরণদ্বারা বিধাতার অভিপ্রায় অতিক্রম করেন নাই, বরং তাঁহার অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়াছেন। উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরে নিবদ্ধবশতঃ যে প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে, সে প্রেম কেবল এই চায় যে, প্রিয়পাত্র সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসরণ করেন, আত্মসম্বন্ধে প্রিয় বা অপ্রিয়াচরণ হইল কি না, সে দিকে তাহার দৃক্‌পাত নাই। যেখানে প্রিয়পাত্র পাপাচরণ করিয়া প্রেমিকের মর্ম্মাহত করিয়াছেন, সেখানে যত দিন প্রিয়পাত্র আবার ঈশ্বরের না হইতেছেন,তত দিন অজস্র অশ্রুদ্বারা ঈশ্বরের চরণ ধৌত করা তাঁহার জীবনের কার্য্য হয়, সুতরাং শোক ও করুণাবিমিশ্র প্রেম পূর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও সুকোমল বেশই ধারণ করে।

যাহা বলিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি আর বলিতে পার না 'প্রেম মিলাইয়া লয়' বলিয়া উহাতে অন্ধতা বা দৌর্ব্বল্য আছে। খাটি প্রেম হইতে যে কোন আচরণ উপস্থিত হয়, উহা স্বয়ং ভগবানের অনুমোদিত, সুতরাং জ্ঞানে, যুক্তিতে, যথার্থ তথ্যে উহার মধ্যে তুমি কোন দোষ দেখিতে পাইবে না। জ্ঞানে, যুক্তিতে, যথার্থ তথ্যে যে প্রেমের মিল নাই, সে প্রেম কখন খাটি হইতে পারে না। প্রেম আপনি যে সকল তথ্য প্রিয়পাত্রের নিকটে প্রচার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে যদি প্রেমিকের আচরণ না মিলে, বুঝিতে হইবে, এমন কোন অপরাধ ঘটিয়াছে, যাহাতে প্রেমিকের প্রেম অন্তর্হিত হইয়া প্রেমাভাস আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রেম জ্ঞানপূর্ণ সত্য পূর্ণ, পবিত্রতাপূর্ণ ; প্রেমেতে ইহার কোনটিরই অভাব থাকিতে পারে না। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, অপূর্ণ মানুষে কি তবে পূর্ণপ্রেম সম্ভব ? অপূর্ণ মানুষে পূর্ণপ্রেম অর্থাৎ অনন্ত প্রেম সম্ভবিবে কি প্রকারে ? তবে প্রেমের পরিমাণে তাহার সঙ্গে জ্ঞান, সত্য ও পবিত্রতা মিলিত থাকিবে। এ সমুদায় প্রেমের সহিত স্বরূপতঃ এক, এজন্য প্রেমের সঙ্গে ইহারা নিত্য বিদ্যমান ; সুতরাং কোনকালে প্রেমে সত্যদৃষ্টি, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য, ও শুদ্ধ ব্যবহারের অভাব হয় না, এবং এইগুলি আছে বলিয়াই, যখন কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়, তখন প্রেমিক স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট গমন করিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতে সমর্থ হন ; অমিলের ব্যাপার উপস্থিত হইলে অনায়াসে ঈশ্বরের আলোকে মিলাইয়া লইতে পারেন। যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই তোমায় বলিতেছি, যদি তোমার প্রেমের জন্য কোন দিন সঙ্কটে পড়িতে হয়, তুমিও স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া এ সকল কথার সত্যত্বের প্রমাণ দিতে সমর্থ হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শাক্য দ্বাদশবর্ষীয় আত্মপুত্রের মাথামুড়াইলেন,তাহাকে সন্ন্যাসী করিলেন, তুমি আমি বলিব, ইহা কি ধর্ম্মসঙ্গত হইল, নীতিসঙ্গত হইল ? দ্বাদশবর্ষীয় শিশু ধর্ম্মের জানে কি ? সে কি সন্ন্যাসধর্ম্মের অধিকারী ? আমরা যে সময়ে বাস করিতেছি, সে সময়ে এ কথা বলা শোভা পায়, কেন না এ কালে কোন মানবগুরুর উপরে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করে না। এখন যদি আমাদের একান্ত অভিলাষ হয় যে, আমাদের পুত্র কন্যা আমরা যে ব্রতাবলম্বী হইয়াছি, সেই ব্রতাবলম্বী হয়, কেন না আমরা জানি এ ব্রতে নিশ্চয় সুখ শান্তি, আমাদের ব্রত গ্রহণ না করিয়া সংসারী হইলে নিশ্চয় তাহাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা কি আর বলপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করাইতে পারি ? আমাদের পুত্রকন্যাদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইতেছে, কেন না সেকালে

যেমন গুরুকৃপা হইয়াছে বলিয়া লোকে গুরুর নির্দ্দিষ্টপথে প্রাণপণে থাকিতে যত্ন করিত, একালে আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। শাক্য যে মনে পুত্রের মাথা মুড়াইয়াছিলেন, আমাদের মনেও ঠিক তাই আছে, মাথা মুড়াইতে না পরিলে যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণাও আছে, কিন্তু এ সময় ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধের সময় বলিয়া আমাদের হাত পা বাঁধা পড়িয়াছে এই মাত্র।

আত্মন্, তুমি নরও নও নারীও নয়, তুমি নরনারী উভয়ই। একাধারে তোমাতে পুরুষ ও প্রকৃতি বিরাজমান। নরেতে ও নারীতে গুণসাম্য থাকিলেও, নরেতে কোন কোন গুণের আধিক্য, নারীতে সে সকলের অল্পতা, আবার নারীতে যে সকল গুণের আধিক্য নরেতে তাহার অল্পতা, কিন্তু একেবারে একের গুণ অপরেতে নাই, ইহা কখন হইতে পারে না। সেই জন্য বলি, আত্মন্, যখন তোমায় সম্বোধন করিতেছি, তখন আর নরনারীর কোন প্রভেদ করিতেছি না। যেমন তুমি নরনারী উভয়ই তোমাতে নরজাতি নারীজাতি একরূপ জাতিভেদ নাই, তেমনি তুমি কালকৃত ভেদেরও অতীত। আজ তুমি জন্মিলে, আজ তোমার বয়োবৃদ্ধি হইল, এসকল কথা লৌকিক কথা, সত্য কথা এই যে, তুমি চিরকাল তোমার জননীর ক্রোড়ে আছ, চিরকাল তাঁহারই ক্রোড়ে থাকিবে। তুমি তোমার মহত্ত্ব ও গৌরব বুঝিয়া সংসারের বিষয় অন্বেষণ করিতে পার না, আপনার জীবনের উচ্চ আদর্শকে মিথ্যা বিনয়ের অনুরোধে খর্ব্ব করিতে পার না। তোমার অন্নপান স্বয়ং ঈশ্বর যোগান, তোমার আবার তজ্জন্য চিন্তা? তোমার পিতা তোমায় বলিতেছেন "সন্তান, কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, যাহা তোমার প্রয়োজন আমি যোগাইব", একথা কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহে? তুমি সন্ন্যাসী বা সংসারী হও, এই কথা শুনিয়া চলাতেই তোমার জীবনের সুখ ও শান্তি।

আত্মন, তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে কি না, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কি না, আমি কি রূপে বুঝিব? বুঝিবার কি কোন উপায় নাই? উপায় আছে বৈকি? সে উপায় বলিয়াছি, আবার একটি একটি করিয়া বলি। (১) হে আত্মন, তোমার যদি নিত্য জ্ঞানোপার্জ্জনে যত্ন থাকে, জ্ঞানোপার্জ্জন জন্য যদি তুমি অধ্যয়নকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ কর, অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকালও প্রতিদিন তজ্জন্য ব্যয় কর; (২) ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া যদি তোমার চিরপ্রসন্নতা থাকে, সত্য ও ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃ যদি সমুচিত গাম্ভীর্য্য তোমাতে দেখিতে পাওয়া যায়, (৩) তুমি যদি জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যদ্বারা জীবন পূর্ণ কর, যে উপায়ে এই সকল লাভ হয়, সে উপায় গ্রহণে প্রাণপণে যত্ন কর, যে সকল আচরণাদি জ্ঞানাদিলাভে অন্তরায় তাহা হইতে দূরে স্থিতি কর, (৪) বিবেকের আদেশ যদি ভয়, লজ্জা বা অন্য কারণে লঙ্ঘন বা অতিক্রম না কর, (৫) মনের সংশয়, অন্ধকার, দুঃখ, একমাত্র ঈশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করিয়া অন্তরিত কর, তিনি তজ্জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতে বলেন তাহা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ কর, (৬) সকলের প্রতি যদি ধর্ম্মের অবিরোধী ভাবে মধুর ব্যবহার কর, তবে জানিলাম, হে আত্মন, তোমার ও আমার মধ্যে প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় আছে। যে সকল নিয়ম বলিলাম, এই সকল নিয়ম অবধান সহকারে পালন কর, দেখিবে, সংসারে সামান্য বস্তুর মধ্যে হরিদর্শন ও তজ্জনিত অপার সুখশান্তিলাভ তোমার পক্ষে একান্ত সহজ হইবে।

উপাসনাবাস।

জীবনের সাক্ষ্য।

৩রা আশ্বিন ১৮২০ শক।

আমাদের বয়স বাড়িয়াছে। কে না জানে, যত বয়স বাড়ে, তত গোঁড়ামিও বাড়ে। লোকে বলে ৪০ বৎসর বয়স অতীত হইলে সে মানুষের আর কোন নূতন মত হয় না। ইহা কি নিন্দার কথা না প্রশংসার কথা? ৪০ বৎসরেও যাহার মত স্থির হইয়া যায় না, স্থিরতর মত বদলাইয়া যাইবে সম্ভাবনা থাকে, জীবনে সংগৃহীত মত বায়ুবিতাড়িত তরঙ্গের ন্যায় উঠে আর পড়ে, ভিত্তিশূন্য প্রাচীরের মত সহজ আঘাতে দুলিতে থাকে, ইহাতে প্রশংসার বিষয় কি আছে বল। ৪০ বৎসর পরেও যদি জীবনে লব্ধ নিশ্চিত সত্য জগতের কাছে প্রকাশ করা না যায়, তবে তুমি কোন মত সুদৃঢ় করিবার জন্য, কোন নিশ্চিত সত্য লাভ করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলে,ইহা বিশ্বাস করিবারও কোন কারণ থাকে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠে এবং চির দিন উঠিবে, এ কথা বলা গোঁড়ামি নহে। এমন কোন ঘটনা হইতে পারে, কোন দিন প্রাতঃকালে হয়ত সূর্য্য উঠিবে না; কিন্তু ইহাতে এই গোঁড়ামির কোন নিন্দা হয় না। কারণ এই প্রকার ঘটনার জন্য মানুষ দায়ী নহে। এত কাল প্রতিদিন যাহা দেখিয়া আসিলাম তাহাকে সত্য বলিব, এত কাল যাহা হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতেও হইবে অসঙ্কুচিত চিত্তে এই কথা বলিব। যদি কোন ঘটনাতে তাহার ব্যতিক্রম হয় সে জন্য এই মতের কোন নিন্দা হইতে পারে না সত্যের প্রতি একরূপ দৃঢ় নিষ্ঠা উপস্থিত না হইলে সত্যের কোন ভিত্ত নির্ম্মিত হয় না, সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন অবকাশ থাকে না। বয়োবৃদ্ধিসহকারে জীবনে ধর্ম্মসম্বন্ধে কতক গুলি মত স্থির হইয়া গেলে তাহা জগতের নিকট অসঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করিলে তাহা নিন্দার বিষয় হয় না। বরং ৪০।৫০ বৎসর ঈশ্বরানুগত থাকিয়াও যদি সাধনসম্বন্ধে, পরমাত্মা সহ সহবাসসম্বন্ধে, ঈশ্বরের কৃপালাভসম্বন্ধে, জীবনের নানা ঘটনাতে প্রেমময়ের হস্ত নানা প্রকারে দেখিয়া কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়া যায়, তবেই নিন্দাভাজন হইতে হয়। প্রত্যেক মতে ও বিশ্বাসে যদি সন্দেহ থাকে, তবে

সত্য ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার প্রমাণ থাকে না। মানবজীবন যদি কেবলই এইরূপ সংশয়ময় হইত, তবে ধর্ম্ম ও বিশ্বাসরাজ্যের সিংহাসন এই জগতের বক্ষে স্থাপিত হওয়া অসম্ভব হইত।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এমন অনেক মত প্রকাশ করেন যে, এই ঘটনা হইবে নিশ্চিত, কিন্তু নাও হইতে পারে; কারণ প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান পণ্ডিত হক্স্‌লি প্রভৃতির এই মত। কিন্তু এরূপ বলিয়াও ঘটনাসমূহের আজ পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহার উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহারা একপ কথা সকল বলিয়া থাকেন, যাহাতে তাঁহাদের গোঁড়ামি যথেষ্ট প্রকাশ পায়। জগতের কাছে যে কোন সত্য প্রকাশ করিতে হইলেই তৎসম্বন্ধে আত্মমত অতি সুদৃঢ় হওয়া চাই। এই সুদৃঢ় মতকেই গোঁড়ামি বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইহা নিন্দার বিষয় বলিয়া মনে হয় না। কতকগুলি সত্য আছে তাহাতে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলেই বরং নিন্দিত হইতে হয়। যেমন প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠে; কেহ যদি কাল সূর্য্য উঠিবে কিনা বলিতে পারি না, এই কথা সকলের নিকট প্রকাশ করে, সে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইবে। কারণ বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতিদিন যাহা দেখা গেল, পাগলামি ভিন্ন তাহাতে সন্দেহ স্থাপনের কোন হেতু নাই।

এমন অনেক গুলি কথা আছে, যাহা শুনিলেই লোকে বলে এ ব্যক্তি অনেক বেশী কথা বলিতেছে, অনেক গোঁড়ামি করিতেছে। কিন্তু লোকে এরূপ বলিলে কি হইবে, নিন্দাভাজন হইলেই বা কি ক্ষতি? যাহা জীবনে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। ঈশ্বর এত কাল আমার জন্য যে ব্যবস্থা করিলেন, ভবিষ্যতে তাহা করিবেন, ইহা নিশ্চিত বলাই বিশ্বাসের কথা। ৪০বৎসরেও জীবনে ঈশ্বরকৃপার সাক্ষ্যদান করিতে না পারিলে জীবন বৃথা মনে হয়। ষাট্ বৎসরের নিকটবর্ত্তী এই তো জীবনের সাক্ষ্য দানের সময় উপস্থিত। সুতরাং লোকে যাহা বলে বলুক, তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া পরমকরুণাময়ের কৃপার কথা বলিতেই হইতেছে। আমাদের জীবনে ঈশ্বরকৃপার সাক্ষ্য এই যে, তিনি কখনও দুঃখ দেন না। নিত্য সুখ নিত্য আনন্দে আমাদিগকে তিনি ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। দুঃখ আছে, রোগ আছে, শোক আছে, একজন মরিলে তাহার আত্মীয় বন্ধুরা শোকে অধীর হয়, তাহা সহ্য করিতে পারে না, একজনকে অনেক খাটিতে হয়, অথচ তাহার উপযুক্ত আহার মিলে না, যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও কেহ পরিবার প্রতি পালন করিতে পারে না; এই সমস্ত দুঃখের ব্যাপার, শোকের ব্যাপার বর্ত্তমান; তথাপি আমরা বলিতেছি, ঈশ্বর দুঃখ দেন না, তিনি আনন্দে রাখিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া লোকে বলিবে, ইহারা ধর্ম্মের নামে ভাণ করিতেছে, অসত্য বলিতেছে, গোঁড়ামি করিতেছে। কিন্তু ইহা ভাণও নহে, গোঁড়ামিও নহে, সত্যের অনুরোধে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে হয়, রোগে, দুঃখে, ভয়ানক রৌদ্রোত্তাপে অনাবৃত মস্তকে বহু ক্রোশ পদব্রজে চলিয়া, দুই তিন দিন অনাহারে থাকিয়া, রোগজীর্ণ শরীরে চারি অঙ্গুলি অন্তরে পদ নিক্ষেপে রজনীর শেষে হাটিতে আরম্ভ করিয়া পর দিন রজনী নয়টায় থামিয়া থামিয়া তিনক্রোশমাত্র পথ চলিতে সমর্থ হইয়াও আনন্দে সে সকল দিন কাটাইয়াছি। আজকাল প্রচারভাণ্ডার হইয়া আর প্রচারকদের আহারের ভাবনা নাই। এক সময়ে কোন সংস্থান ছিল না; কিন্তু ঈশ্বরকৃপাতে এক দিনও মনে কোন অশান্তি হয় নাই, দুঃখ কষ্ট বলিয়া মন ব্যথিত হয় নাই। আচার্য্যের আজ এই যে প্রার্থনা পড়া হইল তাহার প্রত্যেক কথা সত্য। এমন উপায় আছে যাহাতে লোকে যাহাকে দুঃখ বলে তাহা দুঃখ মনে হয় না, লোকে যে রোগে অধীর হয় তাহাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা যায়, লোকে যাহাকে শোক বলে তাহাতে আত্মহারা না হইয়া অনন্ত পরলোকের অনন্ত শান্তিতে মন সংলগ্ন হয়। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ধর্ম্ম যদি রোগে সান্ত্বনা, শোকে নির্ভর, বিপদে অভয় দিতে না পারে, তবে সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। এ কথা অসত্য নহে।

অনেকে মনে করেন, ইহাঁদের কত অভাব দুঃখ কষ্টে দিন যায়, এইজন্য আমাদের গৃহভুক্ত হইতে কত লোক সঙ্কুচিত হন। কিন্তু তাঁহাদের এ সঙ্কোচ সত্য নহে। আমাদের দিন সুখে কাটে, কোন দিন দুঃখ অভাব হয় না। আমাদের আহার্য্য সুমিষ্ট, আমাদের শয্যা সুকোমল; আমরা যখন আহার করি তখন এমন একজন কাছে থাকেন, যিনি শাকে স্বর্গের সুধা ঢালিয়া দেন; আমরা যখন শয়ন করি, আমাদের দুর্ব্বল মস্তকে এক জন হাত বুলাইয়া সকল শ্রান্তি দূর করিয়া সুনিদ্রা আনিয়া দেন। রোগের সময় তাঁহার শান্তিময় কোলে আমরা আশ্রয় পাই। অতএব বলিতেছি, আমাদের মত সুখী আর কেহ নাই। এক দিন লক্ষ্ণৌ হইতে আসিতে আসিতে মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মন তুমি কি এই অবস্থাই ভাল বাস? মনের নিকট কল্পনাযোগে সংসারের বড় বড় অবস্থা আনিয়া উপস্থিত করিলাম। সে গুলির কোনটাই তাহার পছন্দ হইল না। সে সময়ে আহারাদির কোন বন্দোবস্ত ছিল না, প্রচারকার্য্যালয় স্থাপিত হয় নাই, অন্নবস্ত্রের কোন সংস্থান ছিল না, আহার অনাহার এদুইয়ের মধ্য দিয়া জীবন কাটাইতে হইত। সেরূপ অবস্থায় কতবার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, মন তুমি কি অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চাও, মন একদিনও অন্য ভাল অবস্থা ইচ্ছা করে নাই। অনেক সময় অনাহারে রহিয়াছি, কিন্তু সে অনাহারের অবস্থা সুখের অবস্থা বিনা দুঃখের অবস্থা কোন দিন মনে হয় নাই। একপ হয় কেন? ঈশ্বরের করুণা যখন মানুষ বুঝিতে পারে, এবং নিজ জীবনে তাঁহার ব্যবস্থা ও সমস্ত জীবনে তাঁহার হস্ত দেখিতে পায়, তখন মানুষের কোন দুঃখ শোক থাকে না, প্রচুর আনন্দে সে দিন কাটায়।

ঈশ্বরকৃপার সংবাদ আরও কত আশ্চর্য্য শোন। অনেকে হয়ত মনে করেন, ইহারা উপযুক্ত আহার পায় না, ভাল অবস্থায় থাকে না, সুতরাং ইহারা অকর্ম্মণ্য, সামান্য পরিশ্রম করিতে পারে না। কিন্তু ইহা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি, এই অবস্থাতে, এই বয়সেও এই রুগ্ন শরীরে প্রতিদিন নিয়মিত ১৫। ১৬ ঘণ্টা, সময়ে সময়ে

১৮।১৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে কাতর নই। এক দিন নয়, বহু দিন হইতেই এইরূপ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি। দেখিতে পাই যুবকগণ পরিশ্রম করিতে পারেন না, অল্প পরিশ্রমে কাতর হন। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা পরিশ্রমের কৌশল অবগত নহেন। অনেক চিকিৎসক আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, ইঁহারা প্রায় অনাহারে দিন কাটান, অথচ এত পরিশ্রম কি রূপে করেন। আমরা এত কাল ঈশ্বরের করুণা ভোগ করিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্যদানে সমর্থ। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আছে এবং তিনি আমাদিগকে পরের জন্য ব্যবহার করেন। এই প্রচারকগণ নিজের জন্য কিছুই করেন না। সুতরাং ঈশ্বর সহায় হইয়া শক্তি হইয়া ইঁহাদের সঙ্গে কার্য্য করেন, ইহাতে অনাহারেও সুখে দিন যায়, অনিদ্রাতেও ইঁহারা অবসন্ন হন না। কখনও কখনও রোগ হয় না তাহা নহে। রোগ হইলে লোকে বলে তোমরা অনিয়ম কর। কিন্তু বলিলে কি হয়,এই কথা শুনিবার অবসর কোথায়? প্রকৃতির নিয়মে যাহা ঘটিবার তাহা তোমার আমার সকলের পক্ষে অনিবার্য্য; তাই বলিয়া মানুষ আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারে না।

আজ আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের করুণার সাক্ষ্য দান করিতেছি। প্রতিদিন সূর্য্য উদয় হওয়া যেমন নিশ্চিত, মানুষের জীবনে ঈশ্বরের করুণা তেমনি নিশ্চিত। অতএব বন্ধুগণ, সকলে ঈশ্বরের করুণাতে নির্ভর করুন; ঈশ্বরের আশ্রয় লউন, সমস্ত দুঃখ নিবারণ হইবে। রোগ হইবে না, শোকে পড়িতে হইবে না, এমন নহে। প্রকৃতির নিয়মে যাহা হইবার তাহা হইবে; কিন্তু তাহার মধ্যে যথেষ্ট সান্ত্বনা আছে দেখিতে পাইবেন। সংসার আপনাদের কাছে কেবল সংসার হইবে না; ইহার মধ্যে যথেষ্ট সুখ, আনন্দ, আরাম আছে দেখিতে পাইবেন। যতই ঈশ্বরের করুণা আশ্রয় করিবেন, ততই দেখিতে পাইবেন, নিজ কর্ত্তব্য-সাধনে যথেষ্ট বল পাইতেছেন, তজ্জন্য যথোচিত আয়োজন আপনি আসিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন, সকল কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া আপনারা তাঁহার করুণারথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে উপনীত হইয়াছেন।

এখন বিজ্ঞানের সময় কতক গুলি কথা বলিলেই কেহ বিশ্বাস করিবে না, প্রত্যেক কথার প্রমাণ চাই। অতএব জীবনে যে সমস্ত কর্ত্তব্যপালনে অভিলাষ হইবে তাহা জীবনে সপ্রমাণ করা প্রয়োজন। আজ যে করুণার কথা বলা হইল, সেই করুণায় সকলে বিশ্বাস করুন, জীবনে আশ্রয় করুন, নিশ্চয়ই সিদ্ধমনোরথ হইবেন। ঈশ্বরের করুণা কেবল প্রচারকগণের জন্য নহে, সমস্ত নরনারী তাঁহার করুণার অধিকারী। প্রভাতে সূর্য্য যেমন সকলের দ্বারে গমন করে; ঈশ্বরের করুণা তেমনি। তিনি প্রচারকগণের জীবনে যাহা দেখাইলেন ও প্রমাণিত করিলেন, সকলের জীবনে তাহা করিবেন। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সকলে দুঃখ, বিপদে সহায়তা পাইবেন। কৃপাময় ঈশ্বর, তাঁহার কৃপা আমরা সকলে আশ্রয় করিতে পারি, এজন্য আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হে কৃপানিধান, তুমি আমাদের জন্য অনেক করিয়াছ কিন্তু আজপর্য্যন্ত পৃথিবীর নিকট তাহার কিছুই বলি নাই। প্রকাশ্যে সকল কথা বলিতে লজ্জা করে। তুমি গোপনে যাহা বলিলে, যাহা করিলে, সে সকল কথা, সে সকল তোমার ব্যবহার মানুষের কাছে বলিতে পারিলাম না। ভয় হয় পাছে বা তাহারা নিন্দা করে। কিন্তু যাহা সত্য, তাহা না বলিয়াও থাকিতে পারা যায় না। এত করুণা ভোগ করিলাম, যদি কিছু প্রকাশ না করি, তবে যে বড় কৃতঘ্নতা হইবে। কৃপাময়, এখন বয়সও হইয়াছে, আর লজ্জাই বা কি? এখন ঘোমটা খুলিবার দিন। অতএব আজ দু একটী কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আজ এই কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছি যে, তুমি কখনও দুঃখ দাও নাই; চির আনন্দে তোমার কাছে এই জীবন কাটাইতেছি। শত শত জননী অপেক্ষা অধিক স্নেহ তুমি করিয়াছ; এখনও তোমার অপার করুণাতে জীবনে যথেষ্ট আনন্দ পাইতেছি। আশীর্ব্বাদ কর, সকলে যেন এইরূপ তোমার করুণার আশ্রয় লইয়া দুঃখ বিপদে তোমার অভয়পদ লাভ করেন। তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ভিন্ন আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই, সুতরাং ইহাই বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি পিতা, তোমার চিরশান্তিময় পাদপদ্মে আমরা সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও তহফতোল্ মোহেদিন।

আমাদের ধর্ম্ম পিতামহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক পারস্যভাষায় বিরচিত, তহফতোলমোহেদিন, (একেশ্বর বাদী দিগের প্রতি উপহার) নামক গ্রন্থ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, ভাই বলদেব নারায়ণ সম্প্রতি বাঁকিপুরে উহার তৃতীয় সংস্করণ করিয়াছেন। এখন সাধারণের পক্ষে সেই গ্রন্থ সুলভ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে মূল গ্রন্থ না পাওয়াতে আমরা তাহা পাঠ করিতে পারি নাই। কিয়ৎকাল হইল উহার হস্ত লিখিত উর্দ্দু অনুবাদের কিয়দংশ পড়িয়াছিলাম। সম্প্রতি মূল পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করা গেল। এই পুস্তকের আয়তন বৃহৎ নহে। পুস্তকের অবতরণিকা আরব্যভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে গ্রন্থকর্ত্তা উক্ত মহাত্মার আরব্য পারস্য ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনুপম বিচারশক্তি, ও সূক্ষ্ম দার্শনিক বুদ্ধি এবং গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁকিপুরস্থ একজন প্রসিদ্ধ সুবিজ্ঞ মৌলবি তহফতোল মোহেদিন পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, "এই পুস্তকের রচনানৈপুণ্য বিস্ময়কর, এরূপ আশ্চর্য্য পারসি লিখিতে পারেন পাটনানগরে একজন মৌলবিমাত্র আছেন, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।" শুনিয়াছি, আরব্য পারস্য ব্যতীত সংস্কৃত ইংরেজি হিব্রু লাটিন প্রভৃতি আরও দশটী ভাষায় আমাদের ধর্ম্মপিতামহের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনিই বঙ্গভাষার গদ্য রচনার প্রবর্ত্তক,

তাঁহা কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ বিরচিত হয়। তিনি বঙ্গভাষায় গদ্যে পৌত্তলিকপ্রবোধ ও পথ্যপ্রদানাদি বিবিধ পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে ২। ৪ খানা পদ্য গ্রন্থই বঙ্গভাষার সম্পত্তি ছিল। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়কেই বাঙ্গলা গদ্যরচনার প্রথম পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে। যদিও প্রথম উদ্যম বলিয়া হউক, বা তদানীন্তন বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণতা-বশতই হউক,তাঁহার বাঙ্গলা গদ্য রচনায় তাদৃশ লালিত্য রক্ষা পায় নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত বাঙ্গলা পুস্তকাদিতেও তাঁহার আসাধারণ দার্শনিক জ্ঞান, উজ্জ্বল বিচারশক্তি ও অকাট্য যুক্তির নিদর্শন সকল উপলব্ধি করিয়া কে না চমৎকৃত হন? "তহফতোল মোহেদিন" বিশেষভাবে ভাষার উচ্চতা ও বচনবিন্যাসের পারিপাট্যের সঙ্গে রাজার উন্নত জ্ঞান, মার্জ্জিত দার্শনিক বুদ্ধি ও সূক্ষ্মচিন্তাশীলতার পরিচয় দান করে। রাজার রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এরূপ প্রতীতি হয় যে, তাঁহার জীবন জ্ঞানপ্রধান ছিল, বিশ্বাসপ্রধান বা প্রেমভক্তিপ্রধান নয়। তিনি "তহফতোল্ মোহেদিনে" বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ লোকসকলের পরস্পরবিরোধী অযৌক্তিক মত, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ক্রিয়াদির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মনেতৃ-গণের আত্মত্যাগ, জনহিতৈষণা ও বিশ্বাস ভক্তি এবং নানা সদ্‌গুণাদির কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তাঁহাদের অনেককে ভ্রান্ত, কপট ও প্রতারকরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুগামী অনুগত লোকদিগকে অন্ধ, পথভ্রান্ত, প্রবঞ্চিত বলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার লেখা পড়িয়া দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষীণবিশ্বাসী লোকদিগের বিশেষ অনিষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। প্রাচীন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মনেতৃগণও অপূর্ণ মনুষ্য ছিলেন, তাঁহাদের যে ভ্রান্তি, দুর্ব্বলতা ও সাময়িক সংস্কার ছিল না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। উহার সমালোচনা হউক, সেই সকল কুসংস্কার ও ভ্রান্তিজালে লোকে যাহাতে জড়িত হইয়া না থাকে তজ্জন্য যত্ন চেষ্টা হউক, কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহাদের দেবত্ব ও মহত্ত্ব সমধিক সমালোচিত হওয়া আবশ্যক। রাজা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বিবাদবিসংবাদের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়া-ছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন প্রতিবাদ নাই, বরং অন্তরের সহানুভূতি আছে। উক্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাদির মানবীয় শক্তির অতীত অনৈসর্গিক অসম্ভব বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপবৃত্তান্ত পরম্পরাগত জন-শ্রুতিমূলক, অসত্য ঐতিহাসিকতত্ত্ব বলিয়া রাজা যে তৎপ্রতি অনাস্থাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি কি হইতে পারে? ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি অত্যাচারের বিধিসূচক কোরানের আয়ত সকল যে প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধেও আমরা কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মনেতা-দিগকে নাম,খ্যাতি,ও প্রভুত্বের প্রত্যাশী,স্বার্থপর বঞ্চকাদি কুৎসিত-শব্দে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ যে সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির অত্যন্ত দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তহফতোল মোহেদিনের ৩০ পৃষ্ঠার কিয়দংশ এস্থানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল,—"অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মনেতৃগণের বহুশত বৎসর অতীত হইলে পর, নবতত্ত্বের পরি-সমাপ্তি,—এরূপ তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রচারিত হওয়া সত্বে, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষে ও অন্য অন্য দেশে নবতত্ত্বপ্রচারের পতাকা উত্তোলনপূর্ব্বক বহু লোককে ভুলাইয়া নিজেদের অধীন ও অনুগত করিতে সফলমনোরথ হইয়াছেন ইত্যাদি।" এইরূপ আমাদের ধর্ম্মপিতামহ অতীতকালীন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ ও ধর্ম্মনেতৃগণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা পরিতাপের বিষয়। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ লোকদিগের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনেক স্থানের বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত ও ভ্রান্তিসঙ্কুল হয় নাই, ইহা কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে? এদিকে আবার দেখিতে হয়, তিনি নবধর্ম্ম ও নবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাঁহারও সাময়িক কুসংস্কার ও দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ পাঠ করাইতেন, যজ্ঞসূত্র স্কন্ধে ধারণ করিতেন, জাতিভেদ মানিয়া চলিতেন, তজ্জন্য কি তিনি নিন্দনীয়?

সকল সম্প্রদায়ের লোক মূলতঃ জগতের স্রষ্টা একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কেবল কতকগুলি অবান্তর বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা, পরস্পর অনৈক্য ও মতভেদ, তহফতোল-মোহেদিনে গ্রন্থকর্ত্তা ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি তহ-ফতোলমোহেদিনের শেষাংশে লিখিয়াছেন যে, ইহার বিস্তা-রিত বিবরণ "মনাজরতোল্ আদিয়ানে" উল্লিখিত হইয়াছে।" এতদ্দারা প্রতীতি হইতেছে যে, তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত "মনাজরতোল আদিয়ান" নামক পারস্য বা আরব্য ভাষায় এক গ্রন্থ ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

উপাসনাশ্রম।

নিরাকার সত্য।

৮ই কার্ত্তিক, রবিবার ১৮১৯ শক।

আর্য্যজাতির মহত্ত্ব ও গৌরব কিসে, আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা নিরাকারকে সৎ এবং সাকারকে অসৎ বলিয়া, অসৎ সাকারকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, এই জন্য কি তাঁহাদের মহত্ত্ব ও গৌরব? পাশ্চাত্য জগতের নিকটে কি ইহা অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য যত্ন নহে? যে দেশে সভ্যতার স্রোত বহিতেছে, বিজ্ঞান কত নূতন নূতন আবিষ্কার করিতেছে, বাহিরের বিষয় সমুদায়ই যেখানে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, সে দেশে নিরাকারকে যাঁহারা একমাত্র সত্য বলেন, তাঁহাদের গৌরব কি প্রকারে স্বীকৃত হইবে? বিজ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কতবিধ নব নব বিলাসদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, সে সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া এখানকার লোকেরা বি

অনির্দ্দেশ্য অবিজ্ঞেয় অনন্তের ধারণার জন্য ব্যস্ত হইবে? আর্য্য-ঋষিগণতো আর বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন না? আমরা যে সকল লাসদ্রব্য দেখিতেছি, ভোগ করিতেছি, এ সকল কি আর তাঁহাদের সময়ে ছিল? সে প্রাচীন কালে এখন যদি আমরা ফিরিয়া যাই, সমুদায় ভোগের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আকাশের চিন্তায় কাল কাটাই, তাহা হইলে কি আর বুদ্ধিমানের কার্য্য হয়? নিরাকার লইয়া কে থাকিতে পারে? যদি নিরাকারই সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার সাকারের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রয়োজন কি? সাকারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া নিরাকার লইয়া এক দিনের জন্য তুমি কি তোমার শরীর রক্ষা করিতে পার? যদি না পার, তাহা হইলে সাকারকে মিথ্যা বলিয়া নিরাকারকে যে সত্য বলিতেছ ইহা কি আর উপহাসের বিষয় নয়? আর্য্যঋষিগণের জীবন এ সমুদায় কথার প্রতিবাদ। তাঁহারা নিরন্তর অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণ করিতেন। একালের লোকেরা তাঁহাদের এই মহত্ত্ব গৌরব বুঝিতে পারিতেছে না। তাহারা বাহিরের বস্তু লইয়া যে আমোদ পায় তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমোদ আছে মানিতে চায় না। পৃথিবী নিতান্ত ভ্রান্ত। সে নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি কি তাহা জানে না। পৃথিবীর লোক কেবল অবাস্তব বিষয় লইয়া নিরন্তর ব্যস্ত আছে। আত্মা যে কি বস্তু তাহা তাহারা জানে না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া তাহারা যথার্থ বস্তু কি তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। প্রতিদিন স্বচ্ছন্দ আহার পানে আত্মা কি পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট হয়? যদি হইত, তাহা হইলে এত ভোগবিলাসের মধ্যে তাহার অশান্তি কেন? বাহিরের এত আয়োজন সত্ত্বে আত্মার যাতনা কেন অপনীত হয় না? ধনমানাদি যদি সত্য হয় এবং তাহাতেই পুরুষের পুরুষার্থ হয়, তবে যথেচ্ছ ধনমানাদি সকলে অর্জ্জন করিয়া দেখুন তাহাতে তাঁহাদের সুখ শান্তি হয় কি না? আজ যদি অজ্ঞতাবশতঃ আত্মার সুখ শান্তি কিসে হয় তাহা অবধারণ না করিয়া বিষয়সুখের পশ্চাতে কেহ ধাবিত হন, যিনি ধাবিত হইতে চান ধাবিত হউন, একদিন তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে উহাতে আত্মার শান্তি আনন্দ হয় না। আর্য্যগণ ইহা জানিয়াই সাকারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া নিরাকার রাজ্যে বাস করিতেন। তাঁহারা সেখানে যাহা দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, তাহা সত্য, নিরেট সত্য। তাঁহারা সেই সত্যকে সত্য বলিয়া ধারণ করিতেন, যাঁহা হইতে বাহিরের এই সমুদায় উৎপন্ন হইয়া সত্যাশ্রয়ে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। সেই মূল সত্যের যে শক্তি সাকাররূপে প্রতীত হইতেছে, সে শক্তি কি সত্য নয়? যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে এই দৃশ্যমান বিষয়সকলকে সত্য বলিতেছ কিরূপে? সাকাররাজ্য অপেক্ষা নিরাকার রাজ্য তাঁহারা কেন সত্য বলিতেন, ইহা বোঝা কিছু একটা কঠিন বিষয় নয়। তাঁহারা দৃশ্যমান বিষয়সমূহের আবরণ ভেদ করিয়া উহার মূলে কি আছে, তৎপ্রতি দৃঢ়মনোভিনিবেশ করিতেন। এই দৃঢ়মনোভি-নিবেশে তাঁহারা নিরাকার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য বাস্তবিক সত্য বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সকল জগৎ ও জীব অন্তশ্চক্ষুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল; থাকিল এক অনন্ত জ্ঞানসত্তা। এ জ্ঞানসত্তাকে আর কোন উপায়ে তাঁহারা উড়াইতে পারিলেন না। যাহা বহু যত্নেও উড়িয়া গেল না, তাহাকেই ঠিক সার সত্য বলিয়া তাঁহারা ধরিলেন। যাহা উড়িয়া যায় তাহা অসৎ, যাহা কিছুতেই উড়িয়া যায় না তাহা সৎ। সাকার অসৎ কেন না বিলুপ্ত হয়, নিরাকার সৎ কেন না বিলুপ্ত হয় না. এজন্যই নিরাকার চিৎসত্তাকে তাঁহারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। চিৎসত্তার নিকটে দৃশ্যমান জগৎ ধোঁওয়ার মত অপদার্থ হইয়া গেল। অন্তরে নিরাকারকে ধরিয়া যখন তাঁহারা বাহিরে আসিলেন, তখন সর্ব্বত্র সেই নিরাকারেরই প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। নরনারীর ভিতরে প্রেমপুণ্যের লীলা, অন্নপানের ভিতরে অন্নদায়িনীর অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইলেন। সাকার অবলম্বনমাত্র রহিল, নিরাকার রাজ্যেই তাঁহারা ক্রমিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বনসেন যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, আর জীবিতাশা নাই, তখন একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার পত্নীর মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন, "আর মৃত্যুকে কোন ভয় নাই, আমি তোমার মুখে অনাদ্যনন্তকে দর্শন করিলাম." ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার কালে পণ্ডিত বনসেন যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া অভয়প্রাপ্ত হইলেন, আর্য্য ঋষিগণ জীবিত কালে তাহাই নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেন। পুত্রেতে কন্যাতে, বন্ধুতে বান্ধবেতে, আত্মীয়ে স্বজনে, সেই নিরাকার অনাদ্যনন্তকে দর্শন করিয়া তাঁহারা বিগতভয় বিগতশোক হইতেন। আর তাঁহারা মৃত্যুকে ভয় করিবেন কেন? তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মেতেই স্থিতি করিতেন। ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া তাঁহারা 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' হইয়াছিলেন, অসৎ সাকার তাঁহাদিগকে আর আবদ্ধ রাখিবে কি প্রকারে? যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া তুরীয়াবস্থাতে স্থিতি করিতেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বিশ্বাস করিতেন। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থাতে স্থিতি করিয়া সংসারে অবস্থিত ছিলেন, সংসারের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান করিতেন। এই সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার কখন যোগভঙ্গ হইত না। তাঁহার এই যোগাবস্থা বলিয়া দিতেছে, নিরাকারে নিয়ত স্থিতি করিয়া সাকার রাজ্যে বিচরণ করিতে পারা যায়। মহর্ষি ঈশার জীবনেও এ যোগ আমরা দেখিতে পাই। নিরাকারকে যাঁহারা সত্য বলিয়া ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ যোগ অসম্ভব হইবে কেন? আমরা যদি মুখে নিরাকার সত্য বলিয়া অন্য লোকের ন্যায় সংসারে কার্য্য করি, তাহা হইলে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান মিথ্যা। আমাদের এ বিষয়ে নিয়ত সাবধান হইতে হইবে। আমরা এ সংসারে বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য আসি নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার আয়োজনসমূহের মধ্যে যদি ব্রহ্মদর্শন না হয়, তবে সে সমুদায় বিষবৎ দূরে পরিহার করিতে হইবে। ঋষিরা প্রথমে সমুদায় ত্যাগ করিলেন, পরে যখন তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন হইল, তখন সংসারে আসিলেন। সংসারে

আসিয়া আর তাঁহাদের সে ব্রহ্মদর্শন বিলুপ্ত হইল না। লোকে বলিতে লাগিল, ইঁহারা সংসারী হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়ত চিদানন্দে ডুবিয়া ছিলেন। শাক্য যখন কঠোর তীব্র তপস্যায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিলেন, তখন তাঁহার পঞ্চ শিষ্য ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবায় রত ছিল, কিন্তু যাই তিনি আহার-পানে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তাহারা ভ্রষ্ট মনে করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শাক্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রথম প্রযত্ন ছিল সেই পঞ্চশিষ্যকে নির্ব্বাণাধিকারী করা। সংসারী লোকেরা যোগভ্রষ্ট মনে করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না, ভিতরে যোগ দিন দিন প্রগাঢ় হইয়া আসিতেছে কি না ইহাই দেখিতে হইবে। যদি প্রতিদিন দেখিতে পাই সাকার অপেক্ষা নিরাকার সত্য হইতেছেন, সাকার আর চিত্তকে বান্ধিয়া রাখিতে পারে না, সাকার ছাড়িয়া উহা কেবল নিরাকারে বিচরণ করিতেছে, তাহা হইলে আর ভয়ের কারণ রহিল না। সাকারে আবদ্ধচিত্তেরই যোগভ্রষ্ট হইবার ভয়। সেই সাকার যদি অসৎ ধোঁয়ার মত প্রতীত হইল, তাহা হইলে আর ভয়ের কারণ কোথায়? নিরাকার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে যিনি নিয়ত বিচরণ করিতেছেন, নিরাকার ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না, সমুদায় সৌন্দর্য্য নিরাকারে তাঁহার নিকটে ঘনীভূত হইয়াছে, তিনি আর প্রলোভনকে কেন ভয় করিবেন? এখানে অণুমাত্র দ্বৈধ থাকিলে চলিবে না; সমুদায় সংশয়ের অতীত হইতে হইবে। আমাদের এ সকল হইতেছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। আমরা আর্য্য ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগের সেই যোগ জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছি, ইহা আমাদিগকে দেখাইয়া যাইতে হইবে। অন্যান্য অসার প্রয়াসে জীবন যাপন করা আর আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর নয়। সেই অনন্ত ভূমা মহান্ ঈশ্বরকে সাকার মধ্যে নিরাকাররূপে ধারণ করিয়া নিত্যকাল তাঁহাতেই বিচরণ করিব, ইহারই জন্য আমাদের প্রাণগত যত্ন হউক। যে তুরীয়াবস্থায় স্থিতি ঋষিগণের যোগের উচ্চতম ভূমি ছিল, সেই ভূমি আমাদিগেরও আয়ত্ত হইবে, ইহাই আমাদিগের আশা। সকলে ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন, সে ভূমির সন্নিকর্ষ লাভ করিয়াছেন কি না? ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা অচিরে সেই ভূমিতে আরোহণ করিব, এই আমাদের হৃদয়ের বাসনা।

যোগাচার্য্যসম্মত সাধনপ্রণালী।

যোগাচার্য্যের সাধনপ্রণালী কি? এ প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর এই যে, তিনি প্রতিব্যক্তিকে স্বভাবের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। 'স্বভাব সদোষ হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না,' তাঁহার এই অনুশাসন জীবনে কি প্রকারে নিয়োগ করা যাইতে পারে, ইহাই বুঝিবার বিষয়। সম্প্রতি গীতার যে সমন্বয় ভাষ্য বাহির হইতেছে, তাহাতে আমরা স্বভাববিহিত সাধনপ্রণালীর বিবৃতি দেখিতে পাই। সত্ত্ব রজ, ও তমোগুণসংসর্গে প্রতি-মানুষের স্বভাব উৎপন্ন হইয়াছে, যোগাচার্য্যের এই মত। স্বাভাবিক সাধনপ্রণালী ঠিক এই মতের অনুরূপ না হইলে, কখন আমরা উহাকে তাঁহার মতানুযায়ী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সমন্বয়ভাষ্যে ত্রিবিধ গুণের অনুরূপ সাধনপ্রণালী এইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ তমোগুণ। তমোগুণের ক্রিয়া অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা। মনে হইতে পারে অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা আবার সাধন প্রণালীর অন্তর্ভূত হইবে কি প্রকারে? অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা জড়-স্বভাব, সাধনে জড়স্বভাবের উপযুক্ত স্থান আছে কি না, জড়-ভরতের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। আহার পানাদি ভোগ্যবিষয়ে জড়স্বভাব অবলম্বন করা সাধনের পক্ষে অতীব অনুকূল। ভোগবিষয়ে যে ব্যক্তি জড়স্বভাবাপন্ন, ভোগাকর্ষণে সে কখন পথভ্রষ্ট হইতে পারে না। অতএব আমাদের প্রতিজনের মধ্যে তমোগুণের যে অংশ আছে, সেই অংশকে ভোগ্যবিষয়সম্বন্ধে নিয়োগ করিয়া জড়ভরতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা শ্রেয়স্কর। রজোগুণের কার্য্য উদ্যম, উৎসাহ বল। ইহারও নিয়োগের বিশেষ স্থল আছে। সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে প্রবল উদ্যম সহকারে নির্জ্জিত করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রজ্ঞাবান্ থাকা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সাধন করিতে হইবে। প্রজ্ঞাবান্ বা স্থিতপ্রজ্ঞ হইলেই সাধন শেষ হইল তাহা নহে। সত্ত্বগুণের ক্রিয়া জীবনে প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন। এ স্থলে মহর্ষি বশিষ্ঠের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক স্থিত-প্রজ্ঞ ব্যক্তিকে অপরোক্ষব্রহ্মদর্শনে কৃতকৃত্য হইতে হইবে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনে যখন সাধক কৃতকৃত্য হইলেন, তখন ভগবদাজ্ঞা-পালন তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব হইল। তখন যোগাচার্য্যের এই উক্তি তাঁহার জীবনে সিদ্ধ হয়, "নিরন্তর আমাতে (সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষেতে) চিত্ত সংলগ্ন করিয়া তাহারা আমার ভজনা করে, তাই আমি (সর্ব্বান্তর্য্যামী) তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করি; যে বুদ্ধিযোগে আমায় তাহারা লাভ করে। তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিতি করি, এবং সেখানে থাকিয়া দীপ্যমান জ্ঞানদীপ যোগে আমি (সর্ব্বান্তর্য্যামী) তাহাদিগের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি।" (১০ অ, ৮—১১ শ্লোক।)

সংবাদ।

আগামী শুক্রবার ৫ই কার্ত্তিক হইতে সোমবার ৮ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চারি দিন ৩নং রমা নাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বিশেষ ভাবে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব হইবার কথা।

ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন আরা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার পায়ের ক্ষত শুকাইয়াছে কিন্তু এখনও ফুলা রহিয়াছে।

স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সদানন্দ কয়েকদিন হইতে নিরুদ্দেশ ছিল। এক্ষণে জানা গেল যে সে ধুবড়িতে আমাদিগের একটি বন্ধুর গৃহে অবস্থিতি করিতেছে।

রামবাগানের স্বর্গগত শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ দত্তের সাংবৎসারিক শ্রাদ্ধ তাঁহার কন্যা, বাগবাজারস্থ আমাদিগের বন্ধুবর স্বর্গগত শ্রীযুক্ত কালী নাথ বসুর পত্নীকর্ত্তৃকগত ২৯শে অশ্বিন সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

ভাই অমৃতলাল বসু গত রবিবার কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান হইয়া কৈলোয়ার গিয়াছেন।

গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে বাঁকিপুরস্থ শমসোলা ও লমা মৌলবি এমদাদ এমাম সাহেবের পিতামহের আশ্রয়ে থাকিয়া স্বর্গগত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আরব্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে জানা গেল যে, তাহা নয়। রাজা যখন রংপুরে বিষয়কর্ম্মে আবদ্ধ ছিলেন তখন একবার অবকাশ কালে তিনি পাটনা নগরে আসিয়া উক্ত মৌলবি সাহেবের পিতামহের আতিথ্য গ্রহণে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

গোরকপুর হইতে প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন;—ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় এখানে আসিয়া ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন এবং পবিত্র বিধানের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। প্রকাশ্য একটি স্থানে রবিবাসরিক উপাসনা হইতেছে। বিগত ৯ই অক্টোবর রবিবার স্থানান্তরে "খোদা কি কুদরৎ ও আদমী কি হিক্‌মাৎ" বিষয়ক বক্তৃতা হিন্দি ভাষায় বিবৃত হইয়াছিল। দুই শতাধিক লোক আগ্রহের সহিত এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া ছিল। সন্ধ্যা ৭টার সময়ে বক্তৃতা সমাপন করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত রবিবাসরিক উপাসনাস্থলে শাস্ত্রপাঠ ও সঙ্গীত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গভাষায় এক সুদীর্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশ সময়োপযোগী এবং উৎসাহপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। বারান্তরে বক্তৃতা দিবার ইচ্ছা আছে।

আমাদিগের প্রচার কার্য্যালয়ের সমস্ত পুস্তক এক্ষণে অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম থাকিবে। আশাকরি এ সুযোগ কেহ পরিত্যাগ করিবেন না।

ব্রাহ্ম বেনেভোলেন্ট এণ্ড কো—অপারেটিভ এসোসিয়েসন তিনবৎসরাধিক হইল সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে একটি সভ্যেরও মৃত্যু হয় নাই। সম্প্রতি প্রথম শ্রেণীস্থ একজন সভ্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বিধবা পত্নীকে এই সভা হইতে ১০০৲ এক শত টাকা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সভার দাতব্য বিভাগ হইতে বাঁকিপুরস্থ একটি অনাথ ব্রাহ্মপরিবারকে মাসিক ২৲ দুই টাকা করিয়া সাহায্য করা হইতেছে। আশাকরি এই সভার উন্নতি-কল্পে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া দেশের একটি গুরুতর অভাবমোচন করিবেন।

শ্রীমান্ মনোমথধন দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত আলাপিনী নামক সঙ্গীতবিষয়িনী পাক্ষিক পত্রিকা প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলাম। ইহার কাগজ ও মুদ্রাঙ্কন অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মসঙ্গীত ও অন্যান্য উত্তম সঙ্গীত অতি সহজে অপরের সাহায্য ব্যতীত শিখিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। আশা করা যায় ইহা সর্ব্বসাধারণের খুব আদরের সামগ্রী হইবে।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১লা কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REGISTERED No C. 37

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
২০ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে মাতঃ, তুমি তোমার সন্তানগণকে দর্শন দিতে কুণ্ঠিত, এ কথা কি প্রকারে বলিব? বরং যাহাতে তাহারা তোমায় দেখিয়া সুখী হয়, তাহারই জন্য তোমার যত আয়োজন। আমরা যখন তোমায় উপেক্ষা করিয়া বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ি, তোমার স্নেহ স্মরণ করি না, আমাদের প্রতি তোমার প্রতিদিনের যত্ন দেখিয়াও দেখি না, সকলই যেন এমনি হইয়া যাইতেছে তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, এই ভাবে দিন কাটাই, তখন তুমি আমাদের চেতনার জন্য পরীক্ষা পাঠাও, এমন কি আমাদের প্রবৃত্তিবাসনাগুলিপর্য্যন্ত আমাদিগকে জাগ্রৎ করিবার জন্য ক্লেশোৎপাদন করে। যতই বিষয় সেবা করি, ততই কেবল যাতনা বাড়ে। কি জন্য কি হইতেছে, বুঝিতে না পারিয়া তোমার ব্যবস্থার উপরে আমরা দোষ দি। আমরা যাহা চাই তাহা তুমি দাও না, ইহা বলিয়াই বা তোমার উপরে আমরা কত বিরক্ত। কিসে আমাদের কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ তাহা আমরা বুঝি না, অথচ তোমার উপরেও আমাদের বিশ্বাস নাই। অধিকন্তু আমরা যাহা কল্যাণ মনে করি, তাহা না দিয়া যাহা আমরা অকল্যাণ মনে করি তাহাই যখন তুমি প্রেরণ কর, আমাদের মনঃপীড়ার আর শেষ থাকে না। আমাদের মনঃপীড়া হইল বলিয়া তুমি কি আর আমাদিগকে ক্ষণিক সুখে সুখী করিবার জন্য আমাদের নিত্যকালের কল্যাণ ভুলিতে পার? আমরা জীবনে অনেকবার দেখিলাম, আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম, যদি তাহা পাইতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের কি দুর্দ্দশাই না হইত। আজ কি আর তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকিতাম, না তোমার বিধানের আশ্রয় পাইতাম। এত দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের চৈতন্য হইল না, আমাদের মোহ ঘুচিল না। কোন একটি বিষয়ে তোমার ইচ্ছা কি, যত দিন আমরা স্পষ্ট বুঝিতে না পারি, সেই অবকাশে আমাদের বাসনা কামনা কত কি কল্পনা মনে আনিয়া জোটায়, আর আমাদের অন্তরের শান্তি আমরা হারাইয়া ফেলি। তোমার ইচ্ছা স্পষ্ট বুঝিবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়টি আমাদের ঘোর পরীক্ষার স্থল হইয়া রহিয়াছে। যদি আমরা তোমায় সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া, তোমার উপরে নির্ভর স্থাপন করিয়া এই সময় অতিবাহিত করি, আমাদের কোন ভয়ের কারণ থাকে না, কিন্তু যদি অণুমাত্র হৃদয়ে অবিশ্বাস স্থান পায়, আমাদের

এই সময়ে পতনের সম্ভাবনা। যদি তোমার উপরে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া আমরা এই সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাই, তোমার প্রেমমুখ দেখা আমাদের পক্ষে অতি সহজ হইয়া পড়ে। তখন আর তোমার মাতৃমূর্ত্তি আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকে না। অতএব, হে জননী, তব পদে এই ভিক্ষা করি, আমরা যেন যত ক্ষণ তোমার ইচ্ছা বুঝিতে না পারি, তত ক্ষণ বিশ্বস্ত মনে তোমার উপরে নির্ভর করিয়া থাকি, এবং যত পরীক্ষা শান্ত হৃদয়ে বহন করি। এই ভাবে পরীক্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া আমরা তোমার দর্শন লাভ করিব, এই আশা করিয়া বার বার তব চরণে প্রণাম করি।

শারদীয় ব্রহ্মোৎসব।

শারদীয় ব্রহ্মোৎসব এখন সাধকগণের সাধনের অন্তর্গত হইয়াছে। যেখানে নববিধানসমাজ আছে, সেখানেই এই উৎসব হইয়া থাকে। বেদান্তের পরব্রহ্মকে মার সাজে গৃহস্থের বাড়ীতে অধিষ্ঠিত দেখা এই উৎসবের উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য যদি সফল না হইত, সাধকগণের এই উৎসবের প্রতি এরূপ অনুরাগ বৎসর বৎসর কিছুতেই বাড়িত না। বিগত ৫ কার্ত্তিক শুক্রবার ৩ সংখ্যক রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সপ্তমী দিনে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হয়। প্রাতে মাতৃস্তোত্র পাঠানন্তর ৯৷৷০ টার সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। মফঃসলস্থ কয়েকজন বন্ধু, এবং স্থানীয় উপাসক উপাসিকাগণ উপস্থিত হন। উপাসনা গৃহটি সুন্দররূপে যুবকগণ কর্ত্তৃক সজ্জিত হইয়াছিল। নিয়মিত উপাসনানন্তর এ দিনে যে উপদেশ হয় তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হিন্দুর দুর্গোৎসবে আমাদের আমোদ কেন? আমাদের এ সময়ে কাঁদাই তো স্বাভাবিক, তবে আমরা হাসিতেছি কেন? আমাদের মা এ সময়ে আমাদের নিকটে নূতন বেশে আসিবেন, তাই আমরা হাসিতেছি। কাঁদিবার বিষয় অনেক, সে জন্য আমরা কাঁদিতেছি না তাহা নহে, কিন্তু কান্নার ভিতরে হাসি মার দর্শনলাভের আশায়। এ সময়ে নূতন ভাবে মা দর্শন দিবেন যদি এ আশা না থাকিত, আমাদের এ উৎসব করিতে প্রবৃত্তি হইত না। আজকার দিনের প্রার্থনায় আচার্য্য শিশুগণের যে আবদার প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আবদার যদি আমরা প্রতিজন শিশু হইয়া মার নিকটে জানাইতে পারি, আমাদের নিকটে মা কি আর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন? আচার্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন, "দয়াময়, এ সময়ে যদি ছোট ছোট ছেলেরা তোমাকে গিয়া বলে 'ভগবতি, এয়েছিস্? আমাকে কোলে কর্‌বি? আমার পায়ে নূতন জুতা আছে। সেই আর বছর আমাকে কোলে করেছিলি, পৃথিবীর মার কোল থেকে টেনে নিয়েছিলি, সেই যে মোয়া খাইয়েছিলি। তুই কি ঠাকুর মা, না দিদি মা? এত দিন আসিস্‌নি কেন? তুমি কি খুব দূরে থাক? আকাশে থাক? দূর বলে আসতে পারনি? তা হলোই বা, তুমিত খুব বড় মানুষ? তবে আসতে পারিলে না কেন? তুমি আমাদের বাড়ী দুবেলা এস না কেন? শুনেছি কারো কারো বাড়ীতে দুবেলা যাও, আমাদের বাড়ীতে কেন এস না, গরিব বলে? তোমার না কি বড় দয়ার শরীর? তবে আসিতে পার না কেন? তুমি তিন দিন বই থাক্‌বে না কেন?" সরল শিশুরাই এরূপ আবদার করিতে পারে? আমরা পারি না কেন? মাতো আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই আছেন, আমরা জ্ঞানে স্বীকার করি, কিন্তু স্বীকারের মত দেখা পাই না, এর কারণ কি? একত্র থাকিয়াও দেখা নাই; অবশ্য মাঝে কোন আবরণ পড়িয়াছে। যদি নূতন সাজে সজ্জিত মাকে দেখিবার জন্য আমাদের আজ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই আবরণ উন্মোচন করিতে হইবে। আবরণ উন্মোচন না করিলে নিশ্চয়ই আমাদের আমোদের দিনে কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে।

এ আবরণ কি? আমাদের প্রবৃত্তিবাসনা। প্রবৃত্তিবাসনা আমাদের মনকে বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; উহাকে ভিতরে কিছুতেই প্রবেশ করিতে দেয় না। যদি ভিতরে যাই, বিষয়চিন্তা সেখানেও আমাদিগকে ছাড়ে না। কোথায় ভগবৎপাদারবিন্দ চিন্তা করিব, না অচরিতার্থ বাসনার কোলাহল ও বিরোধ কিছুতেই থামে না মন যদি প্রবৃত্তিবাসনার দাস হইয়া ভিতরেও বাহিরের বিষয়ে বান্ধা থাকিল, তাহা হইলে আন্ধার ঘুচিল কৈ; আন্ধারের আবরণ উন্মোচন হইল কোথায়? প্রবৃত্তিবাসনার এ আন্ধার, এ আবরণ ঘুচাইতে না পারিলে আমরা কিরূপে মার মুখ দর্শন করিব? প্রবৃত্তিবাসনা আমাদিগকে সুখ দেয়, তাই কি আমরা উহার দাস হইয়া পড়িয়াছি? বিষয় ভোগ করিয়া কি কোন দিন আমাদের তৃপ্তি হইয়াছে, না হইবার সম্ভাবনা আছে? ভোগের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা বাড়িয়া যায়, প্রবৃত্তির প্রভুত্ব দৃঢ়মূল হয়। বাসনা বিষয়তৃষ্ণার আগুন প্রজ্বলিত করে, প্রবৃত্তি তাহাতে ক্রমান্বয়ে আহুতি দিতে থাকে? প্রবৃত্তিবাসনায় যাহাদের সঙ্গে বান্ধা পড়িয়া রহিয়াছি, তাহারা সময় পাইয়া আমাদিগকে খেলার সামগ্রী করিয়া ফেলিয়াছে, যখন যেরূপ ইচ্ছা

আমাদিগকে লইয়া সেইরূপ খেলা করে। ইহারা আমাদিগকে সুখ দেয় না, কেবল দুঃখ বাড়ায়, অথচ যেখানে গেলে আমরা সুখী হইব, সেখানে যাইতে দেয় না। যদি ইহারা দুঃখই দিবে, তবে ইহারা সুখের আশা দিল কেন? সুখের আশায় ভুলিয়া যাহাদের হস্তগত হইলাম; পরিশেষে তাহারাই দুঃখী করিবে, ইহা যদি আগে জানিতাম, তাহা হইলে কি আর এ দশা কখন ঘটিত?

প্রবৃত্তিবাসনা কি তবে আমাদের নিজের নয়? এত দিন তো আমরা ইহাদিগকে আপনার বলিয়াই মানিয়া আসিয়াছি। বিষয়ের প্রতি আমাদের টান দেখিয়া ইহারা আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছিল, বিষয়ভোগে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম, ইহাদের মত ভোগের পথে সহায় ও বন্ধু আর নাই। এখন দেখিতেছি, সে সকলই ভুল! এরা দুঃখ দেয় কেন? এদের মন যোগাইতে একটু ত্রুটি হইলে, ইহারা হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দেয় কেন? যে সকল বিষয় দিয়া ইহাদিগকে তুষ্ট করিব, সে সকল বিষয়তো আর আমাদের আয়ত্তাধীন নয়? যথেষ্ট ধন চাহিলে যথেষ্ট ধন পাই কোথায়? যদিও বা পাই, তাতেও ইহাদের মন উঠে না। আরও চায়, আরও চায়, শেষে অধর্ম্মের পথে গিয়া ধন আনিয়া ইহাদের মন তুষ্ট করিতে হয়। তুষ্ট করিয়াও আমাদের তুষ্টি হয় না; অধর্ম্মের আগুন নরকের আগুন দিন রাত আমাদিগকে পুড়ায়। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিলাম, দাসদাসীতে, আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইলাম, ভোগের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করিলাম, বাহিরে কিছুরই অভাব রহিল না. অথচ বাসনা প্রবৃত্তি নিত্য নূতন তৃষ্ণা বাড়াইয়া সে সকলই বিফল করিয়া দিল। ইহারা আপনার করতলস্থ করিয়া পরিশেষে যেরূপ ক্লেশ দেয়, তাহাতে ইহারা যে আমাদের আপনার নয়, ইহা বুঝিবার আর বাকি নাই। তবে বুঝি ইহারা কাহারও নিযুক্ত গুপ্তচর হইবে? ছদ্মবেশে ইহারা আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছে! ইহারা আমাদের অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ইহারা আমাদিগের কখন ক্লেশ যাতনার কারণ হইত না। বুঝিয়াছি, ইহারা মার চর। মা আমাদিগকে বিপথ হইতে ফিরাইবার জন্য ইহাদিগকে আমাদের জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছেন। আমরা যখন বিষয়প্রলোভনে পড়িয়া বিপথে যাই, তখন ইহারা ক্লেশ, যাতনা, পরীক্ষা আনিয়া উপস্থিত করে, কিছুতেই আমরা শান্তি লাভ করি না। ইহারা আমাদিগকে এইরূপে জব্দ করিয়া মার কাছে লইয়া যায়; আমরা যাতনায় ছটফট করিয়া পরিশেষে তাঁহার শরণাপন্ন হই।

আমরা যখন প্রথমে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব দূর সম্বন্ধ ঘোচে না। যে পাপ তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল, তিনি নিকটে থাকিতেও নিকটে নাই, এই প্রকার অবিশ্বাস জন্মাইয়াছিল, সে পাপের ফল এখনও আমাদের মনে আছে। আমরা বিষয়ভোগেও সুখ পাই না, ঈশ্বরের সহবাস-জনিত আনন্দও পাই না। এই মধ্যাবস্থা কি পরীক্ষার অবস্থা! আমরা ঈশ্বরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবল চিৎকার করিতেছি, আর জগদীশ্বর, জগদীশ্বর বলিয়া অবিশ্রান্ত ডাকিতেছি। আমাদের নিকটে অন্তঃপুরের দ্বার রুদ্ধ। অশুদ্ধ মনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কে মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে? প্রবৃত্তিবাসনার বিকার লইয়া পরিত্রাণার্থী ঈশ্বরের দ্বারে ক্রন্দন করিতে পারে, ক্রন্দন করিতে করিতে যত বিকার ঘোচে, তত দূর হইতে ঈশ্বরের মুখ এক এক বার দেখিতেও পায়, কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ তাহার পক্ষে এখনও সম্ভব নহে। পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল আত্মা যদি মাঝে মাঝে ঈশ্বরের মুখ না দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে নিরাশ হইবে, অনন্ত জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবে, এজন্য ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাহাকে দেখা দেন, সে তাহার হৃদয়ের তরল আন্ধারে নিকটে থাকিতেও তাঁহাকে দূরে দেখে, ঠিক তিনি যেমন তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। অন্তঃপুরে গিয়া মাকে দর্শন করিতে হইলে বলিদানের প্রয়োজন। বলি না দিয়া কেহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় না। পশুবলি, নরবলি দ্বিবিধ বলিই মা গ্রহণ করেন। বলিগ্রহণে প্রসন্ন হইয়া তিনি সন্তানকে আপনার চরণতলে উপবেশন করিতে অধিকার দেন। আজ সপ্তমীর দিনে সকলেই বলি লইয়া মার নিকটে গমন করিতে প্রস্তুত হউন। মার পূজা করিব, এই বাসনা করিয়া যদি তাঁহার পুত্রকন্যাগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া পূজা করুন। এ পূজা বিনা বলি সিদ্ধ হইবে না জানিয়া কাহার কি বলি দিবার আছে, লইয়া অগ্রসর হউন।

আজ হিন্দুগণ নির্দ্দোষ ছাগশিশু, মহিষশিশু মৃত্তিকানির্ম্মিত মাতৃমূর্ত্তির নিকটে বলি দান করিবেন। মৃত্তিকানির্ম্মিত মা তাঁহাদিগকে কখন পরিত্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের বলিও মাটির মার উপযোগী। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে মাটীর মা করিয়া যেমন তাঁহাদের অপরাধ ঘটিয়াছে, নির্দ্দোষ পশুশাবককে বলি দিয়াও তেমনি অপরাধ ঘটিতেছে। আমরা বাহ্য বলি দিব না। যুবকগণ প্রাচীরে অঙ্কিত করিয়াছেন "ঈশ্বর আত্মা, যাঁহারা তাঁহার পূজা করিবেন, সত্যে ও আত্মিকভাবে তাঁহার পূজা করিবেন।" ঈশার মুখে যে দিন এই কথা উচ্চারিত হইল, সেই দিন হইতে বাহিরের আয়োজনের পূজা বন্ধ হইয়া গেল। এখন বলি উপহার যাহা কিছু সকলই আত্মিক। ছাগ চাই, মহিষ চাই, নর চাই, নারী চাই, কিন্তু এ সমুদায়ই আত্মিক ভাবে। "কাম এষ ক্রোধ এষ," এরাই প্রকৃত ছাগ ও মহিষ। কামক্রোধকে বলিদান না করিয়া মিথ্যা নির্দ্দোষ ছাগ মহিষ বলি দিয়া পাপ বৃদ্ধি করা কেন? কামক্রোধের নিদর্শন ছাগ মহিষ এতদিন হিন্দু বলি দিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কি তাঁহাদের কাহারও অন্তরের কামক্রোধ বিনষ্ট হইয়াছে? যদি বিনষ্ট না হইয়া থাকে, তবে সে বলি দেবতা গ্রহণ করেন নাই। কামক্রোধকে বলি দিতে গিয়া হৃদয়ের প্রচুর পরিমাণ শোণিত ব্যয় হয়। সেই শোণিতে মার চরণ সিক্ত করে যে, তার প্রতি মা কি

প্রসন্ন না হইয়া কখন থাকিতে পারেন ? কেবল কাম ক্রোধকে বলি দিয়াই শেষ হইল না। আবার কাম ক্রোধের পুনরায় উৎপত্তি না হয়, এজন্য তাহাদের মূল অহং মার চরণে বলি দিতে হইবে। আমি বা অহংজ্ঞান কামক্রোধের মূল, এই অহংকে বলিদান সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য।

এই নূতন বলিদানের পথ ঈশরতনয় দেখাইলেন। তিনি আপনার আমিকে সম্যক্ প্রকারে পিতার চরণে বলিদান করিয়াছিলেন, অন্যথা তিনি কি আর ক্রুশোপরি জীবন দান করিতে পারিতেন ? যত ক্ষণ তিনি ক্রুশোপরি তাঁহার জীবন দেওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা নিশ্চয় না বুঝিলেন, তত ক্ষণ শরীরের রক্ত ঘর্ম্মে পরিণত করিয়া সমুদায় রজনী রোদন ও প্রার্থনা করিলেন। যাই বুঝিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, অমনি যে বিষপূর্ণ পানপাত্র তিনি অন্তরিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই পানপাত্র পান করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, তাঁহার বধের উদ্যোগে কোন বাধা দিলেন না, বিচারাসনের নিকটে আত্মপক্ষসমর্থন করিলেন না, নিজের বধার্থ ক্রুশ নিজে স্কন্ধে বহন করিলেন, কণ্টকের মুকুট পরিয়া ক্ষতবিক্ষত হইলেন, অত্যাচারী শত্রুগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পিতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রুশোপরি জীবন দিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে শিষ্যগণ ও তাঁহাদিগের শত শত অনুযায়িগণ আত্মবলিদান করিলেন বালবৃদ্ধ যুবা নরনারী কেহই আত্মবলিদানে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ঈশা আপনার শোণিত দিয়া জগতের পাপ ধৌত করিলেন, এ কথার অর্থ আছে। তিনি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনতা স্বীকার করিয়া নিদর্শনস্বরূপ আপনার শোণিত না দিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী কি আত্মবলিদান করিতে শিখিত ? ঈশা যেমন আত্মবলিদান করিলেন, তেমনি সকলকে আত্মবলি দিতে হইবে, অন্যথা তাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই নূতন বলিদানের পথ আশ্রয় করিয়া আত্মবলি না দিলে নরনারী পিতার চরণে স্থান পাইবেন কিরূপে ? ঈশা যেমন পরিত্রাণার্থ আপনার শোণিত দিলেন, আমাদিগকে সেইরূপ শোণিত দিতে হইবে। তিনি যে বলিয়াছেন, "গোধূমবীজ ভূমিতে পতিত হইয়া যদি বিনষ্ট না হয়, তবে তাহা একাকী থাকে ; কিন্তু যদি উহা বিনষ্ট হয় প্রচুর ফল প্রসব করে", একথা তাঁহার জীবনে সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি এক জীবন দিলেন, তাঁহা হইতে সহস্র সহস্র জীবন উৎপন্ন হইল। যে কোন নরনারী এইরূপে আত্মজীবন ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটে বলিদান করিবেন, তাঁহার এক জীবন সহস্র জীবন প্রসব করিবে।

মার পূজা সিদ্ধ হয়, এজন্য আজ আমাদের বলির আয়োজন করিতে হইতেছে। আজ আমরা কি বলি দিব ? নরবলী, নারীবলি। নরজাতির রুচি প্রবৃত্তি, নারী জাতির রুচিপ্রবৃত্তি, দুই মিশিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার জীব আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কিম্ভূতকিমাকার জীবকে আজ বলি দিতে হইবে। কাহার হৃদয়ে কোন্ প্রকারের রুচি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে, হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া সকলে দেখুন। সেই রুচি ও প্রবৃত্তি আমির সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, আমি আর আমি নাই, আমি সেই রুচি ও প্রবৃত্তি। এই রুচি ও প্রবৃত্তিকে বলি দিতে পারিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমিরও বলি হইয়া যাইবে। নরনারী আজ মার চরণে আমিকে বলি দিবেন, মা প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি সকলকে আপনার অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু অশুদ্ধ অপবিত্র নীচ বাসনাকামনায় আবদ্ধ সন্তানদিগকে তিনি কি প্রকারে স্বর্গে স্থান দিবেন ? এই অপবিত্র দেহ মন প্রাণ বিনষ্ট হইলে ইহার ভিতর হইতে দিব্যকান্তি ধারণ করিয়া নবীন নরনারী বাহির হইবেন। ইহাদিগের ভিতরে যে পশু ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, যে নর বা নারী ছিল তাহারা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পশুবলি নরবলি ও নারীবলি মরণের হেতু হয় নাই, নবজীবনের হেতু হইয়াছে। এখন তাঁহারা দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবীর চরণতলে দেবগণ সহ উপবেশন করিয়াছেন। আসুন তবে আমরা প্রাতিজনে এক বার অন্তরে প্রবেশ করি। দেখি কোন্ রুচি ও প্রবৃত্তিকে আজ আমাদিগকে মার চরণে বলি দিতে হইবে। যদি মার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অভিলাষ থাকে, তাঁহার রূপমাধুরী দেখিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজ নিজ রুচি ও প্রবৃত্তিকে বলি দিতে যেন আর কেহ পশ্চাৎপদ না হন। আমরা মার দর্শনের ভিখারী হইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলি না দিলে যদি তাঁহার দর্শন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলি দিতে আমরা কেনই বা কুণ্ঠিত হইব ? বলি না দিলে আমাদের শিশুত্ব সিদ্ধ হইবে না, শিশু না হইলে আমরা মার ক্রোড়ের অধিকারী হইব কি প্রকারে ? মা, আজ আমাদের প্রাতিজনকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা রুচিপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমিত্বকে বলি দিয়া চিরদিন তাঁহারই হইয়া যাই।

৬ই কার্ত্তিক শনিবার অষ্টমী। অদ্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি স্বতন্ত্র উপদেশ দেন না। প্রার্থনাতে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার সেই প্রার্থনার ভাব নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

হে দেবি, হে মহাশক্তি, তোমাকে পূজা করিয়া মানুষ দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়, পাপের দ্বারা পরাজিত হয়, ইহা কি সম্ভব ? শুনিয়াছি এবং জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, যাহারা তোমার পূজা করে, আরাধনা করে, তাহারা শক্তি লাভ করিয়া থাকে। মহাশক্তির পূজা করিলে শক্তিলাভ হইবে, পাপের উপর জয়লাভ হইবে, বিশেষ পুণ্যলাভ হইবে, তোমার উপর বিশ্বাস ভক্তি বাড়িবে ; মানুষ দুর্ব্বল হইবে কেন ? এই সময় সংবৎসরের বিশেষ সময়, বঙ্গদেশের ঘরে২ শক্তিপূজা হয়, কিন্তু শক্তিপূজা করিয়া, দেবীপূজা করিয়া, দেখি মানুষ আরও দুর্ব্বল হয়। তাহাদের

চরিত্রবল যায়, এক সময় যাহা ছিল তাহাও যায়, লোক পশুর সমান হয়, পাপ তাহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে। তবে বাস্তবিক শক্তিপূজা হয় না, সত্যদেবীর পূজা হয় না। আগুনের নিকটে যে থাকে, আগুনের তেজ ও উত্তাপ সংক্রমিত হইয়া তাহার দেহকে অবশ্য উত্তপ্ত করে। জলে যে নিমগ্ন হয়, তাঁহার শরীর অবশ্য শীতল হইয়া থাকে, জলের শৈত্যগুণ নিশ্চয় তাহাতে সঞ্চারিত হয়। হে পুণ্যশক্তি দেবি, তোমার সঙ্গে যাহার যোগ স্থাপিত হয়, তোমাকে যে শ্রদ্ধা ভক্তি করে তাহাতে পুণ্যের সঞ্চার নিশ্চয় হইবে। সে কি পাপ করিতে পারে? মহাশক্তি, তোমার সহিত যোগ স্থাপিত হইলে অন্তরে ও চরিত্রে শক্তিসঞ্চার হয়, দেবত্বলাভ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। শক্তির পূজা করিয়া যদি লোকে আরও অশক্ত ও দুর্ব্বল হয়, পাপাসুর কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হয়, তবে কেন পূজা করে? সেই পূজায় কি প্রয়োজন? বরং না করাই ভাল। আজ আমাদের প্রিয় জন্মভূমির মাতৃভূমির মুখে হাসি হইবে, উল্লাস আনন্দের চিহ্ন ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইবে, না পাপ কালীমায় তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এরূপ তো কোন দেশে কোন সমাজে হয় না। পূজা উপাসনা করিয়া এ প্রকার অবনতি ও দুর্গতি কোন দেশে দেখা যায় না। কোথায় বিশ্বাস প্রেম পবিত্রতা বাড়িবে, না একেবারে ক্ষয় হইবে? তবে সত্যদেবীর পূজা হয় না, সত্য আদ্যাশক্তি মহাদেবীর পূজা হয় না। চিন্ময়ী মহাশক্তির পূজা কি খড় মাটীতে হয়? তিনি প্রাণের ভিতরে প্রকাশ পান। আজ আর্য্যভূমির এত দুর্দ্দশা! যে দেশে পবিত্রতার জ্যোতি, পুণ্যের নির্ম্মল জ্যোৎস্না সঞ্চারিত হইতেছিল, আজ সেখানে এরূপ গাঢ় অন্ধকার!! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আজ কি উপাসনা ও প্রার্থনা হয়? বলিদান কি হয়? বিদ্বান্ পণ্ডিত বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, আজ বাল্যক্রীড়ার ন্যায় তাঁহারাও কি করিতেছেন। পুণ্যের জন্য, আধ্যাত্মিক বলের জন্য কোথায় প্রার্থনা করিবেন, না "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি," ইত্যাদি প্রার্থনা হইতেছে। আত্মবলি রিপুবলির পরিবর্ত্তে বনের পশু ছাগ মহিষাদির বলি হইতেছে। হায় কি হইল! তোমাকে লোকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিল! নিকৃষ্ট সংস্কার আসিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল! হে মাতঃ, দুর্গতিহারিণী, আমাদের দেশের দুঃখ দুর্গতি দূর কর। আমরা, হে দেবি, তোমাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া পূজা করিব, প্রকৃত শক্তি লাভ করিব। যাহাতে পুণ্যবল ধর্ম্মবল সকলে লাভ করিতে পারেন, এ দেশের পরিত্রাণ হয়, যাহাতে পাপী তাপীর উদ্ধার হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। তুমি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া লোকের ভ্রম ভ্রান্তি দূর কর, এবং যাহাতে সকলে তোমার দিকে আকৃষ্ট হয় সেইরূপ বিধান কর। প্রকৃত দেবী পূজা বুঝিতে দাও। হে মাতঃ, তুমি ব্যতীত আমাদের অন্য কেহ নাই। কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া আমাদের দুর্গতি দূর কর, এ দেশের দুর্গতি দূর কর। যদি তোমাকে না চিনিতে পারিল, তোমাকে পূজা না করিতে পারিল, তবে এ দেশের যথার্থ গৌরব কি? বাহ্যিক পূজায় কি হইবে, যদি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়। হে মঙ্গলময়, তুমি প্রকাশিত হও, কৃপা করিয়া আত্মার সম্বল, ধর্ম্মবল বিধান কর, আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের পাপ অধম মস্তকের উপর তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর। যাহাতে সংসারের পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা তোমার সঙ্গে যুক্ত হইতে পারি, হে পুণ্যদায়িনি, তুমি তাহা কর।

৭ কার্ত্তিক রবিবার নবমী। অদ্য ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সংক্ষিপ্ত সার এই:—তত্ত্বজিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্ম জীবন্ত কিরূপে জানা যায়? ধর্ম্মজীবন জীবন্ত কি না নিজের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। জীবন্ত লোকের সঙ্গে থাকিলে নিজের মৃতভাব বুঝা সহজ। যখন মানুষ মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন চিকিৎসক হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখেন উহা নড়িতেছে কি না, তেমনি যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে চিকিৎসক তাঁহারাও পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতে পারেন, এ ব্যক্তি ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে জীবিত কি মৃত। আচার্য্য এ সম্বন্ধে যে একটী কথা বলিয়াছেন, সেই কথাতে জীবিত ও মৃত অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম্মজীবন তখনই মৃত হয়, যখন ধর্ম্মবিষয়ে কোন কথা ভাল লাগে না। আর এক কথা এই, সাংসারিক জীবনে জীবিতলোকের যেমন যত্ন, চেষ্টা, উদ্যম প্রকাশ পায়, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে সাধনাদিতে উৎসাহ, উদ্যম, যত্ন, চেষ্টা দেখাইয়া দেয়, সাধক জীবিত আছেন মরেন নাই। জীবিত লোকেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু যখন তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, তখন পথের সম্বল সঙ্গে লইয়া থাকে। ট্রেণে যাইতে হইলে টিকিটক্রয়ের আয়োজন সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। ধর্ম্মপথের যাত্রিকগণসম্বন্ধেও সেই একই কথা। ধর্ম্মপথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া আছে। এ পথে কোন্ সম্বল লইয়া পথিককে গমন করিতে হয়? কামজয়, ক্রোধজয় রিপুজয়, এ পথের সম্বল। অনন্ত আনন্দধামে পথিককে যাইতে হইবে, সেখানে কেহ কাম ক্রোধ লইয়া

প্রবেশাধিকার পায় না। রিপুজয় ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ব্রত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সম্বল করিয়া যাইতে হয়। আজ এই বিশেষ দিনে বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়া আনন্দধামের যাত্রী হইতে হইবে। ঈশা মুষা প্রভৃতি সকলেই এ পৃথিবীতে যখন আনন্দধামের যাত্রী ছিলেন, সকলেই বিশেষ ব্রতধারী হইয়া আনন্দধামের যাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহারা উচ্চ ব্রত জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা ক্ষুদ্র লোক ব্রতসম্বন্ধে তাঁহাদের সমান হইব, এরূপ অভিমান করি না। কিন্তু আমারা যেমন ক্ষুদ্র তেমনি ক্ষুদ্র ব্রত কেন গ্রহণ করিব না? আমরা দীন হই, দরিদ্র হই, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, আমাদের বলি উপহার কি করুণাময়ী মা অগ্রাহ্য করিতে পারেন? অতএব আইস, আমরা আমাদের সামান্য যাহা কিছু সম্বল আছে তাহা লইয়া মার নিকটে যাই, তিনি অবশ্য আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সায়ঙ্কালে উপাসনাবাসে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে যে উপদেশ হয় তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে;—সত্যেতে ও ভাবেতে আমরা ঈশ্বরের পূজা করিব, এজন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। ঈশ্বরতত্ত্বসম্বন্ধে আমরা কোনপ্রকার অসত্যসংস্কার পোষণ করিতে পারি না। ঈশ্বর মঙ্গলময় ইহা আমরা স্বীকার করি, এবং মঙ্গলময় বলিয়াই আমরা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকি। বর্ত্তমান সময়ের অনেকগুলি পণ্ডিত, ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলিতে কুণ্ঠিত। তাঁহারা বলেন, জগতে যখন রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, বিবিধ প্রকারের যাতনা, দেশবিপ্লব প্রভৃতি মহানিষ্ট বিরাজ করিতেছে, তখন ঈশ্বর নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল ইহা বলিব কি প্রকারে? যদি তাঁহাকে মঙ্গলময় বল তাহা হইলে তাঁহাকে অমঙ্গলময়ও বলিতে হয়। এমন যে সর্ব্বোত্তম মানব দেহ, তাহা যদি এমন কীটজাতির আবাস করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, যাহাতে মানবের চরিত্রের শুদ্ধিপর্য্যন্ত রক্ষা করা দায় হয়, তাহা হইলে যিনি এরূপ হইতে দেন তাঁহাকে মঙ্গলময় বলা যাইবে কি প্রকারে? যদি সত্যই জগতে অকল্যাণ ও অমঙ্গলের রাজ্য থাকে, তাহা হইলে জগতের স্রষ্টা ও পাতা নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময় কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। কোন সম্প্রদায় যেমন এক জন মঙ্গলময় আর এক জন অমঙ্গলময়, এ দুইয়ের সাম্রাজ্য স্বীকার করে, ব্রাহ্মগণকেও তাহাই স্বীকার করিতে হইতেছে। ঈশ্বর নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময় ইহা সপ্রমাণ না হইলে আমরা কোন প্রকারে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া আরাধনা করিতে পারি না। যাহা দেখিতে অমঙ্গল বলিয়া প্রতীত হয় তাহা যদি মঙ্গল হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর মঙ্গলময় একথা বলা কখন সত্যবিরুদ্ধ নয়। অকল্যাণ— 'প্রচ্ছন্ন কল্যাণ', গভীর রূপে তত্ত্বালোচনা করিলে প্রতীত হয়। একথা এত দূর সত্য যে, যে সকল পণ্ডিত জগতে বিবিধ অমঙ্গল দর্শন করিয়া মঙ্গলবাদের পক্ষপাতী হইতে ভীত হন, তাঁহারাও অকল্যাণ যে 'প্রচ্ছন্ন কল্যাণ' ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। রোগ, শোক, বিপদ ইহারা সকলেই প্রচ্ছন্ন কল্যাণ, দেখিতে ভীষণ শত্রুর মত, কিন্তু ইহারা প্রতিনিয়ত মিত্রের কার্য্যই সাধন করে। মদ্যপান ব্যভিচারাদির সঙ্গে সঙ্গে রোগ দুঃখ ক্লেশ সংলগ্ন রহিয়াছে। ইহা কেবল তত্তদভিতোচারীর কল্যাণেরই জন্য। মদ্য যদি বিষ না হইত, ক্লেশকর রোগ সকলের উৎপাদক না হইত, তাহা হইলে উহা জনসমাজের কল্যাণকর কখন হইত না, কেবল উচ্ছেদক হইত। বেদান্তে একটী আখ্যায়িকা আছে, যখন সৃষ্টি হইল তখন অসুরেরা সেই সৃষ্ট বস্তুতে প্রবেশ করিল বলিয়া তাহাতে অসত্য দুঃখাদি মিশ্রিত হইয়া পড়িল। সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই সয়তান বা অসুর সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বিশ্বাস করে। যাহাকে আমরা অকল্যাণ বলি তাহাই অসুর। অকল্যাণের ভিতরে প্রচ্ছন্ন কল্যাণ রহিয়াছে, ইহার অর্থ এই, দেবশক্তি দ্বারা অকল্যাণ কল্যাণে পরিণত হয়। মনে কর তুমি পানদোষের অধীন হইয়া পড়িয়াছ, পানদোষে তোমার শরীর মন বিবিধ পাপ দুঃখের আধার হইয়াছে, দেবশক্তি

দ্বারা এই পানদোষরূপ অসুরকে বিনাশ কর, দেখিবে উহার ভিতর হইতে কল্যাণমূর্ত্তি প্রকাশ পাইবে। আজ আমরা অসুরনাশিনীর পূজায় প্রবৃত্ত। অসুরনাশিনীরমূর্ত্তি কল্যাণ মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তির পূজা দুদিন বা চারিদিন করিলে কিছু হয় না, প্রতি গৃহস্থের গৃহে প্রতিদিন ইঁহার পূজা হইলে তবে সকল পাপ দুঃখ গৃহ হইতে পলায়ন করে। অতএব প্রতিদিন নিজ নিজ গৃহে, পরিবারে অসুর-নাশিনী দুর্গতিহারিণীর পূজা সকলে করুন যে, সে গৃহে কখন পাপাসুর প্রবেশ করিতে না পারে।

৮ই কার্ত্তিক সোমবার দশমী। ভাই প্যারী-মোহন চৌধুরী অদ্য উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিজয়া দশমী আজ। আমাদিগের প্রিয়তম ধর্ম্ম-বন্ধু ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্মবীরের ন্যায় বলিলেন, "বিজয়া, তুমি চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাক। আদ্যাশক্তি সতী জয়া বিজয়া দুই সখীকে সঙ্গে লইয়া ভক্ত-হৃদয়ে থাকেন।" ইহার অর্থ কি? সমস্ত মানব-প্রকৃতি গাঢ়ভাবে জয়বাঞ্ছা করিতেছে। জয়ের ইচ্ছা প্রত্যেক নরনারীর অন্তরতম দেশে রহিয়াছে। প্রত্যেকেই জয় চায়। কেহই পরা-জয় চায় না। ঈশ্বরের নিগূঢ় ইচ্ছাই মহাপ্রকৃতি বিজয়া অথবা তাঁহার অনন্ত জয়-শক্তি। তাঁহার পুত্র কন্যা হইয়া কেহ শত্রু দ্বারা পরাস্ত হয় ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। আমাদের শত্রু কে? শুনিয়াছি শ্রীরামচন্দ্র মহাশত্রু দুষ্ট রাবণের হস্ত হইতে সতীকে উদ্ধার করিবার জন্য পরম সতী আদ্যাশক্তির পূজা করিয়া-ছিলেন। আমাদিগের মধ্যে কাহারও সেরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই। তবে আমরা কেন সতী পূজা করিতেছি? আমাদের শত্রু বাহিরে নহে; অন্তরে। অন্তরে পঞ্চভূতের আধিপত্য অথবা জড়বুদ্ধি, ষড়রিপুর অত্যাচার অথবা পশুবুদ্ধি, এবং বিকৃত বিষয়ানু-রাগ অথবা কুটিল মানববুদ্ধি, এ সকলই আমাদিগের শত্রু। এই ত্রিবিধ শত্রু—জড়ভাব, পশুভাব এবং নরভাব—অথবা জড়ত্ব, পশুত্ব, এবং নরত্ব বিনাশ করিবার জন্য তীক্ষ্ণতম অসির প্রয়োজন। সেই অসি কি? আমাদিগের পরমারাধ্যা বিশ্বজননীর শ্রীমুখের হাসি! যখন আমাদিগের পূজনীয়া সুহাসিনী জননী তাঁহার সুমধুর হাসিরূপ অসি দ্বারা আমাদিগের আন্তরিক এ সকল শত্রু নিপাত করিবেন, তখন আমাদিগের জড়-পশু-এবং নরবুদ্ধি-বিমুক্ত আত্মা "জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী" বলিয়া আনন্দে আনন্দময়ীর জয়ধ্বনি করিবে; এবং সেই ধ্বনি স্বর্গে প্রতিধ্বনিত হইবে। বাহিরের জড়-রাজ্য আমাদিগের শত্রু নহে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ভূত কিংবা দেহশুদ্ধি নামে এক প্রকার সাধন আছে। মুসলমানেরা ইহাকে অজু বলেন, ইহা দ্বারা চক্ষু-কর্ণাদি শুদ্ধ হয়, এই তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহা দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদিগের জড় দেহও আমাদিগের শত্রু নহে। কেহ কেহ বলেন শরীর পাপের আলয়। ইহা সত্য কথা নহে। পাপ মনের ব্যাধি। কাম ক্রোধাদি পাপ, শরীরের রোগ নহে। ষড়রিপু যদি শরীরের ব্যাধি হইত, তবে শরীরধারী কোন ব্যক্তিই সাধু কিংবা সতী হইতে পারিতেন না।

ঈশ্বর শরীরী আত্মাকে শরীরকে দমন করিবার ক্ষমতা দান করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইলে জড়দেহ অথবা ভৌতিক শরীরকে আর দোষী মনে হয় না। মনের ইচ্ছা ভিন্ন চক্ষু অভদ্র-ভাবে দর্শন করিতে পারে না, কর্ণ অভদ্র শ্রবণ করিতে পারে না, এবং রসনা অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে না। ঈশ্বর কোন মনু-ষ্যকে তাঁহার-প্রদত্ত পবিত্র শরীরের কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় কিংবা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা পাপ করিতে অর্থাৎ তাঁহার অনভিপ্রেত কোন কার্য্য করিতে বলিতেছেন না। পাপ অন্তরে, বাহিরে নহে। দৃশ্যবিষয়ে কিংবা দৃষ্টিশক্তিতে পাপ নাই। শ্রাব্যজগতে কিংবা শ্রবণশক্তিতে পাপ নাই। ঘ্রেয়জগতে কিংবা ঘ্রাণশক্তিতে পাপ নাই। রসাল পদার্থে কিংবা রসনায় পাপ নাই। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ স্বাধীন এবং সমর্থ হইয়াও আপনার দেহমন শাসন করে না, সে পাপাচার করে। ঈশ্বর কোন মনুষ্যকেই তাঁহার অবাধ্য হইয়া পঞ্চভূত কিংবা ষড়রিপুর সেবা করিতে বলিতেছেন না। যখন মানুষ কোন জড়, কোন পশু, অথবা কোন নরকে ঈশ্বর মনে করিয়া তাহার পূজা সেবা করে, সেই জড়-পশু-অথবা-নর-পূজা দেখিয়াও প্রকৃত ঈশ্বর হাসিতেছেন, ইহা যখন বিশ্বাসী দেখিতে পান, তখন আর সেই বিশ্বাসীর পাপের সম্ভাবনা থাকে না।

"নিরখি মধুর হাসি, মাতঃ, তব প্রেমাননে, হাসে প্রকৃতি সুন্দরী চিরপ্রফুল্ল যৌবনে।" বাস্তবিকই কি জড়-প্রকৃতি, কি পশু-প্রকৃতি, কি নর-নারী প্রকৃতি, সমস্ত প্রকৃতি, ঈশ্বরের নিরাকার চিন্ময় হাসি অর্থাৎ আনন্দমূর্ত্তির প্রতিকৃতি। এই হাসির মধ্যে ঈশ্বরের দুই সখী জয়া বিজয়া গোপনে বাস করিতেছেন। একটি সঙ্গীতে আছে, "কাম মোহ আদি পথের দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ, পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম দুই জনে।" শম দম, অথবা জয়া বিজয়া ব্রহ্মের দুই শক্তি। দম কি? যে শক্তিদ্বারা দুর্জ্জয় দশানন অথবা দৈহিক দশেন্দ্রিয়কে দমন করা যায় তাহার নাম দম। শম কি? যে ঐশী শক্তি দ্বারা প্রবল-ঝটিকা পীড়িত তরঙ্গায়িত সমুদ্র-সম দুর্জ্জয় রিপুকুল প্রশমিত করা যায়, তাহারই নাম শম। সংক্ষেপতঃ যে শক্তিদ্বারা দেহকে দমন করা যায় তাহার নাম দম, দান্তি, অথবা জয়া, এবং যদ্দ্বারা মনকে শান্ত করা যায়, যায়, তাহার নাম শম, শান্তি অথবা বিজয়া। এই জয়া বিজয়ার সাহায্য ব্যতীত কোন নরনারীর পরিত্রাণ নাই। কোন কোন ধর্ম্মবীর এই দুই ব্রহ্ম-বলকে বিবেক বৈরাগ্য বলিয়া থাকেন।

"(ব্রহ্ম-দত্ত) বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে, অনায়াসে চলে যাও স্বর্গ-নিকেতনে।" বিবেক এবং বৈরাগ্যরূপ দুই রাজ-দণ্ড দ্বারা যিনি আপনার দেহমন নিরন্তর শাসন করিতেছেন, তিনি জড়রাজ্য এবং মনোরাজ্যের সম্রাট। শম দম দ্বারা যাঁহার মন এবং দেহ উভয়ই শাসিত তিনি শান্ত দান্ত। "শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জ্জনঃ।" যে চিত্ত শান্ত, কিছুতেই তাহা অশান্ত হয় না। ধর্ম্মপিতামহ মহানুভব রামমোহন ধর্ম্মের জন্য তাঁহার জননীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার শান্তচিত্ত পূজনীয়া জননীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইল না। জগাই মাধাই নিত্যানন্দের রক্তপাত করিল; জুডাস্ বিশ্বাসঘাতক হইয়া স্বীয় পরমবন্ধু দেবর্ষি ঈশাকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিল। নিত্যানন্দ এবং ঈশা শান্তি-খড়্গ দ্বারা নির্ব্বাণের মধুর হাস্য দ্বারা এই মূঢ়দিগের মোহ পরাস্ত করিলেন।

ঈশা শত্রুকর্ত্তৃক ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন। কিন্তু কাহার জয় হইল? আজ ধর্ম্ম-জগৎ কাহার জয় ঘোষণা করিতেছে? তিনি কি তাঁহার ক্ষমারূপ অসি, অথবা দিব্য হাসি দ্বারা দুষ্ট জগৎকে পরাস্ত করেন নাই? ধন্য ঈশা! বলিহারি ঈশা!! তুমি কি না ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুখে পড়িয়াও বলিলে, "হে আমার দিব্য পিতা, ইহারা আমাকে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে মারিতেছে, ইহাদিগকে ক্ষমা কর ইহারা নির্ব্বোধ—ইহারা জানে না যে কি মহাপাতক করিতেছে।" শান্ত ঈশা, ক্ষমাশীল ঈশা নিগূঢ় যোগ-তত্ত্ব, অনন্ত জীবন-তত্ত্ব জানিতেন। তাই তিনি যোগভ্রষ্ট মানবজাতিকে অনিত্য জীবন অথবা মৃত্যু হইতে অমৃতধামে অর্থাৎ অনন্তজীবনরাজ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার দিব্য পিতার অভিপ্রায় এবং ইচ্ছানুসারে বাধ্য সন্তানের ন্যায় নিজ ইচ্ছায় অনিত্য ঐহিক জীবন পিতৃচরণে বলিদান করিলেন। তিনি জানিতেন দৈহিক জীবন প্রকৃত আত্মার জীবন নহে। "তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ। স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।" "তরুলতা মৃগ পক্ষীরাও জীবন ধারণ করে, কিন্তু ব্রহ্মমননে যাহার মন সজীব হয় তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন।" এই ব্রহ্ম-জীবনে ঈশা সঞ্জীবিত ছিলেন; তাই তিনি ব্রহ্মেতে শান্তভাবে ঐহিক জীবন বিসর্জ্জন করিয়া আপনার শরীর মনের উপরে পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন শম দম এই দুই ব্রহ্ম বল দ্বারা দেহরাজ্য এবং মনোরাজ্য শাসন করিয়া এই উভয়-রাজ্যের শান্ত দান্ত সম্রাট হইতে পারিলেই মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য সিদ্ধ হইল; আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না; কিন্তু ইহা পূর্ণ সত্য কথা নহে। কারণ, মানুষ কেবল ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড এবং আত্মিক জগৎ জয় করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। যেহেতু এই দুই জগতের এবং এই উভয় জগতের সম্পর্কিত তাহার দেহ মনের অন্ত আছে। সুতরাং এই দুই অন্তবিশিষ্ট রাজ্যের রাজা হইয়া সে সুখী হইতে পারে না। মানুষের অন্তরে অনন্তের অধিকারী হইবার জন্য অনন্ত পিপাসা রহিয়াছে। সে বলে, "অনন্তের টানে অনন্তের পানে ধায় প্রাণনদী বাধা নাহি মানে। বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে তাঁহাকেই প্রাণ চায়।" শম দম দুই বল দ্বারা সে সসীম মনোরাজ্য এবং জড়রাজ্য শাসন করে, আবার সে ভাবে কি বল দ্বারা সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতিকে বশীভূত করিবে। নিত্যমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্রহ্মকে কোন্ শক্তি দ্বারা বশ করা যায়? বিশ্বজয়ী বিশ্বনাথ কোন্ শক্তির নিকটে পরাস্ত হন? কে তাঁহাকে বলিতে পারে? "বিশ্বেশ্বর, তোমাকে আমার অধীন হইতে হইবে। আমি যাহা বলিব তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। আমি বলিব তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরে অষ্ট প্রহর বসিয়া থাক, তুমি আমার কথার অন্যথা করিতে পারিবে না। আমি বলিব অন্ধকারে সূর্য্যোদয় হউক, পৃথিবী স্বর্গ হউক, মানুষ দেবতা হউক। বিশ্বনাথ, আমার কথায় তোমাকে এ সকল করিয়া দিতে হইবে।" এই অসম্ভব কি সম্ভব হয়? সত্যই কি ব্রহ্ম ভক্তাধীন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু? ব্রহ্ম নিজমুখে বলিতেছেন, "সতী যেমন ভক্তি দ্বারা সৎপতিকে বশ করে, তেমনই আমার ভক্ত ভক্তি দ্বারা আমাকে তাঁহার অধীন করে।" ব্রহ্ম মিথ্যাবাদী নহেন। আমি যদি তাঁহার ভক্ত পুত্র, ভক্ত শিষ্য, ভক্ত প্রজা, ভক্ত দাস এবং ভক্ত মিত্র হইয়া তাঁহাকে বলি, "জগন্নাথ, মন্মথ, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার ইচ্ছা, তোমার যে বাঞ্ছা আমারও সেই বাঞ্ছা," তাহা হইলে আমি দেখিতে পাইব সমস্ত প্রকৃতিতে আমার ইচ্ছা অর্থাৎ আমার হৃদয়-নাথের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে। এই-রূপে জয়া বিজয়া ব্রহ্মের দুই শক্তি দ্বারা যেমন জড়রাজ্য এবং আত্মিকরাজ্য জয় করা যায়, তেমনই ব্রহ্মের সখী অব্যভিচারিণী পরম সতী ভক্তিদ্বারা এই দুই সসীম রাজ্যের অতীত অসীম স্বর্গ-রাজ্যের সম্রাট সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্মকে জয় করা যায়, অর্থাৎ আপনার করা যায়। ব্রহ্ম আমার মিত্র হইলে কেহই আর আমার শত্রু থাকে না। তখন আমি বলি, "তোমাতে যখন মজে আমার মন, তখনই ভুবন হয় সুধাময়।" সত্য সত্যই তখন ব্রহ্মশক্তি জয়া, বিজয়া, সতী, অথবা, দান্তি, শান্তি, ভক্তি, এই ত্রিশক্তি, এই ত্রিনীতি আসিয়া আমাকে ব্রহ্মপ্রকৃতিতে মিশাইয়া ব্রহ্মের হাসি-সুধাসিন্ধুতে ডুবাইয়া দেয়, এবং তখন ব্রহ্মশ্রী অথবা ব্রহ্ম-কান্তি আমার আত্মাকে আরাম দান করে; সকল বিরোধ চলিয়া যায়। ব্রহ্মের মধুর হাসিতে আমার প্রাণের সকল সন্তাপ দূর হয়। দেশে দেশে যুগে যুগে প্রকৃত ভক্তগণ ভক্তবৎসলের সঙ্গে ভক্তিযোগে এইরূপে মিশিয়া সতীদর্পে মহিষা-সুরকে বলিয়াছেন, "লঘুমার, জয়াসি ত্বাম্।" "দূর হও শয়তান", এবং সত্য সত্যই তাঁহাদিগের ব্রহ্মাগ্নিপূর্ণ বাক্যে পাপাসুর ভস্ম হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক নরনারীর জন্য পরব্রহ্ম এই শান্তি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়াছেন। ইহারই জন্য পাপের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম এবং এই মহাযুদ্ধে জয়লাভের জন্য পরমারাধ্যা জননী মহাসতী তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার মনে তাঁহার তিন সখী—সতী, জয়া, বিজয়াকে সংগোপনে বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন।

ভ্রমশোধন—গতবারে 'প্রেম মিলাইয়া দেয়' শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় স্তম্ভের চরম পংক্তির অন্তে এই কয়েকটী কথা বর্ণযোজকগণের ভ্রমে ভ্রষ্ট হইয়াছে;—পূর্ব্বক ঈদৃশ আচরণের প্রকৃত অভিপ্রায় কি,।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আত্মন, তুমি আপনার কথা আপনি বল, তোমার সম্বন্ধে কোন কথা অপরের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস হয় না। তুমি এক পরম রহস্য, তোমার ভিতরকার রহস্যভেদ তুমি ভিন্ন আর কি কেহ করিতে পারে? অথবা তুমিই তোমার আপন রহস্য ভেদ করিতে পার কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ। একপ স্থলে, হে আত্মন, যদি তোমার কথা বলিতে গিয়া কেহ তোমার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত কিছু বলে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। আমি তোমার বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আমি তোমার মুখে না শুনিয়া সে সকল কথায় প্রত্যয় স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত।

আত্মন, তুমি তোমার আপনার রহস্য ভেদ করিতে পার কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ, এ কথা বলিলাম কেন? তুমি যদি আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ না জান, তবে তোমায় সম্পূর্ণ জানেন কে? জানেন পরমাত্মা। তোমার জ্ঞানের ভূমি অতি অল্পদূর বিস্তৃত। বর্ত্তমানে তোমার মনে যে সকল ভাব আছে, চারিদিকের যে সকল অবস্থা আছে, তোমার জ্ঞান তাহারই মধ্যে বদ্ধ। তোমার ভাব সকল অস্থায়ী, চারিদিকের অবস্থাও পরিবর্ত্তনশীল। দুইই যখন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তখন তুমি কি হইবে, কিছুই জান না। আজ তুমি সংসারী, বৈরাগ্যের লেশমাত্র তোমাতে স্ফূর্ত্তি পায় নাই, বিশ্বাস তোমার অল্প, কিন্তু আর কয়েক দিন পরে যে, সন্ন্যাসী হইবে না, বৈরাগী হইবে না, একান্ত বিশ্বাসবান্ হইবে না, ইহা কি তুমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার? এজন্য বলি পরমাত্মা তোমায় চেনেন, আপনাকে আপনি তুমি চেন না।

আত্মন, তোমার জ্ঞানের অতীত ভূমিকে তুমি অতি আদরের চক্ষে দেখ, কেন না এখানে পরমাত্মার সহিত তোমার অতি সুখের সম্বন্ধ। ভবিষ্যৎ তুমি জান না, এজন্য অনেক সময়ে তোমার ক্লেশ হয়, অনেক সময় যাহা ইচ্ছা কর তাহার বিপরীত ঘটে, তোমার ভাবনা চিন্তা নির্দ্ধারণ সকলই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। বল, ইহাতে তোমার ক্লেশ কি দুঃখ কি? তুমি যদি পরমাত্মার বক্ষে বাস কর, এবং সকল বিষয়ের ভার তাঁহার হাতে রাখ, যখন যেরূপ ব্যবস্থা তিনি করেন, তাহার অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমার প্রশান্ত ভাব চিরপ্রসন্নতা কে বিনষ্ট করিতে পারিবে? তুমি আপনি দুর্ব্বল বট, কিন্তু অনন্তশক্তি তোমার বল হইয়া রহিয়াছেন, অনন্তজ্ঞান দিন দিন তোমার অজ্ঞানতা হরণ করিতেছেন, অনন্ত প্রেম তোমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ ভাব দূর করিতেছেন, অনন্ত পুণ্য তোমার হৃদয়ে স্বর্গের সৌন্দর্য্য সংক্রামিত করিতেছেন, তোমার আবার অভাব কি?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

উপাসনায় একাত্মতা সাধন।

৫ই আশ্বিন, রবিবার, ১৮১৮ শক।

সকল আত্মা এক হইবে, সমুদায় বিরোধ চলিয়া যাইবে, একত্বের ধর্ম্ম জগতে বিস্তৃত হইবে, সকল শাস্ত্রে সকল সম্প্রদায়ে এরূপ আশার কথা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে, যে ধর্ম্ম,—আপনার সাম্রাজ্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে, সকল লোক তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, সকল লোক এক অখণ্ড মণ্ডলীতে পরিণত হইবে,—এরূপ মনে করে না। আজ পর্য্যন্ত শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত মানবজাতির এই আশা পূর্ণ হইল না। এক ধর্ম্ম জাতি, দেশ ও কালানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, প্রত্যেক ধর্ম্মখণ্ড আপনার জয় অপর সমুদায়ের পরাজয়ের উপর স্থাপন করিয়া একত্ব ঘোষণা করিল, সুতরাং একত্বের আশা দূরতর হইয়া পড়িল। সকল দেশ, সকল জাতি, সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্মের আশা পূর্ণ করিবার জন্য নববিধান আগমন করিলেন, আশা হইয়াছিল যে, ইনি আসিয়া একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সাধকগণমধ্যে ধর্ম্মসম্প্রদায়মধ্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় কোন বিরোধ আর অবস্থান করিবে না। কিন্তু এখানেও মানবজাতির চিরদিনের আশা পূর্ণ হইবে, তাহার কোন চিহ্ন নয়নপথে পতিত হইতেছে না। তবে বোধ হয় অসময়ে নববিধান ঘোষিত হইয়াছে। চারি দিকে লোক আপনাকে লইয়া ব্যস্ত। ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা দূরে, ধর্ম্মসমাজেও আপনাকে লইয়া ব্যস্ততা আজও দূর হয় নাই। সকলেই আপনার স্বার্থ, আপনার মত, আপনার রুচি, আপনার অধিকার, সর্ব্বোপরি জয় লাভ করে, এই জন্য যত্নশীল। এরূপ স্বার্থপূর্ণ সময়ে নববিধান আপনার লোকের ভিতরে বা অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহা কিরূপে আশা করা যাইতে পারে?

দলের মধ্যে সুমিষ্ট একতা যদি দেখিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবিধানের দিকে সহজে দৃষ্টি যায়। শ্রীচৈতন্যের সময়ের ভক্তবৃন্দের বিনয়, ভক্তি, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, অপরকে সম্মানদান প্রভৃতি সদ্গুণ আলোচনা করিয়া দেখিলে মানবে মানবে একতা লাভ করিবার পক্ষে যে সকল গুণের প্রয়োজন তাহার সকলই তাঁহাদের ছিল, ইহা সহজেই সকলে দেখিতে পান। সকল ভক্ত তাঁহার সময়ে একপ্রাণ ছিলেন, এক চৈতন্যের ভাবে মুগ্ধ হইয়া সকলে এক হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এভাব অধিক দিন থাকিল না, অল্প দিনের মধ্যে মানবসমুচিত শক্রতা আসিয়া দেখা দিল, একতার স্থলে বিরোধ উপস্থিত হইল। শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেমে

যে একতার সূত্রপাত করিলেন তাহা ভাঙ্গিল কেন? তিনি ভক্তগণের নিকটে যে আদর্শ ধরিলেন, সে আদর্শ অনাদৃত হইয়া পড়িল, আদর্শ নিচু করিয়া ভক্তিবিধানকে সাধারণ লোকের উপযুক্ত করিবার জন্য যত্ন উপস্থিত হইল। ইহা কি চৈতন্যের তিরোভাবের পর প্রকাশ পাইয়াছিল, না তাঁহার জীবনকালেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। অদ্বৈতাচার্য্য যখন চৈতন্যদেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হাটে আর বিকায় না চাউল, ভেবে ভেবে আউল হইল বাউল' এ কথার অর্থ আর কি হইতে পারে? অদ্বৈতাচার্য্য স্বভাবতঃ নিতান্ত দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন, তিনি চৈতন্যপ্রতিষ্ঠিত ভক্তির বিধি নিয়ম সকল দৃঢ়রূপে ভক্তগণের মধ্যে ঘোষণা করিতেন, কিন্তু তৎপালনে অনেকে শিথিলযত্ন হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ দুই জনের দুই দল হইল। ইহাঁদের দুজনের তিরোভাবের পর দুদলে ঘোর বিরোধ প্রকাশ্য আকার ধারণ করিয়াছিল। আরও দল খণ্ডিত হইল, শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এখন শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায় মধ্যে বিনয়াদির দৃষ্টান্তের অভাব নাই, কিন্তু শুদ্ধতা ও একতা যেন মনে হয় চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টের ধর্ম্ম বা শাক্যের ধর্ম্ম তন্মধ্যেও একতার আর আশা নাই। শাক্যের জীবনকালেই তাঁহার ধর্ম্মসম্প্রদায় খণ্ডিত হইয়া যাওয়ার দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। ঈশার শিষ্যগণের মতবিরোধ তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই প্রকাশ পাইয়াছে। পৃথিবীতে এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যাহাতে বিরোধের সূত্রপাত হয় নাই। একত্বের অভিমান কোন ধর্ম্মই স্থির রাখিতে পারে নাই। স্বদলে একতা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন অপর দলকে স্বদলে আনয়ন করিয়া একতা স্থাপন করা হইবে, এ আশা দুরাশা। সকল ধর্ম্মে যাহা হইল না নববিধান তাহা করিবেন, এ সাহসিকতা তাঁহাতে কি প্রকারে শোভা পায়? তিনি এমন কি নূতন উপায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, যে উপায় অবলম্বন করিলে, এত দিন যাহা হয় নাই তাহা সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে? বঙ্গদেশে যখন শ্রীচৈতন্য আসিয়া বলিলেন, হরিনাম সকলে কর, উদ্ধার হইয়া যাইবে, তখন এ অপেক্ষা সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? যাঁহারা ঈশ্বরের নাম অবলম্বন করিয়া ভক্তিসাধন করিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মেতে সকলের অপেক্ষা উচ্চভূমিতে আরূঢ় হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের আচরণ দেখিলেই সহজে বুঝা যায়। রামানুজাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে সময়ে বৈষ্ণববিধানের যে প্রকার মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অত্যল্প আশ্চর্য্য নহে। রামানুজাচার্য্যের জামাতা বৈষ্ণবগণের প্রতি ভ্রাতৃভাবে নিতান্ত আকৃষ্ট ছিলেন। কথিত আছে, নদী দিয়া এক দিন একটি শব ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার কণ্ঠে তুলসীর মালা ছিল। এতদ্দর্শনে আচার্য্য জামাতা তাহাকে জল হইতে তুলিয়া বৈষ্ণবজ্ঞানে আলিঙ্গন দান করিলেন, এবং বৈষ্ণবোচিত ভাবে সমাহিত করিলেন। এক জন বৈষ্ণব রাজা নিতান্ত বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন, অন্য এক জন রাজা তাঁহার অত্যধিক ভক্তিতে বিরক্ত হইয়া এক জন নীচজাতীয় ব্যক্তিকে বৈষ্ণব সাজে সাজাইয়া তাঁহার সভায় প্রেরণ করিলেন। রাজা সসম্ভ্রমে সেই ব্যক্তিকে বৈষ্ণবোচিত সমাদর করিলেন, এবং যাইবার বেলা তাঁহাকে যিনি পাঠাইলেন তাঁহার নিকটে একটি উপঢৌকন পাঠাইলেন। উপঢৌকন লইয়া সেই নীচজাতীয় অবৈষ্ণব রাজসভায় উপস্থিত হইলে সভাশুদ্ধ লোকে বৈষ্ণব রাজার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। যখন উপঢৌকনের বিবিধ মূল্যবান্ আবরণ উন্মোচিত হইল, তখন তন্মধ্যে স্বর্ণকৌটায় একটী কাণাকড়ী দৃষ্ট হইল। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন বৈষ্ণব রাজা অচতুর নহেন, রাজসভায় উপস্থিত হইবার অযোগ্য কাণাকড়ী যেমন মূল্যবান্ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত স্বর্ণকৌটার গুণে সম্মানিত হইয়াছে, তেমনি নীচ জাতীয় লোক বৈষ্ণববেশের আদরে তাঁহার নিকটে আদৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের অপর বৈষ্ণবের প্রতি ঈদৃশ শ্রদ্ধা সম্মাননা ও ভক্তি দেখিলে কে আর বলিবে, তাঁহারা একত্বধর্ম্ম পালন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে বাহ্য সমাদর এখনও যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে সকল বাহ্য লৌকিক ব্যবহার হইয়া পড়িয়াছে, ভাবের সহিত সম্বন্ধ অতি অল্পই আছে। যে ধর্ম্মে এরূপ সহজ সাধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে ধর্ম্ম অকৃতকার্য্য হইলেন, ইহার কারণ কি? শ্রীচৈতন্য নামগ্রহণ সহজ উপায় করিলেন বটে, কিন্তু সেই নামগ্রহণ করিবার অধিকারী যাঁহাদিগকে তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেরূপ লোক কোথায়? তৃণ হইতেও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু, স্বয়ং অমানী অথচ অপরের মানদ হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে, এ উপায় কি সহজ উপায়? অগ্রে বহু সাধন না করিলে কেহ কি আর ঈদৃশ অবস্থা লাভ করিতে পারে? ভক্তি পুণ্যভূমির উপরে স্থাপিত। পুণ্য দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে তৃণাপেক্ষা আপনাকে নীচ মনে করা প্রভৃতি গুণ সে ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। এই অবস্থায় ভগবানের নাম করিতে মানুষ অধিকারী, অন্যথা নাম করিতে গিয়া তাহাকে নামাপরাধী হইতে হয়। নাম করিলে পাপ যাইবে, এই আশ্বাসে নামসাধক পাপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ফলে এই হয় যে, পদে পদে তাহার নামাপরাধ ঘটে। "ঈশ্বরের নাম বৃথা গ্রহণ করিলে কেহ নিরপরাধী বলিয়া গণ্য হয় না।" একথা কি আর চৈতন্যদেব অগ্রাহ্য করিয়াছেন? এক জন বৈষ্ণব ভালই বলিয়াছেন "বৈষ্ণব হইব বলি বড় ছিল সাধ; তৃণাদপি শ্লোকে পাড়ল পরমাদ।" যে নাম গ্রহণ করিয়া জীব উদ্ধার পাইবে, সেই নামের প্রতি অপরাধ ঘটিয়া এখন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি, এখন আর সে পথে যাইতে কাহার সাহস হইবে?

সেবাধর্ম্ম সারধর্ম্ম। সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা শত লোক আমরা একত্র হইব, ইহা কি কখন সম্ভব নহে? খ্রীষ্ট জগতে কেমন শত শত লোক পরসেবার্থ জীবন সমর্পণ করিয়া একত্র কর্ম্ম করিতে-

ছেন। বৈদিক ঋষিগণের কর্ম্মযোগ বিচ্ছিন্নভাবে লোকদিগকে কর্ম্মে নিরত করিত, মহর্ষি ঈশার কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে সে কথা বলিবার উপায় নাই। অতএব আমরা কর্ম্মেতে একাত্মতা সাধন করিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন কর্ম্ম, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে দাসগণের মধ্যে একটা একতা উপস্থিত হয়, তাহাতে আর সংশয় করিবার কারণ কি? কিন্তু এ একতা একাত্মতা নহে, কেন না প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে ঈশ্বরের এক প্রকার ইচ্ছা নহে, সুতরাং নিয়োগও এক প্রকার নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি ও সামর্থ্যাদি অনুসারে ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্মে দাসগণকে নিয়োগ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কর্ম্মের ভূমি স্বতন্ত্র হওয়া অবশ্যম্ভাবী। একজন অন্যের কর্ম্ম করিতে পারেনা, অপরেও তাঁহার কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং দাসত্বে বা ইচ্ছাপালনে একতা থাকিলেও এখানে একাত্মতা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটাকার লাভ করিয়া ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য স্থাপিত হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। খ্রীষ্টসমাজে যে ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য, তাহার মূলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাবে কর্ম্ম করা যে নাই কে বলিবে? যেখানে ব্যক্তিত্ব প্রবল সেখানে একাত্মতা উপস্থিত হইবে, কখন আশা করা যাইতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সহজ পন্থা প্রদর্শন করে, সে দুই ধর্ম্মেই যখন একাত্মতার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে না, তখন অনাত্মতা-সাধক অতি কঠোর সাধনের পন্থা বৌদ্ধধর্ম্মের এ সম্বন্ধে উপকারিতা আলোচনা করিয়া কি ফল? নববিধান সকল মানুষকে এক করিবার জন্য কি উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাই দেখা যাউক। যদি তাঁহার আনীত উপায় সহজ হয়, তাহা হইলে সময়ে উহা যে এই অসাধ্য ব্যাপার সাধন করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ তিষ্ঠিতে পারে না। নববিধানে এসম্বন্ধে উপায় কি এই বেদী হইতে ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা আরও ভালরূপে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। নববিধানে যে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা যথার্থই একাত্মতাসাধক। নববিধানে নির্জ্জন সজন উভয় প্রকার উপাসনাই আছে, কিন্তু ইহাতে নির্জ্জন উপাসনা সাধকগণকে সজন উপাসনার জন্য উপযুক্ত করিয়া থাকে। আমি যদি নির্জ্জনে উপাসনা করিয়া উপাসনাশীল হই, তাহা হইলে সজন উপাসনায় যোগদান আমার পক্ষে সহজ হয়। যেখানে এক জন উপাসনা করিতেছেন, আর দশজন তাহার সহিত উপাসনায় এক হইয়াছেন, সেখানে একমত সাধন অতি সহজ। উপাসনা অন্তরের পাপ ধৌত করিবার জন্য, অবিনয়, অহঙ্কারাদি অপনয়ন করিবার জন্য, আপনাদিগকে নিতান্ত হীন জানিয়া মহতোমহীয়ান ঈশ্বরের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য। সুতরাং এখানে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া পরে উপাসনায় আসিতে হইবে, এরূপ নিয়মের অবকাশ নাই। এখানে কি তবে কিছুরই প্রয়োজন নাই। অবশ্য একটি বিষয়ের প্রয়োজন আছে, উহা বিশ্বাস। বিশ্বাস লইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। উপাসনায় মুক্তি, উপাসনায় গতি, ইহা বিশ্বাস না করিলে উপাসনায় প্রবৃত্তিই বা হইবে কি প্রকারে? এই একটি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশ্বাস চাই, সেই বিশ্বাসটিই নববিধানের বিশেষত্ব। আমরা সকলে ঈশ্বরেতে এক অখণ্ড প্রাণ হইয়া আছি, তিনি আমাদিগকে তাঁহাতে এক করিয়া রাখিয়াছেন। ভ্রাতৃভাব ভগিনীভাব এ সকল গৌণ সম্বন্ধ, এই যে ঈশ্বর প্রাণে একপ্রাণত্ব একত্ব বা একাত্মতা, ইহাই আমাদিগের মুখ্য সম্বন্ধ।

একজন উপাসনা করিবেন আর শত জন তাঁহার সহিত এক হইয়া ভগবানের সন্নিহিত হইবেন, ইহা বলিতে যে প্রকার সহজ শুনায়, কার্য্যতঃ তেমন আজ পর্য্যন্ত কৈ হইয়াছে? স্বয়ং উপাসনা করিলে বরং মন স্থির হয়, অপরের উপাসনায় যোগ দিতে গিয়া মন সহজে এ দিকে ও দিকে চলিয়া যায়। যিনি উপাসনা করিতেছেন, তিনি আপনার ভাবে আপনি উপাসনা করিতেছেন, সকল লোকেরই যে তাঁহার সহিত ভাবের একতা হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিতেছেন, সেই ভাবে উপাসনা করিতেছেন, আমি কোন পাপ করি নাই, মিথ্যা মিথ্যা অনুতপ্ত হইব কি প্রকারে? অনুতাপের উপাসনার সঙ্গে যোগ দিই বা কি প্রকারে? আজ আমার চিত্ত ভারগ্রস্ত; যিনি উপাসনা করিতেছেন তিনি আগাগোড়া ঈশ্বরেতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এ স্থলে তাঁহার সহিত আমার উপাসনায় যোগ হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? এক জন উপাসনা করিতেছেন, তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা নিতান্ত প্রবল, তাঁহার উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল জ্ঞানেরই বিকাশ। আমি ভাবুক ব্যক্তি, ভাব ভিন্ন আমার কিছুই ভাল লাগে না। এরূপ স্থলে উভয়ের উপাসনায় যোগ হইবার কি সম্ভাবনা আছে? এক জনের স্বর নিতান্ত কর্কশ, তাহার স্বর শুনিলেই মনে উদ্বেগ উপস্থিত হয়, সেখান হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা যায়, এরূপ স্থলে উপাসনায় যোগের কথা অতি দূরে? যাঁহার ভাবের সঙ্গে আমার ভাবের মিল আছে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে, কিন্তু এরূপ লোক অতি বিরল। অতএব উপাসনায় একতা কোন প্রকারে সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপায়াপেক্ষা যদি কঠিনও না হয় কাঠিন্যে সমতুল্য। মানুষের যখন আত্মাভিমান আছে, তখন যাহার তাহার উপাসনায় যোগ দিয়া যে সে একাত্মা হইবে, এ আশা করা দুরাশা।

ভাবে ভাবে মিল হইলে উপাসনা হয়, অন্যথা হয় না, হইতে পারে না, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু সকল সময়ে ভাবে মিল করিয়া লওয়া যাইতে পারে না, লওয়া অসম্ভব, একথায় নববিধান বিশ্বাস করেন না। এক জন পাপানুভব করিয়া তদনুরূপ উপাসনা করিতেছেন, আমি তাঁহার সহিত যোগ দান করিয়া উপাসনা করিব কি প্রকারে, নববিধান একথায় শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। সে ব্যক্তি পাপী, তুমি কি পাপী নও? তুমি বলিবে আমিতো উপাসনায় বসিবার পূর্ব্বে পাপবোধ লইয়া আসি নাই, বসিয়া পাপবোধ উদ্দীপন করিব কি প্রকারে? তুমিও পাপী ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হঠাৎ আত্মপাপের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া পাপবোধ জাগ্রৎ করা আর একটা কঠিন ব্যাপার কি? তুমি বলিবে, আমি কোন পাপাচরণ করি নাই স্পষ্ট জানিতেছি, এরূপ স্থলে মনে মিথ্যা মিথ্যা পাপবোধ তোলা কি ঠিক? স্পষ্টতঃ কোন পাপাচরণ কর নাই, অতএব তুমি পাপী নও, তুমি আপনার ভিতরে পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দেখিতেছ না, এ কথা বলিবার কি তোমার সাহস আছে? তুমি আপনি বোধশূন্য হইয়া থাকিতে চাও, ইহা কি তোমার পক্ষে যথার্থ ভাব? যদি তুমি সরল হও—সরলতাই জীবনে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন—তাহা হইলে পাপীর উপাসনায় অবশ্য যোগ দিতে পারিবে। তুমি বলিতেছ, যাহার আজ আনন্দ উথলিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ভারগ্রস্ত চিত্ত লইয়া আমি কি প্রকারে উপাসনায় যোগ দিব? তুমি কি ভারগ্রস্ত চিত্তের ভার অপনয়ন করিবার জন্য উপাসনা করিতে আইস নাই? ঈশ্বর তোমার ভার অপনয়ন করিবেন, তোমায় আনন্দিত করিবেন, এই জন্য তুমি আনন্দময়ের উপাসনা করিতে আসিয়াছ। যে উপাসনায় আনন্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে তোমার লাভ বিনা ক্ষতি কিছুই নাই। তুমি নববিধানবিশ্বাসী অথচ তোমার নব নব জ্ঞান-লাভের জন্য লিপ্সা নাই? তুমি জ্ঞানলিপ্সুর সহিত উপাসনা

করিতে পার না, এ কথা তোমাতে কিছুতেই শোভা পায় না। কোকিলকণ্ঠের লোক না পাইলে তোমার উপাসনা সিদ্ধ হয় না, কর্কশকণ্ঠ যেন কখন ঈশ্বরের নাম গ্রহণ না করে, এই কি তোমার মত? পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলেই কোকিলকণ্ঠ হইবে এই কি তুমি মনে কর?

হে নববিধানবাদী, তুমি বলিতেছ, তোমার একা একা মন স্থির হয় ভাল, অপরের উপাসনায় মন এ দিকে ওদিকে চলিয়া যায়, ইহাতে বুঝা যাইতেছে নির্জ্জনের উপাসনা কেবল শব্দের উপাসনা, বস্তুতঃ তোমার উপাসনা সিদ্ধ হয় নাই। রসনায় যে কথা উচ্চারণ কর তাহাতে তোমার মন স্থির হয়, কর্ণে যে কথা শ্রবণ কর, তাহাতে তোমার মন নিবিষ্ট হয় না, ইহার অর্থ কি? কথা বলিবার সময়ে তোমার নিজের প্রযত্ন আছে, শ্রবণ কালে তোমার প্রযত্ন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাই তোমার মনের ঈদৃশ চাঞ্চল্য! তুমি উপাসনা শুনিতে আসিয়াছ, করিতে আইস নাই, এই বোধ গূঢ় ভাবে তোমার অন্তরে আছে বলিয়াই এরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত। উপাসনাকে যদি তুচ্ছ ব্যাপার মনে কর, তাহাতে প্রযত্ন নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অপরের সহিত উপাসনা করিতেছ এরূপ ভাণ করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? অপরের মুখ হইতে উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া উহা সেখান হইতে গিয়া ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করিবে, ইহাই ঠিক সজন উপাসনা। নির্জ্জন উপাসনা হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব এই জন্য যে, নির্জ্জনে সাধক আপনি উপাসনা করেন, সজনে আপনি আত্মাতিরক্ত অপর আত্মার সহিত এক হইয়া উপাসনা করেন। এখানে যখন শত সহস্র আত্মা এইরূপে এক হইয়া গিয়া ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করে, তখন পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য উপস্থিত হয়। নববিধান পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, তাহা ঈদৃশ সজন উপাসনাতেই প্রকাশ পায়। গোপনে সকলের প্রাণ ঈশ্বরেতে যেখানে এক হইয়াছে সেখানেই স্বর্গরাজ্য।

স্বর্গগত শ্রীমান্ রামেশ্বর দাস।

গত কল্য রজনীতে আমাদের মণ্ডলীর একজন উৎসাহী কর্ম্মক্ষম সভ্য অনুমান ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অতি অল্পবয়সে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক পাইয়া অসদুপায়ে ধনোপার্জ্জনে বিমুখ হইয়াছিলেন, এ জন্য ইঁহাকে নির্ধনাবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল। যে বিভাগে ইনি কর্ম্ম করিতেন, সে বিভাগের কর্ম্মে অনেকে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু এক ধর্ম্মই ইঁহাকে সেই অসৎকার্য্য হইতে বিরত রাখিয়াছিল। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, বিদেশে থাকিলে ধর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত হয়, এজন্য উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিয়া, বেতনের আয় ন্যূন করিয়া ইনি কলিকাতায় আইসেন। এখানে আসিবার পর হইতে ইনি মণ্ডলীসম্বন্ধে বহু বিষয়ে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের ইনি একান্ত অনুগত ছিলেন, এবং এ আনুগত্য অনেক সময়ে অনেক আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীমান রামেশ্বর দাস অতি সুচতুর বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিচাতুর্য্য অনেক সময়ে মণ্ডলীর অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। অল্পবয়সে বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াতে ইনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক বুদ্ধিমত্তাবলে ইনি ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং ইদানীন্তনকার লিবারেল পত্রিকা তাঁহার লেখার জন্য ঋণী। যখন আচার্য্যদেব দেহে অবস্থিত ছিলেন, সে সময়ে ইনি মন্দিরের উপদেশ গুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেন, সেগুলি নিউডিসপেন্সেন পত্রিকার অঙ্গ শোভান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রবন্ধ তিনি লেখেন নাই তাহা নহে। সে সকলেতে দার্শনিক গভীরতা না থাকুক, ভাবের প্রাচুর্য্য বিলক্ষণ আছে। শেষ সময়ে স্বর্গগত শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী সেনের সহিত বিশেষ বন্ধুতাসূত্রে ইনি আবদ্ধ হন। ইনি অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন, বন্ধুসমুচিত ব্যবহার ইনি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার চারি পুত্র দুই কন্যা, মাতা ও পত্নী বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইনি মাতার একমাত্র সন্তান, সন্তানকে হারাইয়া বিধবা মাতার কি যাতনা সকলেই বুঝিতে পারেন। আপনার বিশ্বাসমত ইনি জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, অপর কন্যা এখনও নিতান্ত অল্পবয়স্কা। তিন পুত্র কর্ম্মক্ষম হইয়াছেন, এক পুত্রের পাঠাবস্থা। পত্নীর তিনি একমাত্র অবলম্বন ছিলেন, অসহায়ের একমাত্র যিনি অবলম্বন তিনিই এখন তাঁহার অবলম্বন রহিলেন। পুত্রহারা মাতা, পতিহারা পত্নী, পিতাহারা পুত্রকন্যাগণ, যিনি জীবনের সকল দুঃখ হরণ করেন, তাঁহার শরণাপন্ন হউন, অচিরে সুখশান্তি প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে এবং বুঝিতে পারিবেন, যিনি চলিয়া গেলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অসহায় ফেলিয়া যান নাই। স্বর্গগত আত্মা পরলোকে শান্তি সম্ভোগ ও বিশ্বাসসমুচিত অবস্থা লাভ করুন।

সংবাদ।

হাজারীবাগ, টাঙ্গাইল এবং ভাগলপুর হইতে আমরা সংবাদ পাইয়াছি, ঐ সকল স্থানে বিশেষভাবে শারদীয় উৎসব হইয়াছিল।

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল এ পর্য্যন্ত যাঁহারা মূল্য দেন নাই, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিতে আর বিলম্ব না করেন।

টাঙ্গাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ ঘোষ গত শারদীয়পূর্ণিমার দিন নববিধানমণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার জন্য দীক্ষিত হইয়াছেন, উপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। রাধানাথ বাবু প্রকাশ্য ভাবে আপনার বিশ্বাস স্বীকার করাতে হয় তো তাঁহাকে বিশেষ পরীক্ষায় পড়িতে হইবে। বিশ্বাসীর রক্ষক ভগবান্ তাঁহার সহায়।

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে পাঠকদিগকে জানাইতেছি, সাঁতারাগাছিনিবাসী আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য গত কল্য রাত্রি ১।৹ টার সময় আত্মীয়স্বজন সকলকে দারুণ শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। মাসাধিক কাল তিনি জ্বর ও উদরাময় রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। জগজ্জননী তাঁহাকে শান্তিধামে লইয়া যাইয়া আরাম প্রদান করিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিবিধান করুন। শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান পরিষ্কার ছিল। ভগবান্‌কে ভুলিবেন না, এ কথা বলাতে বলিলেন আমি ভগবান্‌কে মনে মনে ভাবিতেছি। আর কিছু ইচ্ছা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, ভগবান্‌কে পাইতেই এখনকার ইচ্ছা। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বাহ্যতঃ বিশেষ যোগ না দেখাইলেও তাঁহার প্রাণের টান ইহার প্রতি চির দিনই ছিল আমরা তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অভাবে আমরা একটি বিশেষ বন্ধুকে এ পৃথিবীতে হারাইলাম। তাঁহার আত্মা পরলোকবাসী অমর আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুখী হউক; আমাদের সঙ্গে তাঁহার যে প্রাণের ভালবাসার যোগ ছিল তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকুক।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৬ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REGISTERED No C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
২১ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৮২০ শক।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে পুণ্যময় পরমেশ্বর, আপনার বলে আমরা কোন দিন বাসনাজাল ছিন্ন করিতে পারি নাই, কোন দিন পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। আমরা বাসনা সহ সংগ্রাম করিতে পারি, জয়লাভ তোমার করুণার উপরে নির্ভর করে। যদি জীবনে এ সম্বন্ধে তোমার করুণার বল আমরা না দেখিতাম, তাহা হইলে সংগ্রামে জয়লাভের সম্ভাবনা আছে, ইহা কখন বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। সম্প্রতি জীবনে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, যদি তোমার ইচ্ছার অধীন হইবার জন্য অভিলাষ থাকে, প্রবল বাসনাকেও ভয় করিবার কোন কারণ নাই। বনের বাঘ বনের সাপ লইয়া খেলা করা, ইহা তত আশ্চর্য্য নয়, হৃদয়ের প্রবল বাসনাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে পারে কয় জন? বাসনাপ্রবৃত্তির হাতে প্রতিদিন শত শত লোক মরিতেছে, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন অবলম্বন করিয়াও তাহার হাত হইতে কেহ রক্ষা পায় না, আমরা কোন্ সাহসে তাহাদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অগ্রসর? যখন সংসারে আছি, তখন সংগ্রাম অপরিহার্য্য। এখানে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বা তপস্যা সম্ভবপর নহে। সংসারের শত কর্ত্তব্য যখন দেহ মনের বল শোষণ করিতেছে, তখন অন্যবিধ কঠোর তপস্যায় আর কি হইবে? কিন্তু, নাথ, কৈ এগুলিকে আজও তো তপস্যার অন্তর্গত করিতে পারিলাম না। রোগ, শোক, বিষাদ, দুঃখ, দারিদ্র্য, নিন্দা ঘৃণা প্রভৃতিকে যদি আমরা তপস্যার অন্তর্গত করিয়া না লইতে পারি, তাহা হইলে সংসার তপোভূমি হইল কোথায়? যাঁহারা তোমার হন, তাঁহাদের যশ, খ্যাতি, সম্ভ্রম পর্য্যন্ত তপঃক্লেশের অন্তর্গত। যখন আমরা সংসারে আছি, তখন আমাদের তপস্যা সংসারত্যাগীর তপস্যার সদৃশ কখনই হইতে পারে না। যদি আমরা ইহাদিগকে তপস্যার ভাবে গ্রহণ করিয়া জীবনশোধনের উপায়রূপে গ্রহণ না করি, আমাদের জীবন বিশুদ্ধ ও উন্নত কখন হইবে না, আমাদের হৃদয় কঠোর হইয়া যাইবে, বিশ্বাস শিথিল হইবে, প্রবৃত্তিবাসনা প্রবল হইয়া উঠিবে। আমরা সেই তপস্যাসমুচিত ক্লেশও ভোগ করিব, অথচ তাহার ফলভোগী হইব না, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক শাস্তি হইতে পারে? অতএব, হে দেবাদিদেব, তব পাদপদ্মে ভিক্ষা এই, তোমার নিয়মে প্রতিদিন জীবনে যে তপস্যার আয়োজন

উপস্থিত হয়, সেইগুলিকে জীবনসংশোধনে নিয়োগ করিয়া আমরা যেন তোমার কৃপাবল-লাভের উপযুক্ত হই। তোমার করুণায় আমাদের এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে বিশ্বাস করিয়া বার বার তোমায় প্রণাম করি।

অরূপের রূপ।

রূপদর্শন বিনা ভক্তির উদয় হয় না, ইহা আর কে না বোঝে? কিন্তু যাঁহার কোন আকার নাই, বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, রূপ নাই, রস নাই, কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিনি গ্রাহ্য নহেন, তাঁহার রূপ আছে, একথা বলা বাস্তবিক হাস্যাস্পদ। যাঁহারা নিরাকার একেশ্বরবাদী তাঁহারা 'রূপ' এই শব্দ শুনিবামাত্রই ইহাতে সাকারের গন্ধ পান, সুতরাং তাঁহারা ইহাতে যে নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইবেন, এবং সেই পৌত্তলিকতা আবার আসিল এই ভয়ে নিতান্ত ভীত হইবেন,ইহা একান্ত স্বাভাবিক। এজন্য রূপশব্দের প্রয়োগ আমাদিগকে অতি সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক করিতে হইতেছে। আমাদের সমাজে যেরূপ ভক্তিস্রোত প্রবেশ করিয়াছে, সঙ্গীত ও প্রার্থনাদির মধ্যে ঈশ্বরের রূপবত্তার যেরূপ বাড়াবাড়ি বর্ণন নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে আমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা প্রয়োজন। বিশেষতঃ ভক্তচূড়ামণি শ্রীমচ্চৈতন্য যখন আমাদের কর্তৃক গৃহীত হইয়াছেন, তখন ভক্তিতে তাঁহার সহিত ঐক্য রাখিবার জন্য 'অরূপের রূপমাধুরী' কি,আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইতেছে।

যদ্দ্বারা কোন বস্তু নিরূপিত হয়, তাহাই রূপ। বর্ণ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, শীতল, উষ্ণ ইত্যাদি গুণের দ্বারা বাহিরের পদার্থ সমুদায় আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়। বস্তু সকল আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ে আলোক-যোগে, বায়ুর আন্দোলনে, বা সাক্ষাৎ সংস্পর্শে প্রতিহত হইয়া বর্ণাদিসম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করে। এইরূপে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইল তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যাহাতে এই গুণগুলির সমষ্টি হইয়াছে, তাহাই সেই বস্তু, ইহা ব্যতীত বস্তুসম্বন্ধে আমরা আর কিছু বলিতে পারি না। পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বুঝিবার পক্ষে আকারই প্রধান, কেন না বর্ণাদিতে সহস্র বস্তুর একতা আছে, ভিন্নতা কেবল তাহাদিগের আকারে। একই প্রকার আকারের বস্তু সকল এক জাতীয়, অপর আকারের বস্তু সকল অপর জাতীয়, এইরূপ আকার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তু গৃহীত হইয়া থাকে। যদি এইরূপে আমরা পৃথক্ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে বর্ণদ্বারা শৈত্যাদি দ্বারা বস্তু পৃথক্ করা কখন সহজ হইত না।

সাকার যদি পদার্থনিরূপণের কারণ হইল, তাহা হইলে যাহা কিছু নিরাকার তাহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই, সুতরাং নিরাকারের রূপ কোন রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে না। আকারে বস্তুর বিশেষত্ব নিরূপিত হয়, বস্তুর সত্তা আকার-বোধের পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়া থাকে, ইহা বুঝিলে আর নিরাকার নিরূপিত হইবার যোগ্য নহে, ইহা আমরা বলিতে পারি না। জন্মান্ধের চক্ষু শস্ত্র-চিকিৎসায় আলোকপ্রবেশের উপযোগী করিয়া দিলে বস্তুসমুদায় আলোকযোগে চক্ষুতে প্রতিহত হয়, সে ব্যক্তি ঈষৎ কষ্টকর প্রতিঘাত অনুভব করে,অথচ বস্তু সমুদায় পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য তখনও তাহার জন্মায় নাই। এই প্রতিঘাত তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্বমাত্র জ্ঞাপন করে,বিশেষরূপে নিরূপণ দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফল। প্রতিঘাত যখন আপনা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর জ্ঞানলাভের মূল, তখন এই প্রতিঘাত শক্তিমাত্র আমাদের বুদ্ধিগোচর করিয়া দেয় বলিতে হইবে। আপনার বল, এবং তৎপ্রতিরোধক অপর বস্তুর বল, বস্তুজ্ঞানের আদিমসূত্র। এই বলই শক্তি, সুতরাং শক্তির অস্তিত্ব সকল জ্ঞানের মূল। এই শক্তির কোন আকার নাই, আকারবান্ বস্তুর ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় এইমাত্র। বায়ু, জল বা তেজ ইহাদের নিজের কোন আকার নাই, ইহাদিগকে

আকারবান্ বলা এই জন্য যে, ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যদি আকারবান্ কিছু অবলম্বন না করিয়া নিরাকারের প্রকাশ অনুভব করা না গেল, তাহা হইলে সিদ্ধ হইতেছে, স্বয়ং নিরাকার কখন আমাদিগের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। এ আপত্তি শুনিতে যত অকাট্য মনে হয়, বস্তুতঃ তত অকাট্য নয়। কোন বস্তুর প্রতিঘাত জন্য যে জ্ঞান উপস্থিত হয়, সে জ্ঞান কাহার? মনের। মন সাকার না নিরাকার? অবশ্য নিরাকার। যে কোন প্রণালী দিয়া কেন প্রতিঘাত গমন করুক না, সর্ব্বশেষে গিয়া পঁহুছায় মনে। মন যখন সেই প্রতিঘাত অনুভব করিল, তখন সেই প্রতিঘাতানুরূপ দেহে ও দেহযোগে চারিদিকে ক্রিয়া উৎপাদন করিল। সুতরাং বস্তুজ্ঞান ও তজ্জনিত ক্রিয়া উৎপাদনের জন্য মনে প্রতিঘাত পঁহুছান প্রয়োজন। নিরাকার হউক সাকার হউক, মনকে স্পর্শ করিলেই তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। এই জন্যই মনোমধ্যে বস্তুবিষয়ে যে সকল নিরাকার ভাব থাকে, উহারাও মনকে উত্তেজিত করিয়া শরীর ও তাহার বাহিরে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া থাকে,সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে নিরাকারও আপনাকে নিরাকার মনের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। যদি বল, এ ভাবের সমাগম প্রথমতঃ সাকার হইতে হইয়া পরে নিরাকার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ভাবোৎপাদনেও সাকার প্রধান। এ বিচারে হস্তক্ষেপ করিয়া কোন লাভ নাই। কেন না সর্ব্বপ্রথমে মনের ভিতরে অন্ততঃ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যঘটিত ভাব না থাকিলে যখন কোন জ্ঞানেরই উদয় হইতে পারে না, তখন এ বিচার বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডামাত্র। পিতৃপিতামহ হইতে সাদৃশ্যবৈসাদৃশ্যঘটিত ভাব শিশুতে সংক্রামিত হইয়াছে, এ বিচারও মূলশূন্য, কেন না এই রূপ ভাব বিনা যখন জ্ঞানের আরম্ভই হইতে পারে না, তখন যেখান হইতে প্রথম জ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেখানেই প্রথম হইতে উহার অস্তিত্ব সূক্ষ্মাকারেও স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে সিদ্ধ হইতেছে নিরাকার ভাব, অন্য কথায় নিরাকার শক্তি বাহিরের অবলম্বননিরপেক্ষ হইয়াও নিরাকার মনের উপরে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ। ফলতঃ শক্তিজ্ঞান এমনই আদিম যে, তাহা হইতেই সকল জ্ঞানের আরম্ভ। আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে শক্তি অনুভব করি বলিয়াই সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে শক্তি আমাদের অনুভবগোচর হয়। চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতে পাই, এই শক্তির আদি বা অন্ত আমরা কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং এক অনন্ত শক্তি হইতে আমাদের অরূপের নিরূপণ আরম্ভ হয়, এবং এই অরূপের প্রথম রূপ শক্তি—অনন্ত শক্তি। আমরা নিরাকার ভাব ও শক্তি উভয়কে এক করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এরূপে গ্রহণকরিবার প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রথম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি কেবল শক্তি নহে, জ্ঞানশক্তিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। একজন্য যেমন সর্ব্বত্র শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে, তেমনি জ্ঞানশক্তিও অনুভূত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানশক্তি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হয় বলিয়াই জড় ও চেতনের প্রভেদ আদিম লোকের মনে প্রতিভাত হয় না, সকলই তাহার নিকটে আত্মবৎ চেতন এবং অর্চ্চনার সামগ্রী। শক্তি ও জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভূত হয় কোথায়? অন্তরে, এবং সেখান হইতে সর্ব্বত্র সকল পদার্থে এই অনুভূতি ছড়াইয়া পড়ে এবং সকলই শক্তিমান্ ও জ্ঞানবান্ বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। শক্তি ও জ্ঞান যখন বস্তুমাত্র হইতে আমরা পৃথক্ ভাবে মানসগোচর করি, তখনই এই দুই স্বরূপকে আমরা অরূপের রূপ বলিয়া পরিগ্রহ করি।

আরও একটু অগ্রসর হও, শক্তি ও জ্ঞানের ভিতরে প্রেমের প্রকাশ দেখিতে পাইবে। এ সম্বন্ধে যদিও পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে, তথাপি প্রবন্ধের পূর্ণতা জন্য প্রেমের বিষয় কিছু বলিতে হইতেছে। জ্ঞান আমাদের অবস্থা, অভাব, এবং তাহা কি হইলে পূর্ণ হয় সকলই অবগত।

শক্তি আমাদের অবস্থা অভাব ও প্রয়োজন অনুসারে সমুদায় আয়োজন করিতে সমর্থ। এইরূপে শক্তি ও জ্ঞানপূর্ণ পরমদেবতার সহিত নিত্য ব্যবহার যখন আমরা দেখি, তখন তাঁহাকে আমরা প্রেম না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার ইচ্ছা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি আজ এ প্রকার অন্য দিন অন্য প্রকার করিবেন,ইহা তাঁহাতে কখন সম্ভব নহে। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত। সুতরাং তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তাঁহার প্রেম ও পুণ্য আনন্দে অভিন্ন। যেখানে প্রেম ও পুণ্য আছে, সেখানে দুঃখ শোক প্রবেশ করিতে পারে না, চিরপ্রসন্নতা, হর্ষ, আহ্লাদ বিরাজ করে। শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আনন্দ তাঁহাকে সাধকের নিকটে মূর্ত্তিমান্ করিয়া রাখিয়াছে, কেন না এ সকল আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, এখানে অনুমান বা সংশয়ের লেশমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না।

এই সকল স্বরূপই ব্রহ্মের রূপ, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপ তাঁহাতে আরোপ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী তাঁহারা সত্তামাত্র উপলব্ধি করেন। এখানে ব্রহ্মসম্বন্ধে কোন বিশেষ ভাবের বিকাশ হয় নাই, এজন্য সাধকের তৎসম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত গাঢ় হয় না। যখন সত্তা চিন্ময় সত্তা বলিয়া অনুভূত হয়, তখন কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব উপস্থিত হয় বটে,কিন্তু কেবল যদি ব্রহ্ম চিন্মাত্র এই বলিয়া সাধক কৃতার্থ হন,জ্ঞানজনিত তাঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ সাধক অনুভব না করেন, তাহা হইলে নির্গুণবাদের ভাবের গাঢ়তার অভাব থাকিয়া যায়। সত্তার সঙ্গে শক্তি ও জ্ঞান, এ দুই একত্র মিলিত হইলে এবং জীবনে ঐ দুই স্বরূপের ক্রিয়া দর্শন করিলে ভাবের গাঢ়তা উপলব্ধি হয়। আবার যখন এই শক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে প্রেম উপলব্ধি হয়, তখন ভাব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া থাকে। এইরূপে ভজনীয় ঈশ্বরের স্বরূপ সকল যত পরিস্ফুটরূপে ক্রমে উপলব্ধির বিষয় হয়, তত ভগবদনুরাগ গাঢ় হইতে গাঢ়তর এবং দর্শনজনিত আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে। শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আনন্দ সাকার নহে, কিন্তু সাকার অপেক্ষাও এ সকল প্রত্যক্ষ কেন না এই সকল স্বরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মাকে স্পর্শ করে ও উপলব্ধির বিষয় হয়। অরূপের রূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলিতে হয়। স্বরূপই ব্রহ্মের রূপ, এবং এ উভয়ের সহিত ভক্তশিরোমণি শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পারিষদবর্গের ঐকমত্য আছে *।

প্রেমে শত্রুতা বাড়ে কেন ?

প্রেম সকলকে মিত্র করে, প্রেমে শত্রু বাড়ে, এ কি প্রকারের কথা? প্রেমে শত্রু বাড়ে কি না, এ সংশয় তুমি করিবে কি প্রকারে? তুমি এই বলিতে পার, প্রথমে শত্রু বাড়ে বটে, কিন্তু শত্রুই শেষে মিত্র হয়। হঁা, শত্রু শেষে মিত্র হয় বটে, কিন্তু শোণিতপাত না করিয়া মিত্র হয় না, এ কথার উত্তর কি? শোণিতপান না করিয়া উগ্রতা নিবৃত্ত হয় না, উগ্রতা নিবৃত্ত হইলে মিত্র হয়, ইহা মন্দের ভাল। তবে যিনি প্রেম দিতেছেন, তিনি শোণিত দিতে প্রস্তুত, ইহাতে তাঁহারই মহত্ত্ব। যে শত্রুতা করিয়া পরে মিত্র হইল তাহার কিছু ইহাতে মহত্ত্ব নাই, বরং অধমত্বই প্রকাশ পাইল।

প্রেমে শত্রুতা বাড়ে ইহার কারণ কি? প্রেম আপনি সর্ব্বস্বান্ত হয়, যাহার প্রতি ধাবিত হয় তাহাকেও সর্ব্বস্বান্ত করিতে প্রাণগত যত্ন করে, শত্রুতা বাড়ে এই জন্য। সর্ব্বস্বান্তই পরম সুখ, সুতরাং প্রিয়পাত্রের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সুখ হউক,ইহা ভিন্ন তাহার জন্য আর কি ইহা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? প্রেমের শত্রু হয় কাহারা? যাহারা সংসারাসক্ত। কেহ যদি বলে, তোমার প্রিয়পাত্র ঈশ্বর চান না, সংসার চান, তাহা হইলে প্রেমিকের

* "কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকঃ" ইতি। "তচ্চ (অদ্বয়ং জ্ঞানং) বৈশিষ্ট্যং বিনোপলভ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে, বৈশিষ্ট্যেন সহ তু শ্রীভগবানিতি।" ইতি—ভগবৎসন্দর্ভ।

হৃদয়ে কি সুতীক্ষ্ণ বিষাক্তবাণ বিদ্ধ হয় না? প্রেমিকের আনন্দ কিসে? যদি সমুদায় পৃথিবীতে তাঁহার যশ ও খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সকল লোকেই যদি তাঁহাকে প্রশংসা করে, তবে তাঁহার তাহাতে আহ্লাদ হয় না, দুঃখ হয়, কেন না সে সকল তাঁহার প্রিয়পাত্রের হইলে তিনি সুখী হন, তাহার না হইয়া আমার হইল এই দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত। তিনি নিজে পরিত্রাণ চান না, প্রিয়পাত্রের সর্ব্বাগ্রে পরিত্রাণ চান, কেন না তিনি জানেন, তাঁহার প্রিয়পাত্রের পরিত্রাণ বিনা তাঁহার পরিত্রাণ হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। যাহার পরিত্রাণের জন্য তিনি দিবারজনী ভাবেন তাহার পরিত্রাণ না হইয়া নিজের পরিত্রাণ হইবে, এ কি তাঁহার পক্ষে সামান্য যন্ত্রণার বিষয়, যদি যন্ত্রণাই থাকিল, তবে পরিত্রাণ হইল কোথায়? তাই বলি প্রিয়পাত্রের পরিত্রাণ না হইলে প্রেমিকের পরিত্রাণ কিছুতেই হয় না।

প্রেমিক যাহাদিগকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহাদিগকে সংসারের সুখ ছাড়াইয়া স্বর্গের সুখ দিবার জন্য ক্রমান্বয়ে ব্যস্ততা প্রকাশ করেন, এবং এজন্যই তিনি তাহাদের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। যাহারা সংসার ভিন্ন আর কিছু বোঝে না, তাহাদিগকে লইয়া যদি তুমি ক্রমান্বয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি কর, তাহাদিগের ভাল লাগিবে কেন? তাহারা তোমার প্রতি বিরক্ত হইবেই হইবে। যদি তুমি বাড়াবাড়ি কর, পরিশেষে তোমায় শীঘ্র শীঘ্র যে কোন উপায়ে ইহলোক হইতে বিদায় করিয়া দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইবে। এ কালে কেহ প্রেমিককে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে সাহসী নয়, কেন না অপরের প্রাণবধে নিজ প্রাণের হানির ভয় আছে। কিন্তু এ কালে তুষানলের আয়োজন প্রচুর পরিমাণ রহিয়াছে। যাহাকে 'দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া প্রাণে মারা' বলে তাহার আয়োজনের কিছু অল্পতা নাই। এই 'দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মারাকেই' তুষানল বলিতেছি।

যদি প্রেমিক হইতে চাও, তাহা হইলে পৃথিবীর নিকটে প্রেমিকের যাহা প্রাপ্য তাহা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইও না। প্রেম যদি দিয়া থাক, তাহা হইলে তুষানলের ভয়ে কদাপি পশ্চাৎপদ হইও না। প্রেম যদি না দিতে অপরাধী হইতে না; এখন প্রেম দিয়া ফিরিয়া লওয়া, বল ইহার তুল্য আর কি ঘোর পাপ আছে? ঈশা এক বার ভাই ভগিনীকে যে প্রেম দিলেন, আর তাহা প্রত্যাহার করিতে পরিলেন না, কেন না দেওয়া প্রেম ফিরাইয়া লওয়াও যাহা, ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করাও তাহা। তুমি কি কাহাকেও প্রেম দিতে পার? যদি দিতে পারিতে তাহা হইলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে তুমি তোমার প্রিয়পাত্র পাইতে। কিন্তু কি শুভক্ষণে ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে লইয়া আর একজনের হাতে অর্পণ করিলেন, আর তোমার সাধ্য রহিল না যে, তুমি আর তোমার হৃদয় তাহা হইতে ফিরাইয়া লইতে পার। যেখানে আর তোমার ফিরাইয়া লওয়ার সামর্থ্য নাই, সেখানে তুমি তুষানলকে ভয় করিয়া কি করিবে? পোড়— তুষানলে পোড়, যিনি তোমায় প্রেমিক করিয়া তুষানলভাজন করিয়াছেন, তিনি তোমার সম্বন্ধে যাহা হিত আপনি করিবেন, তুমি কেন মিছা ভাবিয়া অস্থির হও।

দেখ, প্রেমের গোপনীয় কথা ব্যক্ত করা বড় বিপৎকর। প্রেমিক প্রেমের তাড়নায় যে সকল কথা বলে, সে সকল কথা সংসারী ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না, প্রেমিককে বঞ্চক বলিয়া স্থির করে, আর তাহাতে তাহার অপরাধের বৃদ্ধি হয়, পরিত্রাণ দূরতর হইয়া পড়ে। প্রেম চিত্তকে নিয়ত ব্যগ্র করে, তাই যত্ন করিয়াও গোপন কথা চাপিয়া রাখা যায় না, যখন বাহির হইয়া পড়ে তখন প্রেমিক আশা করেন, বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার প্রেমপ্রণোদিত কথা আপাততঃ অকল্যাণের কারণ হইলেও কালে উহার সুফল অবশ্যই ফলিবে। প্রেম যেমন বিফল হয় না, প্রেমপ্রণোদিত কথাসকলও তেমনি বিফল হয় না, প্রেমিকের এ বিশ্বাস যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে তিনি বাস্তবিকই প্রিয়পাত্রের নিকটেও

লাঞ্ছিত হইতেন, অপরাধের সাগরেও ডুবিয়া মরিতেন। প্রেমিকের সহায় ঈশ্বর স্বয়ং। তাঁহার আচার ব্যবহার কথা, সকলই তাঁহার দ্বারা নিয়মিত সুতরাং তাঁহার সকল দায়িত্ব স্বয়ং ঈশ্বরই মাথায় করিয়া বহন করেন।

প্রেমিক, তুমি শত্রুর সংখ্যা বাড়াইতেছ কেন? যে তোমার মত সর্ব্বত্যাগী হইতে চায় না, তাহাকে কি তুমি সর্ব্বত্যাগী করাইতে পার? সে তোমার ব্রত গ্রহণ করিবে, ইহা তুমি আশা কর, কি প্রকারে? ভিতরে সব ঠিক না হইলে কেহ কি কাহারও অনুরোধে সর্ব্বত্যাগী ব্রতধারী হইতে পারে? তোমার এ অন্যায় নির্ব্বন্ধই তোমার যন্ত্রণার কারণ। প্রেমিক এ সকল উপদেশে কর্ণপাত করেন না। তিনি ক্রমান্বয়ে অসম্ভব সম্ভব করিতে চান, আর পৃথিবীর শত্রুতা তাঁহার প্রতি বাড়িতে থাকে। প্রেমিকের এরূপ বৃথা চেষ্টা কেন? মিথ্যা মিথ্যা শত্রুতা বাড়ান কেন? প্রেম যাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই, তাঁহারা একথা বলিতে পারেন, কিন্তু স্বর্গের প্রেম যাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তিনি পৃথিবীর দৃষ্টি ভুলিয়া গিয়া স্বর্গের দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, সে দৃষ্টির নিকট কিছুই অসম্ভব নাই, যাহারা অসম্ভব বলে, তাহাদের উহা দুষ্টতা, তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান, সুতরাং তিনি লোকের কথায় কর্ণপাত করিবেন কেন?

তুমি আমি লোকের প্রিয় হইতে চাই, তাহারা কিছু না বলুক, এ দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, সুতরাং প্রেম আমাদের হৃদয়ে আসিয়া ফিরিয়া যায়, আর যেটুকু প্রেম অঙ্কুরিত হইতেছিল, শুকাইয়া গেল বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। প্রেমকে পৃথিবীর লোকের চেয়ে ছোট করা, ইহা কি স্বয়ং ঈশ্বরকে অপমান করা নয়? পৃথিবীর লোক যদি প্রেম হইতে বড় হইল তাহা হইলে ঈশ্বর হইতেও তাহারা বড়। প্রেমই ঈশ্বর, প্রেমের নিয়ম সকল ঈশ্বরেরই নিয়ম, ইহা কি আমরা জানি না? পৃথিবীর শত্রুতা ঈশ্বরের মিত্রতা এ কথা কি আমরা শুনি নাই, প্রত্যক্ষ করি নাই? তবে প্রেমকে কেন হৃদয়ে স্থান দিই না, প্রেমস্বরূপের আরাধনা করি না? যে নূতন ধর্ম্মে আমরা দীক্ষিত হইয়াছি তাহার আদিতে প্রেম, মধ্যে প্রেম, অন্তে প্রেম। প্রেম বিনা এ ধর্ম্ম কি কখন সাধন করা যাইতে পারে? লোকের নিকটে অপদস্থ হইব, নিন্দিত হইব, এই ভয়ে কি আমরা প্রেম ও ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিব? ঈশ্বর করুন, এরূপ দুর্ভাগ্য যেন আমাদের কখন না হয়!

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আত্মন্, আমি তোমার দেহের অনাদর করি তাহা নহে, কিন্তু এই বলি দেহ আমার অনুরাগের বিষয় নহে। যদি দেহই অনুরাগের বিষয় হইত, তোমার দেহ হইতে আরও কত সুন্দর সুন্দর দেহ আছে, তৎপ্রতি আমার অনুরাগ কেন ধাবিত হয় না, বলিতে পার? তোমার জন্য তোমার দেহের আদর, ইহা অপেক্ষা আমি আরও এই বলি, তোমার দেহের প্রতি আদর হ্রাস হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও প্রতি আদর হ্রাস হয়। ইহার কারণ কি জান? সৃষ্টির প্রতি অনাদরে যেমন স্রষ্টার প্রতি অনাদর হয়, দেহের প্রতি অনাদরে তেমনি দেহীর প্রতি অনাদর হইয়া থাকে।

আত্মন্, দেহ যদি এতই আদরের সামগ্রী হইল, তাহা হইলে দেহকে কোন দৃষ্টিতে দেখি শুনিতে চাও কি? দেহ এবং দুহিতা এ দুইকে এক জ্ঞান করি, কেন না দুহিতা দুঃখ দিয়া চলিয়া যায়; দুহিতা পিতৃগৃহ ছাড়িয়া অন্য গৃহে আশ্রয় লয়, দেহও সেইরূপ স্থানান্তরে গিয়া রূপান্তর ধারণ করে। আত্মা মাতৃস্থানীয়, আত্মা কখন ছাড়িয়া চলিয়া যায় না, অন্যত্র গিয়া ঘর বান্ধে না। ব্রহ্মনিকেতনে এ আজও বাস করিতেছে কালও বাস করিবে, চিরদিন এ আবাস ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবে না। আত্মাকে লইয়া আছি ভাল; প্রার্থনা করি, যেন আত্মাকে লইয়া চিরদিন সুখী হই। তবে দেহ ও আত্মা যত দিন একত্র আছে, ব্রহ্মনিকেতনেই উহাদের দুজনের বাস হউক, বল কে না আকাঙ্ক্ষা করে?

আত্মন্, নির্জ্জনে তোমায় অনেক কথা বলি, কিন্তু সে সকল কথাই যে তোমার ভাল লাগে ইহা আমি মনে করি না। যদি মনে করি না, তবে বলি কেন? যাহা সত্য জানি তাহা বলি, তোমার রুচিকর হইল কি না হইল, তাহা ভাবিয়া কি করিব? একই সত্য কখন তিক্ত, কখন মিষ্ট লাগে। যখন তিক্ত লাগে তখন বুঝিতে পারি, এখনও রোগের অবস্থা। যখন আবার সেই সত্যই মিষ্ট লাগিতেছে জানিতে পারি, তখন এই বলিয়া আনন্দিত হই যে,

আত্মন্, তুমি স্বাস্থ্য লাভ করিতেছ। আরও যত সুস্থ হইবে, তত সত্য ভিন্ন আর কিছুই তোমার মিষ্ট লাগিবে না। এখন যে সকল সত্য অভিশাপ মনে হইতেছে, সময় আসিবে, যে সময়ে সেগুলি অভিশাপ নয় আশীর্ব্বাদ, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে। সত্যসম্বন্ধে দেশ কাল নাই, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ইহার সমান প্রভাব। সুতরাং সত্য বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত, কেন না সত্যের প্রভাব তুমি একালেই হউক বা অন্য কালেই হউক, কখন অতিক্রম করিতে পারিবে না।

একেশ্বরবাদের অভিনবত্ব।

রবিবার ২৭এ ভাদ্র, ১৮২০ শক।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিবৃত :

আমাদের এই যে পবিত্র এবং অভিনব ধর্ম্ম, ইহা কেবল পরমাত্মা ঈশ্বরকে লইয়া। আমরা অন্য কাহাকেও জানি না, অন্য কাহাকেও মানি না, অন্য কাহাকেও ভজনা করি না, এবং অন্তিমে অন্য কাহারও ভয়ে ভীত হই না। এই নিরাকার জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ চৈতন্য হইতে আমরা বিশ্বাসের উৎকর্ষ, জীবনের সঙ্গতি এবং পরিণামের সম্বল লাভ করি। এই অজানিতের গভীর অন্ধকারে আমরা সচ্চিদানন্দের দর্শন পাই। অন্তরাত্মা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন আমাদের আর কেহ নাই। "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার কেহ নাই, ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আমি অন্য কাহাকেও জানি না এবং অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না" ইহাই আমাদের জীবনের সার কথা।

ঈশার কথা অনেক সময় বলি, শাক্যের কথা বলিতেও ত্রুটি করি না, চৈতন্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা চিরকাল করিয়াছি। কিন্তু আমাদের গম্যভূমি, আশ্রয় নিকেতন, আরম্ভ ও পরিণতি ও আদর্শ সকলি সেই আনন্দময় এক পুরাতন মহান্ পরব্রহ্ম। আমরা একেশ্বরবাদী এই কথা বলিলেও যেন আমাদের মনের আয়াস পূর্ণ হয় না। একেশ্বরবাদ যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের তাহা অপেক্ষা অনেক গভীর ও নূতন সম্পর্ক, সুতরাং আরও কোন ভাল ও অভিনব শব্দে ও ভাবে আমরা তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধের দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে পারিলে যেন সুখী ও কৃতার্থ হই। একেশ্বরবাদ নূতন নহে; ইহা বহুকাল পূর্ব্বে মানবজগতে আসিয়াছে। বরং পুরাতন কালে, পৃথিবীর সৃষ্টি কালে এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ অতি বিচিত্র। তিনি যুগে যুগে নানা প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

তিনি কোন সময়ে কোন মানুষকে অবলম্বন করিয়া মানুষ হন নাই, অথবা মানুষের আকার ধারণ করিয়া মনুষ্য স্বভাবের অভিনয় করেন নাই, কিন্তু যথাসাধ্য মানুষের মধ্য দিয়াও আপনাকে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই শেষভাগে তাঁহার যে প্রয়োগ তাহা অতীব বিচিত্রতাময়, অত্যন্ত আশ্চর্য্য। জগতে তাঁহারই প্রকাশ অতি অপরিস্ফুট ও সর্ব্বপ্রকার সংশয়-বিরহিত। অন্যান্য সময় কিছু আবরণ ছিল, এই বিধানে আর কোন আবরণ, কোন মাঝামাঝি, কোন ঘোর কপট নাই। সাক্ষাৎ তাঁহার প্রকাশ : আমরা এই বিধানে তাঁহাকে পাইয়াছি এই কথা বলিতে আর সঙ্কুচিত হই না। ইহা আমরা স্বীকার করি, এবং বিবেকের উপর হস্ত রাখিয়া বলিতে পারি এই বিধানে বিধানাশ্রিত সমস্ত নরনারী তাঁহাকে পাইয়া উপকৃত হইয়াছে; নরনারী নির্ব্বিশেষে পরিত্রাণপথের পথিক হইয়াছে। অন্যান্য সময়ে একেশ্বরবাদ ছিল কিন্তু সাধারণ নরনারীর তাহাতে কোন অধিকার ও কৃতার্থতা ছিল না। সেই একেশ্বর কেবল ব্যক্তিবিশেষের বা কতিপয়মাত্র বিশেষ ব্যক্তির পরিচিত ও ভোগ্য ছিলেন। বিশেষতঃ এই বিধানে যেমন ঈশ্বর একমাত্র, নিরাকার অথচ চৈতন্যময়, হৃদয়ে জীবন্ত জাগ্রত ব্যক্তিরূপে সাধকের মনে প্রীতি, প্রাণে আনন্দ, হৃদয়ে শান্তি ও আত্মাতে নিঃসংশয় দর্শন দিয়া আত্ম পরিচয় দিতেছেন এমন আর কোন কালে হয় নাই। এই ক্ষণে ব্রহ্মপরায়ণ সাধক তাঁহাকে সাক্ষাৎব্যক্তি জানিয়া তাঁহাতে অনুপ্রাণিত; প্রাণের আশা, মনের ব্যথা কি না তাঁহাকে বলিতে-ছেন; মনের সাধ তাঁহা হইতে পূরণ করিয়া লইতেছেন। ঈশ্বর এবং মানুষে এমন ঘনিষ্ঠ ও মিষ্টতম যোগ ও সম্পর্ক আর কখনও হয় নাই। তোমরা বলিতে পার ইহা পুরাতন কথা, অথবা ইহা সেই পুরাতন একেশ্বরবাদের সামান্য অভিনবত্বমাত্র; কিন্তু তাহা নহে। সত্য সমুদয় পুরাতন, সত্যের ন্যায় পুরাতন আর কিছুই নাই। এই পুরাতন আবার সময়ে সময়ে অত্যন্ত নূতন আকার ধারণ করে।

আমরা এই একেশ্বরবাদের নূতনত্বের সঙ্গে সমুদায় সত্যই নূতন দেখিতেছি। এই পুরাতন হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরে কত নূতন সত্য, নূতন রস লইতেছি; যাহা কোন হিন্দু খুঁজিয়া পায় না। বেদ বেদান্তের গভীর তত্ত্ব, উপনিষদের শ্লোক সংগ্রহ করিয়া কত লাভ করি, গীতা শাস্ত্র, যোগবাশিষ্ঠ মধ্যে কত সার সত্য দেখিতে পাই। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় মধ্যেও কত শিক্ষা লাভ করি। বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে যখন মনকে নিহিত করি, তখন অভিনব ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া যাই। শাক্যের মহানির্ব্বাণপথ আমাদের গন্তব্য পথ, কে কত সুগম করিয়া দিতেছে। এই সমস্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্ম মধ্যে কত ভাব, কত বিভূতি, ঈশ্বর লাভের কত প্রণালী, আমরা সমস্ত সংগ্রহ করিয়া জীবনের সম্বল করিতেছি। পুরাতন সমস্ত একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম ও শাস্ত্র পরস্পর কাটাকাটি করিতেছে, আমরা দেশবিদেশজাত সমস্ত তত্ত্বকুসুম সংগ্রহ করিয়া ঈশ্বরের মন্দির ও পবিত্র পূজার বেদী সাজাইতেছি। দেশবিদেশস্থ শাস্ত্রনিহিত রত্নরাজীদ্বারা পরমা-রাধ্যা জগজ্জননীর প্রেমাঞ্চল পরিশোভিত দেখিতেছি।

আমাদের ধর্ম্মরক্তের সঙ্গে বিজাতীয় ঈশার যোগ-ভক্তিময়

ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টানদিগের উৎসাহ উদ্যম, মোহম্মদের ধর্ম্ম-শক্তি মিশ্রিত করিলে আমরা আমাদের ধর্ম্ম হারাই না,বরং আরও অধিক শক্তি-সম্পন্ন হই। পূর্ব্ব দেশ ও পশ্চিম দেশের সমুদয় ফুলে আমরা আমাদের পরম দেবতার পূজা করিতেছি। একেশ্বরবাদের এই অভিনব ভাবে এই বিধান অলঙ্কৃত।

আমরা যদি পুরাতন একেশ্বরবাদীদিগের মত হইতাম, তবে হয়ত আমরা সেই সমস্ত একেশ্বরবাদীদিগের কোন দলস্থ হইতাম, অথবা সেই প্রকার বিরোধিময় কোন এক নূতন দল প্রস্তুত করিতাম এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত বিধানকে অসত্য বলিতাম। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম তাহা নহে। যেখানে সমস্ত বিরোধ তিরোহিত, যেখানে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, ঈশ্বরের জ্ঞান, ভাব, মহিমা ও গৌরবে পূর্ণ, যেখানে সমস্ত মহাজন পরস্পরের হস্তাকর্ষণ করিয়া একত্র দণ্ডায়মান, আমরা সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছি। এই প্রকার সর্ব্ব সামঞ্জস্যময়, জীবন্ত, জাগ্রৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশপূর্ণ, ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিচালিত, যে একেশ্বরবাদ তাহা পুরাতন একেশ্বর-বাদ হইতে কত স্বতন্ত্র একবার ভাবিয়া দেখ। ইহাই যথার্থ মুক্তির পথ, ইহাই মানবস্বভাব বিকাশ ও মানুষের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবার একমাত্র উপযোগী ধর্ম্মবিধান। বন্ধুগণ, আমাদের ধর্ম্ম অতি উচ্চ ভাবে পূর্ণ, আমাদের ঈশ্বর পরিচয় বিশেষ পরিষ্কার হইবার কথা, আমাদের বিশ্বাস নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় ঈশ্বরদর্শনে আমাদের সহায় হওয়া উচিত; আমাদের আশা অতি বড়, ইহার সাহায্যে আমাদের অনন্তকে গভীর প্রেমে, অনন্ত অনুরাগে পূজা করিতে সমর্থ হওয়া বিধেয়; কিন্তু যাহা হইবার তাহা হই নাই, আমাদের যাহা হওয়া উচিত তাহা হই নাই। যদি সাক্ষাৎ জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বরে আমরা অনুরাগী হইতাম, তবে জীবন কত উচ্চ হইত, কত সুখময় হইত। এই যে বাহ্যপ্রকৃতি ইহার মধ্যে তাঁহার ভাবে ভাবুক ব্যক্তি কত লাভ করিতে পারেন তাহার অন্ত নাই। ইহার রূপ রস ভাবে সেই মহান্ পরমেশ্বরের কত বিভূতি কত ও গৌরব, তাহা কয় জন বুঝিয়াছে? এখনও তোমাদের কাছে বৃক্ষ বৃক্ষ মাত্র, ফুল ক্ষণমাত্র নয়নতৃপ্তিকর সামান্য বস্তুমাত্র, বারি তৃষ্ণা নিবারক জলমাত্র, সূর্য্য একটি অগ্নি-পিণ্ড, চন্দ্রতারকা জ্যোতির্ম্ময় এক প্রকার বস্তু ভিন্ন আর কি? যদি এই প্রকৃতির সঙ্গে তোমাদের প্রকৃতি মিসাইতে পারিতে, তবে প্রত্যেক বৃক্ষের পত্র ফুল ফলে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে। বৃক্ষের সহিত তোমাদের যোগ নাই ফুলের সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, চন্দ্র-মার সহিত তোমাদের সহানুভূতি নাই। এই প্রকাণ্ড জগতের সমুদয় বস্তুর সহিত যোগ ও পরিচয় ব্রহ্মপরিচয়ের নামান্তর মাত্র। যাঁহাকে প্রিয়তম মনে কর, তাঁহার হস্তরচিত এমন সুন্দর বস্তু সমুদায়দেখিয়া তোমাদের মন প্রাণ কোন্ পরম পবিত্র রাজ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিবার কথা; কিন্তু তাহা হইল কই? প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য যত চিন্তা করিবে, যত বুঝিতে পারিবে, তত পরম কৃতার্থতা লাভ হইবে।

তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য ও তোমার তপ্ত কপালে শীতল বাতাস দিবার জন্য পরমেশ্বরের যদি কোন হস্ত থাকে, নিরাশ্রয় তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য যদি তাঁহার কোন কোল থাকে, তোমার ক্ষুধিত আত্মার ক্ষুধা নিবারণ জন্য তাঁহার ভাণ্ডারে যদি কোন অন্ন থাকে, তোমার তৃষ্ণা নিবারণ জন্য যদি তাঁহার পবিত্রপদবিধৌতকারী কোন সুশীতল জলস্রাবী নির্ঝর থাকে, তবে তাহা এই প্রকৃতি মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তোমাদের দেশ প্রকৃতির রম্য নিকেতন বলিলেই হয়। কত কত বিদেশীয় কবি এই প্রকৃতি সম্ভোগে দেবভাব প্রাপ্ত হইলেন। আর তোমরা এই প্রকৃতির সন্তান হইয়া আকাশ দেখিয়া শূন্য বই কিছু দেখ না, ভূতলের নানা শোভার মধ্যেও কিছু ভোগের বস্তু পাও না, ফুলকে একত্র করিয়া তাহার স্পর্শে হস্তকে পবিত্র, মনকে স্বর্গীয় করিতে পার না, চন্দ্রকে প্রাণযোগে আলিঙ্গন করিয়া তোমরা পরমাত্মার সুধাপান করিতে পার না, বায়ুকে প্রেমে আবদ্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণসখার প্রেমনিকেতনে চলিয়া যাইতে পার না। যদি প্রকৃতিকে অধিকার করিতে পারিতে, তবে আর কি কোন প্রকার অবিশ্বাস ও অপবিত্রতা থাকিতে পারিত? প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিয়া যতই প্রকৃতির সঙ্গে নিজ প্রকৃতি মিশাইবে, তত স্বর্গভোগের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই।

এখন বাহির হইতে ভিতরে এস, একবার দেখ আত্মার রাজ্যে কত দূর উন্নত হইলে? প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে সেই এক ঈশ্বরের সিংহাসন, প্রত্যেক আত্মাতে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি, অপার মহিমা। তুমি যদি সমস্ত আত্মার রাজ্যে গভীর যোগভরে নিমগ্ন হইতে না পার, তবে ঈশ্বরের অনন্ত লীলার সন্ধান পাইলে না। অতএব পরস্পরের সঙ্গে প্রেমযোগে মিলিত হইয়া পরব্রহ্মের কার্য্য ও অভিপ্রায় বুঝিয়া লও। অধিক আর কি বলিব? তোমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে অধিকারী হইয়াছ, বিজ্ঞান বলে ঈশ্বরের কীর্ত্তি অনেক বুঝিতেছ। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সুখে, দুঃখে তাঁহাকে নিকটে পাইতেছ না। বিশ্বাস বিজ্ঞানের অনেক উপরে। বিজ্ঞান তোমাকে তাঁহার সম্বন্ধে জাগ্রৎ করিবে, বিশ্বাস তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবে। তাঁহার দর্শনে সমর্থ করিবে। যথার্থ একেশ্বরবাদ কি তাহা বুঝিতে পারিলে, অতএব এই ধর্ম্মই জীবনের ধর্ম্ম কর। সমুদায় ধর্ম্ম তোমাদের জন্য; সমুদয় সিদ্ধগণের সিদ্ধি তোমাদের জন্য; সমুদয় যোগিগণের স্বর্ণমুকুট তোমাদের জন্য রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হও। আত্মযোগে যোগী হইয়া পরমেশ্বরের সঙ্গে একাকার হও। কল্যাণদাতা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম, তুমি যেমন সরল ও সহজ, এই বিশ্বাসও তেমনি সরল ও সহজ, এই রক্ত যেমন সহজে গতিশীল, আত্মা মধ্যে তোমার গতিও তেমনি সহজ। বাল্যকালে তোমাকে ভাবিয়াছি, বৃদ্ধকালেও তোমাকে ডাকিতেছি। আবালবৃদ্ধ বনিতা, যাহার যে ভাব তোমাকে সেই ভাবে ডাকিতেছে। এক

মাত্র জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বর, তুমি সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছ। বিন্দুরের ক্ষুদে যেমন তুমি প্রসন্ন, সকল ক্ষুদ্র প্রার্থনাতেও তুমি তেমনি প্রসন্ন। সমস্ত শাস্ত্র তোমার কীর্ত্তিতে পূর্ণ, তাহা একত্র করিয়া তোমার গুণের ব্যাখ্যা করিতে আমরা অসমর্থ। কত মহাজন আত্মপ্রভাবে তোমাকে ডাকিয়া পরিশ্রান্ত হইলেন, আর ডাকিতে না পারিয়া বলিলেন বাক্যের সহিত মন যাঁহার স্তুতিগানে অসমর্থ তিনিই ব্রহ্ম। আমরা যেন তোমার গৌরব ঐশ্বর্য্য ভুলি না। অবোধ বলিয়া সহজে দেখা দিয়াছ বলিয়া আমরা যেন তোমার মহান্ কীর্ত্তিকে অগ্রাহ্য না করি। তুমি সরল হইতে সরল, তুমি শিশু হইতেও শিশু। আমরা যেন তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইয়া অসরল ও অবিশ্বাসী না হই। যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাও। এই কোলাহলময় দেশ হইতে নির্জ্জন শান্তিময় দেশে লইয়া যাইতেছ। আশীর্ব্বাদ কর যেন ভবপথের পরিশ্রম ভুলিয়া যাই। হে জ্যোতির্ম্ময়, অনেক কথা বলিবে বলিয়া ডাকিয়াছ, কিন্তু জীবনত ফুরাইয়া যাইতেছে। এখন তোমাকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া একান্ত অকপট সরল প্রাণে তোমার কাছে সমস্ত বুঝিয়া লই। কি ধর্ম্ম দিয়াছ তাহাত এখনও বুঝিলাম না। এমন পূর্ণ ও শক্তিপ্রদ ধর্ম্ম পাইয়াও আমরা আত্মদোষে আর যেন বঞ্চিত না হই। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন, তোমার মহিমা ও গৌরবে জীবন পূর্ণ হয়। মঙ্গলময়, সকল ভাই ভগিনী মিলিত হইয়া তোমার পবিত্র শ্রীপাদপদ্মে বার বার নমস্কার করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

প্রাণযজ্ঞ।

২৩শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

আমাদের এই দেহের শক্তিগুলি অতি পবিত্র অতি বিশুদ্ধ। ইহাদের সেই অনন্তশক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ। ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়া সেই অনন্তশক্তির ক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে। যাঁহার যোগনয়ন খুলিয়াছে, তিনি তাঁহার দেহ মনের ক্রিয়ার ভিতরে সেই অনন্তশক্তির ক্রিয়া নিয়ত দর্শন করেন। আচার্য্য প্রার্থনায় কহিতেছেন, "যত শক্তি অন্তরে, এরাও সকলে তোমার সন্তান। তা আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি, এ সমুদায় শক্তি তোমারই কন্যা। এরা কেন তবে অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, অনলস হয়ে, দিবানিশি হরিনাম করিবে না? হরি কীর্ত্তন কি আর বদ্ধ হয় ভক্তের বাড়ীতে? বিবেকের দল একটা, চক্ষের দল একটা, এই রকম করে গোটাকতক দল করে কেন দিবানিশি যাতে হরিনাম কীর্ত্তন হয় তারই বন্দোবস্ত হয় না।" "এই পায়ের নখথেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত যত শক্তি হরি হরি বল্‌ছে। মনের যত কিছু শক্তি সব হরি হরি বল্‌ছে।" "দিবা রাত্র শক্তি সকল মাতৃনাম কীর্ত্তন করে, মার নামের সুগন্ধ সমস্ত দেহমনে ছড়াইয়া দিচ্ছে, সমুদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য।" দেহ মনের সমুদায় শক্তির মধ্যে অনন্তশক্তিকে প্রত্যক্ষ করা, ইহা অতি উৎকৃষ্ট যোগ। এই শক্তি সমুদায় সেই অনন্তশক্তির অনুগত; সে শক্তির সহিত বিরোধ কোন সময়ে ইহাদের ঘটে না। যদি বিরোধ ঘটিত, মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদায় শক্তির বিনাশ উপস্থিত হইত। এ কয়েকবার আমরা প্রাণশক্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছি; এখন সেই প্রাণশক্তিরই বিষয় আমরা প্রসঙ্গ করি। আমাদের প্রাণশক্তির জন্য আমাদের দেহের সমুদায় ক্রিয়া চলিতেছে। এই প্রাণশক্তির মধ্যে সেই অনন্ত প্রাণ নিয়ত বিদ্যমান। তাঁহার বিদ্যমানতা বিনা এই প্রাণশক্তি শক্তিশূন্য। আমাদের দেহের সমুদায় কর্ম্ম এক প্রাণ শক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে, অথচ অতি অল্পসংখ্যক মানুষ এই প্রাণশক্তির সংবাদ লইয়া থাকে, আবার তদপেক্ষাও অল্পসংখ্যক লোক উহার মূল কোথায় খুঁজিয়া বাহির করে। যে শক্তির জন্য আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি, তৎপ্রতি লোকের এ প্রকার উপেক্ষাদৃষ্টি তাহাদের পক্ষে বড়ই নিন্দার বিষয়। যদি লোক সকল এই প্রাণশক্তির উপরে দৃষ্টি স্থাপন করিত, তাহা হইলে অচিরাৎ সেই প্রাণশক্তির মূলে অনন্তপ্রাণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইত। আমাদের দেহের প্রাণশক্তির প্রথম প্রকাশ কি? বুভুক্ষা। ক্ষুধা তৃষ্ণা মানবের ইতিহাসে অতি আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছে। প্রাণশক্তির প্রথম প্রকাশ ক্ষুধা তৃষ্ণাকে আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না, ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারি না। যদি এই প্রাণশক্তির প্রকাশকে নীচ দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহা হইলে যিনি আমাদের মধ্যে ইহাকে স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে অবমাননা করা হয়।

মানুষ প্রতিদিন এত ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে কেন? ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রেরণায়। যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত, মানুষ নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিত। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদির নিত্য এত উন্নতি হইতেছে কেন? এ সকলের উন্নতির মূলে কি অবস্থান করিতেছে? ক্ষুধা তৃষ্ণা। যদি ক্ষুধা তৃষ্ণাকে শ্রেষ্ঠ পদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে মানুষকে কি পশুর সঙ্গে সমান করা হয় না? পশুরাও তো ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা নিপীড়িত হইয়া আহার অন্বেষণ করে, পরস্পর সংগ্রাম করে, বিবিধ প্রকার দৈহিক চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যদি কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে তাহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? প্রভেদ অবশ্য আছে। আহারান্বেষণ, আহার প্রাপ্তি ও তাহাতে তৃপ্তি, পশুদিগের জীবনের এইখানে শেষ, মানুষের সম্বন্ধে কি তাহাই? মানুষ যে ক্ষুধা তৃষ্ণাকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ঋষিগণের আদিম উক্তি পাঠ কর, দেখিবে তাহার মূলে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকিয়া ঋষিগণকে অভীষ্টদেবতার নিকটে উপস্থিত করিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রার্থনাবাক্যগুলি পাঠ করিয়া কি দেখিতে পাও না, কোন প্রার্থনা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভিন্ন আর কোন বৃত্তি দ্বারা উদ্দীপিত হয় নাই। অন্ন, বস্ত্র, বিত্ত, পশু, বীর

সন্ততি এ সমুদায়ই জীবিকার অবিচ্ছেদজন্য প্রার্থিত হইয়াছে। শত্রু পরাজয়ের জন্য প্রার্থনা কেন? তাহারা গোধন হরণ করিত, শস্য সকল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত, জীবিকার বিশেষ ক্ষতি জন্মাইত, সুতরাং তাহাদিগকে বিনাশ বা হ্রাস না করিলে কিছুতেই চলিত না। সন্তান সন্ততি দ্বারা বংশ পরম্পরায় যীয় পুরুষের অবিচ্ছেদ না থাকিলে, এই সকল শত্রু পরাজয়েরই বা সম্ভাবনা ছিল কোথায়? ক্ষুধা তৃষ্ণা নিপীড়িত বৈদিক ঋষি জীবিকা উচ্ছেদের আশঙ্কায় ভীত হইয়া দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া দেবতার নিকটে বারি বর্ষণ প্রার্থনা করিয়াছেন, আকাশে বারি আবদ্ধ থাকিলে দৈত্যবধ দ্বারা আকাশ হইতে ভূতলে বারি প্রেরণ করিতে ইন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছেন। ইঁহারা যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা বিতাড়িত না হইতেন, তাহা হইলে কি আর ঋগ্বেদের সুন্দর সুন্দর সূক্তগুলি বিরচিত হইত?

ঋগ্বেদের ঋষিগণের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে যখন আমরা পরসময়ে আসি, তখনও ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রাধান্য হ্রাস পায় নাই। বেদান্তে ক্ষুত্তৃষ্ণাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, এবং দেবগণের প্রাপ্য হবিরও তাহাদিগকে অংশভাজন করা হইয়াছে। প্রতিদিনের ভোজনপান দ্বারা বৈশ্বানরের (জঠরাগ্নির) উপাসনাকে বেদান্ত ব্রহ্মোপাসনার সহিত একীভূত করিয়া লইয়াছেন। এই ভোজনপানরূপ উপাসনায় কেবল চক্ষু, কর্ণ, বাক্ মনের তৃপ্তি নহে, তৎসংযুক্ত দেবতা ও তাহাদিগের অধিষ্ঠানভূমির তৃপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিদিনের অন্ন পান গ্রহণ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া লওয়া, ইহা কি আমরা সংসামান্য ব্যাপার মনে করি? যে ক্ষুত্তৃষ্ণা বৈদিক সময়ে ঋষিগণকে দেবতার আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে, তাঁহাদিগের হৃদয়ের গূঢ় ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিয়া দিয়াছে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে প্রার্থনাশীল করিয়া রাখিয়াছে, সেই ক্ষুধাতৃষ্ণার পরিতৃপ্তিসাধক অন্নপানগ্রহণ পর সময়ে উচ্চতম উপাসনা বলিয়া গৃহীত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? প্রাণবৃত্তির পরিপুষ্টির জন্য প্রতিদিন অন্নপান গ্রহণ ইহা কিছু সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা বস্তুতই প্রাণযজ্ঞ। আমাদিগের ভিতরে যে অগ্নি আছে, এ অগ্নি কল্পনা নয়, রূপক নয়, মিথ্যা নয়। ইহাতে প্রতিদিন ইন্ধন না দিলে এ শরীর কি কখন রক্ষা পাইতে পারে? ভিতরের অগ্নি প্রতিদিন শরীরের উপাদান সকলকে আপনার ইন্ধন করিয়া দগ্ধ করিতেছে, বাহির হইতে অন্নপানরূপ ইন্ধন ভিতরে প্রেরণ করিয়া সেই অগ্নিকে তৃপ্ত ও উদ্দীপ্ত না রাখিলে দেহ থাকে না, প্রাণের ক্রিয়াও স্থগিত হয়। এই মহত্তম ব্যাপারকে যদি আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞ বলিয়া থাকেন, ঠিকই বলিয়াছেন। এই যজ্ঞ ভগবদুপাসনা, কেন না ইহা তাঁহারই বিধানপালন।

ক্ষুধা তৃষ্ণা পশুবৃত্তি, ইহা বলিয়া আমরা কখন উহার নিন্দা করিতে পারি না। যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত, অসহায় শিশু ক্রন্দন করিত না, মার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চারিত হইত না, তাঁহার স্তন হইতে স্তন্যসুধা ক্ষরিত না; পৃথিবী আপনার বক্ষ বিদারণ করিয়া ফল শস্য উৎপাদন করিত না; পৃথিবীতে জীবরক্ষার উপযোগী বিবিধ উপকরণ উৎপন্ন হইত না; জনসমাজের বিবিধ প্রকারের উন্নতির মূল বাণিজ্যাদির বিস্তার হইত না; এক জাতি অন্য জাতির সহিত মিলিত না; পরস্পরের উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও গুণসমূহের বিনিময় হইত না; সভ্যতার উচ্চসোপানে মনুষ্যজাতি কখন আরোহণ করিত না; এমন কি ধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা পর্য্যন্ত মানবজাতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা দিয়াছেন, তিনিই উহার উপযোগী বিষয় সকল সৃজন করিয়াছেন, এবং মানবজাতির উন্নতি সঙ্গে উহাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রাণশক্তির অবসাদের জন্য নহে, কিন্তু তাহার তেজ, বল, ক্রিয়াশক্তি বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য ভগবান্ আপনি যে উপায় স্থাপন করিয়াছেন, তৎপ্রতি উপেক্ষারদৃষ্টিতে দেখিবার আমাদের অধিকার কি? যদি আমরা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখি, কখন তজ্জন্য নিরপরাধ বলিয়া গণ্য হইব না। ক্ষুধা তৃষ্ণাকে যদি মানুষ উন্নতভাবে নিয়োগ করিতে না পারে, সে কি কখন মনুষ্যনামের উপযুক্ত হইতে পারে?

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিবেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে মানুষের যেমন ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়াছে, তেমনি দুর্ব্বৃত্ততাও বাড়িয়াছে। পরস্বাপহরণ, দস্যুতা, প্রাণবিনাশ, যুদ্ধবিগ্রহ, এ সমুদায় কি ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন হয় নাই? ক্ষুত্তৃষ্ণা দ্বারা বিতাড়িত হইয়া লোকে কতপ্রকারের অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এমন কি স্বাভাবিক স্নেহ মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া আপনার পুত্র কন্যাগণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছে। মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণায় ধার্ম্মিক হয় বা দুর্বৃত্ত হয়, ইহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন গুণ বা দোষ নাই। ইহারা কেবল মানুষগণকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেয় না, প্রাণশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারে তাহাদিগকে উত্তেজিত করে। মানুষ যদি আজও পশু থাকে, তাহা হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা বিতাড়িত হইয়া সে পশুধর্ম্ম প্রকাশ করিবে, যদি মানুষ হয় তবে সে ধর্ম্ম ও নীতির অনুসরণ করিবে, দেবতা হইলে সে যোগযুক্ত হইবে। মানুষ পশু, মানুষ মানুষ, মানুষ দেবতা, এ প্রভেদ যদি আমরা মনে রাখি, তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। মানুষের এমন কোন্ বৃত্তি আছে, যাহার সে অপব্যবহার করিতে পারে না? এমন যে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মবৃত্তি, তাহাই পশুপ্রকৃতির হাতে পড়িয়া কি অসদৃশ আকার ধারণ করে, কি কুকর্ম্মেই না লোকদিগকে নিক্ষেপ করে? কোন একটা বৃত্তি মানবজাতির উন্নতির মূলে থাকে, কিন্তু তাহার ক্রিয়াপ্রকাশ প্রতিমানুষের তত্তৎকালের অবস্থানুসারে হয়।

মনুষ্যের জীবনে যখন ঘোরতর বৈরাগ্যের অবস্থা উপস্থিত হয়, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্টাবস্থায় অবস্থান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তখনও সে ক্ষুধাতৃষ্ণার বিধি অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারে না, শরীরধারণের জন্য তাহাকে অন্নপানের যত্ন করিতে হইবে, এবং সে যত্নে যদি তাহার ধর্ম্মের ক্ষতি হয় তাহা হইলে.

তাহার দেহত্যাগ বরং ভাল তথাপি ধর্ম্মত্যাগ করা সমুচিত নয়। ঘোর কঠোর বৈরাগ্যের পথাবলম্বী লোকও এই জন্য ক্ষুত্তৃষ্ণা-নিবারণ ব্যাপারকে ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এবং আহারপানের সঙ্গে বিবিধ প্রকারের ধর্ম্মবিধি সংযুক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বথা কর্ম্মশূন্য হওয়া অসম্ভব, অন্ততঃ শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মের আশ্রয় করিতে হইবে, এই দেখিয়া যোগাচার্য্য কর্ম্মের অপরিহার্য্যতার শিক্ষা দিয়াছেন। এদেশের বৈরাগ্যপথাশ্রয়ী সন্ন্যাসিগণ অন্নপানাদি প্রাণাহুতিরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাণে ও অন্নপানে ব্রহ্মদৃষ্টিপূর্ব্বক প্রাণযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এ পথকে আমরা সর্ব্বথা দূষণীয় বলিতে পারি না। কেন না অন্নপান গ্রহণ-কালেও ব্রহ্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্ন অতি বিশিষ্ট পন্থা। তবে নূতন প্রণালীতে এই ব্যাপার সম্পন্ন করিতে যদি আমরা যত্ন করি, তাহা হইলে মূল বিষয়ে তাহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না।

প্রাচীন কালে ক্ষুত্তৃষ্ণা দ্বারা বিতাড়িত হইয়া অন্নপানের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ছিল, ইহা এ কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কেন না অন্নপান প্রাপ্তি সে কালের ন্যায় আর বিপৎসঙ্কুল নাই। প্রয়োজন হইলেই অন্নপান উপস্থিত হইবে, ইহা যখন স্থির নিশ্চয় আছে, তখন আর তৎসম্বন্ধে প্রার্থনা কি? কিন্তু প্রার্থনা নাই বলিয়া ক্ষুত্তৃষ্ণা ও অন্ন পানের সহিত গভীর সম্বন্ধ কি উঠিয়া গিয়াছে? ক্ষুধা তৃষ্ণা সে কালে অন্ধবৃত্তিমাত্র ছিল, লোকে জানিত না যে, তাহাদের ক্ষুত্তৃষ্ণা অন্ধবৃত্তি নহে, উহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ক্ষুত্তৃষ্ণার ভিতরে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা পাঠ করিতেন। 'বৎস, উঠ, অন্ন পান গ্রহণ কর', ক্ষুধা তৃষ্ণার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের এই মধুর বাণী সাধকের নিকটে আসিতেছে। অন্নপান যখন সম্মুখে উপস্থিত, তখন সেই অন্ন পান কে পরিবেশন করিল? সেই অন্নপানস্থ পোষণ শক্তিই বা কে? সেই অন্নপানের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কি আধ্যাত্মিক ব্যাপার অবস্থিত, এখনকার সাধগণ তাহা সুস্পষ্ট দর্শন করেন। পূর্ব্বে ক্ষুত্তৃষ্ণানিবারণার্থ অন্নপানগ্রহণ প্রাণাহুতি ছিল, এখন অতি উচ্চতম প্রাণযজ্ঞে উহা পরিণত হইয়াছে। এ প্রাণযজ্ঞের প্রতি কাহারও উপেক্ষা দৃষ্টি ধর্ম্মজীবনের পক্ষে শ্রেয়স্কর নয়।

পরিশ্রম করিলাম, শরীরের উপাদান ক্ষয় পাইল, ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ভিতরে থাকিয়া জননী বলিতেছেন, 'সন্তান, আর নহে, নিবৃত্ত হও, এখন অন্নপান গ্রহণ কর।' আমরা তাঁহার এ সুমধুর কথার প্রতি কি উচ্চ ধর্ম্মজীবনের ভাণ করিয়া উপেক্ষা করিব? আমাদের প্রাণের প্রাণ যিনি তিনি কি প্রাণকে নবীভূত করিবার জন্য, নবশক্তিতে শক্তিমান্, নব স্ফূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তিমান্ করিবার জন্য আমাদিগকে অন্নপান গ্রহণ করিতে বলিতেছেন না? প্রাণশক্তির ক্রিয়াতে উৎপন্ন অন্নপান আমাদিগের সম্মুখে সেই শক্তিযোগে তিনি আপনি উপস্থিত করিলেন, আবার সেই শক্তি-যোগে আমাদিগের উদরস্থ করিলেন, এবং বাহির হইতে সমাগত অন্নপানের পোষণশক্তিমধ্যে প্রাণবর্দ্ধন শক্তি নিহিত করিয়া দিলেন, এ সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া আমরা কি উহার মধ্যে সেই প্রাণের অর্চ্চনা করিব না? প্রাণশক্তি আপনি কিছুই নহে, যদি তন্মধ্যে সেই প্রাণের প্রাণ অবস্থান করিয়া উহাকে প্রাণসম্পন্ন না করেন। অতএব আরাধনার প্রথম মন্ত্র প্রাণের প্রাণ হইতে প্রাণযোগ উপস্থিত হয়, তৎসহ এই প্রাণযজ্ঞ সংযুক্ত করিয়া সাধক-গণের সাধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই প্রাণযজ্ঞসাধনে যেন আমরা কোন দিন বিমুখ না হই। যজ্ঞ ঈশ্বরের যাজনা, ঈশ্বরের অর্চ্চনা; প্রাণশক্তির সর্ব্বপ্রথম প্রকাশের মধ্যে যদি উহা সাধিত না হইল, তাহা হইলে উহার অন্য অন্য প্রকাশ মধ্যে উহা সাধিত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অতএব আমাদের জীবনের প্রধান কৃত্য অন্নপানগ্রহণ যেন উৎকৃষ্ট যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান হয়।

যোগ সাধন।

স্বর্গগত ভাই শ্রীমৎ কালী শঙ্কর দাস প্রণীত।

১৮১৫ শকের ১৬ আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে অনুবৃত্তি।

প্রাণায়াম। ইহা একটি শারীরিক সুস্থতার উপায়। শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য ও শরীরকে লঘু ও কৃশ করিবার জন্য প্রাণা-য়াম প্রয়োজনীয়। প্রণায়াম করিলে শরীরের লঘুতা জঠরাগ্নির প্রবৃদ্ধি এবং কৃশত্ব জন্মে *। প্রাণায়ামের গতি অনুসারে ইহা ত্রিবিধ নামে খ্যাত। রেচক পূরক ও কুম্ভক। নিশ্বাস বায়ুর ত্যাগ রেচক, নিশ্বাসবায়ুর পূরণ পূরক ও পূর্ণ নিশ্বাসের গতি রোধ করিবার নাম কুম্ভক †। পূর্ব্ব কালের যোগীরা এই কুম্ভক যোগের বড়ই উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল ইহার সাধারণ প্রয়োজন টুকু গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইহা দ্বারা নিশ্বাসবায়ু অবরুদ্ধ করিয়া জলে ও মৃত্তিকাগর্ভে অচেতন বস্তুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে বহুকাল অবস্থান করিতে পারিতেন, এবং বাহিরের সমুদায় বিষয়বোধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ ছিলেন। শরীর যদি লঘু ও আরোগ্যপ্রবণ হয়, তবে সকল প্রকার কার্য্যই অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। জঠরাগ্নি বিশুদ্ধ থাকিলেও সহসা রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। আবার কৃশ শরীর স্থূল শরীর অপেক্ষা কার্য্যপটু হয়। এই সকল গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত অচেতন বস্তুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিয়া ফল কি, তাহা অনুমান করিয়া বুঝা যায় না। তবে কেবল এই মাত্র বুঝা যায় যে ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ গতিশূন্য হইলে বিষয়ের প্রলোভনজনক আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হয়। কিন্তু এরূপ ক্রিয়াশূন্যতা নিরাপদ নহে। কেন না ইহা কেবল বাহ্যিক নিশ্চেষ্ট ভাব, ইহা হৃদয়ের

---

* শরীরলঘুতা দীপ্তি র্জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্। কৃশত্বঞ্চ শরীরস্য তস্য জায়েত নিশ্চিতম্॥ দত্তাত্রেয় সংহিতা।

† ত্যাগসংপূরণে হিত্বা নিরোধঃ কুম্ভকঃ স্মৃতঃ।

পবিত্রতামূলক বীতরাগিতার প্রমাণ করে না। সুতরাং ইহা বিনীত সত্যপ্রিয় ও ঈশ্বরপ্রেমিক সাধকের প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। ইহা কেবল লুব্ধ দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লোকের উপযোগী। *

এইরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যের উপকারিতা যত, অপকারিতা তদপেক্ষা অধিক। প্রথমতঃ যাঁহারা এই পথে গমন করেন, তাঁহারা প্রায়শঃ প্রশংসা ও অর্থলোভে জড়িত হইয়া আপন উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া লোকের নিকট কুহকীর বেশে উপস্থিত হন, এবং যশ, ও অর্থলালসায় পতিত হইয়া প্রতারণা দ্বারা লোকের অর্থাপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ হইলে কাজে কাজেই আর ঈশ্বরের স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন করিবার তাঁহার অবসর থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কোন নির্জন প্রদেশে চিরকাল নিশ্চেষ্ট মৃৎপিণ্ড বা প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকিলে যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ জগতের মঙ্গল সাধন করা দূরে পড়িয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্মজনিত কোন পবিত্র সুখ জীবনে অনুভূত হইতে পারে না। কেন না জগতের সঙ্গে সহানুভূতি না থাকিলে জগতের মঙ্গলামঙ্গল হৃদয়ঙ্গম হওয়াই অসম্ভব। †

তৃতীয়তঃ সকলেই ইহার বাহ্যিক চমৎকারিতা দর্শন করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু অনেকেই রুগ্ন ও তগ্নাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হন। লাভের মধ্যে ইহকাল পরকাল দুইকাল যায়। সুতরাং প্রাণায়ামের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য যে শরীরকে নীরোগ ও কার্য্যক্ষম করা, তাহারও সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। অতএব শরীরকে সুস্থ ও কার্য্যপটু করিবার জন্য যত প্রয়োজন, প্রাণায়াম করিবে, অতিরিক্ত বৃথা পরিশ্রম করিয়া সময় নষ্ট করা অনুচিত। প্রাণায়াম শব্দের অর্থ "প্রাণানামায়ামঃ" অর্থাৎ প্রাণসকলের সংযম। প্রাণের সংযম যদি প্রাণায়াম হয়, তবে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে প্রাণের অনিয়মিত কার্য্যকে নিয়মিত করিবার জন্যই প্রাণায়ামক্রিয়ার প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সপরিবারে বাঁকিপুরে গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পরিবারের শরীর আজও সুস্থ হয় নাই।

আগামী ৪ঠা অগ্রহায়ণ ইংরাজী ১৯এ নবেম্বর শনিবার আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ষষ্টিতম জন্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে শ্রীদরবারে এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে।

প্রাতে ৭টার সময় কলুটোলার পুরাতন বাটীতে জন্মস্থান দর্শন।

৮৷৹ টার সময় ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে উপাসনা।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ৪৫ নং বেনেটোলার গলিস্থিত উপাসনালয়ে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্তৃক বক্তৃতা, বিষয়—"বৈষ্ণব ও ঈশা," বক্তৃতান্তে সংকীর্ত্তন। সকলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

৩০ শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে কলিকাতার অনেক নববিধানবিশ্বাসী পরিবারে বিশেষ ভাবে প্রার্থনাদি হইয়াছিল।

ভাই অমৃতলাল বসু, পৌত্রীর নাম করণ করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ গমন করিয়াছেন। শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ বসু ভাই অমৃতলাল বসুর পুত্র; তিন বৎসরের অধিক কাল লক্ষ্ণৌনগরে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করিতেছেন।

গীতার সমন্বয় ভাষ্য বাঙ্গালা ২য় খণ্ড বাহির হইয়াছে। মূল্য ৵৹ ডাকমাশুল ৴১৹। অগ্রিম মূল্য প্রদাতাদিগের নিকট শীঘ্রই পুস্তক প্রেরিত হইবে।

আগামী রবিবার শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় খরসিয়ং হইতে কলিকাতায় আসিয়া সম্ভবতঃ তিনিই ঐ দিবস সামাজিক উপাসনা করিবেন।

আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ওয়াল্ড এণ্ড নিউডিসপেন্সেসন, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং মহিলার বাকি মূল্য আদায়ের জন্য উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম অঞ্চলে যাইতেছেন, গ্রাহকগণ তাঁহার বা শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট মূল্য প্রদান করিলে আমরা প্রাপ্ত হইব। তাঁহার সঙ্গে প্রচার কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তকাদিও থাকিবে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রণীত গৃহধর্ম্ম পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বেণারস হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি পাল এক দীর্ঘ পত্র ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশার্থ আমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, এরূপ পত্র আমরা প্রকাশ করি না।

আমাদের আচার্য্য দেবের ভ্রাতার পুত্র শ্রীমান্ প্রমথ লাল সেন, যিনি দুই বৎসর কাল বিলাতে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় অধ্যয়ন করিতেছেন, এক্ষণে অধ্যয়নকাল সমাপ্ত হওয়ায় বিলাতের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল অতি উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোক সকলের বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন। সকল স্থানেই তিনি আদরের সহিত গৃহীত হইতেছেন। শ্রীমান্ প্রমথ লাল লোকদিগের নববিধানের নূতন তত্ত্ব সকল শুনিবার আগ্রহ দেখিয়া দেশে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিতেছেন না। ভগবান্ শ্রীমানের দ্বারায় তাঁহার কার্য্য ভাল করিয়া করিয়া লউন। শ্রীমান্ জ্ঞান ধর্ম্ম বিশ্বাসে উন্নত হইয়া দেশে আসিতেছেন। আমরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে যেমন তিনি বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সুখী হইতেছেন, দেশে আসিয়া আরও উৎসাহের সহিত জীবনের কার্য্য করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করুন এবং আমাদিগকেও সুখী করুন এই আমাদের আন্তরিক কামনা। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

---

* কেহ কেহ বলেন, শীতকালে ভেক সকলকে অনাহারে নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে দেখিয়া আর্য্য ঋষিগণ সেই ভেকগণের নিকট হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন, কিন্তু ভেকগণের সেই শক্তি কেমন করিয়া তাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। বস্তুতঃ আর্য্যগণ যে এই অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং অদ্যাপি ঐ প্রণালীর দুই একজন সাধকের কথা শুনিতে পাই।

† এই জন্য কোন ভক্ত যোগী ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে শ্মশ্রু রাখিলেই যদি যোগী হওয়া যায়, তবে ছাগল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যোগী—অনাহারে নিশ্চেষ্ট থাকিলেই যদি যোগী হওয়া যায়, তবে ভেকই উত্তম যোগী। ইত্যাদি।

এই পত্রিকার ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে পি,নাথ কর্তৃক ৩ অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REGISTERED No C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
২২ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দেবাদিদেব, তুমি আপনাকে এত সুলভ করিলে কেন? আমরা যে কেহ তোমায় ডাকি তুমি তখনই তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হও, বল, ইহাতে তোমার মহত্ত্ব থাকিবে কি প্রকারে? কোন যুগে সাধারণ লোকে এরূপ সহজে তোমায় পায় নাই, এবার তুমি এত সহজ হইলে ইহার অর্থ কি? সেকালের লোকের বুঝি তুমি সুলভ এ বিশ্বাস ছিল না। মহান্ জ্ঞানাতীত তুমি, তুমি বুদ্ধির অগম্য, এইরূপ ভাবিয়া তাহারা তোমায় ডাকে নাই, তাই তাহারা তুমি যে অতি নিকটে, সন্তানের সঙ্গে কথা কহিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, ইহা তাহারা বুঝিতে তখন অক্ষম ছিল। আমরা সাহস করিয়া তোমার নিকটে যাই, তুমি আমাদের সাহসিকতা দেখিয়া আমাদিগকে ভৎসনা করা দূরে থাকুক, আরও যাহাতে আমাদের সাহস বাড়ে তুমি তাই কর। বুঝিয়াছি সাহসে জীবের পরিত্রাণ, সাহস না থাকাই তাহার মৃত্যুর কারণ। যদি পাপ করি, অধর্ম্মাচরণ করি, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করি, সাহস ভাঙ্গিয়া যায়, নিতান্ত কাপুরুষ হইয়া পড়ি। তবে কি আমরা পাপী নই? পাপী নই তোমার নিকটে একথা বলিব কিরূপে? তবে তোমার কৃপায় পাপ পরিত্যাগের অভিলাষ জন্মিয়াছে, এজন্যই তোমার নিকটে যাইতে আমাদের সাহস হয়। পাপ পরিত্যাগের বাসনা তুমি বল না দিলে কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। বল লাভ করিব কিরূপে, যদি সাহসপূর্ব্বক তোমার দ্বারে গিয়া প্রার্থী না হই। পরিত্রাণার্থী পাপী কোন দিন কি তোমা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে? পাপাচারী পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া যখনই তোমার দ্বারে আসিয়াছে, তখনই তুমি তাহাকে আদরের সহিত স্বগৃহে স্থান দিয়াছ। হে দেব, এজন্য আমাদের এ সাহসিকতাকে আমরা তোমার ইচ্ছা বা তোমার প্রেমের বিরোধী বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। যদি অন্য লোকে সাহসিকতা প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আমরা কি করিব? তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ ইহা কখনই আমরা মনে করি না। আমাদের তোমার নিকটে যাইবার সাহস তোমার করুণাই বাড়াইয়া দিয়াছে, এই মাত্র কেবল আমরা বলিতে পারি। এরূপ করুণা কেন তুমি আমাদের প্রতি প্রকাশ করিলে তাহার কারণ তুমি জান, সে কারণ আমরা জানিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। তবে এই জানি,

তোমার এই করুণা আমাদিগের মস্তকে গুরুতর দায়িত্ব স্থাপন করিয়াছে। যদি তোমার এই বিশেষ করুণার পাত্র হইয়া জনসাধারণের সাহস বর্দ্ধনের আমরা সহায় না হই আমরা কখন নিরপরাধী বলিয়া গণ্য হইব না। তাই তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা করি, আমাদের সাহস দিন দিন বর্দ্ধিত হউক, এবং আমাদের সাহসিকতা ও তজ্জনিত তোমার বিশেষ কৃপালাভ দেখিয়া সাধারণ লোকে তোমার শ্রীচরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল চিত্ত হউক। যখন তাহারা দেখিবে যে তুমি তোমার কোন সন্তানের প্রতিই উপেক্ষা কর না, তখন তাহারাও তোমার নিকটে আসিতে সাহসী হইবে, এবং সেই সাহসই তাহাদের পরিত্রাণের হেতু হইবে। হে নাথ, এইরূপে আমরা জনসাধারণের তোমার নিকটে আসিবার সাহসিকতা বৃদ্ধি করিয়া কৃতার্থ হইব, এই আশা করিয়া বিনীত ভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

ব্রহ্মপরিচয়।

ব্রহ্মদর্শন অতি দুর্ল্লভ, ইহা আর কে না মনে করে? মনের কল্পনা মিশিয়া প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায় উপস্থিত হয়, সাধনপথের পথিকগণ ইহা অনেক সময়ে নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দর্শন ক্ষণিকও হইতে পারে, জীবনব্যাপীও হইতে পারে। ক্ষণিক দর্শন অনেক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটে, জীবনব্যাপী দর্শন কচিৎ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মপরিচয় বিনা জীবনব্যাপী দর্শন সম্ভবপর নহে। অতএব ব্রহ্মপরিচয় কি এবার তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

অমুক ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় আছে, ইহা যখন আমরা বলি, তখন সে ব্যক্তির সহিত আমার পুনঃ পুনঃ দর্শন ঘটিয়াছে, এই মাত্র বুঝায় তাহা নহে, সে ব্যক্তির চরিত্রাদি আমি জ্ঞাত আছি, ইহা পর্য্যন্ত পরিচয় আছে বলিলে বুঝায়। কোন এক ব্যক্তির সহিত ব্যবহার না হইলে, তাহার সহিত আমাদের পরিচয় হয় না, সুতরাং পরিচয়ের মূলে ব্যবহার সর্ব্বদা বিদ্যমান। ব্রহ্মপরিচয় এ কথা বলিলেই ব্রহ্মের সহিত ব্যবহার ঘটিয়াছে এবং তাহাতেই তিনি আমাদের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রহ্মের সহিত ব্যবহারজনিত সম্বন্ধ কি কখন সম্ভবপর? যিনি অসঙ্গ উদাসীন, কিছুতেই যিনি লিপ্ত নহেন, তিনি আবার কবে কোন মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকেন? মানুষে মানুষে ব্যবহার চলে, মানুষে ও ঈশ্বরে ব্যবহার এ কিরূপ কথা?

ব্রহ্মদর্শন কি, প্রথমতঃ ইহা নির্ব্বাচিত হইলে ব্রহ্মপরিচয় সম্ভব কি না, তাহাও নির্দ্ধারিত হইতে পারে। আত্মা যখন আপনাকে আপনি অবগত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে পরমাত্মাকেও অবগত হয়। আত্মা পরমাত্মার সহিত এমনি নিত্যযুক্ত যে, একের জ্ঞানের সঙ্গে অপরের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। যদি বল, কপিল পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াও পরমাত্মার অস্তিত্ব যখন স্বীকার করেন নাই তখন একের জ্ঞানে অপরের জ্ঞান অবশ্য হইবেই হইবে, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কপিল এক অখণ্ড চৈতন্যের সত্তা স্বীকার করিতেন, প্রত্যেক জীব সেই অখণ্ড চৈতন্যের অংশমাত্র। প্রতিব্যক্তি আপনার পরিমিত চৈতন্যসত্তা অনুভব করিতে গিয়া এক অখণ্ড চৈতন্যের সহিত আপনাকে সংযুক্ত দেখিতে পান, এবং এই অখণ্ড চৈতন্যকে তিনি ব্রহ্মনামে আখ্যাত করিয়াছেন। বেদান্ত এই অনন্ত চৈতন্যকে ঈশ্বরার্থবাচক ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন। সুতরাং কপিলও জীবের সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মদর্শন পরিহার করিতে পারিয়াছেন, ইহা কিরূপে বলা যাইবে? অখণ্ড বিনা খণ্ড কখন আপনি স্থিতি করিতে পারে না, এই অপরিহার্য্য চিন্তার নিয়ম যখন কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, তখন সসীম আত্মার সঙ্গে সঙ্গে অসীম অনন্ত আত্মা বা পরমাত্মার জ্ঞান যে অবশ্যম্ভাবী ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আত্মার বিদ্যমানতার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে পরমাত্মার বিদ্যমানতা অনুভবই ব্রহ্মদর্শন।

আত্মদর্শনে ব্রহ্মদর্শন অপরিহার্য্য, ইহা স্বীকৃত হইল, কিন্তু ব্রহ্মপরিচয় ও দর্শনতো এক নহে? বস্তুদর্শন বস্তুপরিচয়লাভের প্রথম সোপান, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। দর্শন না হইলে পরিচয় হইবে কিরূপে? দর্শন সত্তামাত্র পরিগ্রহে হয়, সেই সত্তার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ অবগত হইলে বস্তুর পরিচয় ঘটিল। বস্তুর স্বরূপস্ফূর্ত্তি বিশেষরূপে সেই বস্তু পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হইয়া থাকে। জড় বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ সম্ভবপর, চৈতন্য বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ কিরূপে হইবে? পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী জড় ও চৈতন্যসম্বন্ধে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু মূলে পর্য্যবেক্ষণ উভয় সম্বন্ধেই সমান। জড় বস্তু আমাদিগের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে, সেই ক্রিয়ানুসারে তাহাদিগের স্বরূপ আমরা নির্ব্বাচন করিয়া থাকি। বর্ণাদি জড়ে প্রতিভাত হয়, কিন্তু সে সকল আলোকাদির ক্রিয়া মাত্র। অখণ্ড চৈতন্য সত্তা খণ্ড চৈতন্যের উপরে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করেন না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। খণ্ড চৈতন্য যখন অখণ্ড চৈতন্যের সংস্পর্শ অনুভব করে, তখন যে আনন্দোদয় হয়, তখন সেই আনন্দে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়। যাঁহারা নির্গুণ সত্তামাত্র ধারণ করেন, তাঁহারাও এই জন্য ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মকে দৃঢ়রূপে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং আনন্দস্বরূপে ব্রহ্ম তাঁহাদিগের নিকটে পরিচিত হন। চৈতন্যের সহিত জ্ঞানের কোন কালে বিচ্ছেদ নাই, সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ এ দুই স্বরূপ নির্গুণব্রহ্মবাদীর পক্ষেও অপরিহার্য্য। খণ্ড চৈতন্যের উপরে অখণ্ড চৈতন্যের এইরূপ নিয়ত ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়াতে তিনি শক্তিমান্ ইহাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে, সুতরাং ব্রহ্ম শক্তিস্বরূপ, ইহাও অস্বীকার করা কদাপি সম্ভবপর নহে।

ব্রহ্মের এইরূপ স্বরূপসমূহের স্ফূর্ত্তি হইতে তাঁহার যে পরিচয় হয়, তাহাতে আমরা যে পরিচয়ের কথা বলিতে প্রবৃত্ত, সে পরিচয় ঘটিতেছে না। আমাদের ও পরিচয় ব্যবহারমূলক, সে ব্যবহার কি, একবার আমাদের তাহাই আলোচনা করিতে হইতেছে। আমাদের কল্যাণার্থ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ব্রহ্মনিরপেক্ষ, অথবা ব্রহ্মসাপেক্ষ। ব্রহ্মনিরপেক্ষ একথা বলিতে পারি না, কেন না তাহা হইলে জড় প্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি আপনা হইতে উৎপন্ন আপনাতে স্থিত, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু যাহা আপনি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে মুহূর্ত্তের জন্য একই ভাবে স্থিতি করিতে পারে না, তাহা অন্যনিরপেক্ষ হইবে কি প্রকারে? যাহা কোন কালে আপনি পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহা মূলে না থাকিলে কদাপি পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। তবে জড়প্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি ব্রহ্মসাপেক্ষ। ব্রহ্মসাপেক্ষ বলিলেই এ দুইয়েতে যে ক্রিয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। প্রাকৃতিক ক্রিয়াতে যে কল্যাণ উৎপন্ন হয়, আমাদের সুখ সমৃদ্ধি হয়, তাহার মূল কারণ তবে ব্রহ্ম। প্রকৃতিতে যত ঘটনা ঘটিতেছে, সে সকল ঘটনাতে স্বয়ং ব্রহ্মেরই ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল ক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিব্যক্তির যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ সেই সেই ব্যক্তির সহিত ব্রহ্মের ব্যবহার প্রদর্শন করে। বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের জীবনে যত গুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সকল ঘটনাগুলি আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মের ব্যবহার। লোকে এই সকলকে ঘটনা বলে, ব্রহ্মের ব্যবহার বলে না, সুতরাং ব্রহ্মের নিত্য ব্যবহার সত্ত্বেও তাহারা তাঁহার পরিচয় পায় না। যাঁহারা বিশ্বাসী প্রেমিক অনুরাগী, তাঁহারা সেই সকল ঘটনাকে তাঁহাদের প্রতি ব্রহ্মের কল্যাণকর মধুর ব্যাবহার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আবদ্ধ হন। তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

প্রেমের নিগূঢ় শক্তি।

সাধারণ লোকের ধারণা এই, প্রেমের স্বভাব হৃদয়ের সঙ্কোচসাধন, কেন না উহা প্রিয়পাত্র ভিন্ন অপরের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টিকে প্রসারিত হইতে দেয় না। প্রেম এক স্থানে হৃদয়কে আবদ্ধ করে, ইহা সত্য, কিন্তু সেই আবদ্ধ ভাবের মধ্যে যে হৃদয়ের প্রাশস্ত্যসাধনের সামর্থ্য লুক্কায়িত আছে, ইহা উহার ক্রিয়া ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রেমের বাহিরে বিস্তার না থাকুক, কিন্তু উহার ভিতরের গভীরতা এত যে, সেই গভীরতার মধ্যে সকলই অন্তর্ভূত হইয়া অবস্থান করে। আমরা কি বলিতেছি, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, সুতরাং দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের কথা বুঝাইতে যত্ন করিতেছি।

ঈশ্বর ও সংসার এ দুই বিরোধী বলিয়া বহুদিন হইল গৃহীত হইয়া আসিতেছে, আজ পর্য্যন্ত এ দুইয়ের বিরোধ মিটে নাই, কোন কালে যে মিটিবে তাহাও সম্ভব বলিয়া অনেকের মনে হয় না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে অবশ্য সংসারবিরাগী হইবে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ কথা। সংসারানুরক্ত ব্যক্তিও সেইরূপ ঈশ্বরবিরাগী হয়, ইহাই বা কে না জানে? ঈশ্বরপ্রেমিক সংসারের প্রতি বীতরাগ, সংসারপ্রেমিক ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগশূন্য, ইহাতে এই দেখায় যে, একেরই প্রতি একই সময়ে প্রেম অর্পণ করা যাইতে পারে, দুইয়ের প্রতি প্রেম সমর্পণ কদাপি স্বাভাবিক নহে। ঈশ্বর ও সংসার বিরোধী হইল কেন? এ উভয়ের মধ্যে কি বস্তুতই বিরোধ আছে? সংসার ঈশ্বরসৃষ্ট, ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট, ঈশ্বরের সহিত উহার কোন দিন বিরোধ নাই, বিরোধ থাকিতে পারে না; তবে যে বিরোধ অনুভূত হয়, উহা আমাদিগেরই দোষে। সংসার ঈশ্বর ছাড়া নহে, ঈশ্বরেরই অন্তর্ভূত। যাহা যাহার অন্তর্ভূত, তাহাকে গ্রহণ না করিয়া যদি সেই অন্তর্ভূত বিষয়টিকে মাত্র গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষুদ্রের প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ হওয়াতে চিত্তের ক্ষুদ্রতা উপস্থিত হয়, এবং এই ক্ষুদ্রতানিবন্ধন চিত্ত আর প্রশস্ত ভূমিতে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। মানিলাম, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে অনুরক্ত হইলে হৃদয়ের প্রাশস্ত্য বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরে অনুরক্ত হইলে তদন্তর্ভূত সংসারের প্রতি বিরক্তি কেন উপস্থিত হয়, ইহাই গভীর প্রশ্ন। প্রেমের গভীরতাবিষয়ে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার সত্যতা এই প্রশ্নের উত্তরের উপরে নির্ভর করে।

মানুষের মন যদবধি ঈশ্বর ও সংসার এ উভয়ের মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় অবস্থান করে, তদবধি তাহাতে প্রেমের উদয় হইয়াছে, ইহা কখন বলা যাইতে পারে না। সংসার যাহার মনকে আর টানে না, ঈশ্বর সমগ্র হৃদয় একেবারে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাহার সংসারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের কোন কারণ থাকে না। সংসার হৃদয়ের প্রতি অধিকার বিস্তার করিতে না পারে, এজন্য তৎপ্রতি ঘৃণা পোষণ করা প্রয়োজন হয়, অন্যথা যদি চিত্ত সংসার হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া থাকিবে তাহা হইলে সংসার চিন্তার বিষয় হইবে কেন? যদি বল, পূর্ব্বস্মৃতি এখানে বিলুপ্ত হয় নাই, এজন্যই সংসার ঈশ্বরের প্রতি প্রেমস্থাপনে যে বিরোধী ভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, এখন তাহা স্মরণপথে বিদ্যমান থাকাতে তৎপ্রতি ঘৃণা বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা হইলে তদুত্তরে আমাদিগকে এই বলিতে হয় যে, এ পূর্ব্বস্মৃতি কেবল মাত্র পূর্ব্বস্মৃতি নহে, সংসারের প্রতি এখনও গূঢ় আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে তুমি আপনার পূর্ব্ব দোষ স্মরণ না করিয়া সংসারকে দোষী মনে করিতেছ কেন? যদি যথার্থই তোমার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাতে মিথ্যা দৃষ্টি থাকিবে কি প্রকারে? বল, সংসার তোমার সহিত শত্রুতা করিয়াছে, অথবা তোমার নিজের প্রবৃত্তি বাসনা তোমার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে। তোমার প্রবৃত্তি বাসনা

যদি তোমার বশে থাকিত, সংসারের যে কোন দোষ নাই, তুমি তাহা সহজে দেখিতে পাইতে। আপনার দোষ আপনি দেখিতে না পাইয়া সকল দোষ সংসারের প্রতি আরোপ করিয়া সংসারকে ঈশ্বরের বিরোধী স্থির করা হইয়াছে, এ বোধ যখন তোমাতে উপস্থিত হয় নাই, জানিও এখনও ঈশ্বরপ্রেম তোমার হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করে নাই। ঈশ্বরপ্রেম সত্যদৃষ্টি অর্পণ করে, ইহা যেন সর্ব্বদা তোমার স্মরণে থাকে।

ঈশ্বরের প্রতি অবিমিশ্র প্রেম উপস্থিত হইলে সংসারের সহিত বিরোধ ঘুচিয়া যায় কেন, এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ। ঈশ্বরসৃষ্ট সংসার অতিনির্দ্দোষ, সে সংসার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বাড়ায় বিনা, কখন প্রেম হ্রাস করে না। তোমার প্রবৃত্তি বাসনা একটি কল্পিত সংসার সৃষ্টি করিয়াছে, তোমার বিরোধ সেই সংসারের সঙ্গে। তুমি নিয়ত তোমার কল্পনার রাজ্যে বাস কর, সত্যের রাজ্যে নহে, এই জন্য মিথ্যাদৃষ্টিনিবন্ধন ঈশ্বরের ভিতরে যে সংসার বিদ্যমান, সে সংসার তোমার চক্ষে পড়ে নাই। যে সংসারে ঈশ্বর অনুপ্রবিষ্ট, সংসার ঈশ্বরে অবস্থিত, সে সংসার তোমার কল্পনার সংসার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তোমার কল্পিত সংসার ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিত, সুতরাং উহা ঈশ্বরের বিরোধী; ঈশ্বর হইতে তোমাকে উহা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তোমার হৃদয়ে উদিত হউক, তুমি দেখিতে পাইবে, ঈশ্বর সংসারে বিরাজ করিতেছেন, ঈশ্বরের কমনীয় কান্তি সংসারের মুখে প্রকাশ পাইতেছে, সংসারের কোন বস্তুই আর ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে না; সকলই ঈশ্বরকে লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত। ঈশ্বরপ্রেমে সকল সংসার তোমার আপনার হইয়া গিয়াছে, তুমি সংসারকে আর পর ভাবিবে কিরূপ?

ঈশ্বরপ্রেমসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, মানবীয় প্রেমসম্বন্ধে তাহাই বলিতে হইবে। স্ত্রী পুত্রাদিতে প্রেম যে ব্যক্তি স্থাপন করিয়াছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমেরতো কথাই নাই, স্ত্রী পুত্রাদি অতিরিক্ত ব্যক্তিগণের প্রতিও প্রীতি বিস্তার করিতে পারে না, বহু দিন হইল এই বিশ্বাস চলিয়া আসিয়াছে। এই বিশ্বাসনিবন্ধন সাধনার্থী ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি চিরদিন ঔদাসীন্যের দৃষ্টিতে দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। এ কথা স্থিরনিশ্চয়, যেখানে স্বার্থ আছে, সেখানে প্রেম নাই। যদি স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি প্রীতি আছে বলিয়া তোমার প্রেম তদতিরিক্ত ব্যক্তিগণ ও ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করিতে না পারে, জানিও এখনও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি তোমার প্রেম উপস্থিত হয় নাই, সেখানে স্বার্থের গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার পত্নী আছে সে যেন পত্নী নাই এই ভাবে, যাহার পতি আছে সে যেন পতি নাই এইভাবে, জীবন যাপন করে, এ কথা শুনিতে হৃদয়শূন্যতার মত শুনায়, কিন্তু বস্তুতঃ এ অতি উচ্চ প্রেমের কথা। পতি ও পত্নী যদি উভয়ে সংসারিক ভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হন, জানিও সেখানে স্বার্থ আছে প্রেম নাই। যেখানে সাংসারিক ভাব নাই, স্বার্থ নাই, সেখানে উভয়ের হৃদয় এক হইয়া আপনাদের জীবনের উচ্চতম ব্রতসাধনে প্রবৃত্ত, এবং এ অবস্থায় তাঁহাদিগের হৃদয় কখন জনমাত্রের কল্যাণ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে না। তাঁহাদের উভয়ের ঈশ্বরেতে একহৃদয়ত্ব অবশ্যম্ভাবী। পতি-পত্নী-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অন্যান্য সম্বন্ধসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে।

এখানে একটি জীবনের পরীক্ষিত সত্যের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। দেখা গিয়াছে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রেমসঞ্চারিত হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সেই ব্যক্তির প্রতি প্রেম যুগপৎ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক ঈশ্বর ও এক মানব অবলম্বন করিয়া প্রেম উদিত হইল, অথচ সমুদায় সংসার এ উভয়ের অন্তর্ভূত হইতে লাগিল, এবং সর্ব্বত্র প্রেম বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যাহার প্রতি যাহার প্রেম উপ-

স্থিত হয়, তাহার সজাতীয়ে প্রেম সহজে ধাবিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও মানব,এ উভয়ে যখন যুগপৎ প্রেম উপস্থিত হইল, সমুদায় প্রকৃতি ও জীবমণ্ডলী সজাতীয় ভিন্ন আর বিজাতীয় ভাবে গৃহীত হইতে পারিল না, সুতরাং সর্ব্বত্র প্রেম ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপ প্রেম ছড়াইয়া পড়াতেই প্রেমের যে কি নিগূঢ় শক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। একেতে প্রেম আরম্ভ হইয়া প্রেম সকলেতে ছড়াইয়া পড়ে, এ বিচিত্র রহস্য যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কি আর প্রেমের নিগূঢ় শক্তি বুঝিবার অবশিষ্ট থাকে? যাহা এক ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা সকল ব্যক্তিতেই প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, এই আশায় এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। ঈশ্বরকৃপায় সকলের জীবনে প্রেমের এই নিগূঢ় শক্তি প্রত্যক্ষ হয়, এই হৃদ্গত কামনা।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

আত্মন্, অপরের চিত্তে ক্লেশ বা বিরক্তি উপস্থিত না হয়, এজন্য তোমার যত্ন কেনই বা অনুমোদন করিব না? কিন্তু জানিও যদি ক্লেশ দিব না, বিরক্তির কারণ হইব না, সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই লক্ষ্য প্রতিনিয়ত তোমার চক্ষের সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে বিবেকের বাক্যশ্রবণের পক্ষে ঐ দুই ভাব প্রতিবন্ধক হইবে। যেখানে লোকের তুষ্টি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি প্রবল, সেখানে বিবেকের প্রতি দৃষ্টি হ্রাস পাইবে। হে আত্মন্, তাহা কি তুমি আপনি প্রত্যক্ষ কর নাই?

আত্মন্, যত দিন তোমাতে বিবেকিত্ব প্রত্যক্ষ করিব, তত দিন তোমার সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়াছে, ইহা কদাপি মনে করিব না। বিরোধ ঘটিয়াছে, কি মিল আছে, এক বিবেকের অনুসরণ ও অননুসরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়; মিল অমিল বুঝিবার অন্য আর উপায়ান্তর নাই। তুমি বলিবে, আমাতে বিবেকিত্ব আছে কি না, তাহা তুমি বুঝিবে কি প্রকারে? এ সম্বন্ধে তোমার তো ভ্রম ঘটিতে পারে? দুই ব্যক্তি বিবেকী হইলে এ সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি কখন পার্থিব ভাব আসিয়া বিবেকের আলোককে অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়, অমনি ভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিলে মোহ চলিয়া যায়, বিবেকের আলোক প্রজ্বলিত ভাবে নয়নসন্নিধানে পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত থাকে।

আত্মন্, তোমার মুখ সর্ব্বদা বিবেকালোকে আলোকিত হউক। বিশুদ্ধ বিবেক যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি মুখের উপরে ছড়াইয়া দেয় সে জ্যোতি চন্দ্রের আলোক অপেক্ষাও অতি মনোহর। এই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ মুখ দেখিলে, প্রাণের গভীরতম স্থানে যে এক অপূর্ব্ব আহ্লাদের উদয় হয়, সংসারের প্রচুর সম্পদ, সম্মান ও আদর তাহার অণুমাত্রও দান করিতে পারে না। হে আত্মন্, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমার নিকটে আমার চাহিবার বিষয় কি? চাহিবার বিষয়, বিবেকালোকে আলোকিত পবিত্র মুখজ্যোতি। যে জ্যোতির নিকটে চন্দ্র সূর্য্যাদির জ্যোতি শোভা পায় না, সে জ্যোতি এই জ্যোতি। ঈশ্বরের মুখজ্যোতি স্বতঃ চির উজ্জ্বল। তাঁহার সন্তানগণের নিজের কোন জ্যোতি নাই, ঈশ্বরের জ্যোতি তাঁহাদিগেতে যখন প্রবেশ করে, তখনই তাহাকে বিবেকালোক বলা যায়। এ বিবেকালোকে নিয়ত তোমার মুখ জ্যোতিষ্মান্ দেখিতে কেনইবা একান্ত অভিলাষ হইবে না?

স্বর্গগত ডাক্তার শ্রীমান্ প্যারীমোহন গুপ্ত।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।)

অতিশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন্ধ্যাকালে আমার প্রিয়তম মধ্যম ভাগিনেয় শ্রীমান্ প্যারীমোহন গুপ্ত নিউমোনিয়া রোগে ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমানের অকালে পরলোকযাত্রায় আমরা সকলে গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।

প্যারীমোহন ফরিদপুরে সিবিল সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরলোক গমনের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তথায় তাঁহার সামান্য জ্বর হইয়াছিল। পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীমান্ বিনয়চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে ফরিদপুরে গমন করেন। তিনি সেখানে পহুঁছিয়া আমাকে এরূপ পত্র লিখেন যে, "মেজ দাদার জ্বর সামান্য, তবে আমার এখানে আসা ভালই হইয়াছে।" দুই দিন পরেই বিনয় চন্দ্রের আর এক পত্র প্রাপ্ত হই। তাহাতে এরূপ লিখা ছিল,"দাদার জ্বর সামান্য ভাবিয়াছিলাম তাহা নয়, জ্বরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি, প্রায় তিন ডিগ্রি জ্বর হয়, কাসির জন্য রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না। তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ লইয়া যাওয়া আবশ্যক, দুই মাসের ছুটির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার কোন উত্তর আইসে নাই। দাদা ক্রমশঃ যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, বিলম্ব হইলে তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হইবে।" এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র আমি বিনয়চন্দ্রকে এরূপ লিখি যে, "অবিলম্বে টেলিগ্রামযোগে ছুটি লওয়াইয়া যত দূর সাবধানে হইতে পারে সত্বর তোমার দাদাকে লইয়া কলিকাতায় পহুঁছিবা, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবে না।" ছুটী পাইতে বিলম্ব হইল, কলেক্টার সাহেবও ষ্টেশনে ছিলেন না যে, আপাততঃ তাঁহাকে বলিয়া রওয়ানা হইতে পারিবেন। এদিকে

রোগ প্রবল পরাক্রম ধারণ করিল। ২৫শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার হইতে শ্বাসকৃচ্ছ্রের যাতনায় প্যারীমোহনের আর শয়ন করিবার সাধ্য ছিল না, তিনি দিবারাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছেন। বধূমাতার শারীরিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া প্যারীমোহন এক পক্ষ কাল পূর্ব্বে তাঁহাকে কলিকাতায় তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিনয় চন্দ্র দাদার রোগ কঠিন বলিয়া কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিতে পুনঃ পুনঃ উদ্যত হইয়াছিলেন, বধূমাতা অত্যন্ত ভাবিত হইবেন, এই সংবাদ পাইয়া বা ফরিদপুরে চলিয়া আইসেন, প্যারীমোহন ইহা মনে করিয়া তদ্রূপ টেলিগ্রাম করিতে দেন নাই। তথাকার বন্ধুগণও সেরূপ টেলিগ্রাম করিতে বারণ করিয়াছেন। তিনি প্রায় সপ্তাহকাল হইতে ডবলব্রঙ্কো নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তত্রত্য তাঁহার অধীনস্থ ডাক্তারগণ তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্যারীমোহনের দুঃসহ ক্লেশ ও রোগের একান্ত প্রকোপ দেখিয়া বিনয়চন্দ্র ৫ই অগ্রাহায়ণ রবিবার আরম্ভে টেলিগ্রাম যোগে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ শ্রীমান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও প্যারীমোহনের শ্বশুর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন দাস মহাশয়কে এবং ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যকে অবস্থা জ্ঞাপন করেন। সেই দিবস সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এখানে টেলিগ্রাম পঁহুছে। সেই দিন রাত্রির মেইলে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল রত্ন সরকার, শ্রীমান কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন দাস, বধূমাতা ও তাঁহার গর্ভধারিণী এবং আমার চতুর্থ ভাগিনেয়ী ফরিদপুরে যাত্রা করেন। তাঁহারা পর দিন সোমবার ৮॥০ টার সময় ফরিদপুরে পহুঁছিয়া রোগীকে লইয়া ১০ টার মধ্যে কলিকাতায় রওয়ানা হইয়াছিলেন। সেই দিনই চাঁদপুর মেইলে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহারা কলিকাতায় উপনীত হন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণের কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ নূতন প্রশস্ত দ্বিতল আবাসে রোগীকে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সেই রাত্রি ও তাহার পর দিন মঙ্গলবার রোগীর অতিশয় সঙ্কট অবস্থা ছিল। এই ভাবে যে, প্যারীমোহনকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইয়াছে, আমি জানিতাম না, কয়েক দিন কোন সংবাদ না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত ছিলাম। ব্যস্ততা প্রযুক্ত কেহ আমাকে এই সংবাদ দান করেন নাই। ১লা অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে ডাক্তার আচার্য্য পত্রদ্বারা আমাকে ইহা জ্ঞাপন করেন। আমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র প্যারীমোহনকে দেখিতে যাই। তাঁহার ভয়ানক শ্বাসকষ্ট দেখিয়া আমি আকুল হইয়া পড়ি। এই দুঃসহ ক্লেশের মধ্যেও প্যারী আমাকে দেখিবামাত্র পদধূলি গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, এবং কষ্টে আমাকে বলিলেন, "২০ নং বাড়ী ছাড়িয়া ৩নং বাড়ীতে আসিয়া আপনাদের অসুবিধা তো হয় নাই?" চিকিৎসা শুশ্রূষা যত দূর উত্তম হইতে পারে হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরত্ন সরকার প্রধানতঃ চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন ৪। ৫ বার আসিয়া রোগীকে দেখিয়াছেন, আবশ্যক মতে কোন কোন দিন রাত্রি ২টা ৩টার সময় আসিয়াছেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ দিবারাত্রি রোগীর নিকটে ছিলেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ নিয়ত আসিয়া ডাক্তার নীলরত্ন সরকারের সঙ্গে মিলিয়া রোগ পরীক্ষা ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত আর্ এল দত্ত, রসেল সাহেব জুবার্ট সাহেব পরামর্শদাতৃস্বরূপ এক এক দিন উপস্থিত হইয়াছেন। ডাক্তারদিগের গলদ্‌ঘর্ম্ম চিকিৎসাযত্ন, আত্মীয় স্বজনদিগের প্রাণগত সেবাশুশ্রূষা, সমুদায় বিফল করিয়া প্রিয়তম প্যারীমোহন নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। টেলিগ্রাম পাইয়া কাওরাদ হইতে বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় এবং আরা হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। আত্মীয় বন্ধুদিগের হৃদয়ে এই বিষম ক্লেশ যে, উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই, যথা সময়ে প্যারীকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া সমুচিত চিকিৎসা করাইতে পারেন নাই।

প্যারী মোহনের শ্বাসকৃচ্ছ্রের অবস্থা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি প্রায় প্রতিদিন দুই বেলা তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। একদিন সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র প্যারী মামা, মামা, বলিয়া আমার গলা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "আর পারি না, আর পারি না, আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তারগণ বলে কি? প্রাণকৃষ্ণ কোথা?" তখনই প্রাণকৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "প্রাণকৃষ্ণ, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ক্লেশ হইতে মুক্ত কর। বরং চারি ডিগ্রি জ্বর করাইয়া আমাকে শোওয়াইয়া রাখ।" ৪ঠা অগ্রহায়ণ শনিবার পর্য্যন্ত দিবারাত্রি প্যারীমোহন এইরূপ বিষম ক্লেশ যাতনা কাহার স্কন্ধে বা চেয়ারে বালিশের উপর মস্তক রাখিয়া ভোগ করেন। তৎপর শ্বাসকৃচ্ছ্রতার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তিনি শয়ন করিয়া ঘুমাইতে পারিতেছিলেন, কফও তরল হইয়া সহজে পুঞ্জ পুঞ্জ নির্গত হইতেছিল, নাড়ী ও হৃৎকোষের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারগণ অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করিলেন, জ্বর একদিন অধিক হইয়াছিল, অন্য অন্য দিন দুই ডিগ্রির উপরে বড় উঠে নাই। ইতি পূর্ব্বে অনেক বার মর্ফিয়া ইঞ্জেক্ট করিয়া নাড়ী সতেজ রাখিতে হইয়াছিল। এক্ষণ নাড়ীর গতিও অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হইতে লাগিল। সকলেরই মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু প্যারীমোহন কলিকাতায় আগমনাবধি সর্ব্বদা নিজের জীবনে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছিলেন, "যাত্রা করিলাম, আমি বুনুমার (পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা কন্যার) কাছে যাইতেছি;" এই কথাই বলিয়াছেন, বাঁচিবেন এরূপ কথন বলেন নাই। ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সকলে উপস্থিত থাকেন এ প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকলেই নিকটে আসিয়াছিলেন, কেবল শিলচরে যে ৩য় কনিষ্ঠা ভগিনী আছেন, প্যারীমোহনের গুরুতর পীড়ার সংবাদও তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয় নাই। একেবারে নিদারুণ শোক সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হন। প্যারীকে একটু ভাল দেখিয়া আমাদের মনে

আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু রবিবার হইতে তিনি একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে ভুল বলিতেছিলেন। কখন কখন লোক চিনিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্ম হইতেছিল। মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্ব হইতে কফ নির্গত হইতেছিল না, কাসিবার শক্তি ছিল না। ৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার অপরাহ্নে তিনি প্রথমতঃ আমাকে চিনিতে পারেন নাই. "আপনি কে?" এরূপ ২।৩ বার আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি পরিচয় দান করিলে বলিলেন "ছোট মামা।" এইরূপ বধূমাতার ভ্রাতাকে চিনিতে পারেন নাই। সেই দিন বা তাহার পরের দিন গুপ্ত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "বাবা, আমার আর বুদ্ধি নাই, আর আমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি।" ইতিমধ্যে এক দিন প্রাতে এই ভাবের কয়েকটী কথা সুর করিয়া গাইয়া ছিলেন, "আমি পাপের জন্য তোমাকে দেখিতে পাই নাই, আমার শরীর অবসন্ন, ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, এখন আমাকে তুমি দেখা দাও, আমার মা রাজরাজেশ্বরী. আমি আমার মায়ের মার কাছে যাইতেছি, আমার বুন্নু মা যেখানে সেখানে যাইতেছি। আমার মা সেবাদাসী হইয়া আছেন।" ইত্যাদি। ৮ই বুধবার প্রাতঃকালে অবস্থা দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারেন নাই, সেই দিনই প্রিয়তম প্যারী আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় শ্রীমান কৃষ্ণ গোবিন্দ ও আমাকে দেখিয়া কয়েক বার বৃদ্ধাঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া এই ভাব প্রকাশ করিলেন যে, আর আমাকে বাঁচাইতে পারিলে না ৭টার সময় সিবিল সর্জ্জন জুবার্ট সাহেব আসিলেন. "তিনি দেখিয়াই বলিলেন, আর সময় নাই, প্রাণত্যাগের এক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে!" সকলের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তখনও প্যারীমোহন ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ভুল হইয়াছিল। সেই দিন প্রাতঃকালে প্যারীর হস্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় কনিষ্ঠা ভগিনী নিকটে বসিয়া সেবা করিতেছিলেন, প্যারীমোহন একবার তাঁহার হস্তের প্রতি ও একবার নিজের হস্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কফের সঙ্গে একটি লাল রেখা দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই সঙ্কট অবস্থায় এত দূর তাঁহার দৃষ্টি ছিল। মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে প্যারী মস্তক উত্তোলন করিয়া বধূমাতার হস্তে দুগ্ধাদি পান করিলেন, ক্রমে নাড়ীর গতি রুদ্ধ হইল। দুই মিনিট পূর্ব্বে প্যারীমোহন নিজের দক্ষিণ হস্ত মস্তকের নিম্নে স্থাপন করিলেন, তৎপর মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। গৃহে শোকবিলাপের ধ্বনি উঠিল। বধূমাতা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দিবারাত্রি প্যারী মোহনের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। সেই ঘোরতর সময়ে তাঁহার স্থিরতা ধীরতা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন। বৃদ্ধ পিতা গুপ্ত মহাশয় এই নিদারুণ শোকের আঘাত পাইয়া আশ্চর্য্য ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার স্থির অটল ভাব, পরলোকে বিশ্বাস, ঈশ্বরে নির্ভর দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছেন। সেই সময় তিনি পরলোকগত উপযুক্ত গুণবান্ পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কি কি আয়োজন করিতে হইবে, স্থিরভাবে তাহার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কেবল এক এক সময় যখন শোকের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্রহ্মনাম উচ্চারণ ও প্রার্থনা করিয়া তাহা সংযত করিয়াছেন। দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও প্যারীমোহনের শরীর যেন কিছুমাত্র শীর্ণ ও ভঙ্গ হয় নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় যেন তিনি দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তিনি মাতা ও পিতামহীর বড় আদরের পাত্র ছিলেন। পিতামহী তাঁহাকে বাদ্‌লি বলিয়া ডাকিতেন, বাল্যকালে তিনি সেই বাদ্‌লী নামে দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পিতামহী ও জননী পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন, আজ বর্ত্তমান থাকিলে এই শোকেই মারা যাইতেন। গত শনিবার বিশেষ উপাসনার জন্য স্বর্গগত প্যারীমোহনের শ্বশুর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া দেখি বধূমাতার মস্তকের কেশ ছিন্ন,পরিধানে থান কাপড়,হস্ত আভরণশূন্য, তাঁহার দুঃখিনী বিধবা বেশ, ইহা দেখিয়া হৃদয়ে শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল। আজ দেশের চারিদিকে আত্মীয় বন্ধুদিগের হাহাকারের ধ্বনি উঠিয়াছে। নানা স্থান হইতে শোকাকুল পত্র সকল পাইয়া আকুল হইতেছি। আশ্চর্য্য যে রোগসঞ্চারের এক পক্ষ পূর্ব্বে নাকি প্যারী বধূমাতার ভাগিনীকে বলিয়াছিলেন, দেখিবে নিমোনিয়া রোগে আমার মৃত্যু ঘটিবে।

প্যারী মোহনের আমি অতিশয় প্রিয় ছিলাম, তিনি আমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা বুন্নু পরলোকান্তে তিনি নিম্ন লিখিত পত্র খানা লিখিয়াছিলেন;—

"এত হঠাৎ ভগবান্ আমাদিগকে এই কঠিন পরীক্ষায় ফেলিবেন, তাহা পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এই বিপদে তাঁহার দয়া ও আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমাদের শান্তির আর কোন পথ নাই। ৯ বৎসর কাল আমাদের সঙ্গে থাকিয়া মা বুন্নু আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়া গিয়াছে। দীন দুঃখীর প্রতি দয়া, ছোট ভাই ভগ্নীদের উপর স্নেহ ও মমতা, রোগের অসহ্য কষ্টে ধৈর্য্য, এই সকল বিষয় বুন্নু আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে। বুন্নু ঘরে থাকিলে কোন ভিখারী আমার বাড়ী হইতে খালী হাতে ফিরে যায় নাই। 'বাবা একটা অন্ধ আসিয়াছে, তাহার জন্য পয়সা দেও।' কত বার যে এই শিশুর মুখে এ কথা শুনিয়া আমার মন অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। পরলোকে যাইবার ৩। ৪ দিন পূর্ব্বেও এক দিন রাত্রে ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়া তাহার মাকে বলে, 'মা, আমি আজ কয় দিন যাবৎ উপাসনা করিয়া শুইতে পারি নাই, আজ উপাসনা করিয়া শুইব।' সমবয়স্কা কোন মেয়ে বাড়ী আসিলে, তাহারা না খাইয়া যাইতে পারে নাই। শ্রীনাথ বাবুর দুইটি মেয়ে ও রাজকুমার বাবুর ছোট মেয়েটী তাহাকে দেখিবার জন্য আসে, তখন তাহার ১০৫ ডিগ্রি

জ্ঞ। টুনুকে (ছোট বোনকে) ডাকিয়া বলে 'তুই ইহাদের সঙ্গে খা।' তাহার এই সকল গুণের কথা মনে হইলে আর সুস্থির থাকিতে পারি না। মা ১লা মে শুক্রবার স্বর্গারোহণ করেন, আমার বুনুও শুক্রবার ২৯ এপ্রিল স্বর্গারোহণ করিয়াছে। এই শোক ও কষ্ট বহন করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে বল দিন, এই আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনার বউ মা বড় কাতর হইয়াছেন। তাঁহার এই রুগ্নশরীরে এত কষ্টের ভার সহ্য করা বড় সহজ কথা নয়। তবে তিনি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া যত দূর পারেন সহ্য করিতে যত্নবতী হইয়াছেন।"

প্যারীমোহনের অনেক উচ্চ গুণ ও উচ্চ ভাব ছিল, তাঁহার ন্যায় সরল দয়ার্দ্র কোমল হৃদয় লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমি সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি।

প্যারীমোহন ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কালী নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। বাল্যকালে তিনি চপল ও অশাসিত ছিলেন, অনেক সময় জননী ও পিতামহীর অবাধ্যাচরণ করিয়াছেন, এবং অভিমান করিয়া ঢিল ছুড়িয়া ঘর দুয়ার ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কলাগাছ দ্বারা পাঁঠা মহিষ প্রস্তুত করিয়া তাহা ছেদন করা তাঁহার প্রধান ক্রীড়া ছিল। তজ্জন্য তাঁহাদ্বারা গ্রামের উদ্যানকদলী উৎসন্ন হইয়াছিল। একদিন তিনি কলাগাছের পাঁঠা মহিষ বলিদানে তৃপ্ত না হইয়া ক্রীড়ার সঙ্গী একটী বালককে বলেন, তুই পাঁঠা হ তোরে বলি দিব। বালকটি তাঁহার কথানুসারে দুই হস্ত ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক অধোমুখে বসিয়া "ব্যা ব্যা" করিতে লাগিল, প্যারীর ইঙ্গিত মতে আর একটি বালক তাহাকে চাপিয়া ধরিল। তখন প্যারীমোহন এক খানা দা হস্তে ধারণ করিয়া তাহাকে বলিদানে উদ্যত হইলেন। এমন সময় একজন প্রতিবেশী তাহা দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে দা কাড়িয়া লইয়া গেলেন, তাহাতেই সেই বালকটি সেদিন বাঁচিয়া গেল। পাঁচদোনার বাজারে প্রত্যহ মেঘনা নদীর রুই কাতলা প্রভৃতি মৎস্য বিক্রয় হয়, প্যারী-মোহনের জন্মভূমি ভাটপাড়ায় কৈ মাগুর প্রভৃতি বিলের জীবিত মাছ জেলেরা বাড়ী বাড়ী ফেরি করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। পাঁচ দোনার লোকেরা মরামাছ খায় বলিয়া ঘৃণা করিয়া বালক প্যারী-মোহন পাঁচদোনায় মাতুলালয়ে যাইতে চাহিতেন না।

প্যারী ১০।১২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করেন, পরে ময়মনসিংহে যাইয়া ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন ময়মনসিংহে তাঁহার মধ্যম মাতুল আমার অগ্রজ স্বর্গগত হরচন্দ্র সেন মহাশয় বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, অকস্মাৎ তথায় তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। প্যারী মোহনের অগ্রজ শ্রীমান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে মধ্যম মাতুলের আশ্রয়ে থাকিয়া জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর দুই ভাই ময়মনসিংহ পরি-ত্যাগ করিয়া আসিয়া ঢাকা নগরের আরমাণিটোলা পল্লীতে ব্রজ সুন্দর বাবুর আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক উভয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে থাকেন। প্যারীমোহন প্রথমতঃ পোগোজ স্কুলে পরে কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। প্যারীর কনিষ্ঠ শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দও বিদ্যাশিক্ষার্থ তথায় আসিয়া বাস করেন। সেই সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই; ব্রজসুন্দর বাবুর গৃহেই সামাজিক উপাসনা হইত। পূর্ব্ব বঙ্গের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় সেই গৃহে কয়েকটি যুবক ও বালক লইয়া স্থিতি করিতেন। সেখানে প্রতি দিন ধর্ম্মচর্চ্চা ও উপাসনাদি হইত। বালক প্যারীর মনে তখন হইতে ধর্ম্মোৎসাহ প্রবল হইয়া উঠে। তিনি ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের অতিশয় প্রিয় পাত্র হন। প্যারীমোহন ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বঙ্গ বাবু এক দিন তাঁহাকে না দেখিলে অস্থির হইতেন। একদা গ্রীষ্মের ছুটীর সময় শ্রদ্ধেয় বঙ্গ বাবু উঁহাকে সদলে ময়মনসিংহে গিয়া-ছিলেন, প্যারীমোহন তখন নিজালয়ে ছিলেন। একদিন বঙ্গ বাবু তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমার প্যারী না জানি কেমন আছে বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে আমি সপরিবারে ময়মন সিংহে অবস্থিতি করি; প্যারীমোহন আমার নিকট থাকিয়া তত্রত্য জিলা স্কুলে পড়িবার জন্য আগমন করেন। স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার কয়েক দিন পরেই বলেন, "ঢাকার বন্ধুদিগের জন্য আমার মন অস্থির," এই বলিয়া ঢাকায় চলিয়া যান। প্যারী সেই সময় অতি মধুর স্বরে ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন, তাঁহার মুখে সঙ্গীত শুনিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইত। আচার্য্যের প্রতি বাল্যকাল হইতে তাঁহার অটল ভক্তি বিশ্বাস ছিল। পরে নানা প্রকার বিরুদ্ধ আন্দোলনেও তাঁহার সেই ভক্তি বিশ্বাসের হ্রাস হয় নাই। মাঘোৎসবের সময় প্যারীমোহন কলিকাতায় আসিয়া উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। তখন ঢাকা নগর হইতে কলি-কাতায় গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। দৈনিক ষ্টীমার ছিল না, গোওয়ালনন্দ পর্য্যন্ত রেল হয় নাই। সপ্তাহান্তে এক খানা মেলের জাহাজ ঢাকা হইতে ২৩ দিনে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত পহুঁছিত, সেই জাহাজে যাত্রিকগণ কষ্টে সৃষ্টে কুষ্টিয়া পহুঁছিয়া তথায় রেল গাড়ী আশ্রয় করিয়া কলিকাতায় আসিতেন। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও কলিকাতায় উৎসবে আসিয়া যোগদানে প্যারীকে বাধা দিয়া রাখা দুষ্কর হইত। সামাজিক উৎপীড়ন এবং তাঁহার পিতামহীর অনু-রোধ উপরোধে কোনরূপ অবৈধ উপায়ে এই গুপ্ত পরিবার ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়িয়া হিন্দু সমাজভুক্ত হইতে উদ্যত হইয়াছিল। ধর্ম্মবীর বালক প্যারীমোহনের মন কেহই বিচলিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা আর হিন্দু আত্মীয়-দিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন না। বালক প্যারীর দৃঢ়তায় পরিবারটি রক্ষা পাইল।

প্যারীমোহন ১৮৭১ সনে ঢাকা কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। এখানে মেডিকাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৭৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি

ইংলণ্ডে ডাক্তারি শিক্ষা করিবার জন্য চলিয়া যান। ইতি পূর্ব্বে শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ সিবিল সার্ব্বিস পাস করিয়া বরিশাল জিলার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্যারীমোহন তাঁহারই বিশেষ সাহায্যে ইংলণ্ডে গমন করেন। ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া ইংলণ্ড হইতে ১৮৮২ সালে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। প্রথমতঃ তিনি ৬ মাস কাল সাতানায়, পরে গিরিডিতে রেলওয়ে সংক্রান্ত চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৪ সালে তিনি বিবাহ করেন। ১৮৮৫ সালে প্যারীমোহন আসামের অন্তর্গত তুরাগিলে সিবিল সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ সালে তাঁহার সার্ব্বিস বাঙ্গালায় পরিবর্ত্ত হয়। তিনি প্রথমতঃ ৬ মাস ময়মনসিংহে তৎপর ৬ মাস নয়াখালিতে সিবিল সার্জ্জনের কার্য্য করেন। পরে ১৮৯৪ সালে তিনি ফরিদপুরে নিযুক্ত হন।

বিলাত গমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে প্যারীমোহনের ধর্ম্মোৎসাহ ও উপাসনানিষ্ঠার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা সাধুভক্তি বিনয় পরহিতৈষিণা অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। একদা উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উৎসব বা প্রচার উপলক্ষে ময়মনসিংহে যাইতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জ হইতে রেল পথে ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহে যাইতে হয়। প্যারীমোহন তখন ঢাকায় ছিলেন, গৌরগোবিন্দ বাবু যাইতেছেন সংবাদ পাইয়া নরের পথ অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া প্রণাম করেন। আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় ভালবাসা ছিল। কলিকাতায় যখন দুই এক দিনের জন্য আসিতেন, তখন ভবানীপুরে শ্বশুরালয়ে অথবা বালীগঞ্জে জ্যেষ্ঠের আবাসে স্থিতি করিতেন, কিন্তু পটুয়াটোলা আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেন না। আমি তাঁহার কর্ম্মস্থানে যাইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিলে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। এই শুপ্ত পরিবার সাধারণসমাজভুক্ত। কিন্তু প্যারীমোহন নিজের পারিবারিক অনুষ্ঠান আমাদ্বারা সম্পাদন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যখন প্যারীমোহন ময়মনসিংহে ছিলেন, তখন আমি প্রচার উপলক্ষে অল্পদিনের জন্য তথায় গিয়াছিলাম, তাঁহার আবাসেই অবস্থিতি করিতে বাধ্য হই। বধূমাতা সেখানে ছিলেন, কুমার জন্মিয়াছিল। প্যারীমোহন কুমারের জাতকর্ম্ম করিতে আমাকে বাধ্য করেন। কাহার কাহার ইচ্ছা ছিল যে বালকের পিতামহকে ও ঢাকা হইতে আত্মীয় বন্ধুকে আনাইয়া প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম জাঁকজমক করিয়া করা হয়। কিন্তু প্যারী বলিলেন, "মামা এত দিন থাকিবেন না। এক্ষণই এ কার্য্য করিতে হইবে।" ভবানীপুরে শ্বশুরালয়ে দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ হয়, নামকরণের দিন অপরাহ্নে প্যারী আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, "খুকীর নামকরণ কার্য্য আপনাকে সম্পাদন করিতে হইবে।" আমার শরীর অসুস্থ ছিল, আমি কিছু আপত্তি করিলাম। প্যারীমোহন আমাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, "আমার সঙ্গে গাড়ীতে যাইবেন, উপাসনান্তে আমি গাড়ীতে পাঠাইয়া দিব" বলিয়া সঙ্গে করিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। নয়াখালিতে একবার, ফরিদপুরে অনেকবার আমি কিছুদিন তাঁহার আবাসে ছিলাম। তিনি উৎসাহ আনন্দের একশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর হইল তাঁহার সম্বন্ধে কোন কারণে আমার কিছু মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ঢাকা হইতে আমি ফরিদপুরে তাঁহাকে এরূপ পত্র লিখি যে,আমার প্রতি যখন তোমার অবিশ্বাস দেখিতেছি, তখন আমাকে তোমার সম্পর্ক ছাড়িতে হইতেছে, আমি আর তোমার আবাসে স্থিতি করিব না। অমুক দিন আমি কলিকাতায় যাত্রা করিব, বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ একদিনের জন্য ফরিদপুরে থাকিব, কিন্তু কলেক্টরীর সেরেস্তাদার বাবু কালীকুমার বসু মহাশয়ের আবাস আতিথ্য স্বীকার করিব। প্যারীমোহন তখন টুরে ছিলেন, এই পত্র তিনি পরসাতে পাইয়া প্রায় দুই তা কাগজ পূর্ণ এক পত্র আমার নামে কালীকুমার বাবুর ঠিকানায় লিখেন। তাহার সার এই ;—আপনি আমার বাড়ীতে উপস্থিত না হইলে আমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। আমি ফরিদপুরে থাকিতে আপনি অন্যের আবাসে স্থিতি করিতে পারেন না। আমার বাড়ী আমার লোক জন, আপনার বাড়ী আপনার লোক জন। আপনি কি আমার আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন, কখন নয়। আপনার নিজের বাড়ীতে আপনি স্থিতি করেন। মামা, মা চলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণ পৃথিবীতে বাবা আর আপনি আমাদের অবলম্বন। দয়া করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, সমুদায় ভুলিয়া যাইতে হইবে। শুক্রবার দিন মাতৃদেবী স্বর্গগত হইয়াছেন, মাতার স্মরণার্থে সেই দিন সাপ্তাহিক উপাসনা আমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে। ফরিদপুরে কালীবাবুর আবাসে পঁহুছিয়াই আমি এই পত্র পাইলাম। তাহা পড়িয়া আমার মনের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ এইরূপ উত্তর লিখিলাম, প্রিয় প্যারী, আমি সমুদায় ভুলিয়া গেলাম। আজ আমাকে এখানে থাকিতে হইয়াছে। আমি আগামী কল্য তোমার আবাসে উপস্থিত হইব, তুমি আর বিমর্ষ থাকিবে না। এই উত্তর লিখিয়াছি, এমন সময় দেখি প্যারীমোহন আমাকে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং কালীকুমার বাবুর আবাসে উপস্থিত। ইহার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই প্যারী পাংসা হইতে ফরিদপুরে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলাম "প্যারীমোহন, আমি তোমার পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছি, আমি কল্য তোমার কাছে যাইব। আমার মনে আর কোন মালিন্য নাই।" এই কথায় তিনি কৃতার্থ হইয়া আনন্দের সহিত চলিয়া গেলেন। পর দিন প্রাতঃকালে লোক পাঠাইয়া আমার সঙ্গের দ্রব্যজাত লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার গৃহে ২। ৩ দিন স্থিতি করিয়া আমার দিদীর স্বর্গগমনের দিন সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলাম। ইতিপূর্ব্বে প্রতি বৃহস্পতিবার কতিপয় বন্ধু মিলিয়া তাঁহার বাঙ্গালায় উপাসনা করিতেন। একদা

প্যারীমোহনের অনুপস্থিতি কালে আমি ফরিদপুর হইতে কলিকাতায় যাত্রা করি। বধূমাতা ভুলিয়া হউক বা বিরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া হউক, আমাকে পাথেয় প্রদান করেন নাই। প্যারীমোহন আবাসে আসিয়া উহা জানিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হন, এবং বধূমাতাকে অনুরোধ করেন, অবিলম্বে মনিঅর্ডার করিয়া আমার নিকটে টাকা পাঠাইয়া দেন।

উপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্রমশঃ প্রকাশিত সুবিস্তীর্ণ আচার্য্যের জীবনচরিত পুস্তক প্যারীমোহন আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। আচার্য্যের জীবন পুস্তকের ভাষা কঠিন হইতেছে, অপেক্ষাকৃত সরল হইলে ভাল হয়, ইহা উপাধ্যায় গৌর বাবুকে জানাইতে আমাকে বলিয়াছিলেন। আচার্য্যের একখানা উৎকৃষ্ট ছবি প্যারীমোহন চাহিয়াছিলেন। আমি ফ্রেমে বদ্ধ করিয়া সেই ছবি তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দি। তিনি ছবি পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন বটে কিন্তু একপ ভাল ছবির উপযুক্ত ফ্রেম হয় নাই বলিয়া কিছু দুঃখিত হইয়াছিলেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, ইহার ফ্রেম অতিশয় উৎকৃষ্ট হওয়া চাই, আপনি টাকার জন্য ভাবিবেন না। এই বলিয়া প্যারী ছবি আমাকে ফেরত দেন। পরে ভাল ফ্রেমে বদ্ধ সেই ছবি পাইয়া প্যারী অত্যন্ত আনন্দিত হন, এবং তিনি যেখানে বসিয়া সর্ব্বদা লেখা পড়া করেন, সেই স্থানে নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা স্থাপন করিয়াছিলেন।

মাতার প্রতি প্যারীমোহনের অচলা ভক্তি ছিল। মাতৃদেবীর পরলোক প্রাপ্তিতে তিনি অতিশয় শোকাহত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন একবৎসর কি দেড় বৎসর অন্তে ঢাকায় যাইয়া মাতার যে গৃহে পরলোক হইয়াছিল তাহা দর্শনপূর্ব্বক কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তিনি মাতৃদেবীর সমাধিস্থাপনের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, তজ্জন্য ব্যস্ত ছিলেন এক্ষণ নিজেই জননীর নিকটে চলিয়া গেলেন। দিদীর একখানা ভাল বোমাইট ছবি প্রস্তুত করাইয়া দিবার জন্য আমার প্রতি ভার ছিল। আর্টষ্টুডিও হইতে আমি সেই ছবি প্রস্তুত করাইয়া দি। ছবি ও ফ্রেম অতিশয় উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্যারীমোহন অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং আপনি যেস্থানে বসিয়া সর্ব্বদা লেখা পড়া করিতেন, সেই স্থানে নিজের সম্মুখভাগে সেই ছবি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে পরলোক গতা কন্যা বনুর বোমাইট ছবিও রাখিয়াছিলেন। মাকে নিকটে রাখিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, সান্নায় থাকিতে মাতাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রতিমাসে নিয়মিত রূপে মাতৃসেবার জন্য ২৫৲ পাঠাইয়া দিতেন। প্রায় তিনবৎসর হইল দিদী স্বর্গগত হইয়াছেন। প্যারী তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার নামাঙ্কিত একটি সুন্দর রূপার ঘড়ী আমাদের ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রধান ছাত্রীকে এবং মাতৃনামে পাঁচদোনা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে ১০৲ পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করেন।

প্যারীমোহন অতিশয় পরহিতৈষী বদান্য ছিলেন। যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার বাল্যবন্ধুতা ছিল, ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহ সহকারে যথাসাধ্য তাঁহাদের উপকার করিয়াছেন। দুঃখী দরিদ্রের প্রতি সর্ব্বদা তিনি দয়ার্দ্র ও মুক্ত হস্ত ছিলেন। স্বদেশস্থ তাঁহার একটি বন্ধুর অসচ্ছল অবস্থা ছিল, তাঁহার অনেক গুলি পুত্র সন্তান, প্যারীমোহন সিবিলসার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াই তাঁহাকে বলেন, "তোমার প্রথম পুত্রের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার ভার আমার হস্তে রহিল।" তিনি এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত ২০৲ করিয়া বালকটিকে মাসিক সাহায্য দান করিয়াছেন। পরে সেই বালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উচ্চ পদস্থ ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া প্যারীকে সাহায্যদানে নিষেধ করেন, তাঁহার শিক্ষার ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং বহন করিতে থাকেন। ফরিদপুরে প্যারীর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে এক জন ব্রাহ্মযুবা বাঙ্গলা শিশু শিক্ষা ইত্যাদি পড়াইতেন, তাঁহাকে তিনি মাসিক ৫৲ দান করিতেন। সেই শিক্ষক অন্যত্র চলিয়া গেলে পর আমার কথানুসারে তত্রত্য জিলাস্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার চন্দকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রাজকুমার বাবুর অনেক সন্তান সন্ততি, বৃহৎ পরিবার; ৩০ টাকামাত্র মাসিক বেতন, কিছুতেই ব্যয় সঙ্কলন করিয়া উঠিতে পারেন না, অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া প্যারীমোহনের মনে দয়ার উদ্রেক হয়, বালিকাকে সামান্য শিক্ষা দানের জন্য শুনিয়াছি পরে ২০ টাকা করিয়া রাজকুমার বাবুকে প্রতি মাসে প্রদান করিতেন, এবং বধূমাতাকে বলিয়াছিলেন, "রাজকুমার বাবুর বড় কষ্ট, তাঁহার বিস্তর ঋণ, সেই ঋণ আমাকে পরিশোধ করিতে হইবে।" আমাদের দেশস্থ একটি দরিদ্র বালক ঢাকা নগরে জগন্নাথ স্কুলে পড়িতেছিল, বালকটি সুবুদ্ধি, বিনীত ও সচ্চরিত্র, তাহার শিক্ষার জন্য অনেক দয়ালু ব্যক্তি মাসিক কিছু কিছু দান করিতেন, তাহাতে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না, সে অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছিল। আমি এই কথা প্যারীমোহনকে জ্ঞাপন করি। দয়ালু প্যারীমোহন বলিলেন, অপরের সাহায্য পাইয়া তাহার যাহা অকুলন হয়, আমি তাহা পূরণ করিব। তখন প্যারীমোহন হুগলিতে থাকিতেন। সেই বালকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে সংবাদ পাইয়া তাহাকে নিয়মিতরূপে দুগ্ধ পানের জন্য কয়েকটী টাকা পাঠাইয়া দেন, এবং তাহার এণ্ট্রেন্স ফির সাহায্য করেন। পরে সেই বালক এণ্ট্রেন্স ও ফার্ষ্ট আর্টে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং দুই বিষয়ে অনার পাস করে। প্যারীমোহন প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন করিয়া অনেক দরিদ্র বন্ধুকে চাকরীর যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে তিনি কত লোকের যে উপকার করিয়াছেন বলিয়া উঠা যায় না। তদ্ভিন্ন অনুগ্রহের চিকিৎসা দ্বারা কত লোককে উপকৃত করিয়াছেন। প্যারীমোহনের এই সকল সদ্‌গুণে সমুদায় লোক মুগ্ধ, আজ তাঁহারা হাহাকার করিতেছেন। ময়মনসিংহে অবস্থান কালে তত্রত্য স্বাধীন চিকিৎসক নেটীভ ডাক্তার ব্রাহ্ম যুবা শ্রীমান্ বৈদ্যনাথকে প্যারীমোহনের সঙ্গে আমি পরিচয় করিয়া দি। বৈদ্যনাথ তাঁহার একান্ত স্নেহভাজন হন। বৈদ্যনাথের নিতান্ত অসচ্ছল ও দারিদ্র্য অবস্থা ছিল, নানা উপায়ে তিনি তাঁহার আয় বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাঁহার সঙ্গে তিনি সময়ে সময়ে একত্র ভোজন করিতেন। বধূ মাতাকে তাঁহার বাড়ীতে তাহার পরিবার মধ্যে কোন কোন সময় পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহাকে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়াছি, প্যারীমোহন তাহাকে অতিশয় সম্মান করিয়াছেন, তাহার উপকার করিয়াছেন। শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া আমাকে এই পত্র লিখিয়াছেন ;—

"* * সংবাদ পাঠ করিয়া কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছি, কি বলিব। হায় একি ব্যবস্থা! এমন সময়ে ইনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বে একটুকু সংবাদও পাই নাই। শেষ দেখাটা আর হইল না। আপনার পত্রের দ্বারাই আমি প্রথমে ইঁহার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিয়া কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিলেন কি লিখিব। আহা! তিনি আর নাই। সংবাদটা পাঠ করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস হইল না, বুঝি ভ্রম পাঠ করিয়াছি। পরে আর সে দিন বাড়ী থাকিতে পারিলাম না। সমস্তটী দিন কোন এক নির্জ্জন বাগানে কাটাইয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসি। ইহার গুণের কথা কি লিখিব। অহো! তাঁহার লতার ন্যায় সহধর্ম্মিণী মহাশয়ার কি দশা হইয়াছে। ইঁহাদের উভয়ের স্নেহ আমরা ভোগ করিয়াছি। এমন দুঃখের সময় তাঁর

কাছে কিছু লিখিতে সাহস হইতেছে না। বিধাতার কি ইচ্ছা কি অভিপ্রায়! হোক তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হউক। জয় তাঁহারই। আমরা তাঁহার হাতের কার্য্য দেখিয়া হাবা হইয়া থাকি। যেন তাঁর সঙ্গে আবার পরম মাতার ক্রোড়ে এইরূপ একত্র হইতে পারি এই প্রার্থনা।"

কিশোর গঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সেন লিখিয়াছেন ;—

"প্রিয়দর্শন এবং প্রেমাস্পদ বাবু প্যারীমোহন গুপ্তের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। এমন তীব্র নীতি এবং নববিধানে শ্রদ্ধাবান্ অথচ দয়া এবং নিরহঙ্কার দৃষ্টান্তবান লোক অতি বিরল। ঢাকার সঙ্গতের প্রথমাবস্থায় এই ভ্রাতার জীবনের উৎসাহ এবং নিষ্ঠাতে কত উপকার বোধ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আপনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমার এবং আমার পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিষ এবং এখানকার অন্যান্য ভ্রাতাদের গভীর শোক এবং দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। কি বলিয়া যে এসম্বাদে তাঁহার পরিবার হৃদয় বেদনা বহন করিতেছেন ভগবানই জানেন। আপনাকে হারাইব বলিয়া পূজার পূর্ব্বে বড় ভীত হইয়াছিলাম, সেই বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া গেল, এক্ষণ অনুরূপ ঘটনা ঘটিল।"

প্যারীমোহনের বিরহে ফরিদপুরে শোকের তরঙ্গ উঠিয়াছে : ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টরীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসুমহাশয়ের শোকসূচক পত্র তাহার প্রমাণ ;—"ডাক্তার পি এম্ গুপ্তের মৃত্যুসংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। সকলই ভগবানের ইচ্ছা। বিনয়ভূষণের মাতা অত্যন্ত ক্রন্দন করিলেন, শ্রীযুক্তাগ্রজ মহাশয় ও শ্রীমতী প্রফুল্ল অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিলেন। আমার তো পুত্রশোকের ন্যায় হইয়াছে। আমাদের যেরূপ দুঃখ হইয়াছে তাহা পত্রে প্রকাশ করিতে পারি না। ডাক্তার গুপ্তের পিতা ও পরিবারের নিকটে আমি ও বিনয়ের মাতা পত্র লিখিতে চাই। * * * এ সময়ে যে কেহ সান্ত্বনা দিতে পারে তাহার উপায় নাই, ভগবান বিনা আর সান্ত্বনার স্থান নাই।" অনেকগুলি শোকসূচক পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিন খানমাত্র প্রকাশ করা গেল। প্যারীর অধীনস্থ ফরিদপুরের কোন কোন ডক্টর একসময়ে বলিয়াছেন, "আমরা অনেক সাহেব ডাক্তারের অধীনে কাজ করিয়াছি, এমন সুখে কখন কাজ করি নাই; যেন রামরাজ্যে বাস করিতেছি।" পীড়ার সময় ফরিদপুরে তাঁহার সেবা করিবার জন্য লোকের ভিড় হইয়াছে। বড় বড় লোক আসিয়া তাঁহার পা টিপিয়াছে। বাঙ্গলো হইতে চিকিৎসার্থ তাঁহাকে যখন কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য পদ্মার ঘাটে উপস্থিত করা হয়, তখন প্রোসেশন হইয়াছিল, সকলে বিষণ্ণ বদনে অশ্রুপূর্ণ লোচনে সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। প্যারীমোহন পুরাতন ভৃত্যের গুরুতর দোষ দেখিলে তাহাকে শাসন করিতেন, কিন্তু কর্ম্মচ্যুত করিতেন না। বলিতেন "এ আমার বহুকাল সেবা করিয়াছে, দুঃখের সময় উপকার করিয়াছে, আমি ইহাকে ছাড়িতে পারি না।"

প্রিয়তম প্যারী একটি ৫ম বর্ষীয় শিশু পুত্র চারিটি শিশু কন্যা রাখিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে একদিন সন্তান কয়টিকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদিগকে নিকটে আনয়ন করা হইলে, ছোট কন্যাটী তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে চাহিয়াছিল, তিনি তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি কোলে লইতে পারিব না।" এই নিদারুণ শোকনিপীড়নে প্যারীমোহনের শ্বশ্রূমাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। স্নেহময়ী পরম জননী সকল শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন, দুঃখিনী বিধবার ও পিতৃহীন বালকবালিকাগণের তিনি আশ্রয় হউন ; সেই পরলোকগত অমর আত্মাকে আপনার অমৃতক্রোড়ে চিরশান্তিতে রক্ষা করুন।

সংবাদ।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত রবিবারে তিনি ৪৫ নং বাটীর উপাসনালয়ে উপাসনা করিয়াছিলেন।

গত ৭ই অগ্রহায়ণ চুঁচড়া নগরে তত্রত্য সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত মহাশয়ের পৌত্রী স্বর্গগত জহরলালের দ্বিতীয় কন্যার জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত প্রভৃতি ৬৭ জন গিয়াছিলেন।

বিগত শনিবার স্বর্গগত প্যারীমোহন গুপ্তের শ্বশুর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস মহাশয়ের ভবানীপুর বেলতলা পাড়া রোডস্থ ভবনে এবং গত মঙ্গলবার প্যারীমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একসাইজ কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের বালীগঞ্জস্থ ভবনে প্যারীমোহনের পরলোক গমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ব্রাহ্ম ও মহিলা তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন দুই দিনই উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় এবং ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র টাঙ্গাইল ব্রহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া ৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার তথায় উপস্থিত হন, সন্ধ্যার পরেই প্রারম্ভিক উপাসনা তথাকার মন্দিরে সম্পন্ন হয়, পরদিন সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। বুধবার প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ তালুকদার মহাশয়ের উপাসনালয়ে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে শশিবাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী নবসংহিতানুসারে দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর সুসময়ে তাঁহাদিগকে তাঁহার মণ্ডলী মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলবিধান করুন। বৈকালে তত্রস্থ রমেশ হলে উপাধ্যায় মহাশয় যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সাধন প্রণালী সম্বন্ধে একটী চমৎকার বক্তৃতা দেন। বৃহস্পতিবার ইঁহারা টাঙ্গাইল পরিত্যাগ করেন।

ধুবড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সরকার মহাশয়ের প্রথম কন্যা শ্রীমতী কুমুদ কামিনীর সহিত সিদ্ধিপাশানিবাসী শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র দাসের শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে অতি সমারোহের সহিত বিগত ১২ই ভাদ্র ধুবড়ী নগরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় পৌরোহিত্যের ও আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীমান্ মনোমথন দে সঙ্গীত করিয়াছিলেন। পাত্রটি বি, এ, পড়িতেছেন, বয়স ২২ বৎসর। কন্যার বয়স ১৮ বৎসর। এটি একটী অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিবাহ। নগরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৩ই অগ্রহায়ণ সোমবার ৬॥০ ঘটিকার সময় ধুবড়ী ত্রৈলোক্য বাবুর বাটাতে উপাধ্যায় "প্রাচীন ও নবীনের যোগ" বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে বহুতর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

অদ্য উপাধ্যায় ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ১৭ই অগ্রহায়ণ কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত।

REGISTERED No C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
২৩ সংখ্যা।

১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দেব, যাহারা তোমার হাতে জীবন সমর্পণ করিয়াছে, তাহারা সকল প্রকারের চিন্তা ও ভাবনার হাত হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা শুনিয়াছি এবং বিশ্বাসও করি, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে চিন্তা ও ভাবনা কোন না কোন আকারে লাগিয়া থাকে, ইহাও দেখিয়া আসিতেছি। এরূপ অবস্থায় কি নির্দ্ধারণ করিব বলিয়া দাও। হইতে পারে জীবন তোমার হাতে অর্পিত হয় নাই, নয়তো অর্পণ করিয়াও নূতন নূতন শিক্ষার জন্য ভাবনা চিন্তা জীবনে প্রয়োজন, তাই উহারা তোমার নিয়োগে সাধকে উপস্থিত হয়। যে সম্বন্ধে তোমার হাতে ভার অর্পিত হইল সে সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা যদি উপস্থিত হয়, জানিলাম তোমার হাতে ভার অর্পিত হয় নাই, সে মৌখিক ভারার্পণ তুমি স্বীকার কর নাই। কোন একটি বিষয়সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তায় মন ব্যতিব্যস্ত, তৎসম্বন্ধে কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া যখন অনন্যগতি হইয়া তোমার হাতে সাধক ভার অর্পণ করেন, তখন সে অর্পণের পর আর মন বিচলিত হয় না। সাধক প্রথম বুঝিতে পারেন, তুমি ভার গ্রহণ করিয়াছ, তাই তাঁহার মন নিশ্চিন্ত হইয়াছে, ভয়ের কারণ সত্ত্বেও ভয়শূন্য হইয়াছে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও কুণ্ঠিত নহে। হে মহান্ পরমেশ্বর, আমাদের জীবন অনন্ত উন্নতির উন্মুখ, যে দিন হইতে তুমি এই বিশ্বাস আমাদিগের চিত্তে উৎপাদন করিয়াছ, সেই দিন হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার হস্তে ভারার্পণ এক দিনের জন্য করিলে চলে না, নিত্য নূতন নূতন বিষয়ে নূতন নূতন ভারার্পণ করা প্রয়োজন। একটি বিষয়ে ভারার্পণ করিলাম, দেখি আর একটি বিষয় ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য উপস্থিত। তোমার প্রিয়পুত্র ঈশা, তোমার একান্ত বাধ্য সন্তান ছিলেন। যখন তাঁহার জীবনে ঘোরতর পরীক্ষা উপস্থিত হইল তখন সমুদায় রজনী জাগরণ করিয়া, শরীরের শোণিত ঘর্ম্মে পরিণত করিয়া শেষে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন। যখন একবার আত্মসমর্পণ করিলেন, আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; ক্রুশারোহণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। হে পিতঃ, আমরা তাঁহার মত নই, আমাদের জীবনের পরীক্ষাও তৎসদৃশ নহে। আমরা যেমন ক্ষুদ্র, আমাদের জীবনের পরীক্ষাও তেমনি ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলে কি হয়? আমাদের সম্বন্ধে ক্ষুদ্রই মহৎ। এক একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষা পর্ব্বত-

প্রমাণ বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমিক সংগ্রামের পর দেখিতে পাই, তুমি ভিতরে ভিতরে হৃদয়কে প্রস্তুত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছ, আমাদের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য গভীর রোদনধ্বনিতে কর্ণপাত করিয়াছ। আজ এত কাল পর্য্যন্ত তোমার এই বিশেষ কৃপা যদি আমরা প্রত্যক্ষ না করিতাম, আশায় বুক বান্ধিয়া আমারা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম না। পরীক্ষায় পড়িয়া আমরা তোমার যে কৃপা দেখিয়াছি, যেন সেই কৃপার উপরে চির দিন নির্ভর করিয়া পরীক্ষামধ্যে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে পারি, তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণাম করি।

———

ঈশ্বরের ব্যবহার।

মানবের সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে অবিচ্ছিন্ন যোগরক্ষা কখন সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর বিবিধ লোকের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া ফলে এই দাঁড়ায় যে, তাহাদের ব্যবহারের অন্তরালে ঈশ্বরের ব্যবহার লুক্কায়িত হইয়া পড়ে, আমাদের সঙ্গে আর তাঁহার জীবন্ত সম্বন্ধ থাকে না। সৃষ্টির ভিতরে যে সকল শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে মূলশক্তি যেমন প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, লোকে এই সকল সৃজ্যশক্তিরই ক্রিয়া অবলোকন করে, তন্মধ্যে যে মূল শক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পায় না, তেমনি চারিদিকের লোকসকলের ব্যবহার প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যখন দেখি তখন সেই সকল ব্যবহারই দেখিয়া থাকি, তাহার অন্তরালে যে আর কাহারও ব্যবহার আছে, তাহা ভ্রমেও আমরা মনে করি না। ঈদৃশ অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধ যে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

মনের নিয়ম এই যে, নিরন্তর যে বিষয় চিন্তাপথে উদিত হয়, সেই বিষয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে, তৎপ্রতি আমাদের অনুরাগের উদয় হয়, পরিশেষে যত্ন করিয়াও আর আমরা মন হইতে সে বিষয় তাড়াইয়া দিতে পারি না। তাড়াইয়া দিতে গেলে পূর্ব্বাপেক্ষা উহা পুনঃ পুনঃ চিন্তার বিষয় হয়, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়মূল হইয়া পড়ে। অসহায় শিশু মাতাপিতার সমগ্র চিন্তার স্থল অধিকার করে বলিয়া তৎপ্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় স্নেহ উদিত হয়। সামান্য জীবসকলের সন্তানগুলি এক প্রকার কর্ম্মক্ষম হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাই তাহাদিগের প্রতি মাতা পিতার স্নেহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যে সকল প্রাণীর সন্ততি যত দিন অসহায়, তত দিন স্নেহও থাকে, তাহার পর আর কোন কালে কোন সম্বন্ধ ছিল তাহারও কোন পরিচয় থাকে না। মানবশিশু দীর্ঘকাল অসহায়াবস্থ, সুতরাং মাতাপিতার চিন্তা তাহাদের সম্বন্ধে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া এমনই দৃঢ়মূল হইয়া যায় যে, চিরজীবনেও আর উহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারা যায় না। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা সংসারচিন্তায় আকুল, স্ত্রীপুত্রপরিবার ধনজনাদির বিষয় লইয়া অষ্টপ্রহর দিন কাটায়, তাহাদের মন সেই সকল লইয়া এমনই ব্যাপৃত হইয়া পড়ে যে, আর গভীর বিষয়ে চিত্ত কিছুতেই অভিনিবিষ্ট হয় না। সংসারের অকল্যাণভয়ে যাহারা দেবার্চ্চনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আপনারা দেবার্চ্চনা করে না অপরের দ্বারা করায়, কেন না ততটুকুও সংসার হইতে মন ফিরাইয়া দেববিষয়ে নিয়োগ করিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই। অধিংশ লোক এ জন্যই যাজক পুরোহিতের হাতে সকল ভার অর্পণ করিয়া আপনারা সংসারের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে।

সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ নিয়ত কি দেখিতেছে? পরিজন ও প্রাতবেশিবর্গের তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার। মানবমানবীগণ কে কি বলিতেছে, কে কি করিতেছে, তাহাদিগের প্রতি তাহাদিগের ব্যবহার কিরূপ, ইহাই আসক্ত ব্যক্তিগণের দেখিবার শুনিবার, চিন্তা করিবার বিষয়। এই সকল নরনারী ও তাহাদিগের অতিরিক্ত আর কিছু যে আছে, ইহা

তাঁহাদের মনে একবারও স্থান পায় না। প্রতি বেশী ও পরিবারবর্গের ব্যবহার ভেদ করিয়া ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শন করা বর্ত্তমান কালের সাধকগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। যে কালে সাধকগণ নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে জীবন অতিপাত করিতেন, জনসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেন না, সে কালে ব্যবহারিক জীবনকে উপেক্ষা করিলে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইত না। আমরা যখন জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করি নাই, এবং কোন কালে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিব তাহা নহে, তখন সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অন্তরালে ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শন আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। যদি আমরা তাঁহার ব্যবহার না দেখি, জীবনের অধিকাংশ সময় আমাদিগকে ঈশ্বরবিরহিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, এবং এই অযোগনিবন্ধন দুঃখ ক্লেশ পাপ জীবনে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। ঈশ্বরের ব্যবহার আমরা কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব, তাহার গুটিকয়েক নিদর্শন আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রথমতঃ প্রতিজনের দৈনিক মধুর ব্যবহারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম ও স্নেহের ব্যবহার দর্শন সাধকগণের পক্ষে অতীব প্রয়োজন। "মাতার মনে দিলেন স্নেহনীর দুগ্ধ দিলেন জননীর স্তনে," এ সঙ্গীত আমরা অতি আদরের সহিত গাইয়া থাকি। কিন্তু এ সঙ্গীত ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে ব্যবধান সেই ব্যবধানই রাখিয়া দিতেছে। মাতাতে পরমমাতাকে দর্শন করা ইহাতে কৈ হইল? মাতার স্নেহের মূলে কি পরমমাতার স্নেহ নাই? মাতার নিঃস্বার্থ স্নেহ হইতে যে সকল ব্যবহার উৎপন্ন হয়, সে ব্যবহার কি ভগবদ্ব্যবহারমূলক নহে? মাতার অজ্ঞানতা আছে, মোহ আছে, সেই অজ্ঞানতা ও মোহ হইতে যে সকল ব্যবহার হয়, সে ব্যবহার ঈশ্বরের ব্যবহার কিরূপে বলিব? এ চিন্তা যখন আমাদের মনে উদিত হয়, তখন ঘোর অদ্বৈতবাদে নিপতিত হইবার ভয় আমাদের মন হইতে অন্তরিত হয়। কোথায় মানুষের ব্যবহার, কোথায় ঈশ্বরের ব্যবহার, এ দুইয়ের মধ্যে রেখা টানিবার ইহাই এক বিশুদ্ধ উপায়। যেখানে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপে একতা আছে, সেখানে ক্রিয়ারও অভিন্নতা মানিতে হইবে, কিন্তু যেখানে স্বরূপে অনৈক্য, সেখানে ব্রহ্ম ও জীবের ক্রিয়াতেও অনৈক্য অবশ্যম্ভাবী। তুমি বলিবে, ক্রিয়ামাত্রেই যখন ঈশ্বরশক্তির সহায়তার প্রয়োজন, তখন অজ্ঞনাতা ও মোহের মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়া নাই ইহা তুমি কিরূপে নির্দ্ধারণ করিতেছ? ক্রিয়া নাই একথা বলিতেছি না, এই বলিতেছি যে, জীবের অজ্ঞানতা ও মোহ দেখাইয়া দেওয়া ঈশ্বরশক্তির কার্য্য। তিনি উহা এই জন্য দেখাইয়া দেন যে, সে ব্যক্তি আপনি অজ্ঞানতা ও মোহ বুঝিতে পারিয়া তন্মোচনের উপায় অবলম্বন করিবে, অপরেও তাহা হইতে সতর্ক হইবে।

অজ্ঞানতা ও মোহ প্রদর্শন, এবং অপরের তাহা হইতে সতর্ক হওয়া ইহা ছাড়া অন্য একটি ব্যাপার এখানে আছে, তাহা আমাদের সকলেরই ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সমুচিত। বহুব্যক্তির সমষ্টিতে পরিবার ও সমাজ সঙ্গঠিত। পরিবার ও সমাজ কেবল ব্যক্তিসমষ্টিমাত্র নহে, একঅখণ্ড ব্যক্তি। এক অখণ্ড ব্যক্তি কেন বলিতেছি? স্বয়ং এক ব্যক্তি অপূর্ণ; আপনাকে ছাড়া অন্য শত ব্যক্তির সহিত মিলন বিনা তাহার সে সম্পূর্ণতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা শিশুসম্বন্ধে মাতার যে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছি, সেই দৃষ্টান্ত হইতে, আমরা কি বলিলাম, বুঝাইয়া দিতেছি। যেখানে মাতার মোহ অজ্ঞানতা প্রকাশ পাইল, সেখানে পিতার কার্য্য আরম্ভ হইল। মাতার মোহ অজ্ঞানতা অপসারিত করিয়া শিশুসম্বন্ধে সেস্থলে সজ্ঞান ব্যবহার পিতা হইতে হইবে, এজনাই পিতা ও মাতার একত্র যোগ। পিতার যে সমুদায় বিষয়েতেই জ্ঞান থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেখানে পরিবারের সহিত সম্বদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ, পিতার অজ্ঞানতা স্থলে, আপনার জ্ঞান দ্বারা ব্যবহারের ত্রুটি অপনীত করিবেন।

এইরূপ আত্মতত্ত্ববিৎ অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শরীর-তত্ত্ববিদের ভ্রমস্থলে আপন আপন জ্ঞান দ্বারা শিশুর প্রতি ত্রুটি অপনয়ন করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের ব্যবহার দেখিতে গেলে কোন এক ব্যক্তিতে উহা বদ্ধ রাখিলে চলে না, ব্যক্তিসমূহ বা অখণ্ড ব্যক্তিতে উহা দেখা প্রয়োজন। একটি সামান্য ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের সঙ্গে কেবল এক পিতা মাতা প্রভৃতির যোগ তাহা নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সামান্য কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির যোগ রহিয়াছে। এজন্যই আমারা বলি, পরিবার সমাজ কেবল ব্যক্তিসমষ্টিমাত্র নহে, এক অখণ্ড ব্যক্তি।

শিশু সর্ব্বত্র ঈশ্বরের ব্যবহার স্বয়ং দেখিবে, সে সময় তাহার উপস্থিত হয় নাই। এক জন সাধক সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না, তাঁহার কিন্তু সর্ব্বত্র ভগবানের ব্যবহার দেখা একান্ত প্রয়োজন। যদি তিনি তাহা না দেখেন, তাঁহার জীবন অপূর্ণ, তাঁহার যোগ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রকৃতি ও জীব দ্বারা বেষ্টিত সাধক আপনাকে ঈশ্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত যদি না দেখিলেন, তাহা হইলে তাঁহার নিয়ত ঈশ্বর দর্শন ঘটিবে কি প্রকারে? সময়ে সময়ে তিনি আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, তাঁহার কথা শুনিলেন, ইহাতে তাঁহার দর্শনের ভূমি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কেবল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল তাহা নহে, প্রকৃতি ও জীবের সহিত ক্রমিক সম্বন্ধবশতঃ তাহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ যত প্রগাঢ় হইবে, ততই অন্তরে ঈশ্বরদর্শন অন্তরে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ ক্ষীণ হইতে থাকিবে, অবশেষে তিনি আর দশ জন সংসারীর ন্যায় এক জন সংসারী হইয়া পড়িবেন। প্রাকৃতিক শক্তি মধ্যে সেই মহাশক্তির ক্রিয়াদর্শনে অন্তরায় অতি অল্প, কিন্তু জীবমধ্যে নীতি অনীতি, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বিশ্বাস অবিশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ বিপরীত ভেদবশতঃ ঈশ্বরের ব্যবহার দেখা বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে ঘটিয়া উঠে না। ঈশ্বরের স্বরূপানুরূপ আচরণ মধ্যে ঈশ্বরের ব্যবহার দেখা কিছুই কঠিন নহে। জ্ঞান হইতে পুণ্য হইতে যে সকল ব্যবহার উপস্থিত হয়, সে সকল ঈশ্বরের স্বরূপপ্রণোদিত, সুতরাং জীব ও ঈশ্বর অভিন্নভাবে কার্য্য করিলেন বলিয়া সে সকলকে ঈশ্বরের ব্যবহার বলিয়া গ্রহণ করিতে মন একটুও কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু যেখানে অজ্ঞানতা, অপ্রেম, অধর্ম্ম হইতে কোন ব্যবহার প্রসূত হয়, সেখানে কি করিয়া বলিব ঈশ্বর আমার প্রতি এই সকল ব্যবহার করিলেন। যেখানে ভয়ঙ্কর জুগুপ্সিত অধর্ম্মাচরণ, সেখানেতো কিছুতেই ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শন করা সম্ভবপর নহে।

মানবমানবীর পাপপ্রণোদিত ব্যবহারের জন্য পৃথিবীতে ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শন করা বড়ই সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্ববিধ পাপের আবরণ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে ভগবানের ক্রিয়া বা ব্যবহার দর্শন সম্ভবপর কি না, এ সম্বন্ধে আমরা বহুবার বহু প্রকারে বলিয়াছি; এবারও যদি সংক্ষেপে না বলি, এ বিষয়ে সাধকদিগকে সাহায্য দান করা হইল না। মানুষে দেবতা আছে, মানুষ আছে, পশু আছে। ঈশ্বরের ক্রিয়াতে এ তিনই চক্ষুর গোচর হইয়া থাকে। দেবত্বে ও মনুষ্যত্বে ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শন সহজ, পশুত্বে তাঁহার ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন। মানুষের পশুভাবপ্রণোদিত ক্রিয়ামধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অসদ্ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তোমার জীবনের দুইটী দিক্ আছে, একটী পুণ্যের আর একটী পাপের। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ও অসদ্ভাব তোমার পুণ্যের দিক্ স্পর্শ করিতে পারে না, সে দিক্ ওসকলের অতীত। তোমার যে পাপের দিক্ আছে, অপরের হিংসাদ্বেষাদি তাহাই আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়। তুমি বলিবে, আমাতে যখন দৃশ্যতঃ পাপ নাই, পাপের সম্ভাবনামাত্র আছে, তখন তাহারা যখন আমার পাপ না দেখিয়া হিংসাদ্বেষ করিতেছে, তখন সে ব্যবহারের জন্য তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া শান্ত ভাবে সেই ব্যবহারের নিম্নে আমার সম্বন্ধে ঈশ্বরের কি

অভিপ্রায়, আমার সম্বন্ধে তাঁহার এ কি ব্যবহার, চিন্তা করিব কি প্রকারে? তুমি হিংসা দ্বেষের যথার্থ পাত্র কি না, এই কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে। তোমার এখনও সত্যদৃষ্টি উপস্থিত হয় নাই। বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের প্রতি ঈশ্বরতনয় ঈশার ব্যবহার একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তিনি কি প্রকার প্রশান্তভাবে তখন তাহাকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, যখন সে তাঁহাকে শত্রু-হস্তে ধরাইয়া দিল। যদি তুমি এ সম্বন্ধে আজও ঈশ্বরতনয়ের ন্যায় না হইয়া থাক, তুমি হিংসা দ্বেষাদি দ্বারা নিয়ত পরিবৃত থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? যদি বল, ঈশাদেতো হিংসা দ্বেষের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই, ইহাতে আমাদের ন্যায় ব্যক্তি হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কি হইল? তোমার এরূপ সাহসিক কথা মুখে না তোলা ভাল। হিংসাদ্বেষাদিপরিবৃত হইয়াও ঈশ্বরতনয়ের কি প্রকার শান্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর রক্ষা করিতে হয়, তন্মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পাঠ করিতে হয়, জগতের মহত্তর কল্যাণের জন্য কি প্রকার সে গুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে, ইহা দেখাইবার জন্য যাঁহার জীবন, তিনি ঘোরতর হিংসা দ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত হইবেন না, আমরা পরিবৃত হইব ইহা কি সম্ভব? তাঁহার সেই হিংসা দ্বেষে প্রাণপর্য্যন্ত দিতে হইল, আমাদের তাহা দিতে হয় না, অথচ ঈশ্বরতনয় হইতে গেলে যে সামান্য পরীক্ষা স্বীকার করিতে হয় আমরা তাহাতেও কুণ্ঠিত, এই কি আমাদের ধর্ম্মজীবন! ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার করিয়া লইবার জন্য, সংসারের অতীত করিবার জন্য যে লীলা বিস্তার করিতেছেন, তন্মধ্যে দোষ দর্শন, এবং কেবল হিংসাদ্বেষে পূর্ণ সংসার এই মনে করিয়া পশুজীবন যাপনে উদ্যম, ইহা হইলে কি সর্ব্বত্র ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শন করিবার জন্য অন্তর্দৃষ্টি উপস্থিত হয়? অতএব বলিতেছি, তুমি সুখ সৌভাগ্যের ভিতরে যেমন, তদপেক্ষা দুঃখ ক্লেশ বিপদ্ সংসারের প্রতিকূলাচরণ মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ লীলা ও মধুর কল্যাণকর ব্যবহার দর্শন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও, দেখিবে তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় তোমার প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইবে। ঈশ্বর করুন, তাঁহার কৃপায় তোমার সকল প্রকারের মিথ্যাদৃষ্টি তিরোহিত হইয়া যাউক, এবং তুমি সর্ব্বত্র ভগবানের ক্রিয়া, লীলা ও ব্যবহার দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হও।

তুমি আমি, আমি তুমি।

'তোমাতে আমি, আমাতে তুমি' ইহা দেখিতে দেখিতে শেষে 'আমি তুমি, তুমি আমি' হইয়া যায়। প্রেমের ইহাই চরম অবস্থা। 'মুঞি সেই' 'মুঞি সেই' শ্রীচৈতন্যের একথা তাঁহার পার্ষদবর্গ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তত্ব বিলুপ্ত হইয়া ঈশ্বরত্ব দাঁড়াইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের যে এরূপ অভিপ্রায় ছিল না বলা অনাবশ্যক, কেন না তিনি আপনি স্পষ্ট বাক্যে যাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, আমরা তাহা তাঁহার অভিমত বলিয়া কখন গ্রহণ করিতে পারি না। ভাবোন্মত্ততায় যে বিবর্ত্ত অর্থাৎ এক জনের আর এক জনের সহিত অভিন্নাকার ধারণা উপস্থিত হয়, শ্রীচৈতন্যের 'মুঞি সেই' যে তাহাই, জ্ঞানী ভক্ত রামানন্দ সংকারে তাঁহার আলাপে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এ সব কথা থাকুক, এখন মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

ব্রহ্ম সহ স্বরূপের ঐক্যে জীবের অভিন্নতা উপস্থিত হয়, এ কথা আমরা জানি, কিন্তু অনন্তের সহিত সান্তের ঈদৃশ ঐক্যে সান্ত অনন্তে গ্রস্ত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিলীন হইয়া যায়, আবার পুনরায় সে স্বতন্ত্রতা অনুভব করে। স্বতন্ত্রতা অনুভব করে এই জন্য যে, অনন্ত সান্ত, এ পার্থক্য একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না। সান্তে ও সান্তে যে স্বরূপের একবার অভিন্নতা হয়, তাহা নিত্যকালের জন্য স্থায়ী হওয়াতে কোন বাধা নাই, কেন না

জ্ঞানাদিস্বরূপসমূহের সান্তত্ব উভয়েতেই সমান। যদি এই বিতর্ক উপস্থিত হয়, এক সান্ত অপর সান্তের সঙ্গে জ্ঞানাদিতে সম্পূর্ণ অভিন্ন হইবে ইহা কখন সম্ভবপর নহে, সুতরাং এপক্ষেও অবিচ্ছেদে অভিন্ন যোগ কখন সম্ভবপর নহে; এ বিতর্কের উত্তরে আমাদিগকে এই বলিতে হইতেছে যে, সান্তে ও সান্তে যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে একত্ব হইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে এরূপ বলা শোভা পাইত, কিন্তু যখন উভয়ের যোগের কারণ স্বয়ং ঈশ্বর, তখন ঈশ্বরেতে উভয়ের যেস্থলে যোগ তাহা নিত্যকাল স্থায়ী, তদ্ব্যতীত উভয়েতে পরিবর্ত্তনশীল যে অংশ আছে, তাহা দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তিতেও চিরদিন থাকিবে না, সুতরাং পরিবর্ত্তনস্থলে উভয়ের ভিন্নতা থাকিলেও পরিবর্ত্তনযোগ্যত্বে তাঁহারা দুই ব্যক্তি সমান। যেখানে সমত্ব, সেখানেই যোগ ঘটিয়া থাকে।

সান্তে ও সান্তে যোগ দেখান আমাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং আমরা তাহাই বলিব। এ যোগ বলিতে গিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মযোগকে যোগের মূলভূমি করিতে হইতেছে। যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্মনিরপেক্ষ সান্তে সান্তে যোগ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, সান্ত তখনই সান্ত যখন একটি আর একটি হইতে স্বতন্ত্র। যেখানে কোন স্বতন্ত্রতা নাই, এক অখণ্ড বস্তু, সেখানে সান্তত্ব নাই। কোন একটি পদার্থ যত বড় কেন বৃহৎ হউক না, তাহার আর একটি বিপরীত পদার্থ থাকিবে, যে পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া উহার সান্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। এক ঈশ্বর ভিন্ন আর সকলই এ জন্য সান্ত। যদি বল, জীব ও জগৎ হইতে যখন ঈশ্বরকে পৃথক্ করিতে পারা যায়, তখন এ নিয়মে ঈশ্বরও সান্ত হইলেন। না তিনি সান্ত হইলেন না এই জন্য যে, জীব ও জগৎ ঈশ্বরেতে অন্তর্ভূত, ঈশ্বরের বাহিরে নহে যে, তদ্দ্বারা ঈশ্বর সান্ত হইবেন। এখন কথা এই, এক সান্ত যখন অপর সান্ত হইতে স্বভাবতঃ পৃথক্, তখন তাহাদিগের যোগ ও একত্ব এক অখণ্ড বস্তুতেই কেবল সম্ভবপর। তুমি বলিবে, এ যোগের জন্য অনন্ত বস্তুর প্রয়োজন কি? যাহা আমাতে আছে তোমাতেও আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া যোগ ঘটিতে পারে। যেমন তোমার যে প্রকার প্রবৃত্তি আমারও সেই প্রকার প্রবৃত্তি, আমাদের দুজনের সেই প্রবৃত্তিতে মিল অবশ্যম্ভাবী। আমরা বলি, এ মিলের মধ্যে অনৈক্যের বীজ রহিয়াছে, সুতরাং 'তোমাতে আমি, আমাতে তুমি', অথবা 'তুমি আমি, আমি তুমি' কখনই ঘটিতে পারে না। যদি না ঘটিল তাহা হইলে আমরা যে একত্বের কথা বলিতেছি, তাহা সম্ভবপর হইল না। প্রবৃত্তি-মাত্রই অস্থায়ী; বিশেষতঃ প্রবৃত্তিজন্য যে মিল হয়, তাহা যত ক্ষণ এক জন আর এক জনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে, তত ক্ষণ উহা থাকে, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিলেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়, কোন কোন স্থলে ঘৃণা ও বিরোধপর্য্যন্তে উহা পরিণত হয়।

সান্তে ও সান্তে নিত্যযোগের ভূমি ব্রহ্মযোগ, এ কথা এখন পরিষ্কার করিতে হইতেছে। আমরা অনেক বার বলিয়াছি, দেবভাব ও দেবভাবে একত্ব হয়, অহংভাবমূলক মানবীয় ভাব বা নিকৃষ্ট-বৃত্তিপ্রধান পশুভাবে কখন একত্ব হইতে পারে না। সান্তে ব্রহ্মেরস্বরূপ আবির্ভূত হইলে, তবে তাহাতে দেবভাব উপস্থিত হয়। এই স্বরূপাবির্ভাব যখন সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যোগ হইয়াছে এই জন্য দেবভাব উপস্থিত জানা যায়, তখন জীব ব্রহ্মযোগসম্পন্ন হইল। উভয় ব্যক্তিতে যখন দেবভাব অবির্ভূত, তখন তাঁহারা আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন না, দুজন এক জন হইয়া যান। যদি বল দুই ব্যক্তি সমানজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই সে দু জন এক জন হন, তাহা নহে, বরং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়া গিয়া আরও পার্থক্য ঘটে। জানিও, জ্ঞান-সম্পন্ন বলিলে যাহা বুঝায় স্বরূপের আবির্ভাব তাহা নহে। তুমি যাহাকে জ্ঞানসম্পন্ন বলিতেছ, তাহা পার্থিববিষয়ঘটিত, ব্রহ্মস্বরূপঘটিত

নহে। দুই বিন্দু জল একত্র করিলেই যেমন দুই বিন্দু একবিন্দু হইয়া যায়, দুই ব্যক্তিতে ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব ঘটিলে তাহাই হইয়া থাকে, এখানে ঈর্ষা দ্বেষাদির মালিন্য নাই, সুতরাং দুইয়ের পৃথক্ থাকিবার কোন কারণ নাই।

উভয় ব্যক্তিতে ব্রহ্মস্বরূপ আবির্ভূত হইলে, সেখানে দ্বেষ নহে, প্রেম উপস্থিত হয়। ব্রহ্মস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে অথচ প্রেম নাই, ইহা হইতেই পারে না। তুমি আমাতে আমি তোমাতে তখনই বুঝিতে পারি, যখন দেখি, তোমার ও আমার ভিতরে ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মযোগে একই ভাবের সঞ্চার হইতেছে। তুমি বৈরাগী আমি সংসারী, এখানে যোগ নাই, বিয়োগ। তোমাতে বৈরাগ্য আবির্ভূত আমাতেও বৈরাগ্য আবির্ভূত, তখন জানিলাম, তোমাতে আমি, আমাতে তুমি। তোমাতে ব্রহ্মানুরাগ আমাতে বিষয়ানুরাগ, এখানে যোগ নহে, বিয়োগ। তোমাতে ব্রহ্মানুরাগ যেমন উজ্জ্বল, আমাতেও ব্রহ্মানুরাগ তেমনি উজ্জ্বল, জানিলাম তুমি আমি এক হইয়া গিয়াছি। তুমি শোন ঈশ্বরের কথা, আমি শুনি সংসারের কথা, এখানে তুমি উত্তর কেন্দ্রে আমি দক্ষিণ কেন্দ্রে, মিল হইবে কিরূপে? দুজনেই যদি ঈশ্বরের কথা শুনি, তাহা হইলে আমরা পৃথক্ থাকিতে পারি না, এক হইয়া যাই। এক হইয়া যাই কেন? এক ঈশ্বর আমাদের উভয়ের ভিতর প্রকট ভাবে লীলা করিতেছেন, আমাদের দুজনকে প্রেমে মগ্ন করিয়া প্রেমিক করিয়াছেন, এই জন্য। এক ঈশ্বরে তুমিও যাহা আমিও তাহা হইয়া গিয়াছি। তাই বলি 'তুমি আমি, আমি তুমি'। ঈশ্বর করুন, তাঁহার সহিত যোগে আমাদের সকলের এই রূপ অবস্থা উপস্থিত হউক।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আত্মন্, তোমার এ কথা মনে থাকা উচিত যে যখন তুমি অবস্থা জয় করিতে পার নাই, তুমি অবস্থার অধীন, তখন অমুক কার্য্য করিব বলিয়া অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে উচিত নয়। অঙ্গীকার করা সহজ, কিন্তু অঙ্গীকার পালন করা সহজ নহে। দেখ, সামান্য বিষয়েও অঙ্গীকারভঙ্গ হয়। একজন তোমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি অমুক সময়ে আমার এখানে আসিবে? তুমি বলিলে, হাঁ। তুমি এমনি অবস্থায় পড়িয়া গেলে যে সে অঙ্গীকার পালন করিতে পারিলে না। বল, এতে তোমার অপরাধ ঘটিল কি না? যদি বলিতে, যদি কোন প্রতিবন্ধক না হয় আসিব, তাহা হইলে সহজে সত্যরক্ষা হইত। সত্যরক্ষাপক্ষে শিথিলযত্ন হইলে, জীবনের মূল দোষগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

আত্মন্, তোমায় এই কথা বলিতে গিয়া আর একটী কথা তোমায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। মানুষ বড়ই দুর্ব্বলচিত্ত। তুমি অঙ্গীকার পালন করিলে কি করিতে পারিলে না সে দিকে সে দেখে না মন খুলে এক জন যত বড় বড় অঙ্গীকার করে, তাহাকে সে ততই আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করে। আর যদি কোন ব্যক্তি বলে, যদি এরূপ ঘটে, তাহা হইলে আমি ওরূপ করিতে যত্ন করিব, তাহা হইলে যাহাকে এরূপ বলা হইল, সে মনে করিল আমাকে তুচ্ছ করা হইল, অপমান করা হইল। কিন্তু সে বুঝিল না যে, সে ব্যক্তি সে বিষয়সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা আজও বুঝিতে পারে নাই, এজন্য বলিয়াছে—যদি এরূপ ঘটে, অর্থাৎ বিধাতা যদি এইরূপই ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সে ওরূপ করিতে যত্ন করিবে। 'যত্ন করিবে' এ কথা বলাতেও বিরক্ত হইবার কারণ নাই, কেন না মানুষের ক্ষমতা যত্ন করা, ঈশ্বরের ক্ষমতা পূর্ণ করা। মানুষ আশু প্রীতিকর কথা শুনিতে চায়, আত্মন্, তোমার যেন কখন সেরূপ দুর্ব্বলতা না হয়। তুমি একপ অঙ্গীকারে আত্মাবমাননা মনে করিও না, বরং এই অঙ্গীকারকেই সত্য অঙ্গীকার মনে করিও।

মানুষ আপনার প্রকৃতিকে পরাজয় করিতে পারে না এ কথা শুনিয়াছ, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকৃতিসিদ্ধ কোন্‌গুলি সংক্রামিত, ইহা ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত। যে যে ব্যক্তি এ দুইয়ের প্রভেদ করিতে পারে না, এজন্য তাহাদিগের জীবনে কোন উন্নতির চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এগুলি প্রকৃতিসিদ্ধ, ওগুলি সংক্রামিত, বুঝিবার উপায় কি? উপায় বিবেকালোক: আমাদের মধ্যে কোন্‌গুলি স্থায়ী, কোন্‌গুলি অস্থায়ী, কোন্ গুলিকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে, কোন্ গুলিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে হইবে, এ সকল কেবল এক বিবেকালোক দেখাইয়া দেয়। মানুষের অনেক গুলি দেশগত, কালগত ও বংশগত কুসংস্কার, অভিমান, মিথ্যাজ্ঞান আছে, সে সকল তাহার অধ্যাত্ম জীবনের অন্তরায়। তুমি দেখিতেছ, চারিদিকের লোকে কি প্রকার অজ্ঞানতা ও মোহে দিনযাপন করিতেছে, অতি সামান্য বিষয়েও তাহাদিগের কিরূপ অনুচিত সংস্কার। এ সকলের মূল কি কুসংস্কার, অভিমান, মিথ্যাজ্ঞান নহে? যাঁহারা আত্মার হিতেচ্ছু, তাঁহারা এই সকলের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত। অবশ্য যথেচ্ছাচরণে

নহে, কিন্তু বিবেকালোকে সে সমুদায়ের উচ্ছেদ সাধন তোমার আমার সকলেরই কর্ত্তব্য। তোমায় অনুরোধ করি, তুমি বিবেকালোকে এই সমুদায় দেখিয়া উহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণগত যত্ন করিবে।

প্রাপ্ত।

মৃত্যু।

জ্ঞানী মূর্খ, সাধু অসাধু, বড় ছোট সকলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে চায়। কিন্তু মৃত্যুর অর্থ এই দুই শ্রেণীস্থ লোকের নিকট বিভিন্ন জিনিষ। জ্ঞানী সাধু যখন প্রার্থনা করেন, "মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও" তখন তাঁহার দৃষ্টি ঠিক সেই মৃত্যুর দিকে নয় যাহাকে সামান্য লোকেরা এত ভয় করে। শব্দ এক, কিন্তু ভাব পৃথক্। ব্রাহ্মসমাজে, বিশেষতঃ নববিধান সমাজে মৃত্যুসম্বন্ধে কোন প্রকারের গোল থাকা উচিত নয়। সুতরাং মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ মৃত্যু শব্দটার সঙ্গে অনেক কল্পনা ও ভ্রম জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আবর্জ্জনার ভিতর হইতে সার সত্য বস্তুটি বাহির করিয়া না লইতে পারিলে, মৃত্যু-ভয় আমাদের মধ্যে মহানিষ্ট সংঘটন করিবে। আপাততঃ তিনটী কারণে আমরা মৃত্যুকে এত ভয় করি। ১ম, উহার আকস্মিকতা, ২য়, চিরবিয়োগ; এবং ৩য়, সত্যে অবিশ্বাস। ইহার এক একটি সম্বন্ধে একটুকু বিস্তার করিয়া বলা বিধেয়।

১ম, মৃত্যুর আকস্মিকতা। মৃত্যু অনিবার্য্য ইহা সকলেই জানে; কিন্তু মৃত্যু কখন আসিবে, ইহা কেহই বলিতে পারে না। এদিকে আবার ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, বাসনা কামনাদির নিপীড়ন, ভোগের মত্ততা, চিন্তার আন্দোলন এবং কার্য্যের ব্যস্ততা, ইহাতে আর গভীরতর গুরুতর বিষয়ে চিত্ত নিবেশের অবকাশ কোথা? মাস, ঋতু, বর্ষ আসে আর চলিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে জীবনের এক একটী অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। বাল্যাবস্থার ভিতর দিয়া যৌবনে, যৌবনের ভিতর দিয়া প্রৌঢ়ত্বে এবং পৌঢ়ত্বের ভিতর দিয়া বার্দ্ধক্যে সকলকেই যাইতে হয়। কিন্তু এসকল পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে প্রগাঢ় চিন্তাদ্বারা সত্যাবধারণ করে, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। অথচ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থাগুলির প্রত্যেকটী আমাদিগকে মৃত্যুর সন্নিহিত করিতেছে। পূর্ব্বের অবস্থানিচয় কিংবা মধ্যের কতকগুলি অবস্থা ছাড়িয়া দিয়া যদি শেষটীর দিকে মাত্র দৃষ্টি করি, তাহা হইলে মৃত্যু যে আকস্মিকতাজনিত মহাভ্রমের কারণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? শিশুর সুকোমল মুখারবিন্দ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যদি লোলচর্ম্ম, স্খলিতদন্ত, শুষ্ক, লাবণ্যরহিত, বিকটাকার ধারণ করে, তবে তাহা দেখিয়া কে না বিচলিতচিত্ত হইবে? পিতা যদি দুই বৎসরের একটী বালককে ৬০ বৎসরের পর বিদেশ হইতে আসিয়া দেখেন, তাহা হইলে পুত্রের বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সকল তাঁহার মনে যুগপৎ ক্লেশ ও আশ্চর্য্য উৎপাদন করিবেই করিবে। তবে কিনা এরূপ ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে বলিয়া মৃত্যুর ন্যায় ইহা তত আকস্মিক বলিয়া বোধ না হইতে পারে। ফলে চিন্তা করিয়া দেখিলে মৃত্যু আরম্ভের শেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না জন্ম দিনে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা আরম্ভ হয়, মৃত্যুদিনে তাহারই পরিসমাপ্ত। যাঁহারা সূক্ষ্মরূপে বস্তুর বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে মুহূর্ত্তে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তখন হইতেই প্রতিনিয়ত তাহার দৈহিক পরমাণুতে ঠিক সেই মৃত্যু সংঘটিত হয়, দেহনাশে যাহা দেখিয়া আমরা এত ভয় পাই। মুহুর্মুহুঃ আমরা মরিতেছি, আমাদের দেহাণু বিনষ্ট হইয়া পরিত্যক্ত হইতেছে, মৌহূর্ত্তিক মৃত্যু ব্যষ্টিতে, শেষ মৃত্যু সমষ্টিতে হইলেও দুইটাই মৃত্যু। আকার পরিবর্ত্তনও ঠিক এক রকম, তবে কিনা একটা আণবিক আর একটি সামষ্টিক। সহজ ভাষায় বলিতে হইলে এরূপ বলা যায় যে, প্রাত্যহিক মৃত্যুতে দেহের অংশ গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিনষ্ট হয়; অশেষ মৃত্যুতে সমুদায় শরীরটা একেবারে ধ্বংস হয়। তার পর সূক্ষ্ম ভাবে শরীরের যে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, তাহা অনায়াসেই টের পাওয়া যায়। সুতরাং মৃত্যু সম্বন্ধে আকস্মিকতা একটা কথা মাত্র।

২য় চিরবিয়োগ। মৃত্যু হইলে বিচ্ছেদজনিত একটা যাতনা উপস্থিত হয়। দেহপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাঁহাকে হারাই বলিয়া মনে করি, তাঁহাকে একবারেই হারাইলাম এই আমাদের জ্ঞান। কিন্তু এখানেও চিন্তা করিয়া একটকু গূঢ়ত্বে প্রবেশ করিলে দেখা যায় ভয়ের কারণ কিছুই নাই। শারীরিক ক্রিয়াগুলি —আহার, চলা, ফিরা, নিদ্রা, মলমূত্রাদি ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য—বন্ধ হয় বলিয়া প্রায় কেহই দুঃখ করে না। মৃতব্যক্তিসম্বন্ধে দুঃখ তাঁহার আত্মার অভাব জন্য। যিনি আমাদিগকে ভাল বাসিতেন, যাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা, যাঁহার বিনয় দয়া উদারতা; যাঁহার ভক্তি, প্রীতি, ঈশ্বরনিষ্ঠা ইত্যাদি আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিত, মৃত্যুর পর সে সকল আর থাকে না বলিয়া আমরা দুঃখে কাতর হই। এই দুঃখ হয় (১) মৃতব্যক্তির জন্য, না হয় (২) আমাদের নিজের জন্য। (১) মৃতব্যক্তির জন্য দুঃখ নিরর্থক। কারণ শরীরের যখন ধ্বংস নাই, তখন আত্মার বিনাশ কল্পনা করিয়া কেবল বৃথা কষ্টভোগ করা। (২) নিজের সম্বন্ধে যে দুঃখ তাহা নিতান্ত অমূলক না হইলেও তাহার প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত নহে। মৃত আত্মার অভাববোধ কেন হয়? আত্মাকে চিনি নাই বলিয়া। "তিনি", "তুমি", "আমি" পৃথক্‌ত্ব পরিজ্ঞাপন এই ভেদজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। "তিনি", "তুমি", "আমি"কে পৃথক করিয়া আমরা যে ভাবে উহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই, আত্মা সেই ভাবে কারারুদ্ধ থাকিতে চায় না, থাকিতে পারে না। বলপূর্ব্বক আমরা যে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ "আমি" গড়ি, উহা মানবের নীচ "আমি"। যে "আমি" "আমার আত্মা" বলিয়া দুয়ের সম্বন্ধ

স্থাপন করে. সেই "আমি" উচ্চ "আমি" প্রকৃত "আমি" সেই "আমি", কেশব যাঁহাকে বলিলেন "এক সন্তান নীচে", সেই পার্থিব "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা ঈশ্বরপুত্র। ইঁহারই সম্বন্ধে আচার্য্য বলিলেন "And I assure you in your character, the characters of ten other persons lie concealed. Human character is made up of the humility of one saint and of the asceticism of another, of the wisdom and enthusiasm of one and of the love and devotion of another. You may imagine yourself to be quite an independent being ; but the fact is that in you ten others are dwelling." (*New Dispensation* No 46 of 1882) অর্থাৎ "আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তোমাদের এক একজনের চরিত্রে দশ জনের চরিত্র প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। কোন সাধুর বিনয়, কাহারো বা বৈরাগ্য ; একজনের জ্ঞান ও উৎসাহ এবং আর এক জনের প্রেম ও অনুরাগ দ্বারা মানবচরিত্র গঠিত। তোমরা আপনাদিগকে এক এক জন স্বাধীন বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে পার ; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, তোমাদের এক এক জনের ভিতর দশ জন বাস করিতেছেন।" ফলে মাতা, পিতা, পরিবার, প্রতিবাসী, গ্রাম, দেশ, পৃথিবীর সমুদয় আত্মার প্রভাবে এক একটী আত্মা গঠিত। প্রকৃতার্থে সমুদায় মিলিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আত্মা গঠিত—এবং ভিন্ন ভিন্ন আত্মাতে সেই এক পুত্রাত্মার এক একটি অংশের বিকাশমাত্র। একাত্মতার জ্ঞান জন্মিলেও আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে শোক হইতে পারে—পরে সেই অবস্থাতে যখন আমরা টের পাই যে, জীবিত থাকিতে আমরা সেই আত্মাকে আত্মসাৎ করি নাই, এবং সেই শোক নিবারণের উপায় এই এখন সেই মৃতব্যক্তির আত্মাকে স্বীকার ও গ্রহণ করা।

৩য় সত্যে অবিশ্বাস। মানবাত্মা আর একটুকু অগ্রসর না হইলে মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে না। মৃত্যুর ভয় অভাববোধজন্য। পুত্রত্বলাভে সেই অভাব অনেকেটা দূর হয়। কিন্তু পুত্রও সসীম, অপূর্ণ, অথচ পূর্ণত্ব ও অসীমত্ব লাভে অধিকারী। খ্রীষ্টের জীবনকে আমরা পুত্রত্বের আদর্শ জীবন বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাঁহার সেই শেষ প্রার্থনার কথা ভাবিলে তাঁহারও অভাববোধ ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে ?" (মথি ২৭ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক)। এদেশে যে পুনর্জন্মের মত আছে আচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে ইহার প্রকৃত অর্থ আত্মার নিয়ত উত্থান পতন। "Through how many changes does man's life on earth pass. How he becomes in the course of a week, a saint, a sinner, a mean reptile, a ferocious wolf, a tree, and a piece of dead stone." (*Lecture in India* page 246) অস্যার্থ—"কত পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া মানব এই পৃথিবীতে চলিতেছে" সপ্তাহকালমধ্যে মানব কেমন করিয়া সাধু, পাপী, নীচ সরীসৃপ, ক্রুদ্ধবৃক, বৃক্ষ এবং মৃত প্রস্তর, খণ্ডে পরিণত হয় !" অনেক মানব খুব উন্নত হইলেও তাহার অপূর্ণতা দূর হয় না, তবু মানবের পূর্ণত্ব লাভের অধিকার আছে। উপরে যিশুর দুর্ব্বলতার কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মানবত্ব যে তাঁহার দেবত্বে, ইহা এখনও বলি নাই। আসন্ন মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূর কর ; কিন্তু আমার নয়, তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।" (লিউক, ২২ অধ্যায়, ৪২ শ্লোক,) মুমূর্ষাবস্থায় মানুষ যদি জীবনের অনিত্যতার কথা না বুঝিতে পারে, এবং তাহা বুঝিয়া যদি ক্লেশানুভব না করে তবে তাহাকে পাষাণ বলিলেও হয়। মৃত্যু স্মরণে ক্লেশানুভব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মৃত্যু হইলেই সব শেষ হইয়া গেল কিংবা হইতে পারে, এই চিন্তা মনে হইলে নিশ্চয় মানুষ অধিকারচ্যুত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের সত্যে বিশ্বাস নাই, তাহারা মৃত্যুকে চরমাবস্থা না বলিয়া পারেই বা কেমন করিয়া ? সকলই যদি অনিত্য, কেবলই যদি পরিবর্ত্তন, তবে আর মানবের আশা কি ? আশা আছে। বাহ্য বস্তুকে আমরা যেরূপ পৃথক পৃথক বস্তু বলিয়া মনে করি উহাদের সেরূপ স্বাতন্ত্র্য বাস্তবিক নাই। সকলে এক অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে পরস্পরের সহিত গ্রথিত—এক অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য, সার সত্যেতে সকলের অবস্থান। কিন্তু এক মানব ভিন্ন সেই সত্যকে জানিবার অধিকার আর কাহারো নাই। পশু, পক্ষী, জীব জন্তুর ন্যায় আমরা পরিবর্ত্তন ও অনিত্যতার মধ্যে থাকিয়াও এই অধিকার পাইয়াছি যে, আমরা জানিতে পারি আমরা সত্যেতে অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু মোহ আমাদের শত্রু। প্রতি মুহূর্ত্তে এই রিপু আসিয়া সব ভুলাইয়া দেয়। ইহার কারণ নীচ, সঙ্কীর্ণ "আমির" প্রাবল্য। নববিধানের অভ্যুদয়ে "আমিত্ব" অসুরবিনাশের উপায় হইয়াছে। সেই উপায়, সেই পথ নববিধানমণ্ডলী। আমরা যদি ক্ষুদ্র, নীচ "আমিত্বের" প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মণ্ডলী সহ এক হইতে পরি, সকলে মিলিয়া একটি মানব, একটি দেবতনয় হইয়া বলিতে পারি, "আমি আর আমার ভ্রাতা এক", তা হইলে আমাদের প্রত্যেকেই বলিতে পারিব "আমি আর আমার পিতা এক," এবং তখনই আমরা অমরত্ব লাভ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইব।

যোগ সাধন।

স্বর্গগত ভাই শ্রীমৎ কালীশঙ্কর দাস প্রণীত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রত্যাহার। প্রত্যাহার কি ? ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিবার নাম প্রত্যাহার। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিকতা ঈশ্বর স্বহস্তে যোজনা করিয়াছেন। যেমন বিষয়, তেমনি

ইন্দ্রিয়শক্তি বিদ্যমান আছে। সেই ইন্দ্রিয়কে বিষয়বিচ্যুত করা কেন? ইন্দ্রিয়গণ বিষয়বিমুখ না হইলে কোনরূপেই যোগানন্দ লাভ করা যায় না, এই জন্য। * ইন্দ্রিয়ের স্বভাব সর্ব্বদা বিষয়ানুসন্ধান করা, স্বভাবতঃ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয়ানুরক্ত মনের স্বভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়া, আত্মার স্বভাব মনের আনুগত্য করা, সুতরাং ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারব্যতীত যোগ সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে আর আশা কি? আশা আত্মার সাধনে ইচ্ছা ও ঈশ্বরনির্ভর। আত্মা যদি ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় নির্ভর করিয়া সেই অশান্ত মনের আনুগত্য পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি সেই ইন্দ্রিয় ও মনের প্রত্যাহার করিতে পারেন। আর আত্মা স্বয়ং যদি বিষয়ের চাকচিক্য দর্শন করিয়া আপনার বল বিক্রম ও সহায় সম্পদ্ ভুলিয়া যান, তবে আর তাঁহার উদ্ধারের পথ কি। এই কার্য্য সাধন করা অবশ্য কঠিন। কেন না, যত্নশীল সংযমী লোকেরা যত্ন করিয়াও অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। † কিন্তু যিনি ধীরতা সহকারে আপন ক্ষমতা ও সহায় সম্পদ সকল স্মরণে রাখিয়া চলেন, তিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে সমুদায় হস্তগত করিতে পারেন। ‡

ধারণা। ধারণার অর্থ ধরিয়া রাখা। চিত্তের এলমেল গতি দূর করিয়া, অপ্রতিহতভাবে ঈশ্বরের দিকে ধরিয়া রাখিবার নাম ধারণা। কিন্তু ধারণা অভ্যাস করিবার যোগ্যতা চাই আগে যম নিয়মাদি অভ্যস্ত না হইলে ধারণার ক্ষমতা জন্মে না। § এই ধারণা দুই প্রকার। এক সাধনা, দ্বিতীয় দর্শন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের বলে বিষয়রাশির প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ক্রমে যে ঈশ্বরাবস্থিতি জন্মে, তাহাকে সাধনা বলি ¶। আর ঈশ্বরের গৌরবান্বিত সৌন্দর্য্য যদি মানবহৃদয়ে পড়ে, তবে সে হৃদয়কে স্থানান্তরিত করিবার আর তাহার শক্তি থাকে না, এইরূপ ঈশ্বরেতে স্থিতির নাম দর্শন। ইহাতে মানুষের কোন কর্তৃত্ব নাই, অন্যের বলে অবশ হইয়া হৃদয় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। অন্যের দিকে তাকায় না। $

ধ্যান। চিত্তের যে অবিকৃতপ্রবাহ সমুদায় বাহ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সরল ভাবে গিয়া ঈশ্বরে সংলগ্ন হয়, তাহাকে ধ্যান বলা যায়। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সমূহকে পিণ্ডাকারে সংযত করিয়া বাহির হইতে ভিতরের দিকে লইয়া যাইবে এবং ঈশ্বরেতে চিত্ত সংশ্লিষ্ট করিয়া কাষ্ঠের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিবে। এই সময়ে যোগী বাহির হইতে একেবারে ভিতরে চলিয়া যান। ধ্যানে মগ্ন যোগীর ইন্দ্রিয়গণও তাঁহার সঙ্গে ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করে সুতরাং বাহিরে আর তাহারা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। চক্ষু ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চায় না, কর্ণ তাঁহার শ্রীমুখের মধুবর্ষী বাক্য পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের শব্দ শুনিতে চায় না, স্পর্শ তাঁহার আলিঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে কোন সুখ পায় না, সেই জন্য যোগিগণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। * ধারণা পূর্ব্বে না বলিয়া পরে বলিলে বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সুগম হইত, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহা করেন নাই। কেন যে করেন নাই, তাহা অনুভব করিয়া বুঝা যায় না, অথচ ধ্যানের পর ধারণা যেমন সংলগ্ন হয়, ধারণার পর ধ্যান তেমন সংলগ্ন হয় না। কেন না ঈশ্বরেতে সংলগ্ন চিত্তপ্রবাহ ধ্যান। সেই প্রবাহকে ধরিয়া রাখিবার নাম ধারণা। কাজে কাজেই ধ্যানের পূর্ব্বে ধারণা থাকা সঙ্গত বোধ হয় না। তবে এক কথা বোধ হয় এই যে, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিতে করিতে বিষয়বিক্ষিপ্ত মনের্ বৃত্তি সকল যখন আর বিষয় চায় না, পরন্তু ব্যগ্রতার সহিত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য বাহিরের বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করে, এই অনুরাগের অবস্থাকেই বা তাঁহারা ধারণা বলিতেন। ইহাতেও ঈশ্বরেতে আত্মার ভরসা নিশ্চিত বদ্ধমূল না হইলে বাহিরের বাধাকে পরাজয় করা যায় না। সুতরাং ইহাকে ঈশ্বরাবস্থিতি বলা যায়। কিন্তু তথাপি ধ্যানের পর ধারণা যেমন সুন্দর বোধ হয়, উহা সেরূপ বোধ হয় না।

যোগের গতি দ্বিবিধ, ইহা যোগিগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এক বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া, দ্বিতীয় ভিতর হইতে বাহিরে। সেই দ্বিবিধ গতির প্রথমটী এই সময় হইতে আরম্ভ হয়, অর্থাৎ এই সময়ে যোগী বাহির হইতে ক্রমে ভিতরের দিকে চলিতে থাকেন। যোগীর হস্তপদ চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয় ভিতরে প্রবেশ করে। ধ্যানের পর ধারণা তৎপর সমাধি, ক্রমে আত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং সে সুখ সে সম্পদ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আর শীঘ্র বাহিরে আসিতে পারে না। এক সময়ে আবার যোগী ফিরিবেন, প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে লইয়া ফিরিবেন, সেই যোগীর দ্বিতীয় গতি। সেই গতিতে প্রভু বাহিরে স্ফূর্ত্তি পাইবেন, জলে, স্থলে ও শূন্যে স্ফূর্ত্তি পাইবেন, গৃহ ও প্রান্তরে, রাজপ্রাসাদ ও কান্তারে, পুষ্পোদ্যানে ও শস্যক্ষেত্রে স্ফূর্ত্তি পাইবেন; যোগী যেখানে যাইবেন প্রভু তাঁহার

---

* আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে সশান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

† যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

‡ অভ্যাসেনচ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। গীতা

§ যমাদিগুণসংযুক্তমনসঃ স্থিতিরাত্মনি।
ধারণা প্রোচ্যতে সদ্ভির্যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥ দত্তাত্রেয়সংহিতা

¶ যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ গীতা

$ পূর্ব্বকালের ঋষিগণ এরূপ অবস্থাকে ধারণা বলেন না; কেন না ইহা আত্মার কর্তৃত্ব শক্তি হইতে জন্মে না।

* তত্র ধ্যানেন সংশ্লিষ্টমেকাগ্রং ধারয়েন্মনঃ।
পিণ্ডীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামমাসীনঃ কাষ্ঠবন্মুনিঃ॥
শব্দং বিন্দেন্নশ্রোত্রেণ স্পর্শং ত্বচা ন বেদয়েৎ।
রূপং ন চক্ষুষা বিন্দেজ্জিহ্বয়া ন রসাং স্তথা॥
মহাভারত শান্তিপর্ব্ব

সঙ্গে থাকিবেন ও সেই স্থানেই সেই প্রেমমুখ দেখিয়া সুখী হইবেন, এসময়ে আর সাধন থাকে না। এটী সিদ্ধাবস্থা। এই সময়ে যোগী ইচ্ছা করিলেই প্রভুর দর্শন পান।*

(ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন।

গত বারে অর্থাৎ ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে ২৫১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তিতে বর্ণযোজকের অসাবধানতা প্রযুক্ত "বিক্তহস্ত ছিলেন" স্থানে "বিরক্ত হইয়াছিলেন প্রযোজিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের লেখক কাপিতে "রিক্ত হস্ত" লিখিয়াছিলেন। এইরূপ বিষম ভুল হওয়াতে তিনি অতিশয় দুঃখিত। সংবাদস্তম্ভেও একটি ভুল হইয়াছে, "১২ই ভাদ্র ধুবড়ি নগরে" না হইয়া "১২ই অগ্রহায়ণ" হইবে।

সংবাদ।

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৯শে নবেম্বর আচার্য্যের ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব হইয়াছে। কতিপয় প্রচারক ও ব্রাহ্মবন্ধু সেই দিন প্রাতঃকালে কলুটোলার পুরাতন বাটীতে তাঁহার জন্মস্থানে যাইয়া জন্মস্থান দর্শন এবং সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। তৎপর প্রচার কার্য্যালয়ে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্নু ৫টার সময় বেনেটোলাস্থ ৪৫ নং ভবনে উপাধ্যায় "কেশব ও ঈশা" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার আরা নগরে শ্রীমান গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত তাঁহার স্বর্গগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্তের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় বাঁকিপুর হইতে যাইয়া তাহাতে উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের শ্বশুর শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস রায় ক্রিয়াস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার মনে মৃত্যুবিষয়ে কয়েকটি ভাবের উদয় হয়। তিনি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের নিকটে প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। উহা "প্রাপ্ত" স্তম্ভে প্রকাশিত হইল।

ফরিদপুরের সিবিল সার্জ্জন স্বর্গগত প্যারীমোহন গুপ্তের অভাবে তত্রত্য সমুদায় শ্রেণীর লোক আপনাদিগকে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতেছেন। তাঁহার জন্ম শোকপ্রকাশার্থ সম্প্রতি তথায় এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল। সেসন জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্যারীমোহন কেবল যে অর্থ গ্রহণ না করিয়া দরিদ্র রোগীদিগের চিকিৎসা করিতেন তাহা নহে, তাহাদের জন্য নিজের বাড়ী হইতে সুপ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার অমায়িক ভাব ও বিনয়ের জন্য সকল লোক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচারব্রতে ব্রতী শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ তাঁহার সম্বন্ধে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে এরূপ লিখিয়াছেন;—"শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ডাক্তার গুপ্তের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। ধর্ম্মতত্ত্বে মহাশয়ের লেখা পাঠ করিয়া চক্ষুর জলসংবরণ করিতে পারিলাম না। * * * * ভ্রাতা প্যারীমোহন বড়ই অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের মিষ্টতায় সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। তিনি শ্রীযুক্ত বঙ্গ বাবু মহাশয়ের পরিবারকে বহুদিন যাবৎ ৩৲ সাহায্য করিতেন। প্রতিমাসে বেতন পাইয়াই তাহা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিতেন।"

বিগত সোমবার ইংলণ্ড হইতে আগত অক্সফোর্ড ম্যানস ফিল্ড কলেজের প্রিন্সিপল সুবক্তা শ্রীযুক্ত ফেয়ার ব্যারণ সাহেবকে ব্রাহ্মসমাজের তিন বিভাগের কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক সভা করিয়াছিলেন। ফেয়ার ব্যারণ সাহেব ওভরটোনহলে কয়েক দিন ক্রমশঃ ধর্ম্মবিষয়ে দার্শনিক বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি উদার দার্শনিক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় বক্তৃতায় উচ্চ সমদর্শিতা ও বাগ্মিতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। বহু কৃতবিদ্য ও উচ্চ পদস্থ লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু গত শনিবার ধর্ম্মের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকে দুঃখিত ও নিরাশ অন্তরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেদিন তিনি হিন্দুধর্ম্ম, মোহম্মদীয় ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে শিক্ষণীয় বিশেষ কিছুই নাই বলিয়া সেই সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মকে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি অনেক বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা ও পক্ষপাতিতার পরিচয় দান করিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মে মোহম্মদীয় ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব লাভ না করিয়া তাঁহার তদ্বিষয়ে কিছু বলা ভাল হয় নাই। ভক্তির চক্ষে না দেখিলে কোথায় কবে কে বিদেশীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। হিন্দুধর্ম্মের গভীর যোগ ভক্তি, বৌদ্ধদিগের বৈরাগ্য, শুদ্ধতা, ত্যাগস্বীকার, মোসলমানদিগের ধর্ম্মোৎসাহ ও একেশ্বরনিষ্ঠার কি দৃষ্টান্ত আছে?

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর শেষ হইল, দুঃখের বিষয় অধিকাংশ গ্রাহকের নিকট বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য অনাদায় রহিয়াছে। বার বার পত্র লিখিলেও যাঁহাদের অনুগ্রহ আমরা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না, জানি না কি করিলে তাঁহারা আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় দেয় প্রদান করিবেন। আমাদের অর্থবল ও লোকবল কিছুই নাই, এই জন্য বার বার পত্র লেখা কিংবা বিদেশে যাইয়া সকলের দ্বারস্থ হওয়া একরূপ অসম্ভব। আমাদিগকে অনন্যোপায় দেখিয়া আমাদের উপকারী বন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ভ্রাতা অর্থ ও কষ্ট বহন করিয়া মূল্যাদি আদায়ের জন্য বিদেশে যাত্রা করিয়াছেন, মহিলা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও World & New Despensation পত্রিকা ত্রয়ের বাকি মূল্য

* আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি। ভাগবত

তাঁহার নিকট সকলে দয়া করিয়া প্রদান করেন এই বিশেষ অনুরোধ।

গত ১৩ নবেম্বর গোবরুপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সহধর্ম্মিণী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা সহ-নবসংহিতানুসারে দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া নববিধান মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন। ভাই দীননাথ মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর এই পরিবারের মঙ্গল বিধান করুন।

গত মঙ্গলবার এল্‌বার্ট হলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় হিন্দু ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত, বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের আক্রমণাংশ সকলের প্রীতিকর না হইলেও দ্বিজেন্দ্র বাবুর সূক্ষ্মদর্শন ও পাণ্ডিত্যের সকলে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উহা পড়িতে প্রায় চারি ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। অতবড় দীর্ঘ প্রবন্ধ ক্রমশঃ ২।৩ দিনে পাঠ করাই সঙ্গত। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বৃদ্ধবয়সে অক্লান্ত ভাবে তাহা সতেজে পড়িলেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এল্‌বার্ট হলে শ্রোতৃবর্গের স্থানাভাব হইয়াছিল।

পূজার বন্ধের পর ভিক্টোরিয়া কলেজের বালিকা বিদ্যালয় আবার খোলা হইয়া নিয়মিতরূপে কার্য্য চলিতেছে, কয়েকটী নূতন ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছে। গাড়ীর অভাবেই অনেক মেয়ে বিদ্যালয়ে আসিতে অপারগ। অধ্যক্ষগণ এই অভাব দূর করিবার জন্য স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিতেছেন। গাড়ীভাড়া করিয়া ছাত্রী আনিতে মাসিক প্রায় ৪০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

প্রেরিত।

সপ্রণাম নিবেদন মিদং

উপাসকমণ্ডলীর সভাধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ এতৎসহ পাঠাইয়া বিনীত প্রার্থনা যে আগামী বারের ধর্ম্মতত্ত্বে ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিবেদন মিতি।

বর্দ্ধমান
২৮।১১।৯৮ } প্রণত দাস
শ্রীরাজেন্দ্রলাল সিংহ।

গত ২৩ শে নবেম্বর বুধবার প্রাতে ৮॥০ ঘটিকার সময় অত্রত্য রাণীসনের মহল্লাস্থিত অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলীর, অন্যতম সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে, যে সভাধিবেশন হয়, তাহাতে নিম্নের লিখিত প্রস্তাবগুলি অবধারিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। যথা;—

প্রথম। এই সমাজ "বর্দ্ধমান প্রার্থনাসমাজ" নামে অভিহিত হইবে।

দ্বিতীয়। সামাজিক উপাসনা, আপাততঃ রাণীসনের মহল্লাস্থিত অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাড়ী ভাড়া লইয়া, তাহাতে নিয়মিতরূপে প্রতিরবিবার সন্ধ্যাকালে সম্পন্ন হইবে। তবে যত দিন না মহিলাদিগের আসিবার বন্দোবস্ত হইতেছে, ততদিন প্রতি রবিবার প্রাতে ৭॥০ ঘটিকার সময়ে সামাজিক উপাসনা হইবে।

তৃতীয়। সামাজিক উপাসনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয় উপাচর্য্য, এবং সমাজের অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল সিংহ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের নিকট ভিক্ষা।

বৈদ্যনাথে অনাথ কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বোধ হয়, তাহার বিষয় আপনারা অবগত আছেন। এক্ষণে তাহাতে ১৮ টী রোগী বাস করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে একেবারে চলচ্ছক্তিহীন এবং আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। কাহাকে, কাহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাজ-পথ হইতে উঠাইয়া আনিয়া আশ্রমে স্থান দেওয়া হইয়াছে। আশ্রমের আর্থিক অবস্থায় রোগীদিগের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য যাহা সম্ভব, তাহার ক্রটী হইতেছে না। আশ্রম হইতে রোগীদিগকে আহার্য্য, পরিচ্ছদ শীত-বস্ত্র এবং ক্ষত পরিষ্কারের উপযুক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া হইয়া থাকে। রোগীরা বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করে। সন্ধ্যাকালে সকলে সম্মিলিত হইয়া নিষ্ঠার সহিত বৈদ্যনাথের আরাধনা করে। কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বৈদ্যনাথে আসিলে, রোগীরা যাহাতে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে পায়, তজ্জন্য চেষ্টা করা হয়। জগদীশ্বরের কৃপায় আশ্রমটী এক্ষণে একরূপ উত্তমই চলিতেছে। কিন্তু ইহাকে স্থায়ী করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এখনও তাহা সংগৃহীত হয় নাই। পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ দেব মন্দিরের সদাব্রত হইতে আশ্রমটীর অনেক সাহায্য হইত; কিন্তু এক্ষণে তাহা বন্ধ হওয়ায়, অগত্যা মূলধন ভাঙ্গিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। অধিক দিন এরূপ করিলে আশ্রমটী যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে, তাহা বলা অতিরিক্ত। সেই জন্য আমি স্থির করিয়াছি, আমি যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান বা স্নেহ করি, তাঁহাদিগের নিকট কুষ্ঠাশ্রমের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিব। কুষ্ঠাশ্রমের দ্বারা ভগবানের কতকগুলি দীন হীন, সন্তানের উপকার হইতেছে—যদি আপনারা এরূপ বিবেচনা করেন, এবং আপনাদের আর্থিক অবস্থায় ইহাতে সাহায্য করিতে পারেন, এরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে বৎসরান্তে ইহার জন্য অন্ততঃ একটী টাকা ও একখানি পুরাতন বস্ত্র পাঠাইলেও আশ্রমটীর যথেষ্ট উপকার করা হইবে। ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্গে ইহারও জন্য যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য অনায়াসেই করা যাইতে পারে। আপনাদের আত্মীয়গণের নিকট কুষ্ঠাশ্রমের অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, হয়ত, তাঁহাদিগেরও সহানুভূতির উদ্রেক হইতে পারে। সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা যদি আপনারা যোগ্য বিবেচনা করেন, তবে অপর পৃষ্ঠায় লিখিত অঙ্গীকার-পত্রটাতে প্রত্যেক স্বাক্ষর করিয়া ফিরৎ পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। যদি প্রয়োজন হয়, লিখিলে, এইরূপ আরও অঙ্গীকার পত্র আপনার নিকট পাঠাইব। নিবেদন ইতি।

বৈদ্যনাথ, দেওঘর
রাজকুমারী, কুষ্ঠাশ্রম। } বিনীত নিবেদম,
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।
কুষ্ঠাশ্রম কমিটীর সম্পাদক।

অঙ্গীকার-পত্র।

বৈদ্যনাথের অনাথ কুষ্ঠরোগীদের সাহায্যার্থ আমি বার্ষিক টাকা চাঁদা ও খানি বস্ত্র প্রদান করিতে স্বীকৃত লইলাম। আমার শরীর সুস্থ থাকিলে এবং আর্থিক অবস্থা এক্ষণকার অপেক্ষা হীন না হইলে, আশা করি, জগদীশ্বরের কৃপায় আমি প্রতিশ্রুত অর্থ নিয়মিতরূপ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইব। ইতি

শ্রী বাসস্থান পোষ্টাফিস জিলা ১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ২রা পৌষ কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

REGISTERED No C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু রাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৩ ভাগ।
২৯ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, শুক্রবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে অনতিক্রমণীয় পরম দেবতা, বল তোমায় কি প্রকারে অতিক্রম করিব? তুমি ঊর্দ্ধে, তুমি অধোতে, তুমি দক্ষিণে, তুমি বামে আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। একবারও তোমার দৃঢ় আলিঙ্গনপাশ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিব তাহার সম্ভাবনা নাই। তোমার চক্ষু, অনন্ত বিস্তৃত জ্ঞানচক্ষু, আমাদিগের উপরে বিস্তৃত রহিয়াছে। ও চক্ষু তুমি সরাইবে কোথায়, লইয়া যাইবে কোথায়? তুমি নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে সমুদায় আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছ, তোমার কোন সাড়া শব্দ নাই, তুমি সাক্ষী হইয়া সকলই দেখিতেছ, অথচ তোমায় কেহ দেখিতেছে না, তাই বুঝি আমরা মনে করি তুমি এখানে নাই। তুমি স্থির প্রশান্ত, হিমালয় যদি বিকম্পিত হয়, সমুদায় জগৎ যদি প্রলয়দশাপ্রাপ্ত হয়, তথাপি তুমি যেমন তেমনি থাক। তুমি অপ্রকম্প্য, আমরা তাই—তুমি দেখিতেছ, আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ—বুঝিতে পারি না, আর যথেচ্ছ সংসারে প্রবৃত্তি বাসনা চরিতার্থ করিতে সাহসী হই। যখন কোন সন্তান আপনার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়, মনে হয় যেন সে সময়ে তোমার অপ্রকম্প্য স্বভাব বিচলিত হয়, তুমি হুঙ্কাররবে তাহার হৃদয়াকাশকে কম্পিত করিয়া তোল, অশব্দের শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হয়, অপরাধীর হৃদয় বজ্রাঘাতে যেন কাঁপিয়া উঠে। তুমি কি আপনার পরিচয় দেওয়ার জন্য এইরূপ করিয়া থাক? হে অবিকারী পরব্রহ্ম, ইহাতে কি তোমাতে বিকার উপস্থিত হইল না? তুমি শান্ত, গম্ভীর, নিস্তব্ধ, তোমার এ প্রকার ভীষণ বেশ কেন? কে তোমার প্রশান্ত বক্ষে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিল? সন্তানদের একটু অকল্যাণ না হয়, এজন্য তুমি এত ব্যস্ত? কৈ কোথাও কোন শব্দ নাই, আকাশবিদ্যুদ্‌মেঘবর্জ্জিত, অথচ পাপ করিতে গিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠে কেন? এবং ভীত মন যেখানে বজ্রনির্ঘোষ নাই, সেখানে বজ্রনির্ঘোষ শুনে কেন? সৃষ্টির পূর্ব্বে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি সমুদায় তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল, ইহা কি সেই ব্যাপার? আবার বলি, শব্দ নাই, অথচ শব্দ; বজ্রনির্ঘোষ নাই, অথচ বজ্রনির্ঘোষ। তবে তুমি আত্মার প্রকৃতির মধ্যে পাপের প্রতি ঘৃণা, পাপের প্রতি বিদ্বেষ, পাপ করিতে গিয়া অজানিত ভয়ে পশ্চাদ্গমন যে রাখিয়া দিয়াছ, তাহা হইতেই

এই ঘোরতর ব্যাপার সমুপস্থিত ? যখন মনে প্রবল ভয়ের উদয় হয়, তখন সকলই ভীষণ হইয়া উঠে, মৃদু শব্দ বজ্রধ্বনিতে পরিণত হয়। এখন বুঝিলাম আত্মার কাণে কাণে নিঃশব্দে তুমি যাহা বল, তাহাতে প্রবল ভয় উদ্রিক্ত হয়, সেই ভয়ে বজ্রধ্বনি শ্রুত হয়, সমুদায় প্রাণ মন কাঁপিয়া উঠে। প্রভো, যাই হউক তাই হউক, এ ব্যাপার যে সত্য এবং ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তব পাদপদ্মে ভিক্ষা করি, যেন তোমার ভীষণ বাণীর ভয়ে ভীত হইয়া আমরা নিয়ত তোমার পথে থাকি, এবং সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিরত হই, তুমি আমাদিগকে এই ভিক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ কর।

ঈশাকে কি আমরা ভালবাসি ?

ঈশার জন্ম দিনের মহোৎসব শেষ হইল। খৃষ্ট জগৎ সুপ্তোত্থিত হইয়া আবার নিদ্রিত। আমরা জাগিয়া রহিলাম না ঘুমাইলাম, এই গভীর প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত। কে যেন হৃদয়ে থাকিয়া বলিতেছেন, তোমরা কি আমার ঈশাকে ভাল বাস ? আমরাও তাঁহার সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিতকলেবরে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল হৃদয়, ঈশাকে কি আমরা ভালবাসি ? যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভালবাসি বলিলে কি তিনি তাহাতে বিশ্বাস করিবেন ? মুখের কথায় তিনি তো বিশ্বাস করিবেনই না, তিনি যে হৃদয়দর্শী; সামান্য লোকেও বিশ্বাস করিবে না। ঈশাকে ভালবাসার অর্থ, ঈশার কথায় প্রত্যয় স্থাপন করা। কেবল প্রত্যয় স্থাপন নয়, সেই কথার মত জীবন হওয়া। সেই কথার মত জীবন হওয়ার অর্থ, একেবারে ঈশা হইয়া যাওয়া। ঈশ্বর এবং ঈশার কথা এক, দুই নহে, যদি তাহা না হইত, তিনি আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিতে পারিতেন না। ঈশার কথা ঈশ্বরের কথা ; ঈশ্বরের কথা শুনিয়া যে সেই কথার মত আপনি না হইয়া যায়, তাহাকে ঈশ্বর পুত্র বলিয়া স্বীকার করিবেন কেন ?

যে আমার পিতার ইচ্ছা মত কার্য্য করে, সেই আমার ভাই, সেই আমার ভগিনী, সেই আমার মা, সেই আমার সুহৃৎ, ঈশা এ কথা কি আপনি বলিলেন, না পিতা তাঁহার দ্বারা এ কথা বলাইলেন। পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমায় কি বলেন ? আমার ইচ্ছা যে পালন করে না, সে আমার নয়। এ কথা কি তিনি তোমায় কোন দিন বলেন নাই ? তুমি বলিবে, তিনি বলুন, বলিলেও বলিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার ব্যবহার তো সেরূপ নয় ? আমি যখন অপরাধ করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি, তখন কি প্রকারে বলিব যে, তিনি আর আমায় সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন না ? তিনি স্বীকার করেন করুন, কিন্তু তুমি কি তাঁহার মুখ দর্শন করিতে পার ? তুমি কি তাঁহার স্নেহালিঙ্গনস্পর্শে পুলকিতহৃদয় ? কেন, তোমার এরূপ অবস্থা হইল কেন ? তিনি তোমার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে, প্রতি নিশ্বাসপ্রশ্বাসে, অথচ তাঁহার স্পর্শানুভব কর না কেন ? তবে তাঁহার দিকে যাহা থাকুক না কেন, তুমি তাঁহাকে হারাইয়াছ। যে আমার ইচ্ছা পালন করে না সে আমার নয়, এখনও কি একথার অর্থ বুঝিতে পারিলে না ? তুমি তাঁহার হও নাই বলিয়া, তিনি তোমার হন নাই, তুমি বিচ্ছেদের সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছ, এ কথা কি সত্য নয় ? চক্ষু থাকিতে তুমি অন্ধ হইলে কেন ? জ্ঞান থাকিতে অজ্ঞান হইলে কেন ? এ কি তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ড নয় ? যাহারা পিতার ইচ্ছা পালন করে তাহারা আমার ভাই ভগিনী, মা, বন্ধু, এ কথা বলিলেন বলিয়া কি ঈশা পৃথিবীর আর সকল লোককে পরিত্যাগ করিলেন ? কখনই নয়। তবে তাঁহার সঙ্গে যে পৃথিবীর বিরোধ শত্রুতা, ইহাই বলিলেন।

ঈশাকে কি আমরা ভাল বাসি ? এ কথার উত্তর তবে, আমরা কি প্রাণপর্য্যন্ত দিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করি ? যদি বলি, হাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করি বৈ কি ? অমনি ঈশা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, তোমরা কি তবে আকাশের বিহঙ্গ-

গণের ন্যায় নিশ্চিন্ত? কি খাইব, কি পরিব বলিয়া একবারও কি ভাব না? বল, আমরা ইহার উত্তর দিব কি? আমরা উপাসনা করিতে পারি, সঙ্গীত করিতে পারি, দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারি, সৎপ্রসঙ্গে লোকের মন মোহিত করিতে পারি, কিন্তু সকল ভার ঈশ্বরের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত, এ কথা বলিবার সাহস কোথায়? "কল্যকার জন্য ভাবিও না," এ পাঠ বাইবেলে অনেকবার পড়িলাম, কিন্তু পড়িয়া কি ফলোদয় হইয়াছে? আহার পান সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যদি মন ব্যাকুল রহিল, তবে ঈশা আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন কিরূপে? তাঁহাকে যে দূর হইতে পলায়ন করিতে হইতেছে? তাঁহাকে তবে ভালবাসা অতি দূরের কথা।

'কল্যকার জন্য ভাবিও না,' এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেই কি তবে ঈশাকে ভালবাসা হইল? না তাহাতে হইল না। পরের জন্য শোণিত দিতে যদি প্রস্তুত না থাক, তুমি ঈশাকে ভালবাস ইহার প্রমাণ তিনি পাইলেন না। তুমি ঈশ্বরের দানের প্রতি আশ্বস্তচিত্ত হইয়া আহারপানবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলে; কিন্তু এখনও তোমার নিজের প্রাণের প্রতি মমতা বিলক্ষণ আছে আজ যদি তোমায় ঈশ্বর ডাকিয়া বলেন, আমার সন্তানগণের জন্য তোমার ধন, জন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, পুত্র, বিত্ত, প্রাণ, সমুদায় আমার চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে, বিন্দু বিন্দু শোণিত পাত করিতে হইবে, আমরা কি তাহাতে প্রস্তুত আছি? প্রাণ দেওয়া অতি দুষ্কর কর্ম্ম, প্রিয় সামগ্রী প্রিয় জন হইতে বঞ্চিত হওয়া হৃদয়বিদারক, ইহা আর কে না জানে? কিন্তু ঈশাকে ভালবাসিতে গেলে, এ সম্বন্ধে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। যদি তুমি ইহাতে প্রস্তুত থাক, তবে তুমি ঈশাকে ভালবাস অন্যথা নয়। যদি ঈশ্বর তোমার নিকটে এ সকল না চাহিতেন, ঈশা কখন চাহিতেন না। পিতা যাহা বলেন, পুত্র তাহা বলেন, পিতা যাহা চান, পুত্র তাহা চান, ইহা যেন সর্ব্বদা তোমার মনে থাকে।

পৃথিবীর বীর পুরুষগণের বীরদর্প মৃত্যু কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু ঈশার মৃত্যুতে ঈশার জয়নিশান দিন দিন দ্বীপ দ্বীপান্তরে নিখাত হইতেছে, কত লোক আজও তাঁহার জীবনের কার্য্য পৃথিবীময় করিবার জন্য প্রাণ দিতেছে, তবে তাঁহাকে ভালবাসে এমন লোকের অভাব হয় নাই। তুমি আমি ভীরু, কাপুরুষ, বিষয়সুখপিপাসু হইয়া শৃগাল কুক্কুরের মত জীবন যাপন করিতে পারি, কিন্তু আজও ঈশার নামে ঈশার জীবনের মহিমায় শত শত লোক পরের জন্য প্রাণ অকাতরে দান করিতেছে, খ্রীস্টজগতের দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিতে পাইবে। তবে এখানেই কি ঈশার প্রতি ভাল বাসা শেষ হইল? না, তিনি যাইবার বেলা যে নূতন নিয়মপত্র তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকে জ্ঞাপন করিয়া গেলেন সে নিয়মপত্র অনুসারে তাঁহারা কেহইতো চলিতেছেন না। কৈ, তাঁহারা কি সকলে পিতাকে দেখেন, পিতার কথা শুনিয়া চলেন? যদি তাহা না হয়, তবে ঈশার জীবন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিফল হইয়াছে! ঈশা তবে আজও কেবল সমুদায় অধিকার পিতার হস্তে দিতে পারেন নাই তাহা নহে, তাঁহার শিষ্যেরাই সে বিষয়ে তাঁহার সহায় না হইয়া বিরোধী হইয়া রহিয়াছেন। এরূপ স্থলে ঈশাকে ভাল বাসার কথা উঠিতেই পারে না।

আমরা নববিধানের লোক, আমরা খ্রীস্টের নামে জগতের নিকটে পরিচিত নহি। খ্রীষ্ট আমাদের শোণিত। তাঁহার শোণিত যদি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে তাহা পরের জন্য পাত হইবেই হইবে। কি খাইব, কি পরিব, এ চিন্তাতো আমাদের মনে প্রবেশই করিতে পারে না। কেবল আহার পানের জন্য ঈশ্বরের উপরে সকল ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত নহি, তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন আমাদের সমগ্র জীবনের কার্য্য। ঈশাকে জ্যেষ্ঠ ভাই বলিয়া যখন আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তখন পিতার ইচ্ছা পালন ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে সে সম্পর্কতো দাঁড়াইতেই পারে না। এই

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে পারি না। ভূতকালে তাঁহার যে সকল ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলেই ঈশা এবং ঈশার পিতা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবার নহেন। দিন দিন পিতার নূতন ইচ্ছা আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকিবে, আর আমরা তৎপ্রতিপালনে নিয়ত ব্যগ্র থাকিব, ইহা হইলে বুঝিলাম, আমরা ঈশাকে ভাল বাসি। মুখে প্রভু প্রভু বলা, ভাল বাসি ভাল বাসি বলা ঈশা গ্রাহ্য করেন না জানিয়া, ঠিক তাঁহাকে যাহাতে ভাল বাসা যায়, তাহাই করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টযোগ।

হিন্দু ও বৌদ্ধ, এ দুইয়ের মধ্যে লোকে বৃথা বিরোধ কল্পনা করে, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। একটি আর একটির বিপরীত, ইহা বলা অত্যুক্তি নহে। হিন্দুযোগ ব্রহ্মযোগ, ঈশ্বরের সহিত যোগ, ইহা বলিলে বৌদ্ধযোগের সহিত ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু সে দিক্ না দেখিয়া কেবল অধ্যাত্মযোগমাত্রেও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত একতার সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধ জ্ঞানযোগী, হিন্দুগণও জ্ঞানযোগী, ইহাতে নামমাত্রে মিলন হইল, কিন্তু বুদ্ধের জ্ঞানযোগ ও হিন্দুগণের জ্ঞানযোগ কখন এক নহে। কতকগুলি হিন্দুযোগী আত্মজ্ঞানকে সার করিয়া আত্মাকে জড় প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া অধ্যাত্মযোগে সিদ্ধ হইলেন, বুদ্ধ আসিয়া সে আত্মাকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিলেন, তাঁহার সঙ্গে ইঁহাদের মিলন হইবে কি প্রকারে? আত্মা চিৎ, আত্মা জ্ঞান, সকল সীমাবিবর্জ্জিত, তবু আত্মা। ইনি যে আত্মা মানেন না, কেবল অসীম অনন্ত জ্ঞান মানেন। এ জ্ঞান আবার ঈশ্বর নহেন, কেন না সৃষ্টি মিথ্যা, তাহার আবার স্রষ্টা কোথায়? তবে এ জ্ঞান কি উদাসীন ব্রহ্ম? ব্রহ্ম বলিতে চাও ক্ষতি নাই, তিনি ব্রহ্ম বলেন না, কেন না হিন্দুগণের ব্রহ্ম উদাসীন হইলেও তাঁহার দৃষ্টিপাত বিনা সৃষ্টি হয় না। সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধ বিপরীত ভাবাপন্ন, তবে যোগসম্বন্ধে বৈপরীত্য মধ্যে একতা আছে কি না, ইহা দেখা প্রয়োজন, অন্যথা ধর্ম্মের ইতিহাস পূর্ব্বাপরসম্বন্ধহীন হইয়া যায়।

হিন্দু যোগিগণ আত্মাকে কেবল স্থির রাখিয়াছেন তাহা নহে, আত্মাতেই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন, অন্য কথায় আত্মাকে ব্রহ্মে পূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন 'ব্রহ্মাহমস্মি।' বুদ্ধ আসিয়া অহংকে উড়াইয়া দিলেন, অবশিষ্ট রহিলেন অনন্ত ব্রহ্ম। এ ব্রহ্মেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, কেন না ব্রহ্ম থাকিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জীব ও জগৎ অনুস্যূত থাকিবে, সুতরাং এক অনন্ত জ্ঞান রাখিয়া সমুদায় বিরোধ ঘুচাইলেন। জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয় থাকিবে, এ বিতর্ক তিনি তুলেন নাই। জ্ঞানের নিকটে অজ্ঞান অবিদ্যা দাঁড়াইতে পারে না, মিথ্যাভূত জগৎ ও জীব জ্ঞানের প্রকাশে উড়িয়া যায়, ইহা বলিয়াই তিনি সন্তুষ্ট। কোন একটি বিষয় তাহার বিপরীতের সঙ্গে চিন্তাপথে উদিত না হইলে তাহা বুদ্ধিগোচর হয় না, সুতরাং জ্ঞান ও অজ্ঞান এ দুই বুদ্ধিপথে উদিত হইয়া অজ্ঞান মিথ্যা হইয়া উড়িয়া গেল, জ্ঞান রহিলেন কেবল, সুতরাং বৌদ্ধযোগ সম্ভব হইল। বাসনা কামনা যত দিন আছে, অজ্ঞান থাকিবেই থাকিবে, তাই তীব্রসাধনে বৈরাগ্যমন্ত্রে বাসনা কামনা ছেদন করিয়া তাহার সঙ্গে আমিকে উড়াইয়া দিয়া বুদ্ধ কৃতার্থ হইলেন।

হিন্দু ব্রহ্মে পূর্ণ আমিকে রাখিলেন, বুদ্ধ আমিকে ছাড়িলেন, ছাড়িয়া কেবল অনন্ত জ্ঞান প্রাপ্য বস্তু রাখিলেন। এখন এ দুইয়ের বিরোধ ঘুচাইয়া মিলন সাধন করে কে? আমিকে ছাড়িতে হইবে, অথচ কিছুই না বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে না; আমিত্ব ছাড়া আমির অনন্তজ্ঞানের সঙ্গে এমন একটা কোন সম্বন্ধ রক্ষা করা চাই, যাহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগমধ্যে মিলনের ভূমি

প্রকাশ পাইবে। নূতন যোগ বিনা এ কার্য্য সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? খ্রীষ্টের জীবনে সেই যোগ প্রকাশ পাইল। হিন্দু ও বুদ্ধ যোগের সমাগম না হইলে খ্রীষ্টযোগের সমাগম হইতে পারে না। হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগভূমির উপরে খ্রীষ্টযোগ সংস্থাপিত। ঈশা বলিলেন, আমাকে ভাল বলিও না, এক জন কেবল ভাল আছেন, তিনি স্বর্গস্থ পিতা। আমি যদি ভাল না হইল, তবে সে পরিত্যাজ্য। কে আর মন্দ আমিকে লইয়া ঘর করিতে চায়? তবে মন্দকে সম্পূর্ণরূপে ভালোর অধীন করিয়া রাখিতে পারিলে তাহার থাকা না থাকা সমান হয়, তাই ঈশা সেই মন্দ আমিকে ব্রহ্মপদ না দিয়া পুত্রের পদ দিলেন। সে আমি মন্দ হইলেও ব্রহ্মের পুত্র, কেন না তাহার উৎপত্তি ও স্থিতি ব্রহ্মেরই জন্য। তবে সে যখন মন্দ, তখন তাহার ভালোর অধীন থাকা প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহার মন্দেতে কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এ জন্য ঈশা সেই আমিকে সম্পূর্ণরূপে ভালোর ইচ্ছাধীন করিলেন; অন্যকেও সেইরূপ ইচ্ছাধীন দেখিলে আপনার ভাই ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

এখানে হিন্দুগণের ব্রহ্মযোগ হইতে ঈশার এ নূতন যোগ আপাততঃ একটু ন্যূন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। হিন্দু ব্রহ্মেতে সমুদায় জগৎ ও জীব নিবিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা আমিকে পূর্ণ করিলেন, ইহাতে এ যোগের ভূমি অতি বিস্তৃত, সকলকেই মানিতে হইবে। এ দিকে ঈশা পুত্রত্বে সকলের সঙ্গে পিতাতে এক হইলেন। যাহাদিগের ভিতরে এখনও মন্দ আমির প্রাবল্য আছে, সুতরাং আমিত্বশূন্য হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনতা-বশতঃ পুত্র হইতে পারে নাই, তাহাদিগের সঙ্গে তিনি পিতাতে যোগযুক্ত হইবেন কি প্রকারে? যখন ঈশ্বরকে সম্বন্ধের সূত্রে তিনি আপনার সঙ্গে বাঁধিয়াছেন, তখন সেই সম্বন্ধ অনুসারে যাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে বিনা তিনি পিতাতে এক হইবেন, ইহা কি সম্ভব? তাঁহারা ক্রমে যত পুত্রত্ব লাভ করিবেন, তত তিনি সেই সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সহিত পিতাতে এক হইবেন। ব্রহ্ম সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই পিতা, এরূপ ভাব মনে উদ্দীপ্ত হইলে পুত্র অপুত্র সকলেরই সহিত যোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু এস্থলেও যাঁহারা পুত্র তাঁহারা অন্তরঙ্গ, এবং যাহারা পুত্র নয় তাহারা বহিরঙ্গ, এটুকু পার্থক্য তখনও থাকিয়া যায়। ঈশা এই দৃষ্টিতেই ঈশ্বরের নিকটে শেষ সময়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহারা ইহার পর বিশ্বাস করিবে, তাহারাও যেন তাঁহাতে এবং পিতাতে এক হয়। এ প্রার্থনায় এই দেখাইয়া দেয় যে, বহিরঙ্গগণকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে তাঁহার অভিলাষ ছিল, তাঁহাদিগকে বহিরঙ্গ করিয়া রাখা, তাঁহার অভিলাষ ছিল না।

এখন একটী কথা বলিয়া বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করা যাউক। হিন্দু ও বৌদ্ধযোগ যখন খ্রীষ্টযোগে বিরোধ পরিহার করিয়া এক হইয়াছে, তখন এ দুই যোগের আর প্রয়োজন কি? অবশ্য প্রয়োজন আছে, এ দুই যোগের বিশেষ ভাব খ্রীষ্টযোগে বিলুপ্ত হয় নাই, সেই দুই ভাব বিশিষ্টাকার ধারণ করিয়াছে এই মাত্র। হিন্দু আমিকে ছাড়েন নাই, বুদ্ধ ছাড়িয়াছেন, এ দুইই যুগপৎ না থাকিলে খ্রীষ্টযোগ হয় না। ছাড়া ও না ছাড়া দুইই খ্রীষ্টযোগে কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছে, উপরে আমরা তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। জগৎ ও জীব সহ সম্বন্ধযুক্ত ব্রহ্ম, এবং জগৎ ও জীবের সহিত সকলসম্বন্ধবিরহিত অনন্তজ্ঞান, এ দুই কি প্রকারে খ্রীষ্টযোগে মিলিত ভাবে স্থিতি করিল, ইহা বোঝা নিতান্ত প্রয়োজন। সকলে পিতাকে দেখিতে পায় না, পুত্রই কেবল পিতাকে দেখিতে পান, এ কথা বলিয়া তিনি যাহারা পুত্র নয় তাহাদিগকে ও সংসারকে (কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না বলিয়া) ঈশ্বর সহ সম্বন্ধবিরহিত করিয়া লইলেন, অন্য দিকে প্রকৃতি ও পুত্রত্বপ্রাপ্ত জীবগণের সহিত ঈশ্বরকে সম্বন্ধযুক্ত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সর্ব্বজ্ঞানের আধার হৃদয়ের প্রদীপ্ত

আলোক করিয়া অনন্তজ্ঞানের দিক্ স্থির রাখিলেন। এইরূপে হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগের ভাব যখন খ্রীষ্টের যোগে বিনষ্ট হয় নাই, তখন যাঁহারা খ্রীষ্টযোগে যোগযুক্ত হইতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগের বিশেষ ভাব আত্মস্থ করিয়া তবে খ্রীষ্টযোগে কৃতকৃত্য হইবেন। খ্রীষ্ট যোগের পর, ভক্তিযোগ পরিপুষ্টাঙ্গ হইয়া কি করিয়াছে, তাহার আলোচনা আর ইহার সঙ্গে করা গেল না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আত্মন্, আমি শরীরকে কি ভাবে দেখিয়া থাকি তাহা বলিয়াছি, অদ্য আহার ও পরিচ্ছদের বিষয় বলিতে চাই। তুমি শুনিয়াছ আহার ও পরিচ্ছদ কিছুই নহে, তাহারা আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আমি বলি, একথা একেবারে অসত্য নহে; কিন্তু বিপরীত পক্ষেও সত্য আছে। যাহার মন যেমন, আহার ও পরিচ্ছদও সেইরূপ হয়, ইহা তুমি মান কি না? আহার ও পরিচ্ছদে মনের দৌর্ব্বল্য বা বল, উভয়ই প্রকাশ পাইতে পারে। এমন কি এক জন সম্রাট্ যখন গৃহে বাস করেন, পদের অনুরোধ থাকে না, তখন তাঁহার আহার ও পরিচ্ছদে তিনি কি বুঝিতে পারা যায়। জিজ্ঞাসা করি, তোমার ভিতরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পূর্ব্ব রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে কি না? যদি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে আহার ও পরিচ্ছদ কিছুই নয় ইহা বলিতে পার না।

আত্মন্, তুমি ঈশাকে ভাল বাস, ঈশার জীবনবৃত্ত পাঠে তোমার আনন্দ, ইহাতে আমার আনন্দ কেনই বা হইবে না? যে যাহাকে ভাল বাসে, অলক্ষিতভাবে সে তাহার মত হইয়া যায়। তুমি যদি ঈশাকে ও তাঁহার জীবনবৃত্তকে ভাল বাসিতে বাসিতে ঠিক তাঁহার শিষ্য হও, তবে আমার তাহাতে ক্ষতি হইল কৈ, লাভই হইল? তোমার এ ভাব আমার পক্ষে পরম লাভ। ভাল বাসাটাকে তুচ্ছ মনে করিও না, ভাল না বাসিয়া কেহ কাহারও মত হইতে পারে না। ঈশার প্রতি তোমার যেটুকু ভালবাসা আছে, তাহা যাহাতে বাড়ে, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন কর। ভয় করিও না তাঁহাকে ভালবাসিতে গিয়া তুমি বা এক ঈশাতে বদ্ধ হইয়া পড়। ঈশার প্রতি তোমার প্রকৃত ভালবাসা জন্মিলে, তাঁহার ভালবাসার পাত্রগুলি তোমার ভালবাসার পাত্র হইবেন। ঈশা কি অন্যান্য সাধুগণকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন?

ঈশাকে ভাল বাসিলে অন্যান্য সাধুর উপরে ভালবাসা ছড়াইয়া পড়িবে, ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তোমায় বুঝাই। নবসংহিতায় লেখা আছে, "ভ্রাতৃপ্রেম এবং ভ্রাতৃভাব শব্দের বিশুদ্ধ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর এবং তোমাদের পরস্পরের ব্যবহার এমন হউক যে, তাহা বাস্তবিকই প্রেমের এবং সুখদ আত্মীয়তার আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত হয়। এইরূপে ছোট ছোট ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং ভগিনীমণ্ডলী স্বর্গধামের এক বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃভগিনীমণ্ডলীতে পরিণত হইবে।..." দেখ, এখানে ক্ষুদ্র পারিবারিক প্রেম খাঁটি হইলে, তাহা সেই ক্ষুদ্র পরিবারে বদ্ধ থাকে না, সকল নরনারীর উপরে ছড়াইয়া পড়ে। আত্মন্, আমি ব্যগ্রতা সহকারে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি যে, তোমার পারিবারিক ভালবাসা ক্ষুদ্র পরিবারে বদ্ধ থাকিবে না, জন কয়েকের সেবায় পর্য্যবসন্ন হইবে না, কিন্তু উহা বিস্তৃত জনমণ্ডলীর সেবায় নিযুক্ত হইবে। এ বিষয়ে আমি তোমার অক্ষমতায় বিশ্বাস করি না, চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি। যে সেবার্থ প্রাণ মন সমর্পণ করে, তাহার ক্ষমতা ও বল স্বয়ং ঈশ্বর, তুমি কি আজও ইহার প্রমাণ পাও নাই?

উপাসনাবাস।

আত্মার অসাধারণত্ব।

২১এ কার্ত্তিক, ১৮২০ শক।

সাধারণ এবং অসাধারণ এই দুইটা কথা প্রচলিত আছে। আমরাও সাধারণ লোক ও অসাধারণ লোক এইরূপ বলিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃতিতে ইহার কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে কি না দেখিতে হইতেছে। যদি কতকগুলি লোককে সাধারণ করিয়া সৃজন করা হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য নীচ করিয়া রাখা হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহা হইলে ইহাও বুঝা যায় যে, যাহারা অসাধারণ শ্রেণীতে গণ্য তাঁহাদের অহঙ্কার অভিমান থাকিবেই। যদি সৃষ্টিতে বাস্তবিক এই প্রকার কোন পার্থক্য স্বভাবতঃ থাকে, তবে স্রষ্টার সাম্যনীতি রক্ষা পায় না। যদি সৃষ্টিতে ঈশ্বরের এ প্রকার অভিপ্রায় না থাকে তবে এ কথা ও এ ভাব প্রচলিত হইল কেন? ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? সাধারণ ও অসাধারণ শব্দ যেমন প্রচলিত, সম্ভব ও অসম্ভব কথাও তেমনি প্রচলিত আছে। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, এই বলিয়া অনেক সময় আমরা অনেক বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত থাকি; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। হইতে পারে, এক জন জ্ঞানবান্ যে কার্য্য করেন, এক জন অজ্ঞানী তাহা পারে না; এক জন ধার্ম্মিক ধর্ম্মতত্ত্বের যত নিগূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, একজন অধার্ম্মিক তাহা পারে না, এক জন বলবান্ লোক যাহা করিতে পারে একজন দুর্ব্বলের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে; একজন সুবক্তা শ্রোতৃবর্গকে যেমন আপ্যায়িত করেন, যে কখনও বক্তৃতা করে নাই তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাস্তবিক সম্ভব ও অসম্ভব কথা এই ভাবে ব্যবহৃত হয় না। দেখা যায়, মানুষ কতকগুলি বিষয়ে কোন প্রকারে প্রবৃত্ত না হইয়াই, কোন প্রকার চেষ্টা যত্ন বিনাই, তাঁহা তাহার

পক্ষে অসম্ভব স্থির করে। অসম্ভব এ কথা এই প্রকারেই প্রচলিত হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। অন্যের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে করার কোন কারণ নাই। যথেষ্ট যত্নে অন্যেতে যাহা অসম্ভব হইয়াছে তাহা আমার পক্ষেও অসম্ভব, ইহা মনে করা যাইতে পারে। সম্ভাবনার মূলে শিক্ষা, চর্চ্চা, উৎসাহ ও চেষ্টা। যে এই প্রকারে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবার কোন কারণ নাই। অতএব আমাদের অভিধান হইতে সাধারণ ও অসম্ভব কথা একেবারে তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণ লোক তাহাদিগকে বলা হয়, যাহারা কেবল আহার পান ও সংসার লইয়া ব্যস্ত। ইহারা সংসার মোহে এত ভুলিয়া থাকে যে, ইহাদের কোন প্রকার জ্ঞান ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহারা মা, বাপ, পুত্র কন্যা একত্র হইয়া বাস করে, ইহাদের মধ্যে যাহাদ্বারা যত উপকার হয়, তাহার মূল্য তদনুরূপ তাহার নির্দ্ধারণ করে। সংসার এবং সাংসারিক উপকার, অপকার, ক্ষতি বৃদ্ধি ব্যতীত ইহারা আর কিছুই বোঝে না। এই প্রকার লোকই সাধারণ লোক। যাহারা কোন উচ্চ জ্ঞানে, উচ্চ ভাবে, উচ্চ ধর্ম্মে, ও শ্রেষ্ঠ কার্য্যে প্রয়াসী নহে, তাহাদিগকে সাধারণ লোক বলিয়া অবধারণ করা অন্যায় হয় না; কিন্তু তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, ঈশ্বর কতগুলি লোককে এই প্রকার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন কি না, যাহারা চির দিন অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকিবে। যদি তাহারা সেইরূপেই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত অর্থাৎ অসাধারণ মনে করেন তাঁহাদের ইহাদিগকে নিয়ত ঘৃণা করা ও ইহাদের উপর অত্যাচারপরায়ণ হওয়াও অসম্ভব নহে। যদি ইহাদের ভিতর কোন অসাধারণত্ব না থাকে, তবে চিরকাল ইহাদিগকে এই ভাবে থাকিতে হইবে, সন্দেহ কি? কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে এতাদৃশ বৈষম্য কল্পনা করা যায় না। পক্ষান্তরে দেখা যায় আমরা যাহাদিগকে সাধারণ লোক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহাদিগের ভিতরে অনেক অসাধারণ ভাব বর্ত্তমান আছে। এতৎ সম্বন্ধে সুইজর্লণ্ডনিবাসী একজন সাধারণ কৃষকের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। একদা ঐ দেশে সৈন্যগণ তাহাদের অশ্বগণের আহারাভাবে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, সকল লোকেই ইহাদিগের ভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছিল। এমন সময় এক জন শ্বেতশ্মশ্রু কৃষককে পাইয়া তাহারা তাহাকে শস্যক্ষেত্র দেখাইয়া দিতে অনুরোধ করে। কৃষক তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদিগকে শস্যক্ষেত্র অভিমুখে লইয়া যায়। অবিলম্বে তাহারা উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাহা অশ্বগণের আহারার্থসংগ্রহে অভিলাষী হইলে, কৃষক বলিল ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র আছে, এস তোমাদিগকে সেখানে লইয়া যাই। তাহারা সম্মত হইয়া কৃষকের অনুবর্ত্তী হইলে কৃষক নিজ শস্য ক্ষেত্র দেখাইয়া বলিল ইহাই উৎকৃষ্ট শস্য ক্ষেত্র, ইহা হইতে তোমরা যথেচ্ছ অশ্বগণের আহার্য্য সংগ্রহ কর। তখন সৈন্যগণ বলিল তুমি কেন এমন বলিতেছ? পূর্ব্বে আমরা যে ক্ষেত্র দেখিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট নহে। তখন কৃষক বিনীত ভাবে বলিল, উহা অন্যের ক্ষেত্র; আমি অন্যের ক্ষেত্র দেখাইয়া দিতে পারি না। ইহাতে হয়ত এমন কোন নিঃস্ব ব্যক্তির ক্ষেত্র আছে যাহার শস্য বিনষ্ট হইলে সংবৎসর তাহাকে অনাহারে কষ্ট পাইতে হইবে। অতএব আমি আমার নিজ ক্ষেত্র আপনাদিগকে দেখাইয়া দিতেছি। সৈন্যগণ ইহা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল এবং কৃষককে অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়াছিল। সৈন্যগণের ডাক্তার এই সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিজ ডায়েরী পুস্তকে লিখিয়াছিলেন; পরে তিনি তাহা প্রচার করেন। এই প্রকার শত শত সাধারণ লোক মধ্যে অসাধারণ ভাব আছে যাহা আশ্রয় করিয়া তাহারা অসাধারণত্ব লাভ করে। ইহা দেখিয়া সাধারণ অসাধারণ দুইটী শ্রেণী স্থাপন করা আর সত্যের অনুমোদিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান সময়ে একটি ভাব সমস্ত নরনারীর ভিতরে প্রকাশ পাইতেছে,তাহা অতৃপ্ত স্পৃহা। মানুষ কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না। যাহা পাইবার ইচ্ছা তাহা পাইয়াও আবার নূতন কিছু পাইবার জন্য মানুষ ব্যাকুল হইতেছে। মনে হয়, ভগবান্ সকলের ভিতরে এমন এক অনন্ত স্পৃহা দিয়াছেন, যাহা দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে মানুষ কোন বিষয়ে তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। সকলের ভিতরে একটি আদর্শ রহিয়াছে, যে আদর্শের নিকটস্থ হইতে না পারিলে তাহারা পরিতৃপ্ত হয় না। এমন কি সেই আদর্শের নিকটস্থ হইলেও মন তৃপ্ত হয় না,আরও উচ্চ আদর্শ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়। অনন্ত আশা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত স্পৃহা সকল মানুষের ভিতরে বর্ত্তমান। প্রত্যেক মানুষের মধ্যগত এই সাধারণ ভাব ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া তাহাদিগকে অসাধারণ করিয়া তুলিতেছে। এখনে দেখা যাইতেছে, ভগবান্ সমস্ত মানুষে সমান ভাব দিয়াছেন। সমস্ত মানুষেতে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম লাভের ইচ্ছা আছে। সকল মানুষ পরিত্রাণ জন্য ব্যাকুল। অতএব যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন অথবা জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যেক লোকের অসাধারণ হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহাই দেখিতে হইবে।

এইক্ষণে সম্ভব ও অসম্ভব, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কোথায় দেখা যাউক। অনেক গুলি বিষয় আছে যাহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অনেক বিষয়ে প্রকৃতি বিরোধী। যেমন মানুষ যদি মনে করে যন্ত্রের সহায়তা বিনা আমি পাখীর মত আকাশে উড়িয়া সঙ্গীত করিব, মানুষ যদি মনে করে আমি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বতোগামী হইব, মানুষ যদি মনে করে আমি মৎস্যের ন্যায় যথেচ্ছ সমুদ্রে বিচরণ করিব, তাহা সম্ভব হইবে না। ইহা চিরকাল অসম্ভব থাকিবে; কিন্তু এমত স্থলে মানুষ অসম্ভব শব্দ ব্যবহার করে না, তাহারা মানুষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহারই কোন কোন বিষয় অন্যের পক্ষে অসম্ভব মনে করে। ইহাও হইতে পারে যে, আমার সঙ্গীত

শক্তি নাই অথচ যদি আমি মনে করি, উৎকৃষ্ট সঙ্গীত দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিব তাহা অসম্ভব হইবে, অথবা আমি যে বিদ্যা শিক্ষা করি নাই সে বিদ্যায় বিশারদ কাহারও সঙ্গে আমি যদি তৎসম্বন্ধে সমকক্ষতা প্রকাশ করিতে যাই, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইবে সন্দেহ নাই। এ প্রকার অবস্থাতে অসম্ভব শব্দ প্রয়োগ করা অবিধি নহে। কিন্তু কেহ যদি মনে করে, আমি পুণ্যবান্ হইতে পারি না, আমি যোগী হইতে পারি না, আমি ভক্ত হইতে পারি না, আমি প্রেমিক হইতে পারি না, এক পরিবার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, তাহা হইলে ঘোর অপরাধ করা হয়। এই সমস্ত বিষয়ে নরনারীনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার। ইহাতে সাধারণ অসাধারণ নাই, এ বিষয়ে সম্ভব অসম্ভব নাই। যে সমস্ত ঘটনা চিরকাল হইতেছে তাহাতে অবিশ্বাস স্থাপনের কোন কারণ দেখা যায় না। অজ্ঞানী ধীবরগণকে ডাকিয়া ঈশা উচ্চ ধর্ম্মের অধিকারী করিলেন। তাঁহারা যে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন, অস্বীকার করে কাহার সাধ্য? ঈশ্বরের ব্যবস্থা এই যে, আত্মার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা সকলের দ্বারা সম্ভব হইবে। যেমন সাধারণ অসাধারণ হয়, তেমনি অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সকলেই পুণ্যবান্ হইতে পারে, ধর্ম্মাত্মা হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। কেহ যদি মনে করে, আমার মন অতিশয় চঞ্চল, আমার এতাদৃশ স্নায়ুবিকারঘটিত প্রতিকূলতা আছে যাহার জন্য মন স্থির করা কঠিন, আমি কি প্রকারে ধর্ম্মসাধনে অধিকারী হইব? এ কথারও প্রতিবাদ করার কারণ আছে। কারণ দেখা গিয়াছে, এতাদৃশ প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ সাধন, চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা পুণ্যবান্ ও ধর্ম্মাত্মা হইতেছে। আত্মার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা লাভ করিতে পারিব না, ইহা মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তি। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত, তাহা হইবেই হইবে। তবে ২। ৫ দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে। অতএব পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আত্মার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অবশ্যম্ভাবী। ইহা কখন অসম্ভব মনে করিও না। যেমন সাধারণ অসাধারণের রেখা বিলুপ্ত করিয়া ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে সম্ভাবনার সমভূমিতে একত্র সমানভাবে দণ্ডায়মান করিয়াছেন, তেমনি পরিত্রাণার্থ ও আত্মার কল্যাণার্থ প্রেম পুণ্য যোগ ভক্তি মুক্ত শান্তি সকলের পক্ষে সম্ভব করিয়াছেন। অতএব অনন্ত আশা ও আনন্দে এই পথে আমরা সকলে অগ্রসর হই, চিরকল্যাণ দাতা ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হে কৃপানিধান, অসম্ভব বলিয়া আমরা নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছি। অসম্ভব বলিয়া এই বিধানে লোক নিরাশ হইতেছে। অত বড় ধর্ম্মবিধানে আমাদিগকে আশ্রয় দিলে, কিন্তু এ বিধান গ্রহণ করা অসম্ভব ভাবিয়া আমরা দিন দিন ক্ষুদ্রচিত্ত হইয়া যাইতেছি। হে ঈশ্বর, ধন মান পদ গৌরবে সকলের সমান হইতে চাহি না; কিন্তু আত্মার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা পাইব না, তাহা অসম্ভব, ইহাত মনে করিতে পারি না। কোন কোন মানবাত্মাতে প্রেম, পুণ্য, যোগ, ভক্তি, যাহা সহজ হইয়াছে তাহা কেন আমাদের পক্ষে অসম্ভব ভাবিব? হে পিতা, আশীর্ব্বাদ কর যেন অসম্ভব কল্পনা করিয়া আর তোমার কাছে অপরাধী না হই। অনন্ত আশা, অনন্ত প্রেমে আমরা তোমার পথে ব্যাকুল হইয়া অগ্রসর হই। প্রার্থনা করি, আত্মার প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে যেন আমরা নিরাশ না হই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। করুণাময় পিতঃ, কতকগুলি লোককে সাধারণ মনে করিয়া আমরা তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তুমিত সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে তোমাকে লাভ করিবার জন্য অসাধারণ ভাব রাখিয়া দিয়াছ। কত সাধারণ লোক সেই অসাধারণ ভাব আশ্রয় করিয়া অসাধারণ জীবন লাভ করিতেছে। অতএব আমাদের আর যেন এই প্রকার ভেদবুদ্ধি না থাকে। আমরা সাধারণ লোক হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নহি। তোমার প্রসাদ তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় সকলের পরিত্রাণের সহায়তা করিতেছে। সমস্ত নরনারীর মধ্যে তোমাকে স্বীকার ও তোমার বর্ত্তমানতা দেখিয়া আমরা যাহাতে কৃতার্থ হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। আশা ও বিশ্বাসের সহিত তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা করিয়া তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

ভয়ের দেবতা।

২৮এ কার্ত্তিক—১৮২০ শক।

জীবের ভয় কেন? ভয়ের কারণ কি? বিনা ভয়ে কোন কালে কোন্ মানুষ জীবন যাপন করিতে পারে না কেন? আমার কোন ভয় নাই, আমি ভয়ের অতীত, ইহা কেহ বলিতে পারে না কেন? ভয়ের কারণ রহিয়াছে, নরনারী নিত্য ভয়ের মধ্যে বাস করে, এই ভয়ের মূর্ত্তি কখনও তিরোহিত হইবে না। আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকি এবং সময়ে সময়ে নৃত্য গীত উৎসব আমোদে ভয়কে বিস্মৃত হই; কিন্তু বাস্তবিক তাহা বিস্মৃত হইবার বিষয় নহে। ভয় ও আনন্দ যদি পাশাপাশি স্থিতি করে তবেই এই পৃথিবীতে আমরা যে ভাবে অবস্থিত, তাহার উপযোগী সাধন অব্যাহত থাকে। এই যে ভয় যাহার নিষ্কৃতি আমাদের জীবন হইতে কখনও দেখি না এবং ভয়শূন্য হওয়া মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থাও নহে বলিয়া বুঝিতেছি, এই ভয় কিসের? প্রথম ভয় সুখভোগের বিনাশ। মানুষ সুখ ভোগ করে; কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতরে কে যেন নিয়ত বলিতে থাকে, এই সুখভোগ থাকিবে না। ধনী ব্যক্তি নানা প্রকার সুখভোগ করেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবিতে থাকেন, এই সুখভোগ কতক্ষণ স্থায়ী হইবে? সময়ে সময়ে লোকে সুখভোগে বিহ্বল হইয়া, ইহার বিনাশ বিস্মৃত হইয়া থাকে। ইহার নাম মোহ। এই মোহ মানুষকে কিছু কাল ভাবী দুঃখ ভুলাইয়া দিলেও অনিবার্য্য কারণে এই ভোগসুখ দুঃখে পরিণত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি এই জন্য কখন সুখভোগে আসক্ত হন না। আমোদ প্রমোদে লোক মত্ত থাকে;

এক প্রকার আমোদ কখন ভাল লাগে না, নূতন নূতন আমোদ তাহাতে যোগ করা হয়, তথাপি আমোদ আহ্লাদ চিরস্থায়ী হয় না। উহা বিনষ্ট হইবেই হইবে। যেমন আমোদ তেমনি ভোগ। মানুষের কোন প্রকার ভোগ স্থায়ী হয় না। নানা প্রকারে,বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া লোকে বিবিধ প্রকার আয়োজন করে, ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করে; কিন্তু যাহা ঘটিবার অনিবার্য্যরূপে তাহা সংঘটিত হয়। ভোগ অনতিবিলম্বে রোগ উৎপাদন করে। কোথায় জীব ভোগসুখে মত্ত হইবে, না তাহার উপর রোগের যন্ত্রণায় অস্থির। শত্রু সমস্ত যেন চারি দিকে লেগেই আছে। পৃথিবীতে কেহ যদি ভোগসুখে আসক্ত হয়, চারি দিকে সকলে তাহার নিন্দা করে, এমন কি এত তাহার শত্রু উৎপন্ন হয় যে, তাহারা অবিলম্বে তাহার সুখভোগ বিনাশ করে। এই রূপে মানুষের সুখভোগ নিয়ত বিনাশজলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদ, হাস্য ক্রন্দন, যেন পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। অতএব ভয়ের প্রথম কারণ এই, ভোগ পাছে বিনষ্ট হয়। ইহাই জীবের প্রথম ভয়।

ভয়ের আরও কারণ আছে, তাহা আরও ভয়ানক। প্রবৃত্তি বাসনা কামনা লোককে পাপের পথে লইয়া যাইতেছে। প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ পাপসংসৃষ্ট আমোদ আহ্লাদ করে ও পাপাসক্ত হয়। এই পাপ বাসনা অন্তরকে দগ্ধ করে ও মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ পথে পরিচালিত করে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই পাপক্রিয়া পরিসমাপ্ত হয়। অন্তর কেবল সেই দগ্ধ অঙ্গারের বিষম জ্বালাতে অস্থির হয়। ভিতরে গম্ভীর বজ্র নিনাদ ও তিরস্কার শ্রুত হয়, এবং মহাভীষণ দণ্ডপ্রদানোদ্যত এক মূর্ত্তি তাহাদিগকে ভীত করিতে থাকে। ঈশ্বরের এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখে নাই এমন মানুষ বিরল। দ্বিতীয় ভয়ের কারণ এইটি।

এই সমস্ত ভয়ের কারণ নিরসন করিবার উপায় অন্বেষণ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এই জন্য মানুষ ভয়ের দেবতা কল্পনা করিয়া তাহার পূজা করে। ইহুদিরা খুব ভয়ানক দেবতা কল্পনা করিয়াছে। যিহোবার হুঙ্কার ধ্বনিতে তাহারা একেবারে কম্পিত-কলেবর হয়। যে জাতি যে দেশ ভয়ানক কুৎসিত পাপ ব্যভিচারে নিমগ্ন, সে দেশে এমন দেবতা না হইলে চলিবে কেন? এই দেশও যখন মদ ও ব্যভিচারে নিতান্ত অধঃপতিত হইয়াছিল, তখনই এ দেশে এই কালীপূজা আরম্ভ হইয়াছে। কথিত আছে, যখন দারুবনে ঋষিগণ মহাপাপাচরণে প্রবৃত্ত হইল, যাহারা মানবজাতিকে ধর্ম্ম পথে পরিচালিত করিবে তাহারাই পাপপথের পথিক হইয়া সমস্ত মানবজাতিকে পাপে প্রবৃত্ত করিল, তখন বিষ্ণু পৃথিবী প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া মহাদেবের নিকটে ইহার উপায় জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন,"আমি কালী তারা মন্ত্রে পৃথিবীর এই পাপ দমন করিব। ইহা হইতেই তান্ত্রিক মতের উৎপত্তি। ইহা অতি ভয়ানক কুৎসিত ব্যাপার, ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেহ বলেন কালী আর্য্য জাতীর দেবতা নহে, অনার্য্যজাতির দেবতা। সে যাহা হউক, কালী যে পাপদমন মূর্ত্তি তাহার আর সন্দেহ নাই। মদ, ব্যভিচার ও নানা প্রকার আসুরিক ভাব দমন উদ্দেশেই কালীমূর্ত্তির কল্পনা। এই প্রকার ভীষণ মূর্ত্তি না দেখিলে পাপাচারিগণের ভয় হইবে কেন? যেখানে পাপ সেখানেই ঈশ্বরের ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি। যেখানে পাপ নাই, সেখানে তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি। ঈশ্বরের মাতৃমূর্ত্তিতে আমরা সুকোমল, সুমিষ্ট ভাব দেখিতে পাই। আমাদের পাপ বাড়িলে তিনি ভয়ঙ্কর উগ্র মূর্ত্তিতে গভীর হুঙ্কারে আমাদিগকে, রে অধম, কেন পাপ করিলি বলিয়া তিরস্কার করেন। তাঁহার এই মূর্ত্তি, এই শব্দ শুনিয়া কাহার সাধ্য ভীত না হইয়া স্থির থাকে। ঈশ্বর আমাদের ভাবের অনুরূপ হইয়া প্রকাশিত হন। আমরা যদি তাঁহাকে ক্রোধের অতীত বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার শান্ত ভাব কল্পনা করি, তাঁহার ভয়ের মূর্ত্তি ভুলিয়া যাই, তবে আমাদের জীবন ঠিক ভাবে গঠিত হইবে না, আমরা কখনও পাপ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইব না। শিশু পার্কারও সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়াছিলেন। তিনি শিশু ছিলেন, তথাপি সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। তিনি এই শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়া জননীর নিকট গমন করিয়াছিলেন।

আমরা বিবেক বলি, আর ঈশ্বরের শব্দ বলি, যাহা বলি ইহা যে ঈশ্বরের ভয়ের মূর্ত্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সত্যসত্যই আমরা ইহাতে ভীত হই, এবং ইহারই জন্য পাপপথ হইতে পুনরাবৃত্ত হই। প্রতিনিয়ত পাপে পতনের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ঈশ্বরের এই ভীষণ মূর্ত্তি কখনও আমাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় না। আজ এদেশে এই ভয়ঙ্করা দেবীর পূজা। এই দেবীর নাম কালী। ইহা আর্য্যের দেবতা হউক অথবা অনার্য্যসেবিত দেবতা হউক, আর যাহাই হউক, এই মূর্ত্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা এই প্রকার মূর্ত্তি দেখিব, এমন কখনও মনে করি না। কথা এই যে, এই মূর্ত্তি পাপঘাতিনী। যেখানে ভয়ানক পাপ ব্যভিচার, সেখানে এই মূর্ত্তি সেবিতা হইবেই হইবে। ইহা ভিন্ন জীবনে চৈতন্যোদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহা হইতে মৃত্যুচিন্তা উপস্থিত হয়। সেই নরমুণ্ডমালাযুক্ত ভীষণ রক্তলোলুপ লোলজিহ্বা সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া পাপীর মস্তক যেন আপনা হইতে খণ্ডিত হইয়া পড়ে, মৃত্যু আসিয়া পাপাচারীকে যেন দৃঢ় আকর্ষণ করে, মৃত্যু-চিন্তা মানুষের হৃদয়ে স্থান পাইবার অবসর পায়। কালীমূর্ত্তির সাধন মানুষের পক্ষে প্রয়োজন, কেন না পাপপরিত্যাগ ও মৃত্যুচিন্তা এ দুই দ্বারা জীবনগঠন আবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা জরা ব্যাধি মৃত্যু চিন্তা করেন,ইহাতে তাঁহাদের ঈশ্বরের ভয়ের মূর্ত্তি চিন্তাই হইয়া থাকে। যোগীর পক্ষে মৃত্যুচিন্তা অতীব প্রয়োজন, কারণ মৃত্যুচিন্তা ভিন্ন সংসারাসক্তি তিরোহিত হয় না। অতএব এদেশে আজ যে পূজাতে প্রবৃত্ত, তাহাতে আমাদের জীবনের উপযোগী ভাব আছে। আমরা যেন ঈশ্বরের ভয়ের আকার কখনও

বিস্মৃত না হই, সর্ব্বদা যেন তাঁহাকে ভয় করি। তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দেখিব, তথাপি সেই মূর্ত্তির ভিতরেও আমাদের শাসন ও প্রবৃত্তি বাসনা হইতে রক্ষার জন্য তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লুক্কায়িত আছে, ইহা স্মরণ করিব। আমাদের ভোগ সুখ বিনাশ হইবে এ জন্য আমরা ভীত হইব না; কিন্তু প্রবৃত্তির কুহকে পড়িয়া পাপাসক্ত না হই, তজ্জন্য সর্ব্বদা ভীত থাকিব এবং মৃত্যুচিন্তাপরায়ণ হইয়া সমস্ত আসক্তি হইতে দূরে থাকিব, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হে করুণানিধান, আমরা সর্ব্বদা ভীত থাকি, এ ব্যবস্থা তুমি আমাদের কল্যাণের জন্য করিয়াছ। আমাদের চারিদিক্ যেন শত্রুগণে পরিবেষ্টিত। একবার যদি মন কুপথের পথিক হয়, অমনি তাহারা আমাদিগকে ডাকিয়া নেয়, আর আমাদের পাপপ্রবৃত্তিচরিতার্থের উপায় করিয়া দেয়। এই বিপদের সময় তোমার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি না দেখিতে পাইলে আমরা আর কি পাপপথ পরিত্যাগ করি? সামান্য এক খণ্ড মেঘ আকাশে উঠে; কিন্তু তাহা হইতে ভয়ঙ্কর অশনিপাত হইয়া কত অনিষ্ট হয়। তেমনি হৃদয়াকাশে উদিত সামান্য বাসনা কামনা সমস্তজীবনবিনাশের কারণ হয়। হে রক্ষাকর্ত্তা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা ইহা হইতে রক্ষা করিতেছ। ভোগসুখবিনাশের এত ভয় এত সম্ভাবনা না থাকিলে কখনও কি জীব ভোগস্পৃহাতে বীতরাগ হইত? হে কৃপাময়, পরম মঙ্গল অভিপ্রায় হইতে তুমি আমাদিগকে নিত্য ভয়ের অধীন করিয়াছ। এইক্ষণ এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সর্ব্বদা তোমার ভয়ে ভীত থাকি, সকল সমস্ত ভোগসুখ অসার জানিয়া তাহাতে বীতরাগ হই; মৃত্যু আমাদিগের সমস্ত বাসনা কামনা বিনাশ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া মৃত্যুচিন্তাপরায়ণ ও অমরধামলাভের প্রত্যাশায় যেন ব্যাকুল হই। কৃপা করিয়া সকলকে পাপ ভয়ে ভীত কর, তব শ্রীপাদপদ্মে এই ভিক্ষা করিয়া আশা ও ভক্তির সহিত তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

সংবাদ।

বিগত ২২ শে ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুওয়ারি পর্য্যন্ত করাচি নগরের ব্রহ্মোৎসব হওয়ার প্রোগ্রাম আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

উপলক্ষে ইংরাজী নববর্ষের উপলক্ষে প্রচার কার্য্যালয়ের পুস্তকাবলী আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নগদ মূল্য ও অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইবে।

আগামী ১লা জানুয়ারি রবিবার হইতে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট প্রচারকার্য্যালয়ে মাঘোৎসবের প্রস্তুতির জন্য প্রাথমিক সাধন আরম্ভ হইবে।

ব্রাহ্ম বেনেভোলেণ্ট এণ্ড কো অপারেটিভ এসোসিয়েসনের ১৮৯৭ সালের রিপোর্ট সাধারণ সভা কর্ত্তৃক পাশ হইয়াছে। এক্ষণে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিতের জন্য প্রস্তুত আছে। শীঘ্রই মেম্বরগণ প্রাপ্ত হইবেন।

ময়মনসিংহের নববিধানসমাজের উৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ঢাকা হইতে শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায় তথায় গিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কিয়দ্দিনের জন্য বিহার প্রদেশে গিয়াছেন। গত রবিবার উপাসনাবাসে সামাজিক উপাসনার কার্য্য উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় সম্পাদন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পৌষ মাসের প্রথম পক্ষে কয়েক দিন ব্যাপিয়া চট্টগ্রাম নব বিধান সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় উপাচার্য্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত প্রধানতঃ উপাসনাদিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। নগরসংকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

বিগত বুধবার বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নবকুমারীর জাতকর্ম্মক্রিয়া কুমারীর মাতামহ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের কাশীপুরস্থ আবাসে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত শনিবার চট্টগ্রামনিবাসী সদাড়পুরী কলেক্টর শ্রীমান রমেশচন্দ্র সিংহের প্রথম কুমারের জাতকর্ম্ম কুমারের মাতামহ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায়ের পাথরিয়াঘাটাস্থ ভবনে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ১ম ও ২য় খণ্ড বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ৩য় খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রস্থ। আশা করি গ্রাহকগণ শীঘ্রই উহা প্রাপ্ত হইবেন। ইতিমধ্যে গ্রাহকগণের আগ্রহ ও অনুগ্রহ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইয়াছি এবং যাহাতে আগামী চৈত্র মাসের মধ্যেই প্রতিশ্রুত ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত শেষ হয় এইরূপ চেষ্টা করা হইতেছে।

গত ১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তের এক স্থলে তাঁহার মাতুল মহাশয় একপ লিখিয়াছেন যে, সামাজিক উৎপীড়নাদি জন্য এক সময় গুপ্ত পরিবারের পতন হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, বালক প্যারীমোহনের দৃঢ়তায় সেই পতন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইহা পাঠ করিয়া প্যারীমোহনের পিতা মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, প্যারীমোহনের দৃঢ়তায় পরিবার রক্ষা পাইয়াছিল এ কথা ঠিক নয়, তাঁহার নিজের দৃঢ়তায় রক্ষা পাইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, আমাদের রামপুরহাটস্থ বন্ধু তথাকার সম্ভ্রান্ত উকিল বাবু অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বহুমূত্র রোগে গত কল্য ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রামপুরহাট ব্রহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। যদিচ দুর্ব্বলতাবশতঃ সামাজিকবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বহু সদ্গুণ ছিল, তজ্জন্য তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমাদের বন্ধু স্ত্রী কন্যাদি বৃহৎ পরিবার রাখিয়া পরলোকগামী হইয়াছেন। [illegible]

ময় ঈশ্বর পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যাদিগকে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বড় দিনের ছুটীর মধ্যে অনেকগুলি স্থানে ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে চন্দন নগরের ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবকার্য্যসম্পাদনার্থ ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী তথায় গিয়াছিলেন। বাবু কালীনাথ ঘোষ সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন। মেটে বুরুজের উৎসবে ভাই অমৃত লাল বসু ও কান্তি চন্দ্র মিত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের উৎসবে উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্র এবং সঙ্গীতনিপুণ শ্রীমান মনোমোহন দে গিয়াছিলেন। হুগলি জিলার অন্তর্গত দশঘরা গ্রামের সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ও শ্রীমান আশুতোষ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীমান অনন্তানন্দ রায়ও সেই উৎসবে সহিত যোগ দিয়াছিলেন। আশুতোষ রায় সংকীর্ত্তন ও প্রাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিগত ৩ রা পৌষ শনিবার ভাগলপুরস্থ প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরি নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরলোকগত ক্ষেত্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর শুভ বিবাহ কলিকাতা নগরে নববিধান বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স অনুমান ২৩ বৎসর। তিনি ভাগলপুরের ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত। পাত্রীর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর, তিনি বেথুন বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এই বিবাহে আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উদ্বাহকার্য্য অতি সমারোহের সহিত সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নব দম্পতীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদিগণ দয়া করিয়া এদেশের ব্রহ্মমন্দির সকলের জীর্ণ সংস্কার করিবার জন্য সাতশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। সেই টাকা বিতরণের ব্যবস্থার জন্য কলিকাতাস্থ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কতিপয় ব্রাহ্ম লইয়া একটী কমিটিতে অর্পিত হইয়াছে। যে সকল মন্দিরের ট্রষ্টি আছে, জীর্ণ শীর্ণ ও বিগত ভূমিকম্পে ভগ্ন সেই সকল ব্রহ্মমন্দিরের জীর্ণসংস্কারের সাহায্যার্থ উক্ত কমিটী বিবেচনা মত কিছু কিছু অর্থ দান করিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, ভূমিকম্পের দৌরাত্ম্যে ভূতলশায়ী ময়মনসিংহ নববিধান মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণার্থ ২০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। ময়মনসিংহস্থ নববিধান মন্দির দুইবার ভূমিকম্পে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। এবার তথাকার বিধানবাদী বন্ধুগণ মন্দিরের ইটের ছাদ না করিয়া করগেটেড আয়রণের ছাদ করিয়াছেন।

কটক হইতে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু লিখিয়াছেন;—"আচার্য্যদেবের জন্ম দিন উপলক্ষে আমার বাসভবনে সায়ংকালে বন্ধুসম্মিলনী হয়। (প্রাতঃকালে অবশ্য বিশেষ ভাবে পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল।) স্থানীয় ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা ব্যতীত অনেক গুলি বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। আমার বাসস্থানটি বেশ পরিষ্কার এবং অনেকগুলি ফুলের টব আছে, সেই গুলির কএকটি দিয়া এবং ফল দিয়া গৃহটি সুন্দর রূপে সাজান হইয়াছিল এবং আলোক জ্বালিয়া দিয়া আলোকিত করা হইয়াছিল। খানিকটা Evening Partyর মত হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বালকবালিকাদের আমোদ ও সঙ্গীত হইয়াছিল। এখানে দুটী ছোট মেয়ে বড় সুন্দর গায়। কবির সঙ্গে মিলিয়া বলিব কি, "কোকিল কলকণ্ঠবিনিন্দিত স্বর।" প্রায় আট টার সময় আমি সংক্ষেপে উপাসনা করি এবং ভ্রাতা মধুসূদন জীবন বেদ হইতে "অগ্নিমন্ত্র" বিষয়টি সুন্দররূপে পাঠ করেন। উপাসনান্তে চা পান ও নানা প্রকার মিঠাই খাওয়া হয়। ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সকলেই হৃষ্টমনে ঘরে যান, ভিখারীর ঘরে এমন উৎসব।

"Lieutenant Governorএর আগমন উপলক্ষে এখানে অনেক রাজা এবং সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ৪ঠা হইতে ১০।১২ই পর্য্যন্ত এখানে ছিলেন। বহুসংখ্যক Notice বিতরণ করিয়া এবং স্থানীয় সংবাদ পত্রে সংবাদ দিয়া ১০ই ডিসেম্বর রাত্রি ৬॥০ টার সময় Printing Companyর হলে আমি ব্রহ্মদর্শনবিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম বক্তৃতাটী প্রায় ১॥০ ঘণ্টা কাল হইয়াছিল। প্রায় ১৫০ জন ভদ্রলোক; তাহার মধ্যে অনেক গুলী বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্থির হইয়া শুনিয়াছিলেন। সাধন ব্রহ্মানুরাগে আরম্ভ হইলে সোপানের পর সোপান দিয়া কেমন করিয়া সাধক ব্রহ্মদর্শনের অবস্থা লাভ করেন এবং দর্শন লাভ করিলে জীবনে তাহার প্রভাব কিরূপ হয় এবং ব্রহ্মদর্শন না হইলে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায় না, তাহাই যথাসাধ্য বলিয়াছিলাম। এই বিষয়টি ভাবিতে ভাবিতে নিজ জীবনে হরিলীলা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। "অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবায় গীত গায়, বধির শুনে।" প্রাণেশ্বরের লীলা দেখে অবাক্ হইয়া যাইতেছি। এমন অধমের প্রতি এত প্রেম কেন? পথের ভিখারী হয়ে অন্ন কষ্টে সপরিবার যাহার প্রাণত্যাগ হওয়া উচিত, তাদের এত সুখ দেওয়া কেন?"

বড়দিনের ছুটীর মধ্যে ঢাকার নববিধান সমাজের উৎসব হইয়া গিয়াছে। গত শনিবার ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় "ঈশা জীবন" বিষয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "ঈশাজীবন কি কারণে আমাদের দেশে গৃহীত ও আদৃত হইতেছে না," এবিষয়ে ইংরেজিতে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক প্রীতিভাজন শ্রীমান নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১১ই পৌষ রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। সেই দিন প্রাতঃকালে শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের আবাসে উপাসনা হয়, তাহাতে অনেক গুলি যুবক যোগদান করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে ঢাকা কলেজের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেন ঈশার উপদেশ পাঠ ও তাহার

সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর দুই ঘণ্টা কাল শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায় খ্রীষ্টজন্মসম্বন্ধে কথকতা করিয়াছিলেন। পরে সন্ধ্যার পর মন্দিরে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা করিয়াছিলেন।

প্রেরিত।

মাঘোৎসবে সম্মিলন ভিক্ষা।

এ যুগে ভগবানের পবিত্র লীলার আদিভূমি মহানগরী কলিকাতা ব্রাহ্মগণের তীর্থভূমি! তীর্থযাত্রা, সাধুসঙ্গলাভ, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সমতানে ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য। সকল ধর্ম্মভাবের সমন্বয় সাধন যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য তাঁহাদের সেরূপ কার্য্য যে জীবনে অতি আদরণীয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই কলিকাতার মাঘোৎসব ব্রাহ্মদিগের এত আদরের সামগ্রী। আজ কাল ব্রাহ্মদিগের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক উৎসব আছে। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মগণ বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সাধু সজ্জন সহ সমবেত হইয়া ভগবানের পূজা বন্দনা করিয়া উৎসবাদি সম্ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকাতা মাঘোৎসবের তুলনায় সে সকলই ক্ষুদ্র উৎসব। এই উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া ঈশ্বরের পূজা বন্দনা করিবেন, প্রতিজনের ভাবপ্রবাহের মিলনে এমন মহাভাব তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, যাহাতে ডুবিয়া স্নাত হইয়া সন্তরণ করিয়া কত শুষ্ক প্রাণ সরস হইবে, কত অপবিত্র মন পবিত্র হইবে, মহাভাবে বিভোর হইয়া কত জীবন চিরদিনের জন্য ব্রহ্মচরণে আত্মোৎসর্গ করিবে। ভগবানের কৃপার চিহ্নস্বরূপ এত গুলি পিপাসু আত্মা তাঁহার নামে একত্র হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াও কত অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে। মাঘোৎসব এইজন্য ব্রাহ্মদিগের আশা ও আনন্দের সামগ্রী। বাস্তবিক যখন সুপ্রশস্ত পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে শত শত কণ্ঠ হইতে সমতানে সত্যং জ্ঞানং প্রভৃতি ভগবানের স্বরূপ উচ্চারিত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরের আকাশ প্রতিধ্বনিত করে, যখন শত শত কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারিত হইয়া ভগবানের পবিত্র পাদপদ্ম স্পর্শ করে, তখনকার অবস্থা বাস্তবিক ধরাধামে স্বর্গরাজ্য অবতরণের ব্যাপার। সে দৃশ্য দেখিয়া কেহ জীবনে ভুলিতে পারেন বোধ হয় না। আবার এক বৎসর পর এই পবিত্র মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। শ্রীহরি যাঁহাকে কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান ও উৎসবসম্ভোগে অধিকারী করিবেন, তিনিই উৎসব সম্ভোগ করিবেন।

এই সময়ে একটী কথা মনে হইয়া প্রাণকে কষ্ট দেয়, তাই এখানে প্রাণের কথা উল্লেখ প্রয়োজন। জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আদর্শস্থানীয় প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের পূজা উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইবেন বলিয়া দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মগণ সমবেত হন। কিন্তু নানা স্থান হইতে সমাগত ব্রাহ্মগণ মাঘোৎসব উপলক্ষে মিলিত হইয়া যখন প্রেরিত প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অমিলন বিচ্ছিন্ন অবস্থা দেখিতে পান, তখন কেমন যে একটি মনোভঙ্গকর ভাব উপস্থিত হয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। প্রেরিত প্রচারক মহাত্মাদিগের উজ্জ্বল জীবনের সমবেত জ্যোতীরূপ মহাযজ্ঞের উত্তাপে কত শীতল প্রাণে অগ্নি প্রবেশ করিবে, কত [illegible] কৃতার্থ হইবে, এ দৃশ্যাক আর এ দুর্ভাগ্যদের জীবনে সন্দর্শন ঘটিবে না? আমরা ভগবানের কৃপার ভিখারী, প্রেরিত প্রচারক ভক্তদিগেরও কৃপার ভিখারী। আমরা ভগবানের চরণতলে যেমন আমাদের আবদার জানাইব, প্রেরিত প্রচারক মহাত্মাদিগের চরণেও আমাদের প্রাণের [illegible] করিবার আছে? আমরা বলি তাঁহারা আমাদের সম্পত্তি [illegible] ন্যায় পাপী তাপীদিগের উদ্ধারকার্য্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য তাঁহারা ভগবান্ কর্ত্তৃক আহূত। আমাদের নিকট তাঁহারা ভগবানের পবিত্র দান। তাঁহাদিগকে সমবেত ভাবে লাভ আমাদের অধিকার। এ অধিকার হইতে আর কতকাল আমরা বঞ্চিত থাকিব? প্রার্থনা করি আমাদের [illegible] দ্বারা ভগবান্ তাঁহাদের প্রাণকে সম্মিলনের জন্য আকৃষ্ট করুন। তিনি মিলন সংঘটন না করিলে অন্যের সাধ্য কি মিলন ঘটায়।

টাঙ্গাইল } কৃপাভিখারী
প্রণত শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

আমাদিগের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৩রা পৌষ হইতে ৭ই পৌষ, এই পাঁচ দিন উৎসব হয়। সমস্ত দিনের উৎসব ৪ পৌষ রবিবার বিধানাশ্রমেই হইয়াছিল। ৫ পৌষ সোমবার আমাদিগের নূতন মন্দিরের ছাদতলে সকালে বিকালে উপাসনা হয়। টিনের চালা হইয়াছে, শাল কাঠের খুঁটি ঘরে লাগান গিয়াছে। বারান্দায় ইটের গাঁথুনি [illegible] কথা। ৩০০ টাকার উপর এযাবৎ ব্যয় হইয়াছে। প্রায় ১২০০ টাকা ব্যয় হওয়া সম্ভব। টাকার কথা আর কি বলিব, যাহা ব্যয় হইয়াছে, অধিকাংশ ঋণ করিয়া হইয়াছে।

বিলাতের টাকা কিছু আমরা পাইব কি না জানি না। ৬ই পৌষ মহিলাদিগের উৎসবের দিন, অপরাহ্নে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ বিষয়ে কথকতা করিয়াছিলেন। বিষয়টি এমনি ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, সকলের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। ৭ই নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ৮ই পৌষ আমার কন্যার নামকরণ হয়, নাম শ্রীমতী সুধাময়ী ও সুপ্রভা দেবী রাখা হইয়াছে।

এবার উৎসবের ব্যাপার বিধাতার বিশেষ কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুর্গানাথ বাবু আসাতে আমরা খুব উপকৃত হইয়াছি। আর আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ জজ এ, সি সেন মহোদয় আদ্যোপান্ত উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ } শ্রীবৈদ্যনাথ কর্ম্মকার।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ১৭ই পৌষ কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।